পদার্থবিজ্ঞান

দাখিল

নবম–দশম শ্রেণি

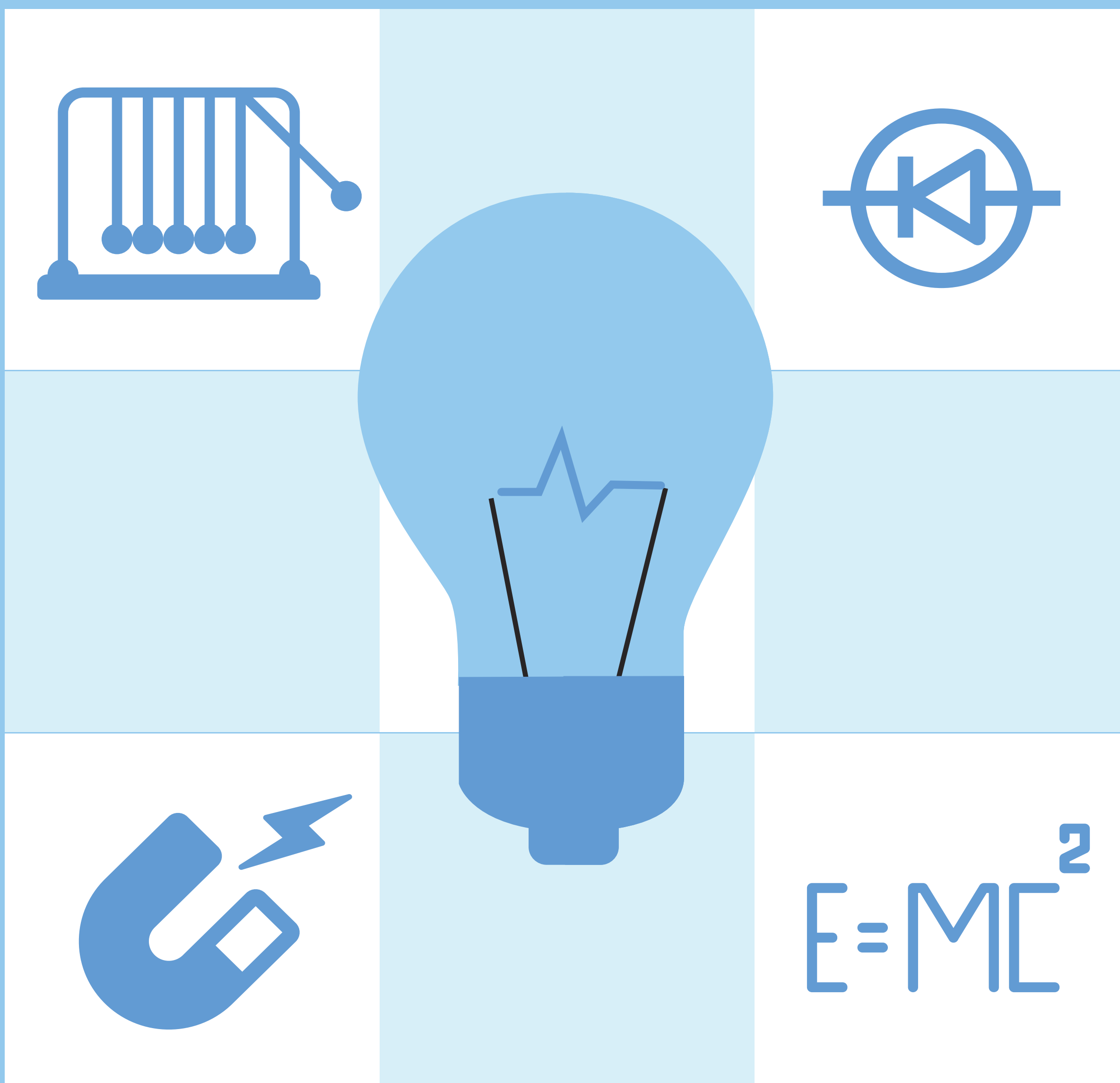

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

মুক্তিযুদ্ধের কয়েকজন শহিদ বুদ্ধিজীবী

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় জ্ঞানী-গুণী ও মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ যাঁরা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসর রাজাকার, আলবদর, আল শাম্‌স বাহিনী কর্তৃক পরিকল্পিতভাবে হত্যাযজ্ঞের শিকার হয়েছিলেন তাঁরাই শহিদ বুদ্ধিজীবী। শহিদ বুদ্ধিজীবীদের স্মৃতির উদ্দেশে বাংলাদেশে ১৪ই ডিসেম্বর শোকাবহ শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত হয়। বুদ্ধিজীবী হত্যা ছিল বাঙালিদের মেধাশূন্য করার জন্য পাকিস্তানি শাসকদের নীলনকশার বাস্তবায়ন। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর নির্দেশনা ও মদদে একশ্রেণির ঘৃণ্য দালাল এই হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত করে।

২০১০ সালে শেখ হাসিনা সরকারের আমলে গঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডে জড়িত সাজাপ্রাপ্তদের অনেকের প্রাণদণ্ড ইতোমধ্যে কার্যকর হয়েছে। বাকিদের বিচার বাস্তবায়নের কাজ এগিয়ে চলছে। কালো পতাকা উত্তোলন, জাতীয় পতাকা অর্ধনমিতকরণ, মিরপুর শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ, শহিদদের স্মরণে আলোচনা সভা, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, মিলাদ মাহফিলসহ নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে বিনম্র শ্রদ্ধায় দিবসটি পালিত হয়।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে
দাখিল নবম-দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

পদার্থবিজ্ঞান

দাখিল

নবম-দশম শ্রেণি

সহজপাঠ্য, আকর্ষণীয় ও সহজবোধ্য করার জন্য পরিমার্জিত সংস্করণে
প্রয়োজনীয় সংযোজন, পরিবর্ধন, পুনর্লিখন ও সম্পাদনা

ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল

ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ

পূর্ববর্তী সংস্করণ রচনা

ড. শাহজাহান তপন

ড. রানা চৌধুরী

ড. ইকরাম আলী শেখ

ড. রমা বিজয় সরকার

পূর্ববর্তী সংস্করণ সম্পাদনা

ড. আলী আসগর

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা

কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ: সেপ্টেম্বর, ২০১২

পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশ: সেপ্টেম্বর, ২০১৭

পুনর্মুদ্রণ: , ২০২২

প্রচ্ছদ: নাসরীন সুলতানা মিতু

চিত্রাঙ্কন: মেহেদী হক, নাসরীন সুলতানা মিতু, রোমেল বড়ুয়া

আলোকচিত্র: সাস্ট SUPA ও সংগৃহীত

ফন্ট প্রণয়ন: মো. তানবিন ইসলাম সিয়াম

বুক ডিজাইন: মেহেদী হক, নাসরীন সুলতানা মিতু

পেইজ মেকাপ: মাহবুবুর রহমান খান

পরিমার্জিত সংস্করণ সার্বিক সমন্বয় ও সহযোগিতা: মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ-কথা

ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার জন্য শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষার যোগ্য করে তোলা মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। শিক্ষার্থীকে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত পটভূমির প্রেক্ষিতে দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক করে তোলাও মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের সকল পাঠ্যপুস্তক। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ থেকে শুরু করে ইতিহাস ও ঐতিহ্যচেতনা, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিবোধ, দেশপ্রেমবোধ, প্রকৃতি-চেতনা এবং ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার প্রতি সমমর্যাদাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করার প্রত্যয় ঘোষণা করে ২০০৯ সালে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর হাতে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক তুলে দেওয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন। তাঁরই নির্দেশনা মোতাবেক ২০১০ সাল থেকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ শুরু করে। সেই ধারাবাহিকতায় উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ভিশন ২০৪১ সামনে রেখে পাঠ্যপুস্তকটি সময়োপযোগী করে পরিমার্জন করা হয়েছে।

সভ্যতার শুরু থেকেই প্রযুক্তি বিকাশের যে অধ্যায় শুরু হয়েছে তার সাথে পদার্থবিজ্ঞান ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রকৌশলশাস্ত্র, চিকিৎসা-বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, সমুদ্রবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান সর্বত্র পদার্থবিজ্ঞানের পদ্ধতি ও যন্ত্রপাতির প্রভূত ব্যবহার রয়েছে। মূলত এ বিষয়গুলোকে সামনে রেখেই **পদার্থবিজ্ঞান** পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে। বিষয়বস্তু বিন্যাস ও গ্রন্থনার ক্ষেত্রে আমাদের চারপাশে সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনার আলোকে পদার্থবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক ধারণাকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অনুসন্ধানমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে বিষয়টির ব্যবহারিক গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। বিষয়টি শিক্ষার্থীদের কাছে সহজপাঠ্য, আকর্ষণীয় ও সহজবোধ্য করার জন্য ২০১৭ সালে পাঠ্যপুস্তকটিতে পরিমার্জন, সংযোজন ও পরিবর্ধন করা হয়েছে।

২০১৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে মাধ্যমিক স্তরে প্রবর্তিত পাঠ্যপুস্তক মাদ্রাসা শিক্ষার বৈশিষ্ট্য উপযোগী করে দাখিল স্তরের পাঠ্যপুস্তকরূপে প্রবর্তন করা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন, নমুনা প্রশ্নাদি প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায়	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	ভৌত রাশি এবং পরিমাপ	১
দ্বিতীয়	গতি	৩১
তৃতীয়	বল	৬১
চতুর্থ	কাজ, ক্ষমতা ও শক্তি	৯৭
পঞ্চম	পদার্থের অবস্থা ও চাপ	১২৭
ষষ্ঠ	বস্তুর ওপর তাপের প্রভাব	১৬০
সপ্তম	তরঙ্গ ও শব্দ	১৮৭
অষ্টম	আলোর প্রতিফলন	২১১
নবম	আলোর প্রতিসরণ	২৪২
দশম	স্থির বিদ্যুৎ	২৭৮
একাদশ	চল বিদ্যুৎ	৩০৭
দ্বাদশ	বিদ্যুতের চৌম্বক ক্রিয়া	৩৩৮
ত্রয়োদশ	আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান ও ইলেকট্রনিকস	৩৫৫
চতুর্দশ	জীবন বাঁচাতে পদার্থবিজ্ঞান	৩৮৯

প্রথম অধ্যায়

ভৌত রাশি এবং পরিমাপ

(Physical Quantities and Their Measurements)

অত্যন্ত নিখুঁতভাবে সময় মাপার জন্য তৈরি এটমিক ক্লক

বিজ্ঞান বলতেই হয়তো তোমাদের চোখে বিজ্ঞানের নানা যন্ত্রপাতি, আবিষ্কার, গবেষণা, ল্যাবরেটরি— এসবের দৃশ্য ফুটে ওঠে, বিজ্ঞানের আসল বিষয় কিন্তু যন্ত্রপাতি, গবেষণা বা ল্যাবরেটরি নয়, বিজ্ঞানের আসল বিষয় হচ্ছে তার দৃষ্টিভঙ্গি। এই সভ্যতার সবচেয়ে বড় অবদান রেখেছে বিজ্ঞান আর সেটি এসেছে পৃথিবীর মানুষের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। বিজ্ঞানের রহস্য অনুসন্ধানের জন্য কখনো সেটি যুক্তিতর্ক দিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়, কখনো ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়, আবার কখনো প্রকৃতিতে এই প্রক্রিয়াটিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করা হয়। সেই প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত অসংখ্য বিজ্ঞানী মিলে বিজ্ঞানকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। এই অধ্যায়ে পদার্থবিজ্ঞানের এই ক্রমবিকাশের একটি ধারাবাহিক বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

পদার্থবিজ্ঞানের ইতিহাস পড়লেই আমরা দেখব এটি তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক বিজ্ঞানীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছে। ল্যাবরেটরিতে গবেষণা করতে হলেই নানা রাশিকে সূক্ষ্মভাবে পরিমাপ করতে হয়। পরিমাপ করার জন্য কীভাবে এককগুলো গড়ে উঠেছে, সেগুলো কীভাবে পরিমাপ করতে হয় এবং পরিমাপের জন্য কী ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হয় সেগুলোও এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- পদার্থবিজ্ঞানের পরিসর ও ক্রমবিকাশ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পদার্থবিজ্ঞান পাঠের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারব।
- ভৌত রাশি [মান এবং এককসহ] ও পদার্থবিজ্ঞানের মূল ভিত্তি ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পরিমাপ ও এককের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- মৌলিক রাশি ও লব্ধ রাশির পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পরিমাপের আন্তর্জাতিক একক ব্যাখ্যা করতে পারব।
- রাশির মাত্রা হিসাব করতে পারব।
- এককের উপসর্গের গুণিতক ও উপগুণিতকের রূপান্তরের হিসাব করতে পারব। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা, প্রতীক ও চিহ্ন ব্যবহার করে পদার্থবিজ্ঞানের ধারণা এবং তত্ত্বকে প্রকাশ করতে পারব।
- যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে ভৌত রাশি পরিমাপ করতে পারব।
- পরিমাপে যথার্থতা, নির্ভুলতা বজায় রাখার কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারব।
- সরল যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে সুষম আকৃতির বস্তুর ক্ষেত্রফল ও আয়তন নির্ণয় করতে পারব।
- দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত সুষম আকৃতির বস্তুসামগ্রীর দৈর্ঘ্য, ভর, ক্ষেত্রফল ও আয়তন নির্ণয় করতে পারব।

1.1 পদার্থবিজ্ঞান (Physics)

পদার্থবিজ্ঞান বিজ্ঞানের একটা শাখা এবং বলা যেতে পারে এটা হচ্ছে প্রাচীনতম শাখা। তার কারণ অন্য বিজ্ঞানগুলো দানা বাঁধার অনেক আগেই বিজ্ঞানীরা পদার্থবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ শাখা জ্যোতির্বিদ্যা চর্চা করতে শুরু করেছিলেন। পদার্থবিজ্ঞানকে একদিকে যেমন প্রাচীনতম শাখা, ঠিক সেভাবে বলা যেতে পারে এটা সবচেয়ে মৌলিক (fundamental) শাখা। এর ওপর ভিত্তি করে রসায়ন দাঁড়িয়েছে, রসায়নের ওপর ভিত্তি করে জীববিজ্ঞান দাঁড়িয়েছে, আবার জীববিজ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে অন্য অনেক বিষয় দাঁড়িয়ে আছে।

সাধারণভাবে আমরা বলতে পারি বিজ্ঞানের যে শাখা পদার্থ আর শক্তি এবং এ দুইয়ের মাঝে যে অন্তঃক্রিয়া (interaction) তাকে বোঝার চেষ্টা করে সেটা হচ্ছে পদার্থবিজ্ঞান। তোমরা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পেরেছ এখানে পদার্থ বলতে শুধু আমাদের চারপাশের দৃশ্যমান পদার্থ নয়, পদার্থ যা দিয়ে গঠিত হয়েছে, অর্থাৎ অণু-পরমাণু থেকে শুরু করে ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন, কোয়ার্ক বা স্ট্রিং পর্যন্ত হতে পারে। আবার শক্তি বলতে আমাদের পরিচিত স্থিতিশক্তি, গতিশক্তি, মাধ্যাকর্ষণ বা বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় শক্তি ছাড়াও সবল কিংবা দুর্বল নিউক্লিয়ার শক্তিও হতে পারে!

1.2 পদার্থবিজ্ঞানের পরিসর (Scope of Physics)

পদার্থবিজ্ঞান যেহেতু বিজ্ঞানের প্রাচীনতম শাখা এবং সবচেয়ে মৌলিক শাখা, শুধু তাই নয় বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা কোনো না কোনোভাবে এই শাখাকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই পদার্থবিজ্ঞানের পরিসর অনেক বড়। শুধু তাই নয়, পদার্থবিজ্ঞানের নানা সূত্রকে ব্যবহার করে নানা ধরনের প্রযুক্তি গড়ে উঠেছে, সেগুলো আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করি (শেষ অধ্যায়ে চিকিৎসাবিজ্ঞানে ব্যবহার করা হয় সেরকম বেশ কয়েকটি যন্ত্রের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে)। বর্তমান সভ্যতার পেছনে সবচেয়ে বড় অবদান হচ্ছে ইলেকট্রনিকসের এবং এই প্রযুক্তিটি গড়ে ওঠার পেছনেও সবচেয়ে বড় অবদান পদার্থবিজ্ঞানের। দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ছাড়াও যুদ্ধের তাণ্ডবলীলা থেকে শুরু করে মহাকাশ অভিযান—এরকম প্রতিটি ক্ষেত্রেই পদার্থবিজ্ঞানের ব্যবহার রয়েছে। শুধু তাই নয়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা এবং পদার্থবিজ্ঞানকে একত্র করে নিয়মিতভাবে নতুন নতুন শাখা গড়ে উঠেছে যেমন: Astronomy ও পদার্থবিজ্ঞান মিলে Astrophysics তৈরি হয়েছে, জৈব প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করার জন্য জীববিজ্ঞান এবং পদার্থবিজ্ঞান ব্যবহার করে গড়ে উঠেছে Biophysics, রসায়ন শাখার সাথে পদার্থবিজ্ঞান শাখার সম্মিলনে জন্ম নিয়েছে Chemical Physics, ভূ-তত্ত্বে ব্যবহার করার জন্য

পদার্থবিজ্ঞান ব্যবহার করে তৈরি হয়েছে Geophysics এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানে পদার্থবিজ্ঞান ব্যবহার করে গড়ে উঠেছে Medical Physics ইত্যাদি। কাজেই পদার্থবিজ্ঞানের পরিসর সুবিশাল এবং অনেক গভীর। পঠন-পাঠনের সুবিধার জন্য আমরা পদার্থবিজ্ঞানকে দুটি মূল অংশে ভাগ করতে পারি। সেগুলো হচ্ছে:

ক্লাসিক্যাল পদার্থবিজ্ঞান: এর মাঝে রয়েছে বলবিজ্ঞান, শব্দবিজ্ঞান, তাপ এবং তাপগতি বিজ্ঞান, বিদ্যুৎ ও চৌম্বক বিজ্ঞান এবং আলোক বিজ্ঞান।

আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান: কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান এবং আপেক্ষিক তত্ত্ব ব্যবহার করে যে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান গড়ে উঠেছে, সেগুলো হচ্ছে আণবিক ও পারমাণবিক পদার্থবিজ্ঞান, নিউক্লিয় পদার্থবিজ্ঞান, কঠিন অবস্থার পদার্থবিজ্ঞান এবং পার্টিকেল ফিজিকস।

আমরা আগেই বলেছি, পদার্থবিজ্ঞান কিংবা বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখাকে ব্যবহার করে পৃথিবীতে নানা ধরনের প্রযুক্তি গড়ে উঠেছে। এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে আমরা আমাদের জীবনকে সহজ এবং অর্থপূর্ণ করে তুলেছি, আবার কখনো কখনো ভয়ংকর কিছু প্রযুক্তি বের করে শুধু নিজের জীবন নয়, পৃথিবীর অস্তিত্বও বিপন্ন করে তুলেছি। অনেক সময় অকারণে অপ্রয়োজনীয় প্রযুক্তি গড়ে তুলে পৃথিবীর সম্পদ নষ্ট করার সাথে সাথে আমাদের পরিবেশকে দূষিত করে ফেলছি। কাজেই মনে রেখো প্রযুক্তি মানেই কিন্তু ভালো নয়, পৃথিবীতে ভালো প্রযুক্তি যেরকম আছে ঠিক সেরকম খারাপ প্রযুক্তিও আছে। কোনটি ভালো এবং কোনটি খারাপ প্রযুক্তি সেটা কিন্তু তোমাদের নিজেদের বিচারবুদ্ধি ব্যবহার করে বুঝতে হবে।

পদার্থবিজ্ঞান এক দিনে গড়ে ওঠেনি, শত শত বছরে গড়ে উঠেছে। পদার্থবিজ্ঞানীরা তাঁদের চারপাশের রহস্যময় জগৎকে দেখে প্রথমে কোনো একটা সূত্র দিয়ে সেটা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সেই সূত্রকে কখনো গ্রহণ করা হয়েছে, কখনো পরিবর্তন করা হয়েছে, আবার কখনো পরিত্যাগ করা হয়েছে। এভাবে আমরা পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা থেকে শুরু করে মহাবিশ্বের বৃহত্তম আকার পর্যন্ত ব্যাখ্যা করতে শিখেছি। এই শেখাটা হয়তো এখনো পূর্ণাঙ্গ নয়—বিজ্ঞানীরা সেটাকে পূর্ণাঙ্গ করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন, যেন কোনো একদিন অত্যন্ত অল্প কিছু সূত্র দিয়ে আপাতদৃষ্টিতে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের সবকিছু ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়ে যাবে।

নিজে করো

প্রযুক্তি ভালো কিংবা খারাপ হতে পারে কিন্তু জ্ঞান কখনো খারাপ হতে পারে না, পদার্থবিজ্ঞানের আবিষ্কারের আলোকে এর স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

দলীয় কাজ

পদার্থবিজ্ঞানের সূত্র ব্যবহার করে ভালো প্রযুক্তি এবং খারাপ প্রযুক্তি গড়ে উঠেছে সেটি নিয়ে একটি বিতর্কের আয়োজন করো।

1.3 পদার্থবিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ (Development of Physics)

আধুনিক সভ্যতা হচ্ছে বিজ্ঞানের অবদান। বিজ্ঞানের এই অগ্রগতি এক দিনে হয়নি, শত শত বছর থেকে অসংখ্য বিজ্ঞানী এবং গবেষকের অক্লান্ত পরিশ্রমে একটু একটু করে আধুনিক বিজ্ঞান বর্তমান অবস্থায় পৌঁছেছে। মনে রাখতে হবে প্রাচীনকালে তথ্যের আদান-প্রদান এত সহজ ছিল না, বিজ্ঞানের গবেষণার ফলাফল একে অন্যকে জানাতে যথেষ্ট বেগ পেতে হতো, হাতে লিখে বই প্রস্তুত করতে হতো এবং সেই বইয়ের সংখ্যাও ছিল খুব কম। প্রচলিত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কথা বলতে সাহসের প্রয়োজন ছিল। বিজ্ঞানীদের বন্দী করে রাখা বা পুড়িয়ে মারার উদাহরণও রয়েছে। তারপরেও জ্ঞানের অন্বেষণ থেমে থাকেনি এবং বিজ্ঞানীরা প্রকৃতির রহস্য উন্মোচন করে আমাদের এই আধুনিক বিজ্ঞান উপহার দিয়েছেন।

পদার্থবিজ্ঞানের ইতিহাসকে আমরা কয়েকটি পর্বে ভাগ করে বর্ণনা করতে পারি।

1.3.1 আদিপর্ব (গ্রিক, ভারতবর্ষ, চীন এবং মুসলিম সভ্যতার অবদান)

বর্তমানে পদার্থবিজ্ঞান বলতে আমরা যে বিষয়টিকে বোঝাই প্রাচীনকালে সেটি শুরু হয়েছিল জ্যোতির্বিদ্যা, আলোকবিজ্ঞান, গতিবিদ্যা এবং গণিতের গুরুত্বপূর্ণ শাখা জ্যামিতির সমন্বয়ে। গ্রিক বিজ্ঞানী থেলিসের (BC 624-586) নাম আলাদাভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে, কারণ তিনিই প্রথম কার্যকারণ এবং যুক্তি ছাড়া শুধু ধর্ম, অতীন্দ্রিয় এবং পৌরাণিক কাহিনিভিত্তিক ব্যাখ্যা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলেন। থেলিস সূর্যগ্রহণের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন এবং লোডস্টোনের চৌম্বক ধর্ম সম্পর্কে জানতেন। সেই সময়ের গণিতবিদ ও বিজ্ঞানীদের মাঝে পিথাগোরাস (527 BC) একটি স্মরণীয় নাম। জ্যামিতি ছাড়াও কম্পমান তারের ওপর তার মৌলিক কাজ ছিল। গ্রিক দার্শনিক ডেমোক্রিটাস (460 BC) প্রথম ধারণা দেন যে পদার্থের অবিভাজ্য একক আছে, যার নাম দেওয়া হয়েছিল এটম (এই নামটি আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান ব্যবহার করে থাকে)। তবে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় তার ধারণাটি প্রমাণের কোনো সুযোগ ছিল না বলে সেটি সবার কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। সেই সময়কার সবচেয়ে বড় দার্শনিক এবং বিজ্ঞানী এরিস্টটলের মাটি, পানি, বাতাস ও আগুন দিয়ে সবকিছু তৈরি হওয়ার মতবাদটিই অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য ছিল। আরিস্তারাকস (310 BC) প্রথমে সূর্যকেন্দ্রিক সৌরজগতের ধারণা দিয়েছিলেন এবং

তার অনুসারী সেলেউকাস যুক্তিতর্ক দিয়ে সেটি প্রমাণ করেছিলেন, যদিও সেই যুক্তিগুলো এখন কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে। গ্রিক বিজ্ঞান এবং গণিত তার সর্বোচ্চ শিখরে উঠেছিল সর্বকালের একজন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী আর্কিমিডিসের (287 BC) সময় (চিত্র 1.01)। তরল পদার্থে ঊর্ধ্বমুখী বলের বিষয়টি এখনো বিজ্ঞান বইয়ের পঠনসূচিতে থাকে। গোলীয় আয়নায় সূর্যরশ্মিকে কেন্দ্রীভূত করে দূর থেকে শত্রুর যুদ্ধজাহাজে আগুন ধরিয়ে তিনি যুদ্ধে সহায়তা করেছিলেন। গ্রিক আমলের আরেকজন বিজ্ঞানী ছিলেন ইরাতোস্থিনিস (276 BC), যিনি সেই সময়ে সঠিকভাবে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ বের করেছিলেন।

চিত্র 1.01: আর্কিমিডিস এবং আল খোয়ারিজমি

এরপর প্রায় দেড় হাজার বছর জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা প্রায় বন্ধ হয়েছিল। শুধু ভারতীয়, মুসলিম এবং চীনা ধারার সভ্যতা গ্রিক ধারার এই জ্ঞানচর্চাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। ভারতবর্ষে আর্যভট্ট (476), ব্রহ্মগুপ্ত এবং ভাস্কর গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যার অনেক মূল্যবান কাজ করেছেন। শূন্যকে সত্যিকার অর্থে ব্যবহার করার বিষয়টিও ভারতবর্ষে (আর্যভট্ট) করা হয়েছিল। মুসলিম গণিতবিদ এবং বিজ্ঞানীদের ভেতর আল খোয়ারিজমির (783) নাম আলাদাভাবে উল্লেখ করতে হয় (চিত্র 1.01)। তার লেখা আল জাবির বই থেকে বর্তমান এলজেবরা নামটি এসেছে। ইবনে আল হাইয়াম (965) কে আলোকবিজ্ঞানের স্থপতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আল মাসুদি (896) প্রকৃতির ইতিহাস নিয়ে 30 খণ্ডে একটি এনসাইক্লোপিডিয়া লিখেছিলেন। ওমর খৈয়ামের নাম সবাই কবি হিসেবে জানে, কিন্তু তিনি ছিলেন উঁচুমাপের গণিতবিদ, জ্যোতির্বিদ এবং দার্শনিক। চীনা গণিতবিদ ও বিজ্ঞানীরাও পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে অনেক কাজ করেছেন। তাদের মাঝে শেন কুয়োর নামটি উল্লেখ করা যায় (1031), যিনি চুম্বক নিয়ে কাজ করেছেন এবং ভ্রমণের সময় কম্পাস ব্যবহার করে দিক নির্ধারণ করার বিষয়টি উল্লেখ করেছিলেন।

1.3.2 বিজ্ঞানের উত্থানপর্ব

ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে ইউরোপে পদার্থবিজ্ঞানের জগতে একটি বিস্ময়কর বিপ্লবের শুরু হয়, সময়টা ছিল ইউরোপীয় রেনেসাঁর যুগ। 1543 সালে কোপার্নিকাস (চিত্র 1.02) তার একটি বইয়ে সূর্যকেন্দ্রিক একটি সৌরজগতের ব্যাখ্যা দেন (বইয়ের প্রকাশক ধর্মযাজকদের ভয়ে লিখেছিলেন যে এটি সত্যিকারের ব্যাখ্যা নয়, শুধু একটি গাণিতিক সমাধান মাত্র)। কোপার্নিকাসের তত্ত্বটি দীর্ঘদিন লোকচক্ষুর আড়ালে পড়ে ছিল, গ্যালিলিও (1564-1642) সেটিকে সবার সামনে নিয়ে আসেন। তিনি গাণিতিক সূত্র দেওয়ার পর পরীক্ষা করে সেই সূত্রটি প্রমাণ করার বৈজ্ঞানিক ধারার সূচনা করেন। গ্যালিলিওকে (চিত্র 1.02) অনেক সময় আধুনিক বিজ্ঞানের জনক বলা হয়। তবে সূর্যকেন্দ্রিক সৌরজগতের প্রবক্তা হওয়ার কারণে তিনি চার্চের কোপানলে পড়েছিলেন এবং শেষ জীবনে তাঁকে গৃহবন্দী হয়ে কাটাতে হয়। 1687 খ্রিষ্টাব্দে বিজ্ঞানী নিউটন (চিত্র 1.02) বলবিদ্যার তিনটি এবং মহাকর্ষ বলের সূত্র প্রকাশ করেন, যেটি বল এবং গতিবিদ্যার ভিত্তি তৈরি করে দেয়। আলোকবিজ্ঞান এবং অন্য আরো কাজের সাথে সাথে বিজ্ঞানী নিউটন লিবনিজের সাথে গণিতের নতুন একটি শাখা ক্যালকুলাস আবিষ্কার করেছিলেন।

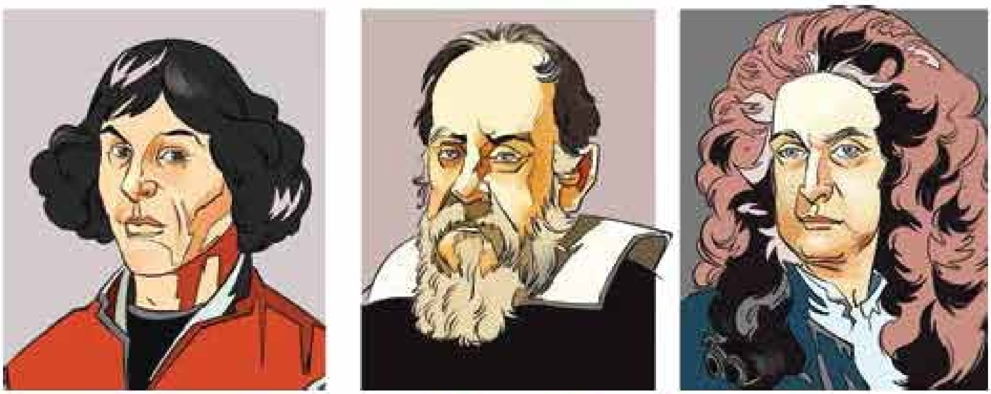

চিত্র 1.02: কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও এবং নিউটন

অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে তাপকে ভরহীন এক ধরনের তরল হিসেবে বিবেচনা করা হতো। 1798 সালে কাউন্ট রামফোর্ড দেখান, তাপ এক ধরনের শক্তি এবং যান্ত্রিক শক্তিকে তাপশক্তিতে রূপান্তর করা যায়। আরও অনেক বিজ্ঞানীর গবেষণার ওপর ভিত্তি করে লর্ড কেলভিন 1850 সালে তাপ গতিবিজ্ঞানের (থার্মোডিনামিক্সের) দুটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র দিয়েছিলেন।

বিদ্যুৎ ও চুম্বকের ওপরেও এই সময় ব্যাপক গবেষণা শুরু হয়। 1778 সালে কুলম্ব বৈদ্যুতিক চার্জের ভেতরকার বলের জন্য সূত্র আবিষ্কার করেন। 1800 সালে ভোল্টা বৈদ্যুতিক ব্যাটারি আবিষ্কার করার পর বিদ্যুৎ নিয়ে নানা ধরনের গবেষণা শুরু হয়। 1820 সালে অরস্টেড দেখান বিদ্যুৎ প্রবাহ দিয়ে চুম্বক তৈরি করা যায়। 1831 সালে ফ্যারাডে এবং হেনরি ঠিক তার বিপরীত প্রক্রিয়াটি আবিষ্কার করেন।

২০২৪

তারা দেখান চৌম্বক ক্ষেত্রের পরিবর্তন করে বিদ্যুৎ তৈরি করা যায়। 1864 সালে ম্যাক্সওয়েল (চিত্র 1.03) তার বিখ্যাত ম্যাক্সওয়েল সমীকরণ দিয়ে পরিবর্তনশীল বিদ্যুৎ ও চৌম্বক ক্ষেত্রকে একই সূত্রের মাঝে নিয়ে এসে দেখান যে আলো আসলে একটি বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গ। বিদ্যুৎ ও চুম্বক আলাদা কিছু নয়, আসলে এ দুটি একই শক্তির দুটি ভিন্ন রূপ। এটি সময়োপযোগী একটি আবিষ্কার ছিল, কারণ 1801 সালে ইয়ং পরীক্ষার মাধ্যমে আলোর তরঙ্গ ধর্মের প্রমাণ করে রেখেছিলেন।

1.3.3 আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের সূচনা

ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই বিজ্ঞানীরা দেখতে লাগলেন প্রচলিত পদার্থবিজ্ঞান দিয়ে অনেক কিছু ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না। 1803 সালে ডাল্টন পারমাণবিক তত্ত্ব দিয়েছেন, 1897 সালে থমসন সেই পরমাণুর ভেতর ইলেকট্রন আবিষ্কার করেছেন, 1911 সালে রাদারফোর্ড (চিত্র 1.03) দেখিয়েছেন, পরমাণুর কেন্দ্রে

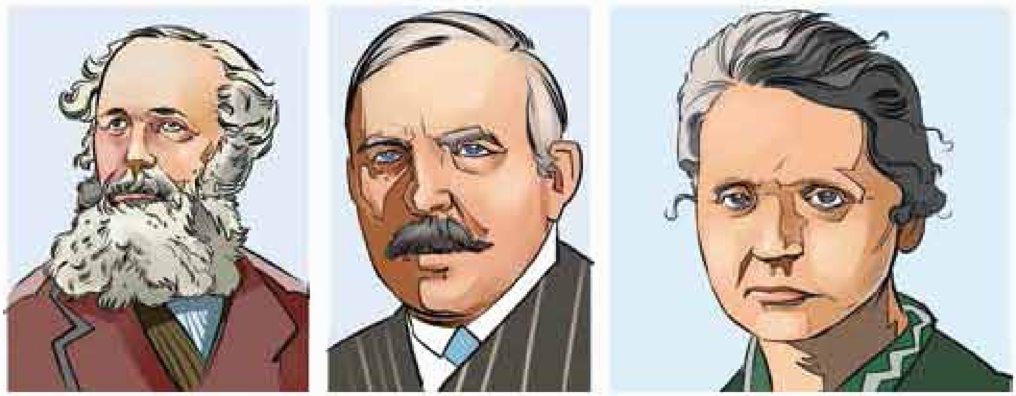

চিত্র 1.03: ম্যাক্সওয়েল, রাদারফোর্ড এবং মেরি কুরি

খুবই ক্ষুদ্র নিউক্লিয়াসে পজিটিভ চার্জগুলো থাকে। কিন্তু দেখা গেল নিউক্লিয়াসকে ঘিরে ঘূর্ণন্ত ইলেকট্রনের মডেলটি কোনোভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না, কারণ বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় সূত্র অনুযায়ী এই অবস্থায় ইলেকট্রন তার শক্তি বিকীরণ করে নিউক্লিয়াসের ভেতর পড়ে যাবে কিন্তু বাস্তবে তা কখনো ঘটে না। 1900 সালে ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক কোয়ান্টাম তত্ত্ব আবিষ্কার করেন, এই তত্ত্ব ব্যবহার করে পরবর্তীতে পরমাণুর স্থিতিশীলতা ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়েছিল। বিকিরণ সংক্রান্ত কোয়ান্টাম সংখ্যায়ন তত্ত্বের সঠিক গাণিতিক ব্যাখ্যা দিয়ে প্রফেসর সত্যেন্দ্রনাথ বসু (চিত্র 1.04) পদার্থবিজ্ঞানের জগতে যে অবদান রেখেছিলেন, তার স্বীকৃতিস্বরূপ একশ্রেণির মৌলিক কণাকে বোজন নাম দেওয়া হয়। 1900 থেকে 1930 সালের এই সময়টিতে অনেক বড় বড় বিজ্ঞানী মিলে কোয়ান্টাম তত্ত্বটিকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গের বাহক হিসেবে ইথার নামে একটি বিষয় কল্পনা করে নেওয়া হয়েছিল এবং 1887 সালে মাইকেলসন ও মোরলি তার অস্তিত্ব আবিষ্কার করার চেষ্টা করে দেখান যে প্রকৃতপক্ষে ইথার বলে কিছু নেই এবং আলোর বেগ স্থির কিংবা গতিশীল সব মাধ্যমে সমান। 1905 সালে

আইনস্টাইনের (চিত্র 1.04) থিওরি অব রিলেটিভিটি থেকে এই বিষয়টির ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। থিওরি অব রিলেটিভিটি থেকেই সর্বকালের সবচেয়ে চমকপ্রদ সূত্র $E=mc^2$ বের হয়ে আসে, যেখানে দেখানো হয় বস্তুর ভরকে শক্তিতে রূপান্তর করা সম্ভব।

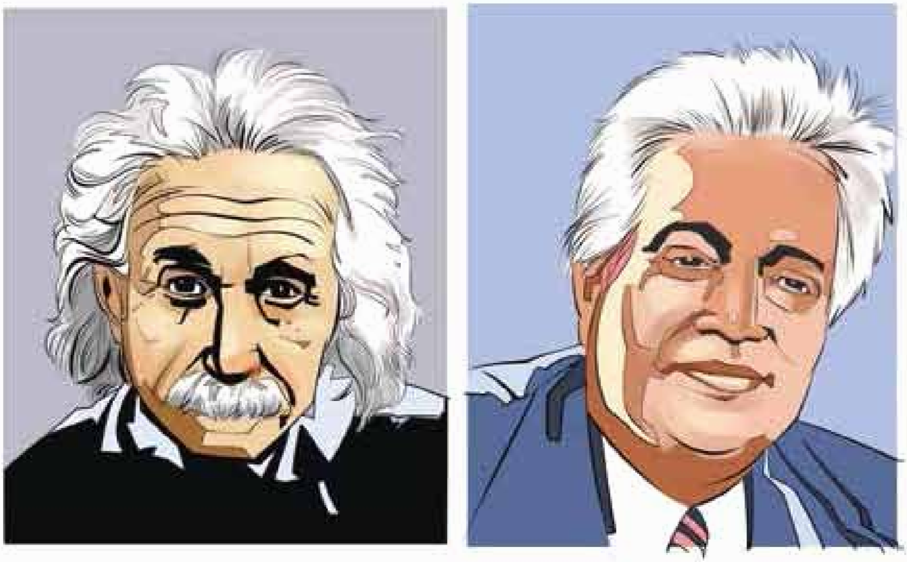

চিত্র 1.04: আলবার্ট আইনস্টাইন এবং সত্যেন্দ্রনাথ বোস

কোয়ান্টাম তত্ত্বের সাথে থিওরি অব রিলেটিভিটি ব্যবহার করে ডিরাক 1931 সালে প্রতি পদার্থের (Anti Particle) অস্তিত্ব ঘোষণা করেন, যেটি পরের বছরেই আবিষ্কৃত হয়ে যায়।

1895 সালে রন্টজেন এক্স-রে আবিষ্কার করেন। 1896 সালে বেকেরেল দেখান যে পরমাণুর কেন্দ্র থেকে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ হচ্ছে। 1899 সালে পিয়ারে ও মেরি কুরি (চিত্র 1.03) রেডিয়াম আবিষ্কার করেন এবং বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারেন পরমাণুগুলো আসলে অবিনশ্বর নয়, সেগুলো ভেঙে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ হতে পারে।

1.3.4 সাম্প্রতিক পদার্থবিজ্ঞান

ইলেকট্রনিক্স এবং আধুনিক প্রযুক্তির আবিষ্কারের কারণে শক্তিশালী এক্সেলেরেটর তৈরি করা সম্ভব হয় এবং অনেক বেশি শক্তিতে এক্সেলেরেট করে নতুন নতুন কণা আবিষ্কৃত হতে থাকে। তাত্ত্বিক Standard Model ব্যবহার করে এই কণাগুলোকে চমৎকারভাবে সুবিন্যস্ত করা সম্ভব হয়। আপাতদৃষ্টিতে অসংখ্য নতুন নতুন কণা মনে হলেও অল্প কয়েকটি মৌলিক কণা (এবং তাদের প্রতি পদার্থ) দিয়ে সকল কণার

গঠন ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়। Standard Model ব্যবহার করে এই কণাগুলোর ভর ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয় বলে ভরের জন্য হিগস বোজন নামে একটি নতুন কণার অস্তিত্ব ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়। 2013 সালে পরীক্ষাগারে হিগজ বোজনকে শনাক্ত করাটি তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানের বিরাট সাফল্য হিসেবে ধরা হয়।

1924 সালে হাবল দেখিয়েছিলেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবগুলো গ্যালাক্সি একে অন্য থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, যেটি প্রদর্শন করে যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধীরে ধীরে প্রসারিত হচ্ছে। যার অর্থ অতীতে একসময় পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এক জায়গায় ছিল। বিজ্ঞানীরা দেখান প্রায় চৌদ্দ বিলিয়ন বছর আগে 'বিগ ব্যাং' নামে একটি প্রচণ্ড বিস্ফোরণে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তৈরি হওয়ার পর সেটি প্রসারিত হতে থাকে। অতি সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন, এই প্রসারণ কখনোই থেমে যাবে না এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবকিছুই একটি অন্যটি থেকে দূরে সরে যাবে। পদার্থবিজ্ঞানীরা আরো দেখিয়েছেন, তারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দৃশ্যমান গ্রহ নক্ষত্র গ্যালাক্সির মাত্র 4 শতাংশ ব্যাখ্যা করতে পারেন, বাকি ব্যাখ্যা করতে হলে রহস্যময় ডার্ক ম্যাটার ও ডার্ক এনার্জির ধারণা মেনে নিতে হয়। যার গঠন নিয়ে বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে যাচ্ছেন।

কঠিন পদার্থের বিজ্ঞান (Solid State) নিয়ে গবেষণা অর্ধপরিবাহী পদার্থের জন্ম দেয়, যেগুলো ব্যবহার করে বর্তমান ইলেকট্রনিকস গড়ে উঠেছে, যেটি বর্তমান সভ্যতার ভিত্তিমূল।

1.4 পদার্থবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য (Objectives of Physics)

তোমরা এর মাঝে জেনে গেছ যে পদার্থবিজ্ঞান হচ্ছে বিজ্ঞানের সেই শাখা যেটি শক্তি এবং বলের উপস্থিতিতে সময়ের সাথে বস্তুর অবস্থান পরিবর্তন ব্যাখ্যা করে। যে কোনো জ্ঞানের মতোই পদার্থবিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে জানা, পদার্থবিজ্ঞানের জানার পরিসরটি অনেক বড়, ক্ষুদ্র পরমাণু থেকে বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রহস্য উদ্ঘাটন করাই হচ্ছে পদার্থবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। বোঝার সুবিধার জন্য আমরা পদার্থবিজ্ঞানের উদ্দেশ্যকে তিনটি মূল ভাগে ভাগ করতে পারি:

1.4.1 প্রকৃতির রহস্য উদঘাটন

প্রাচীনকালে চীন দেশে এক টুকরো লোড স্টোনকে অন্য এক টুকরোকে অদৃশ্য একটা শক্তি দিয়ে আকর্ষণ করতে দেখা গিয়েছিল। বিশেষ ধরনের এই পদার্থের বিশেষ এই ধর্মটির নাম দেওয়া হয়েছিল চৌম্বকত্ব (Magnetism)। একইভাবে প্রাচীন গ্রিসে অম্বর নামের পদার্থকে পশম দিয়ে ঘষা হলে সেটি এই দুটি পদার্থকে একটি অদৃশ্য শক্তি দিয়ে আকর্ষণ করত। এই বিশেষ ধর্মের নাম দেওয়া হলো ইলেকট্রিসিটি বা বৈদ্যুতিক শক্তি (Electricity)। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এটি নিয়ে ব্যাপক গবেষণা হয় এবং বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেন এটি একই বলের দুটি ভিন্ন রূপ এবং এই বলটির নাম দেওয়া হয়

বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় বল (Electromagnetism)। পরবর্তীতে তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কৃত হওয়ার পর বিটা রশ্মি নামে একটা বিশেষ বিকিরণ ব্যাখ্যা করার সময় দুর্বল নিউক্লিয় বল নামে নতুন এক ধরনের বল আবিষ্কৃত হয়। পদার্থবিজ্ঞানীরা পরে দেখালেন বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় বল এবং দুর্বল নিউক্লিয় বল একই বলের ভিন্ন ভিন্ন রূপ। তাদেরকে একত্র করে সেই বলের নাম দেওয়া হলো ইলেকট্রো উইক ফোর্স। পদার্থবিজ্ঞানীরা ধারণা করেন, প্রকৃতিতে মহাকর্ষ বল এবং নিউক্লিয়ার বল নামে আরো যে দুটি বল রয়েছে ভবিষ্যতে সেগুলোও একই সূত্রের আওতায় আনা যাবে।

পদার্থবিজ্ঞান এভাবেই একের পর এক প্রকৃতির রহস্য উন্মোচন করে যাচ্ছে। একইভাবে বলা যায় একটি বস্তু তৈরি হয়েছে অণু দিয়ে, পরবর্তীতে দেখা গেছে অণুগুলো মৌলগুলোর পরমাণু দিয়ে তৈরি। পরমাণুগুলো চার্জ নিরপেক্ষ হলেও তার কেন্দ্রে রয়েছে পজিটিভ চার্জের নিউক্লিয়াস এবং তাকে কেন্দ্র করে ইলেকট্রনগুলো ঘুরছে। ইলেকট্রন একটি মৌলিক কণা হলেও দেখা গেল নিউক্লিয়াস প্রোটন এবং নিউট্রন দিয়ে তৈরি। পরবর্তীতে দেখা যায় নিউট্রন এবং প্রোটনও কোয়ার্ক নামে অন্য এক ধরনের মৌলিক কণা দিয়ে তৈরি। ইলেকট্রন এবং কোয়ার্ক স্ট্রিং দিয়ে তৈরি কিনা সেটি বর্তমান সময়ের গবেষণার বিষয়।

1.4.2 প্রকৃতির নিয়মগুলো জানা

সৃষ্টির আদিকাল থেকে আমরা জানি যে উপর থেকে কিছু ছেড়ে দিলে সেটি নিচে পড়বে এবং সেটি দেখে আমরা অনুমান করতে পারি যে পৃথিবীর সবকিছুই তার নিজের দিকে আকর্ষণ করছে। পদার্থবিজ্ঞান যদি শুধু মাধ্যাকর্ষণ বলের অস্তিত্বের কথা ঘোষণা করে থেমে যায় তাহলে সেটি মোটেও যথেষ্ট নয়। একটি নির্দিষ্ট ভরের বস্তুকে অন্য নির্দিষ্ট ভর কতটুকু বল দিয়ে আকর্ষণ করে এবং দূরত্বের সাথে সেটি কীভাবে পরিবর্তিত হয় সেটি নিখুঁতভাবে না জানা পর্যন্ত এই জ্ঞানটুকু পূর্ণ হয় না। নিউটন মহাকর্ষ বলের সূত্র দিয়ে অত্যন্ত সঠিকভাবে প্রকৃতির এই নিয়মটি ব্যাখ্যা করেছেন। প্রকৃতির নিয়মটি সঠিকভাবে জানা হলে সেটি অন্য অনেক জায়গায় প্রয়োগ করে ব্যবহার করা যায়। কাজেই মহাকর্ষ বলের সূত্র দিয়ে যেরকম একটি পড়ন্ত বস্তুর গতি ব্যাখ্যা করা যায়, ঠিক সেরকম সূর্যকে ঘিরে পৃথিবীর প্রদক্ষিণকেও ব্যাখ্যা করা যায়। প্রকৃতির এই নিয়মগুলো সঠিকভাবে জানার জন্য বিজ্ঞানীরা সেটি যেরকম যুক্তিতর্ক দিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন, ঠিক সেরকম ল্যাবরেটরিতে নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষাও করে যাচ্ছেন। পদার্থবিজ্ঞানের বিস্ময়কর সাফল্যের পেছনে যেরকম তাত্ত্বিক গবেষণা হয়েছে ঠিক সেরকম রয়েছে পরীক্ষা-নিরীক্ষা। এই দুটি ভিন্ন ধারায় গবেষণা করে প্রকৃতির নিয়মগুলো খুঁজে বের করা পদার্থবিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য।

1.4.3 প্রাকৃতিক নিয়ম ব্যবহার করে প্রযুক্তির বিকাশ

আইনস্টাইন তার থিওরি অব রিলেটিভিটি থেকে $E = mc^2$ সূত্রটি বের করে দেখিয়েছিলেন, ভরকে শক্তিতে রূপান্তর করা যায়। 1938 সালে অটোহান এবং স্ট্রেসম্যান একটি নিউক্লিয়াসকে ভেঙে দেখান যে নিউক্লিয়াসের ভর যেটুকু কমে গিয়েছে সেটা শক্তি হিসেবে বের হয়েছে। এই সূত্রটি ব্যবহার করে নিউক্লিয়ার বোমা তৈরি করে সেটি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে হিরোশিমা এবং নাগাসাকিতে ফেলে মুহূর্তের মাঝে লক্ষ লক্ষ মানুষ মেরে ফেলা সম্ভব হয়েছিল। শুধু যে মারণাস্ত্র তৈরি করা সম্ভব তা নয়, এই শক্তি মানুষের কাজেও লাগানো সম্ভব। এই সূত্র ব্যবহার করে নিউক্লিয়ার বৈদ্যুতিক কেন্দ্র (Nuclear Power Plant) তৈরি করা হয় এবং আমাদের রূপপুরেও সেরকম একটি নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি হতে যাচ্ছে।

পদার্থবিজ্ঞানের একটি শাখা হচ্ছে কঠিন অবস্থার পদার্থবিজ্ঞান এবং সেখানে অর্ধপরিবাহী নিয়ে কাজ করা হয়। এই অর্ধপরিবাহীর সাথে বিশেষ মৌল মিশিয়ে তাদের যুক্ত করে ট্রানজিস্টার তৈরি করা হয়। এই প্রযুক্তি দিয়ে ইলেকট্রনিকসের একটি অভাবনীয় উন্নতি হয়েছে এবং বর্তমান সভ্যতায় এই ইলেকট্রনিকসের একটি অনেক বড় অবদান রয়েছে।

আমরা এভাবে দেখাতে পারব প্রযুক্তির প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই পদার্থবিজ্ঞানের ছোট কিংবা বড় অবদান রয়েছে। শুধু চিকিৎসার ক্ষেত্রে পদার্থবিজ্ঞানের কী কী অবদান রয়েছে সেটি এই বইয়ের শেষ অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে।

দলীয় কাজ

পদার্থবিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ কীভাবে হয়েছে সেটি নিয়ে একটি পোস্টার তৈরি করো।

নিজে করো

একটি সরল রেখায় নির্দিষ্ট দূরত্বকে নির্দিষ্ট সময় ধরে প্রাচীনকাল থেকে এখন পর্যন্ত বিভিন্ন বিজ্ঞানী যে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো করেছেন সেগুলো বসিয়ে দেখাও মানবসভ্যতার ইতিহাসে একটি অন্ধকার কাল রয়েছে। কেন এই অন্ধকার কাল ছিল তার কোনো একটি কারণ খুঁজে বের করো।

1.5 ভৌত রাশি এবং তার পরিমাপ (Physical Quantities and Their Measurements)

পানি ঠাণ্ডা হলে সেটা বরফ হয়ে যায়, গরম করলে সেটা বাষ্প হয়ে যায়—এটা আমরা সবাই জানি। মানুষ প্রাচীনকাল থেকেই এটা দেখে আসছে। এই জ্ঞানটুকু কিন্তু পুরোপুরি বিজ্ঞান হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা বলতে পারব কোন অবস্থায় ঠিক কত তাপমাত্রায় পানি জমে বরফ হয় কিংবা সেটা বাড়িয়ে কোন অবস্থায় কত তাপমাত্রায় নিয়ে গেলে সেটা ফুটতে থাকে, বাষ্পে পরিণত হতে শুরু করে। তার অর্থ প্রকৃত বিজ্ঞান করতে হলে সবকিছুর পরিমাপ করতে হয়। বিজ্ঞানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এই পরিমাপ করে সব কিছুকে নিখুঁতভাবে ব্যাখ্যা করা।

টেবিল 1.01: SI ইউনিটে সাতটি ভিন্ন ভিন্ন ভৌত রাশি

রাশি	Unit	একক	Symbol
দৈর্ঘ্য	meter	মিটার	m
ভর	kilogram	কিলোগ্রাম	kg
সময়	second	সেকেন্ড	s
বৈদ্যুতিক প্রবাহ	ampere	অ্যাম্পিয়ার	A
তাপমাত্রা	kelvin	কেলভিন	K
পদার্থের পরিমাণ	mole	মোল	mol
দীপন তীব্রতা	candela	ক্যান্ডেলা	cd

এই জগতে যা কিছু আমরা পরিমাপ করতে পারি তাকে আমরা রাশি বলি। এই ভৌতজগতে অসংখ্য বিষয় রয়েছে, যা পরিমাপ করা সম্ভব। উদাহরণ দেওয়ার জন্য বলা যেতে পারে, কোনো কিছুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা, আয়তন, ওজন, তাপমাত্রা, রং, কাঠিন্য, তার অবস্থান, বেগ, তার ভেতরকার উপাদান, বিদ্যুৎ পরিবাহিতা, অপরিবাহিতা, স্থিতিস্থাপকতা, তাপ পরিবাহিতা, অপরিবাহিতা, ঘনত্ব, আপেক্ষিক তাপ, চাপ গলনাঙ্ক, স্ফুটনাঙ্ক ইত্যাদি— অর্থাৎ আমরা বলে শেষ করতে পারব না। এক কথায় ভৌতজগতে রাশিমালার কোনো শেষ নেই। তোমাদের তাই মনে হতে পারে এই অসংখ্য রাশিমালা পরিমাপ করার জন্য আমাদের বুঝি অসংখ্য রাশির সংজ্ঞা আর অসংখ্য একক তৈরি করে রাখতে হবে! আসলে সেটি সত্যি নয়, তোমরা শুনে খুবই অবাক হবে (এবং নিশ্চয়ই খুশি হবে) যে মাত্র সাতটি রাশির সাতটি একক ঠিক করে নিলে সেই সাতটি একক ব্যবহার করে আমরা সবকিছু বের করে ফেলতে পারব। এই সাতটি রাশিকে বলে মৌলিক রাশি এবং এই মৌলিক রাশি ব্যবহার করে যখন অন্য কোনো

রাশি প্রকাশ করি সেটি হচ্ছে লব্ধ রাশি। মৌলিক রাশিগুলো হচ্ছে দৈর্ঘ্য, ভর, সময়, বৈদ্যুতিক প্রবাহ, তাপমাত্রা, পদার্থের পরিমাণ এবং দীপন তীব্রতা। এই সাতটি মৌলিক রাশির আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সাতটি একককে বলে SI একক, (SI এসেছে ফরাসি ভাষার Systeme International d'Unites কথাটি থেকে) এবং সেগুলো 1.01 টেবিলে দেখানো হয়েছে। 1.02 টেবিলে অনেক বড় থেকে অনেক ছোট কিছু দুরত্ব, ভর এবং সময় দেখানো হয়েছে।

টেবিল 1.02: অনেক বড় থেকে অনেক ছোট দূরত্ব, ভর এবং সময়

দূরত্ব	m	ভর	kg	সময়	s
নিকটতম গ্যালাক্সি	6×10^{19}	আমাদের গ্যালাক্সি	2×10^{41}	বিগ ব্যাংয়ের সময়	4×10^{17}
নিকটতম নক্ষত্র	4×10^{16}	সূর্য	2×10^{30}	ডাইনোসরের ধ্বংস	2×10^{14}
সৌরজগতের ব্যাসার্ধ	6×10^{12}	পৃথিবী	6×10^{24}	মানুষের জন্ম	8×10^{12}
পৃথিবীর ব্যাসার্ধ	6×10^{6}	জাহাজ	7×10^{7}	এক দিন	9×10^{4}
এভারেস্টের উচ্চতা	9×10^{3}	হাতি	5×10^{3}	মানুষের হৃৎস্পন্দন	1
ভাইরাসের দৈর্ঘ্য	1×10^{-8}	মানুষ	6×10^{1}	মিউওনের আয়ু	2×10^{-6}
হাইড্রোজেন পরমাণুর ব্যাসার্ধ	5×10^{-11}	ধূলিকণা	7×10^{-7}	স্পন্দনকাল: সবুজ আলো	2×10^{-15}
প্রোটনের ব্যাসার্ধ	1×10^{-15}	ইলেকট্রন	9×10^{-31}	স্পন্দনকাল: এক MeV গামা রে	4×10^{-21}

1.5.1 পরিমাপের একক (Units of Measurements)

এই এককগুলোর ভেতর সেকেন্ড, মিটার এবং ক্যান্ডেলার পরিমাপ আগেই কয়েকটি ধ্রুব দিয়ে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছিল। 2019 সালের মে মাস থেকে কিলোগ্রাম, কেলভিন, মোল এবং অ্যাম্পিয়ারকেও পদার্থবিজ্ঞানের মৌলিক কিছু ধ্রুব ব্যবহার করে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। কাজেই এখন পৃথিবীর যে কোনো ল্যাবরেটরিতে এই ধ্রুবগুলো পরিমাপ করে সেখান থেকে সবগুলো এককের পরিমাপ অনেক সূক্ষ্মভাবে পরিমাপ করা সম্ভব হবে। সাতটি একক পরিমাপ করার জন্য যে মৌলিক ধ্রুবগুলোর মান চিরদিনের জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে সেগুলো 1.03 টেবিলে দেখানো হয়েছে। কোন ধ্রুব দিয়ে কোন একক পরিমাপ করা হয় সেটি 1.04 টেবিলে দেখানো হয়েছে। এককগুলোর নতুন এবং সহজ সংজ্ঞাগুলো এরকম:

টেবিল 1.03: সাতটি ধ্রুবের নির্দিষ্ট করে দেওয়া মান

ধ্রুব	মান
আলোর বেগ (c)	299,792,458 meter/second
প্লাঙ্কের ধ্রুব (h)	6.626 070 15 × 10^{-34} Joule second
ইলেকট্রনের চার্জ (e)	1.602176634 × 10^{-19} coulomb
Cs^{133} পরমাণুর স্পন্দন (Δv_{cs})	9,192,631,770 hertz
বোল্টজম্যান ধ্রুব (k_B)	1.380649 × 10^{-23} joule/kelvin
এভোগাড্রোর ধ্রুব (N_A)	6.02214076 × 10^{23} particles/mole
বিকিরণ তীব্রতা (K_{CD})	683 lumens/watt

সেকেন্ড (s): সিজিয়াম 133 (Cs^{133}) পরমাণুর 9,192,631,770 টি স্পন্দন সম্পন্ন করতে যে পরিমাণ সময় নেয় সেটি হচ্ছে এক সেকেন্ড।

মিটার (m): শূন্য মাধ্যমে এক সেকেন্ডের 299,792,458 ভাগের এক ভাগ সময়ে আলো যে দূরত্ব অতিক্রম করে সেটি হচ্ছে এক মিটার।

কিলোগ্রাম (kg): প্লাঙ্কের ধ্রুবকে 6.626 070 15 × 10^{-34} m^2/s দিয়ে ভাগ দিলে যে ভর পাওয়া যায় সেটি হচ্ছে এক কিলোগ্রাম।

অ্যাম্পিয়ার (A): প্রতি সেকেন্ডে 1/1.602176634 × 10^{-19} সংখ্যক ইলেকট্রনের সমপরিমাণ চার্জ প্রবাহিত হলে সেটি হচ্ছে এক অ্যাম্পিয়ার।

মোল (Mol): যে পরিমাণ বস্তুতে এভোগাড্রোর ধ্রুব 6.02214076 × 10^{23} সংখ্যক কণা থাকে সেটি হচ্ছে এক মোল।

কেলভিন (K): যে পরিমাণ তাপমাত্রার পরিবর্তনে তাপশক্তির 1.380649 × 10^{-23} joule পরিবর্তন হয় সেটি হচ্ছে কেলভিন।

ক্যান্ডেলা (cd): সেকেন্ডে 540 ×10^{12} বার কম্পনরত আলোর উৎস থেকে যদি এক স্টেরেডিয়ান (Steradian) ঘনকোণে এক ওয়াটের 683 ভাগের এক ভাগ বিকিরণ তীব্রতা পৌঁছায় তাহলে সেই আলোর তীব্রতা হচ্ছে এক ক্যান্ডেলা।

টেবিল 1.04: নতুন SI একক

এক মিটার বলতে কতটুকু দূরত্ব বোঝায় বা এক কেজি ঠিক কতখানি ভর, কিংবা এক সেকেন্ড কতটুকু সময়, এক ডিগ্রি কেলভিন তাপমাত্রা কতটুকু উত্তাপ কিংবা এক অ্যাম্পিয়ার কতখানি কারেন্ট অথবা এক মোল পদার্থ বলতে কী বোঝায় বা এক ক্যান্ডেলা কতখানি আলো সেটা সম্পর্কে তোমাদের সবারই একটা বাস্তব ধারণা থাকা

উচিত! এই বেলা তোমাদের সেই বাস্তব ধারণাটা দেওয়ার চেষ্টা করে দেখা যাক। তোমাদের শুধু জানলে হবে না, খানিকটা কিন্তু অনুভবও করতে হবে। সাধারণভাবে বলা যায়:

- স্বাভাবিক উচ্চতার একজন মানুষের মাটি থেকে পেট পর্যন্ত দূরত্বটা মোটামুটি এক মিটার।
- এক লিটার পানির বোতলে কিংবা চার গ্লাসে যেটুকু পানি থাকে তার ভর হচ্ছে এক কেজির কাছাকাছি।
- 'এক হাজার এক' এই তিনটি শব্দ বলতে যেটুকু সময় লাগে সেটা মোটামুটি এক সেকেন্ড!
- বলা যেতে পারে তিনটা মোবাইল ফোন একসাথে চার্জ করা হলে এক অ্যাম্পিয়ার বিদ্যুৎ ব্যবহার করা হয়। (মোবাইল ফোন 5 ভোল্টের কাছাকাছিতে চার্জ করা হয়। তাই এখানে খরচ হবে 5 ওয়াট। যদি বাসার লাইট, ফ্যান, ফ্রিজে 220 ভোল্টের কিছুতে এক অ্যাম্পিয়ার বিদ্যুৎ ব্যবহার হয় তখন কিন্তু খরচ হবে 220 ওয়াট!)
- হাত দিয়ে আমরা যদি কারো জ্বর অনুভব করতে পারি, বলা যেতে পারে তার তাপমাত্রা এক কেলভিন বেড়েছে।
- মোলটা অনুভব করা একটু কঠিন, বলা যেতে পারে একটা বড় চামচের এক চামচ পানিতে মোটামুটি এক মোল পানির অণু থাকে। এক কাপ পানিতে দশ মোল পানি থাকে।
- একটা মোমবাতির আলোকে মোটামুটিভাবে এক ক্যান্ডেলা বলা যায়।

দেখতেই পাচ্ছ এর কোনোটাই নিখুঁত পরিমাপ নয় কিন্তু অনুভব করার জন্য সহজ। যদি এই পরিমাপ নিয়ে অভ্যস্ত হয়ে যাও, তাহলে ভবিষ্যতে যখন কোনো একটা হিসাব করবে, তখন সেটা নিয়ে তোমাদের একটা মাত্রাজ্ঞান থাকবে!

1.5.2 উপসর্গ বা গুণিতক (Prefix)

বিজ্ঞান বা পদার্থবিজ্ঞান চর্চা করার জন্য আমাদের নানা কিছু পরিমাপ করতে হয়। কখনো আমাদের হয়তো গ্যালাক্সির দৈর্ঘ্য মাপতে হয় (6×10^{24} m) আবার কখনো একটা নিউক্লিয়াসের ব্যাসার্ধ মাপতে হয় (1×10^{-15} m); দূরত্বের মাঝে এই বিশাল পার্থক্য মাপার জন্য সব সময়েই একই ধরনের সংখ্যা ব্যবহার করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়, তাই আন্তর্জাতিকভাবে কিছু SI উপসর্গ বা গুণিতক (prefix) তৈরি করে নেওয়া হয়েছে। এই গুণিতক থাকার কারণে একটা ছোট উপসর্গ লিখে অনেক বড় কিংবা অনেক

ছোট সংখ্যা বোঝাতে পারব। উপসর্গগুলো টেবিল 1.05 এ দেখানো হয়েছে। আমরা দৈনন্দিন জীবনে কিন্তু এগুলো সব সময় ব্যবহার করি। দূরত্ব বোঝানোর জন্য এক হাজার মিটার না বলে এক কিলোমিটার বলি। ক্যামেরার ছবির সাইজ বোঝানোর জন্য দশ লক্ষ বাইট না বলে এক মেগাবাইট বলি!

টেবিল 1.05: SI ইউনিটে ব্যবহৃত গুণিতক বা উপসর্গ

ডেকা	da	10^{1}	ডেসি	d	10^{-1}
হেক্টো	h	10^{2}	সেন্টি	c	10^{-2}
কিলো	k	10^{3}	মিলি	m	10^{-3}
মেগা	M	10^{6}	মাইক্রো	μ	10^{-6}
গিগা	G	10^{9}	ন্যানো	n	10^{-9}
টেরা	T	10^{12}	পিকো	p	10^{-12}
পেটা	P	10^{15}	ফেমটো	f	10^{-15}
এক্সা	E	10^{18}	এটো	a	10^{-18}

1.5.3 মাত্রা (Dimension)

আমরা জেনে গেছি যে আমাদের চারপাশে অসংখ্য রাশি থাকলেও মাত্র সাতটি একক দিয়ে এই রাশিগুলোকে পরিমাপ করা যায়। একটা রাশি কোন একক দিয়ে প্রকাশ করা যায়, সেটি আমাদের জানতেই হয়। প্রায় সময়েই রাশিটি কোন কোন মৌলিক রাশি (দৈর্ঘ্য L, সময় T, ভর M ইত্যাদি) দিয়ে কীভাবে তৈরি হয়েছে, সেটাও জানা থাকতে হয়। একটা রাশিতে বিভিন্ন মৌলিক রাশি কোন সূচকে বা কোন পাওয়ারে আছে, সেটাকে তার মাত্রা বলে। যেমন আমরা পরে দেখব বল হচ্ছে ভর এবং ত্বরণের গুণফল। ত্বরণ আবার সময়ের সাথে বেগের পরিবর্তনের হার। বেগ আবার সময়ের সাথে অবস্থানের পরিবর্তনের হার। কাজেই

বেগের মাত্রা: $\frac{\text{দূরত্ব}}{\text{সময়}} = \frac{L}{T} = LT^{-1}$

ত্বরণের মাত্রা: $\frac{\text{দূরত্ব}}{\text{সময়}^2} = \frac{L}{T^2} = LT^{-2}$

আমরা এই বইয়ে যখনই নতুন একটি রাশিমালার কথা বলব সাথে সাথেই তার মাত্রাটির কথা বলে দেওয়ার চেষ্টা করব। দেখবে সেটা সব সময় রাশিটিকে বুঝতে অন্যভাবে সাহায্য করবে। এই বইয়ে

একটা রাশির মাত্রা বোঝাতে হলে সেটিকে তৃতীয় ব্র্যাকেটের (third bracket) ভেতর রেখে দেখানো হবে। যেরকম বল F হলে $[F] = MLT^{-2}$

1.5.4 বৈজ্ঞানিক প্রতীক ও সংকেত (Scientific Symbols and Notations)

এককের সংকেত লেখার জন্য নিচের পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করা হয়ে থাকে:

1. কোনো রাশির মান প্রকাশ করার জন্য একটি সংখ্যা লিখে তারপর একটি ফাঁকা জায়গা (space) রেখে এককের সংকেতটি লিখতে হয়। যেমন 2.21 kg, 7.3×10^2 m^2 কিংবা 22 K, শতকরা চিহ্নও (%) এই নিয়ম মেনে চলে। তবে ডিগ্রি (°) মিনিট (′) এবং সেকেন্ড (″) লেখার সময় সংখ্যার পর কোনো ফাঁকা জায়গা বা space রাখতে হয় না।
2. গুণ করে পাওয়া লব্ধ লেখার সময় দুটি এককের মাঝখানে একটি ফাঁকা জায়গা বা space দিতে হয়। যেমন: 2.35 N m
3. ভাগ করে পাওয়া লব্ধ এককের বেলায় ঋণাত্মক সূচক বা '/' (যেমন ms^{-1} কিংবা m/s) দিয়ে প্রকাশ করা হয়।
4. প্রতীকগুলো যেহেতু গাণিতিক প্রকাশ, কোনো কিছুর সংক্ষিপ্ত রূপ নয়, তাই তাদের সাথে কোনো যতিচিহ্ন (.) বা full stop ব্যবহার হয় না।
5. এককের সংকেত লেখা হয় সোজা অক্ষরে যেমন মিটারের জন্য m, সেকেন্ডের জন্য s ইত্যাদি। তবে রাশির সংকেত লেখা হয় italic বা বাঁকা অক্ষরে। যেমন ভরের জন্য m, বেগের জন্য v ইত্যাদি।
6. এককের সংকেত ছোট হাতের অক্ষরে লেখা হয় যেমন cm, s, mol ইত্যাদি। তবে যেগুলো কোনো বিজ্ঞানীর নাম থেকে নেওয়া হয়েছে সেখানে বড় হাতের অক্ষর (নিউটনের নাম অনুসারে N) হবে। একাধিক অক্ষর হলে শুধু প্রথমটি বড় হাতের অক্ষর হবে (প্যাস্কেলের নামানুসারে গৃহীত একক Pa)
7. এককের উপসর্গ (k, G, M) এককের (m, W, Hz) সাথে কোনো ফাঁক ছাড়া যুক্ত হবে যেমন km, GW, MHz.
8. কিলো (10^3) থেকে সব বড় উপসর্গ বড় হাতে হবে (M, G, T)।
9. এককের সংকেতগুলো কখনো বহুবচন হবে না (25 kgs নয় সব সময় 25 kg)
10. কোনো সংখ্যা বা যৌগিক একক এক লাইনে লেখার চেষ্টা করতে হবে। খুব প্রয়োজন হলে সংখ্যা এবং এককের মাঝখানে line break দেওয়া যেতে পারে।

1.6 পরিমাপের যন্ত্রপাতি (Measuring Instruments)

একসময় পদার্থবিজ্ঞানের বিভিন্ন রাশি সূক্ষ্মভাবে মাপা খুব কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল। আধুনিক ইলেকট্রনিকস নির্ভর যন্ত্রপাতির কারণে এখন কাজটি খুব সোজা হয়ে গেছে। আমরা এই বইয়ে যে পরিমাণ পদার্থবিজ্ঞান শেখার চেষ্টা করব তার জন্য দূরত্ব, ভর, সময়, তাপমাত্রা, বিদ্যুৎ প্রবাহ এবং ভোল্টেজ মাপলেই মোটামুটি কাজ চালিয়ে নিতে পারব। এগুলো মাপার জন্য আমরা কোন ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করি সেগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক:

1.6.1 স্কেল

ছোটখাটো দৈর্ঘ্য মাপার জন্য মিটার স্কেল ব্যবহার করা হয় এবং তোমরা সবাই নিশ্চয়ই মিটার স্কেল দেখেছ। 100 cm (সেন্টিমিটার) বা 1 m লম্বা বলে এটাকে মিটার স্কেল বলে। যেহেতু এখনো অনেক জায়গায় ইঞ্চি-ফুট প্রচলিত আছে (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি উদাহরণ দেশ!) তাই মিটার স্কেলের অন্যপাশে প্রায় সব সময় ইঞ্চি দাগ কাটা থাকে। এক ইঞ্চি সমান 2.54 cm।

একটা স্কেলে সবচেয়ে যে সূক্ষ্ম দাগ থাকে আমরা সে পর্যন্ত মাপতে পারি। মিটার স্কেল সাধারণত মিলিমিটার পর্যন্ত ভাগ করা থাকে, তাই মিটার স্কেল ব্যবহার করে আমরা কোনো কিছুর দৈর্ঘ্য মিলিমিটার পর্যন্ত মাপতে পারি। অর্থাৎ আমরা যদি বলি কোনো কিছুর দৈর্ঘ্য 0.364 m তার অর্থ দৈর্ঘ্যটি হচ্ছে 36 সেন্টিমিটার এবং 4 মিলিমিটার। একটা মিটার স্কেল ব্যবহার করে এর চেয়ে সূক্ষ্মভাবে দৈর্ঘ্য মাপা সম্ভব নয়—অর্থাৎ সাধারণ স্কেলে আমরা কখনোই বলতে পারব না একটা বস্তুর দৈর্ঘ্য 0.3643 m কিন্তু মাঝে মাঝেই কোনো একটা অত্যন্ত সূক্ষ্ম কাজে আমাদের এ রকম সূক্ষ্মভাবে মাপা প্রয়োজন হয়, তখন ভার্নিয়ার (Vernier) স্কেল নামে একটা মজার স্কেল ব্যবহার করে সেটা করা যায়।

ভার্নিয়ার স্কেল

ধরা যাক কোনো বস্তুর দৈর্ঘ্য মিলিমিটারের 4 এবং 5 দুটি দাগের মাঝামাঝি কোথাও এসেছে অর্থাৎ বস্তুটির দৈর্ঘ্য 4 মিলিমিটার থেকে বেশি কিন্তু 5 মিলিমিটার থেকে কম। 4 মিলিমিটার থেকে কত ভগ্নাংশ বেশি সেটা বের করতে হলে ভার্নিয়ার স্কেল ব্যবহার করা যায়, এই স্কেলটা মূল স্কেলের পাশে লাগানো থাকে এবং সামনে-পেছনে সরানো যায় (চিত্র 1.05)। ছবির উদাহরণে দেখানো হয়েছে মূল স্কেলের 9 মিলিমিটার দৈর্ঘ্যকে ভার্নিয়ার স্কেলে দশ ভাগ করা হয়েছে। অর্থাৎ ভার্নিয়ার স্কেলের প্রত্যেকটা ভাগ হচ্ছে $\frac{9}{10}$ mm আসল মিলিমিটার থেকে $\frac{1}{10}$ মিলিমিটার কম। যদি ভার্নিয়ার স্কেলের শুরুটা কোনো একটা মিলিমিটার দাগের সাথে মিলিয়ে রাখা হয় তাহলে তার পরের দাগটি সত্যিকার মিলিমিটার থেকে $\frac{1}{10}$ মিলিমিটার সরে থাকবে, এর পরেরটি $\frac{2}{10}$ মিলিমিটার সরে থাকবে, পরেরটি $\frac{3}{10}$

মিলিমিটার সরে থাকবে— অর্থাৎ কোনোটাই মূল স্কেলের মিলিমিটার দাগের সাথে মিলবে না, একেবারে দশ নম্বর দাগটি আবার মূল স্কেলের নয় নম্বর মিলিমিটার দাগের সাথে মিলবে।

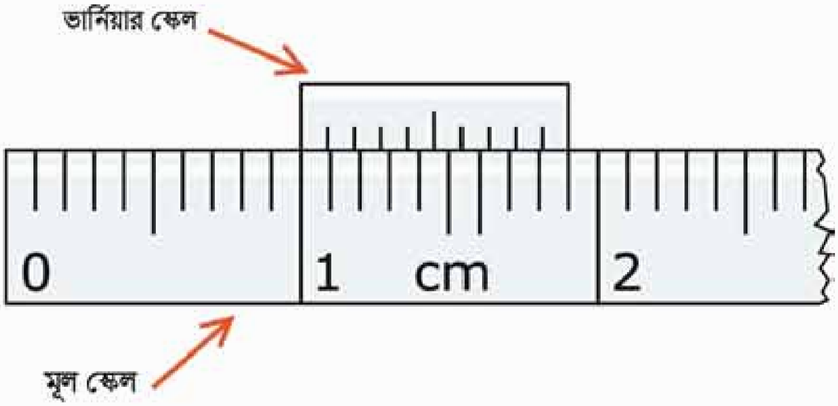

চিত্র 1.05: মূল এবং ভার্নিয়ার স্কেল, যেটি নাড়ানো সম্ভব।

বুঝতেই পারছ ভার্নিয়ার স্কেলটা যদি আমরা এমনভাবে রাখি যে শুরুটা একটা মিলিমিটার দাগ থেকে শুরু না হয়ে একটু সরে (যেমন $\frac{3}{10}$mm) শুরু হয়েছে (চিত্র 1.06) তাহলে ঠিক যত সংখ্যক $\frac{1}{10}$mm সরে শুরু হয়েছে ভার্নিয়ার স্কেলের তত নম্বর দাগটি মূল স্কেলের মিলিমিটার দাগের সাথে মিলে যাবে। কাজেই ভার্নিয়ার স্কেল ব্যবহার করে দৈর্ঘ্য মাপা খুব সহজ। প্রথমে জেনে নিতে হয় ভার্নিয়ার স্কেলের একটি ভাগ এবং মূল স্কেলের একটি ভাগের মাঝে পার্থক্য কতটুকু—এটাকে বলে ভার্নিয়ার ধ্রুবক (Vernier Constant সংক্ষেপে VC)। মূল স্কেলের সবচেয়ে ছোট ভাগের (1 mm) দূরত্বকে ভার্নিয়ার স্কেলের ভাগের (1.05 এবং 1.06 চিত্রে 10) সংখ্যা দিয়ে ভাগ দিলেই এটা বের হয়ে যাবে। আমরা যে উদাহরণ নিয়েছি সেখানে এটার মান:

$$VC = \frac{1\,mm}{10} = 0.1\text{ mm} = 0.0001\text{ m}$$

কোনো দৈর্ঘ্য মাপার সময় মিলিমিটারের সর্বশেষ দাগ পর্যন্ত মেপে ভার্নিয়ার স্কেলের দিকে তাকাতে হয়। ভার্নিয়ার স্কেলের কোন দাগটি মূল স্কেলের মিলিমিটার দাগের সাথে হুবহু মিলে গেছে বা সমপাতন হয়েছে সেটি বের করে দাগ সংখ্যাকে ভার্নিয়ার ধ্রুবক দিয়ে গুণ দিতে হয়। মূল স্কেলে মাপা দৈর্ঘ্যের সাথে সেটি যোগ দিলেই আমরা প্রকৃত দৈর্ঘ্য পেয়ে যাব। চিত্র 1.06 এর শেষ স্কেলে যে দৈর্ঘ্য দেখানো হয়েছে আমাদের এই নিয়মে সেটি হবে 1.03 cm বা 0.013 m।

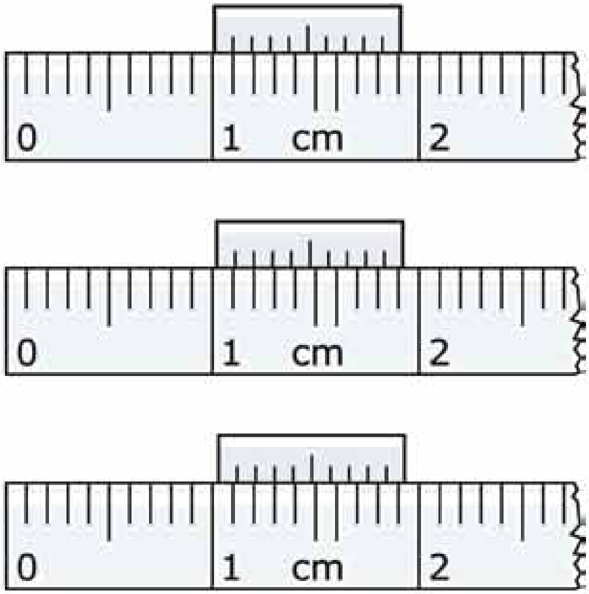

চিত্র 1.06: এক, দুই এবং তিন ঘর সরে যাওয়া ভার্নিয়ার স্কেল।

ভার্নিয়ার স্কেলের পরিবর্তে একটা স্ক্রুকে ঘুরিয়ে (চিত্র 1.07) স্কেলকে সামনে-পেছনে নিয়েও স্ক্রুগজ (Screw Gauge) নামে বিশেষ এক ধরনের স্কেলে দৈর্ঘ্য মাপা হয়। এখানে স্ক্রুয়ের খাঁজ (thread) অত্যন্ত সূক্ষ্ম রাখা হয় এবং পুরো একবার ঘোরানোর পর স্কেল লাগানো স্ক্রুটি হয়তো 1 mm অগ্রসর হয়। স্ক্রুয়ের এই সরণকে স্ক্রুয়ের পিচ (pitch) বলে। যে বৃত্তাকার অংশটি ঘুরিয়ে স্কেলটিকে সামনে-পেছনে নেওয়া হয় সেটিকে সমান 100 ভাগে ভাগ করা হলে প্রতি এক ঘর ঘূর্ণনের জন্য স্কেলটি পিচের $\frac{1}{100}$ ভাগের এক ভাগ অগ্রসর হয়। অর্থাৎ এই স্কেলে $\frac{1}{100}$ mm = 0.01 mm পর্যন্ত মাপা সম্ভব হতে পারে। এটাকে স্ক্রু গজের ন্যূনাঙ্ক বলে।

চিত্র 1.07: চিত্রটিতে ভার্নিয়ার স্কেলযুক্ত স্লাইড ক্যালিপার্স এবং একটি স্ক্রুগজ দেখানো হলো।

আজকাল ভার্নিয়ার স্কেলের পরিবর্তে ডায়াল লাগানো কিংবা ডিজিটাল স্লাইড ক্যালিপার্স বের হয়েছে, যেটা দিয়ে সরাসরি নিখুঁতভাবে দৈর্ঘ্য মাপা যায়!

1.6.2 ব্যালান্স (ভর মাপার যন্ত্র)

ভর সরাসরি মাপা যায় না তাই সাধারণত ওজন মেপে সেখান থেকে ভরটি বের করা হয়। আমরা যখন বলি কোনো একটা বস্তুর ওজন 1 gm বা 1 kg তখন আসলে বোঝাই বস্তুটির ভর 1 gm কিংবা 1 kg. এক সময় বস্তুর ভর মাপার জন্য নিক্তি ব্যবহার করা হতো, যেখানে বাটখারার নির্দিষ্ট ভরের সাথে বস্তুর ভরকে তুলনা করা হতো। আজকাল ইলেকট্রনিক ব্যালেন্সের (চিত্র 1.08) ব্যবহার অনেক বেড়ে গেছে। ব্যালেন্সের ওপর নির্দিষ্ট বস্তু রাখা হলেই ব্যালেন্সের সেন্সর সেখান থেকে নিখুঁতভাবে ওজনটি বের করে দিতে পারে।

চিত্র 1.08: ডিজিটাল ওজন মাপার যন্ত্র।

চিত্র 1.09: থামা ঘড়ি বা স্টপ ওয়াচ।

1.6.3 থামা ঘড়ি (Stop Watch)

সময় মাপার জন্য স্টপ ওয়াচ ব্যবহার করা হয় (চিত্র 1.09)। একসময় নিখুঁত স্টপ ওয়াচ অনেক মূল্যবান সামগ্রী হলেও, ইলেকট্রনিকসের অগ্রগতির কারণে খুব অল্প দামের মোবাইল টেলিফোনেও আজকাল অনেক সূক্ষ্ম স্টপ ওয়াচ পাওয়া যায়। স্টপ ওয়াচে যেকোনো একটি মুহূর্ত থেকে সময় মাপা শুরু করা হয় এবং নির্দিষ্ট সময় পার হওয়ার পর সময় মাপা বন্ধ করে কতখানি সময় অতিক্রান্ত হয়েছে সেটি বের করে ফেলা যায়। মজার ব্যাপার হচ্ছে, স্টপ ওয়াচ যত নিখুঁতভাবে সময় মাপতে পারে আমরা হাত দিয়ে কখনোই তত নিখুঁতভাবে এটা শুরু করতে বা থামাতে পারি না।

নিজে করো

তোমাদের সবার কাছে স্লাইড ক্যালিপার্স থাকার সম্ভাবনা কম কিন্তু তোমরা ইচ্ছে করলে কাজ চালানোর মতো একটা স্লাইড ক্যালিপার্স তৈরি করে নিতে পারবে। 1.10 চিত্রটি ফটোকপি করে নাও। তারপর চিত্রটিতে দেখানো উপায়ে (1, 2, 3, ... ধাপগুলো করে) মূল স্কেলে এবং ভার্নিয়ার স্কেলের অংশটুকু কেটে নিয়ে যেভাবে দেখানো হয়েছে সেভাবে ভাঁজ করে জায়গামতো বসিয়ে নাও। এখন এটা দিয়ে তুমি নিখুঁতভাবে কোনো কিছুর দৈর্ঘ্য মাপতে পারবে। স্লাইড ক্যালিপার্সটি ইঞ্চিতে, কাজেই সেন্টিমিটারে দৈর্ঘ্য পেতে হলে 2.54 দিয়ে গুণ করে নিতে হবে।

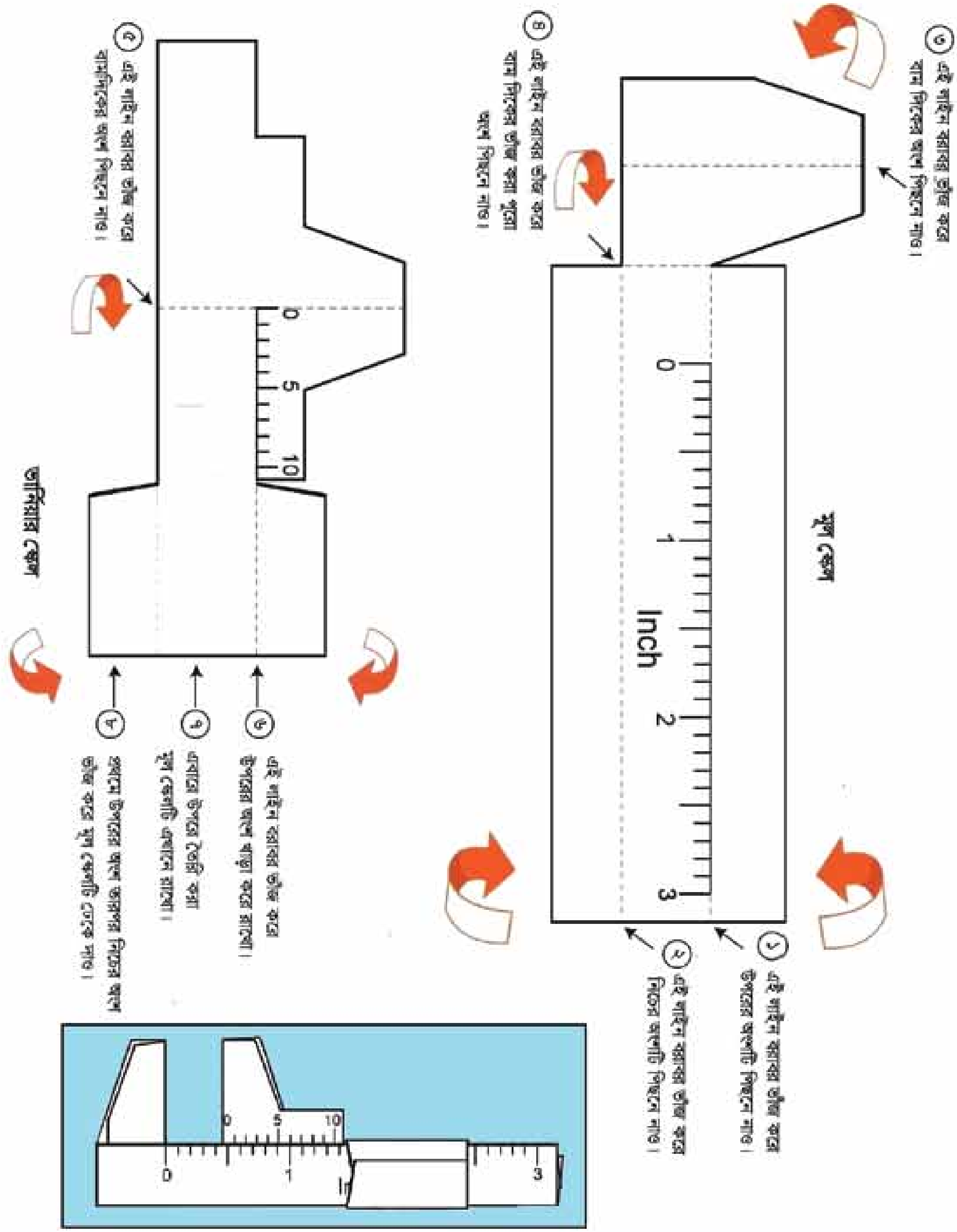

চিত্র 1.10: কাগজ দিয়ে স্লাইড ক্যালিপার্স তৈরি।

অনুসন্ধান 1.01

উদ্দেশ্য: স্লাইড ক্যালিপার্স দিয়ে একটি ম্যাচ বাক্স বা অন্য কিছুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা মেপে তার আয়তন বের করা। যদি তোমার কাছে স্লাইড ক্যালিপার্স না থাকে তা হলে 1.10 চিত্রে দেখানো পদ্ধতিতে একটা স্লাইড ক্যালিপার্স তৈরি করে নাও।

স্লাইড ক্যালিপার্সের সাহায্যে কোনো কিছুর দৈর্ঘ্য মাপতে হলে ছবিতে দেখানো উপায়ে সেটি স্লাইড ক্যালিপার্সের দুটি চোয়ালের মাঝখানে রাখতে হয়। চোয়াল দুটিকে বস্তুটির দুই পাশে স্পর্শ করতে হয়।

এবারে সাবধানে লক্ষ করো ভার্নিয়ারের শূন্য দাগ মূল স্কেলের কোন দাগ অতিক্রম করেছে, সেটি হবে প্রধান স্কেলের পাঠ M। লক্ষ করো, মূল স্কেলের কোন দাগের বেশি কাছে সেটি প্রধান স্কেলের পাঠ নয়, কোন দাগটি সম্পূর্ণ অতিক্রম করেছে সেটি মূল স্কেলের পাঠ M।

এই অবস্থায় ভার্নিয়ার স্কেলের কোন দাগটি মূল স্কেলের যেকোনো একটি দাগের সাথে মিলে যায় সেটি নির্ণয় করো—এটি হচ্ছে ভার্নিয়ার সমপাতন V। একাধিকবার বস্তুটির দৈর্ঘ্য মাপো। ছকে বসাও। একইভাবে ম্যাচ বাক্সটির প্রস্থ এবং উচ্চতা মাপো।

পর্যবেক্ষণ: ভার্নিয়ার ধ্রুবক বের করা:

প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম এক ঘরের মান S = ...

ভার্নিয়ার স্কেলে মোট ভাগসংখ্যা n = ...

ভার্নিয়ার ধ্রুবক VC = S/n = ...

টেবিল 1.06: আয়তাকার বস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা নির্ণয়ের ছক:

বস্তুর	পর্যবেক্ষণ সংখ্যা	মূল স্কেল পাঠ M	ভার্নিয়ার সমপাতন V	ভার্নিয়ার ধ্রুবক VC	পাঠ M + V × VC	গড় পাঠ
দৈর্ঘ্য L						
প্রস্থ W						
উচ্চতা H						

২০২৩

1.7 পরিমাপের ত্রুটি ও নির্ভুলতা (Error and Accuracy)

ত্রুটি একটি নেতিবাচক শব্দ এবং "পরিমাপে ত্রুটি" বলা হলে আমাদের মনে হয়, যে মানুষটি পরিমাপ করেছে সে তার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন না করায় একটি ত্রুটি হয়েছে। বিষয়টি তা নয়, যে পরিমাপ করছে তার অবহেলার কারণে কখনো কখনো ত্রুটি হতে পারে কিন্তু আমাদের জানতে হবে যে আমরা যে যন্ত্রপাতি দিয়ে পরিমাপ করি সেগুলো কখনো নির্ভুল নয়। কাজেই কতটুকু নির্ভুলভাবে পরিমাপ করা সম্ভব তার একটি সীমা আছে অর্থাৎ পরিমাপে ত্রুটি থাকা খুবই স্বাভাবিক। তবে পরিমাপ কতটুকু নির্ভুল হয়েছে তারও একটি পরিমাপ থাকতে হয়। কাজেই একটা পরীক্ষা করে পরীক্ষার ফলাফলটি জানানোর সময় সেটি কতটুকু নির্ভুল সেটাও জানিয়ে দিতে পারলে ফলাফলের বিশ্বাসযোগ্যতা অনেক বেড়ে যায়। পরীক্ষার ফলাফলের নির্ভুলতা বের করার জন্য কিছু প্রচলিত নিয়ম জানা থাকলে তোমরাও তোমাদের পরীক্ষার ফলাফলের নির্ভুলতার একটা পরিমাপ দিতে পারবে।

ধরা যাক তুমি একটি স্কেল দিয়ে বস্তুর দৈর্ঘ্য মাপছ। বস্তুটির দৈর্ঘ্য কত নির্ভুলভাবে মাপতে পারবে সেটি নির্ভর করে তোমার স্কেলটিতে কত সূক্ষ্মভাবে দাগ কাটা হয়েছে তার ওপর। যদি প্রতি 1 cm পর পর দাগ কাটা থাকে তাহলে উত্তরটি অবশ্যই তুমি নির্দিষ্ট সংখ্যক cm এ প্রকাশ করবে। কিন্তু বস্তুর প্রকৃত দৈর্ঘ্যটি যে হুবহু সেই সংখ্যক cm ছিল তা কিন্তু নয়, সেটি সম্ভবত এর কাছাকাছি ছিল, কাজেই তোমার মাপা দৈর্ঘ্যটির ভেতর একটু অনিশ্চয়তা থাকা সম্ভব, সে কারণে প্রচলিত নিয়মে আমরা প্রকৃত উত্তরের সাথে সেই অনিশ্চয়তাটুকু যোগ করে দিই। অর্থাৎ আমরা যদি দেখি দৈর্ঘ্যটি 4 এর কাছাকাছি তাহলে আমরা বলব বস্তুটির দৈর্ঘ্য:

$$4.0 \pm 0.5 \text{ cm}$$

অর্থাৎ বস্তুটির দৈর্ঘ্য 3.5 cm থেকে 4.5 cm এর ভেতর যেকোনো মান হতে পারে।

উদাহরণ

প্রশ্ন :1.11 চিত্রটিতে দেখানো বস্তুটির দৈর্ঘ্য কত?

উত্তর: বস্তুটির দৈর্ঘ্য 7 ± 0.5 mm অর্থাৎ বস্তুটির দৈর্ঘ্য 6.5 mm থেকে 7.5 mm এর ভেতরে যেকোনো মান হতে পারে।

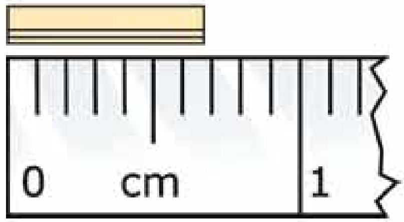

চিত্র 1.11: স্কেলের পাশে বস্তুটির দৈর্ঘ্য 7 mm এর কাছাকাছি।

এবারে আমরা নির্ভুলতা কীভাবে পরিমাপ করা যায় সেটা নিয়ে আলোচনা করতে পারি। নির্ভুলতার একটা পরিমাপ হচ্ছে চূড়ান্ত ত্রুটি (absolute

error)। নামটি দেখেই বোঝা যাচ্ছে এটি হচ্ছে প্রকৃত মানের তুলনায় পরিমাপ করা মাপের পার্থক্যটুকু। তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ আমরা যখন পরিমাপ করি তখন প্রকৃত মানটি আসলে জানি না। তাই চূড়ান্ত ত্রুটি হিসেবে আমরা সবচেয়ে বেশি সম্ভাব্য ত্রুটিকেই ব্যবহার করি। অর্থাৎ আমাদের আগের উদাহরণে চূড়ান্ত ত্রুটি হচ্ছে

$$|\pm 0.5 \text{ mm}| = 0.5 \text{ mm}$$

চূড়ান্ত ত্রুটির পর আমরা Relative Error বা আপেক্ষিক ত্রুটির বিষয়টি দেখতে পারি। ধরা যাক কোনো দৈর্ঘ্য মাপতে গিয়ে আমাদের ± 0.5 mm ত্রুটি হয়। বস্তুটির দৈর্ঘ্য যদি 1 mm হয় তাহলে এই ত্রুটিটি খুবই গুরুতর কিন্তু দৈর্ঘ্যটি যদি 1 m হয় তাহলে পরিমাপটি যথেষ্ট নির্ভুল। এই বিষয়টুকু বোঝানোর জন্য আপেক্ষিক ত্রুটি বা Relative Error এর ধারণা আনা হয়েছে।

অর্থাৎ

আপেক্ষিক ত্রুটি = চূড়ান্ত ত্রুটি/পরিমাপ করা মান

কাজেই আমাদের আগের উদাহরণে:

আপেক্ষিক ত্রুটি হচ্ছে: $0.5 \text{ mm} / 7 \text{ mm} = 0.071$

শতাংশের হিসাবে এটি হচ্ছে $0.071 \times 100 = 7.1\%$

প্রশ্ন: ধরা যাক বর্গাকৃতি একটা বইয়ের দৈর্ঘ্য পরিমাপ করে তুমি 10 cm পেয়েছ। ধরা যাক পরিমাপে 10% আপেক্ষিক ত্রুটি হয়েছে। বস্তুটির ক্ষেত্রফলে আপেক্ষিক ত্রুটি কত?

উত্তর: বস্তুটির পরিমাপ করা ক্ষেত্রফল $10 \times 10 = 100 \text{ cm}^2$

যেহেতু বস্তুটির আপেক্ষিক ত্রুটি 10% কাজেই তার দৈর্ঘ্য পরিমাপ করা হলে সবচেয়ে কম 9 cm এবং সবচেয়ে বেশি 11cm হতে পারে।

কাজেই ক্ষেত্রফল,

সবচেয়ে কম $9 \text{ cm} \times 9 \text{ cm} = 81 \text{ cm}^2$ এবং

সবচেয়ে বেশি $11 \text{ cm} \times 11 \text{ cm} = 121 \text{ cm}^2$ হতে পারে।

কাজেই চূড়ান্ত ত্রুটি:

$$|100 \text{ cm}^2 - 81 \text{ cm}^2| = 19 \text{ cm}^2$$

অথবা $|121 \text{ cm}^2 - 100 \text{ cm}^2| = 21 \text{ cm}^2$

যেহেতু দুটি সমান নয় আমরা বড়টি নিই অর্থাৎ চূড়ান্ত ত্রুটি 21 cm^2

কাজেই আপেক্ষিক ত্রুটি $21\ \text{cm}^2/100\ \text{cm}^2 = 0.21$
শতাংশের হিসাবে $0.21 \times 100 = 21\%$

অর্থাৎ দৈর্ঘ্যের পরিমাপে 10% ত্রুটি হলে ক্ষেত্রফলের বেলায় সেটি হবে প্রায় দ্বিগুণ। একইভাবে তুমি দেখাতে পারবে আয়তন মাপা হলে তার ত্রুটি হবে তিন গুণ!

প্রশ্ন: তুমি একটি বাক্স একটি রুলার দিয়ে মেপেছ যেখানে শুধু cm দিয়ে দাগ। তুমি বাক্সটির দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং উচ্চতা হিসেবে পেয়েছ 10 cm, 5 cm, 4 cm, তোমার মাপে কত শতাংশ ত্রুটি আছে?

উত্তর: যেহেতু তোমার রুলারে শুধু cm দাগ দেওয়া কাজেই তোমার ত্রুটি $\pm 0.5\ \text{cm}$ কাজেই তোমার মাপের ত্রুটি:

দৈর্ঘ্য $10 \pm 0.5\ \text{cm}$
প্রস্থ $5 \pm 0.5\ \text{cm}$
উচ্চতা $4 \pm 0.5\ \text{cm}$

তোমার মাপা আয়তন: $10\ \text{cm} \times 5\ \text{cm} \times 4\ \text{cm} = 200\ \text{cm}^3$

সম্ভাব্য সবচেয়ে ছোট আয়তন:
$$(10 - 0.5)\ \text{cm} \times (5 - 0.5)\ \text{cm} \times (4 - 0.5)\ \text{cm} = 149.625\ \text{cm}^3$$
সম্ভাব্য সবচেয়ে বড় আয়তন:
$$(10 + 0.5)\ \text{cm} \times (5 + 0.5)\ \text{cm} \times (4 + 0.5)\ \text{cm} = 259.875\ \text{cm}^3$$
কাজেই আয়তন $149.625\ \text{cm}^3 < V < 259.875\ \text{cm}^3$

চূড়ান্ত ত্রুটি:

$149.625\ \text{cm}^3$ থেকে $200\ \text{cm}^3$ হচ্ছে $200\ \text{cm}^3 - 149.625\ \text{cm}^3 = 50.375\ \text{cm}^3$
$200\ \text{cm}^3$ থেকে $259.875\ \text{cm}^3$ হচ্ছে $259.875\ \text{cm}^3 - 200\ \text{cm}^3 = 59.875\ \text{cm}^3$

আমরা বড়টি নিই: অর্থাৎ চূড়ান্ত ত্রুটি $59.875\ \text{cm}^3$

আপেক্ষিক ত্রুটি: $59.875\ \text{cm}^3/200\ \text{cm}^3 \times 100 = 29.9375\% \cong 30\%$

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন

1. আমরা কেন পদার্থবিজ্ঞান পড়ব—এ সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন রচনা কর।
2. "বিংশ শতাব্দীতে পদার্থবিজ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতি ঘটে"—উদাহরণসহ এর পক্ষে যুক্তি দাও।
3. (ক) রাশি বলতে কী বোঝায়? (খ) মৌলিক রাশি ও লব্ধ রাশির মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর।
4. (ক) এককের আন্তর্জাতিক পদ্ধতিতে কোন কোন রাশিকে মৌলিক রাশি ধরা হয়েছে?
   (খ) এই সকল রাশির এককের নামগুলো কী?
5. মাত্রা বলতে কী বুঝ?
6. যুক্তিতর্ক, পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং পর্যবেক্ষণ এই তিনটি পদ্ধতির কোনটিকে তুমি বিজ্ঞান গবেষণার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে করো? কেন?
7. সাতটি SI এককের একটি অন্যগুলো থেকে একটু অন্য রকম। কোনটি এবং কেন বলতে পারবে?
8. যদি হঠাৎ করে তোমার এবং তোমার চারপাশের সবকিছুর সাইজ অর্ধেক হয়ে যায় তুমি কি বুঝতে পারবে?
9. তুমি কি পৃথিবীর ব্যাসার্ধ মাপতে পারবে?

গাণিতিক প্রশ্ন

1. টেবিল 1.5 এর উপসর্গ ব্যবহার করে নিচের সংখ্যাগুলো প্রকাশ করো:

(ক) 10^{12} Flops (খ) 10^{9} bytes (গ) 10^{-3} gm (ঘ) 10^{-9} s (ঙ) 10^{-15} m

2. এক বছরে কত সেকেন্ড? (মজা করার জন্য π দিয়ে প্রকাশ করো)
3. এক আলোকবর্ষের দূরত্ব কত মিটার?
4. একটি ভার্নিয়ার স্কেলে একটি দণ্ডের দৈর্ঘ্য মাপার সময় 1.12 চিত্রের মতো দেখা গেছে। দণ্ডটির দৈর্ঘ্য কত?
5. শক্তির মাত্রা ML^2T^{-2}, SI ইউনিটে এর একক কত?

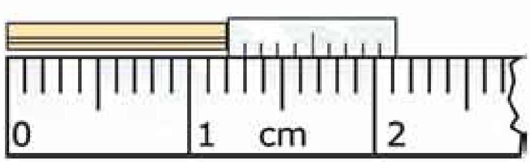

চিত্র 1.12: ভার্নিয়ার স্কেলের রিডিং।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটির পাশে ঠিক (√) চিহ্ন দাও:

1. কোয়ান্টাম তত্ত্ব প্রথম কে প্রদান করেন?
   (ক) প্ল্যাঙ্ক (খ) আইনস্টাইন
   (গ) রাদারফোর্ড (ঘ) হাইজেনবার্গ

2. বোজন কার নাম থেকে এসেছে?
   (ক) জগদীশচন্দ্র বসু (খ) সুভাষচন্দ্র বসু
   (গ) সত্যেন্দ্রনাথ বসু (ঘ) শরৎচন্দ্র বসু

3. নিচের কোনটি মৌলিক রাশি নয়?
   (ক) ভর (খ) তাপ
   (গ) তড়িৎ প্রবাহ (ঘ) পদার্থের পরিমাণ

4. একটি দণ্ডকে স্লাইড ক্যালিপার্সে স্থাপনের পর যে পাঠ পাওয়া গেল তা হচ্ছে প্রধান স্কেল পাঠ 4 cm, ভার্নিয়ার সমপাতন 7 এবং ভার্নিয়ার ধ্রুবক 0.1 mm, দণ্ডটির দৈর্ঘ্য কত?
   (ক) 4.07 cm (খ) 4.7 cm
   (গ) 4.07 cm (ঘ) 4.7 mm

পাশের চিত্র থেকে 5 এবং 6 নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

5. খ চিত্রটির আয়তন:
   (ক) $\frac{1}{3}\pi r^3$ (খ) $\frac{4}{3}\pi r^3$
   (গ) $\frac{3}{4}\pi r^3$ (ঘ) πr^3

6. ক ও খ চিত্রের আয়তনের অনুপাত:
   (ক) 1 : 0.673 (খ) 1 : 0.0673
   (গ) 1 : 0.763 (ঘ) 1 : 0.637

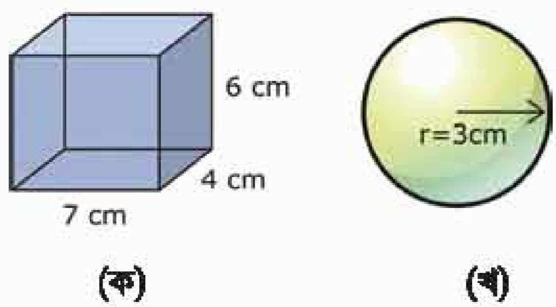

চিত্র 1.13: একটি ব্লক এবং একটি গোলক।

২০২৫

সৃজনশীল প্রশ্ন

1. রাশেদ তার সদ্য কেনা স্কেল দিয়ে পেনসিলের দৈর্ঘ্য মেপে বলল পেনসিলটির দৈর্ঘ্য 11.73 cm। তার বন্ধু সুজন বলল এই পরিমাপ সঠিক নাও হতে পারে। রাশেদ বলল যে এই স্কেল দিয়ে কয়েকবার পরিমাপ করে একই ফল পেয়েছে। তারা শিক্ষকের কাছে গেলে শিক্ষক তাদের 0.005 cm ভার্নিয়ার ধ্রুবকবিশিষ্ট ভার্নিয়ার স্কেল ব্যবহার করতে বললেন। রাশেদ ভার্নিয়ার স্কেলের সাহায্যে সঠিক দৈর্ঘ্য পরিমাপ করল।

   (ক) ভার্নিয়ার ধ্রুবক কী?

   (খ) কোনো রাশির পরিমাণ প্রকাশ করতে এককের প্রয়োজন হয় কেন?

   (গ) ব্যবহৃত ভার্নিয়ার স্কেলের কত ভাগ প্রধান স্কেলের কত ভাগের সমান নির্ণয় করো।

   (ঘ) রাশেদের প্রথম দৈর্ঘ্য পরিমাপ সঠিক পরিমাপের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না যুক্তি সহকারে লেখ।

2. বিজ্ঞান শিক্ষক রশিদ সাহেব পদার্থবিজ্ঞান ক্লাসে ছাত্র-ছাত্রীদের একটি বাক্স এবং একটি রুলার দিয়ে বাক্সটির আয়তন নির্ণয় করতে বললেন। ছাত্র-ছাত্রীরা লক্ষ করল, রুলারে শুধু cm পর্যন্ত মাপা যায়। ছাত্র-ছাত্রীরা রুলার দিয়ে বাক্সটির দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং উচ্চতা হিসেবে যথাক্রমে 20 cm, 15 cm এবং 10 cm পেল।

   (ক) মাত্রা কী?

   (খ) ওজন ও ভর কেন একই ধরনের রাশি নয়?

   (গ) বাক্সটির আয়তন পরিমাপে আপেক্ষিক ত্রুটি কত শতাংশ নির্ণয় করো।

   (ঘ) এই রুলারটি বইয়ের ক্ষেত্রফল মাপার জন্য ঠিক আছে, কিন্তু ঘরের ক্ষেত্রফল মাপার জন্য ঠিক নেই, উক্তিটি বিশ্লেষণ করো।

দ্বিতীয় অধ্যায়

গতি

(Motion)

আমাদের চারপাশে অনেক ধরনের গতি রয়েছে। একজন যখন সাইকেল চালিয়ে যায় সেটি একধরনের গতি, যখন একটি গাড়ি যায় সেটিও একধরনের গতি। যখন প্লেন উড়ে যায় সেটিও গতি, পৃথিবী যখন সূর্যের চারদিকে ঘুরে সেটিও একটি গতি। ঝুলন্ত একটি বাতি যখন দুলতে থাকে সেটিও গতি, রাইফেল থেকে যখন বুলেট বের হয় সেটিও গতি। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় এই নানা ধরনের গতি বুঝি সব ভিন্ন ভিন্ন ধরনের গতি, কিন্তু তোমরা জেনে খুবই অবাক এবং খুশি হবে যে একেবারে অল্প কয়েকটি রাশি দিয়ে এই সবগুলোকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

এই অধ্যায়ে সেই রাশিগুলো, তাদের একক, মাত্রা এবং একের সাথে অন্যের কী সম্পর্ক সেগুলো আলোচনা করা হবে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- স্থিতি ও গতি ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বিভিন্ন প্রকার গতির মধ্যে পার্থক্য করতে পারব।
- স্কেলার ও ভেক্টর রাশি ব্যাখ্যা করতে পারব।
- গতি সম্পর্কিত রাশিসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে পারব।
- বাধাহীন ও মুক্তভাবে পড়ন্ত বস্তুর গতি ব্যাখ্যা করতে পারব।
- লেখচিত্রের সাহায্যে গতি সম্পর্কিত রাশিসমূহের মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে পারব।
- আমাদের জীবনে গতির প্রভাব উপলব্ধি করতে পারব।

2.1 স্থিতি এবং গতি (Rest and Motion)

আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে তার মাঝে কোনটি স্থির বা স্থিতিশীল এবং কোনটি চলমান বা গতিশীল সেটি বুঝতে আমাদের কখনো অসুবিধা হয় না। আমাদের চোখ দিয়ে আমরা এমনভাবে দেখি যে, কোনো কিছু একটুখানি নড়লেই আমরা চট করে সেটা ধরে ফেলতে পারি। কাজেই স্থিতি বা গতি বলতে কী বোঝায় সেটি আমরা খুব চমৎকারভাবে অনুভব করতে পারি। কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানের জন্য শুধু অনুভব করা যথেষ্ট নয়, সেটাকে ভালোভাবে সংজ্ঞায়িত করতে হয়। সেটি করার জন্য আমরা এক কথায় বলতে পারি যে, সময়ের সাথে কোনো কিছুর অবস্থানের যদি পরিবর্তন না হয় তাহলে সেটি স্থির, আর যদি অবস্থানের পরিবর্তন হয় তাহলে সেটি গতিশীল।

এখন আমাদের 'অবস্থান' শব্দটির ভালো করে ব্যাখ্যা করা দরকার। আমাদের দৈনন্দিন কথাবার্তায় আমরা নানাভাবে অবস্থান শব্দটি ব্যবহার করলেও পদার্থবিজ্ঞানের ভাষায় অবস্থান শব্দটির একটি সুনির্দিষ্ট অর্থ রয়েছে। যেমন তোমাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় তোমার স্কুলের অবস্থান কোথায় এবং তুমি যদি উত্তর দাও 'ঝিলটুলি'তে তাহলে উত্তরটি সঠিক হলেও স্কুলের অবস্থানটি কিন্তু জানা গেল না। তুমি যদি উত্তর দাও, তোমার স্কুলটি তোমার বাসার গেট থেকে এক কিলোমিটার দূরে, তাহলেও কিন্তু স্কুলের অবস্থান জানা গেল না। তোমার বাসার গেটটি কোথায় সেটি আমাদের জানা থাকলেও আমরা বলতে পারব না স্কুলটি সেখান থেকে ঠিক কোন দিকে এক কিলোমিটার দূরে। কিন্তু তুমি যদি বলো স্কুলটি তোমার বাসার গেট থেকে পূর্ব দিকে এক কিলোমিটার দূরে তাহলেই শুধু আমরা সুনির্দিষ্টভাবে তোমার স্কুলের অবস্থানটি জানতে পারব। অর্থাৎ স্কুলের অবস্থান জানার জন্য দূরত্ব এবং দিক দুটিই সুনির্দিষ্টভাবে জানতে হয়। শুধু তাই নয়, সেই দূরত্ব এবং দিকটি নির্দেশ করতে হয় একটি নির্দিষ্ট বিন্দু বা প্রসঙ্গ বিন্দুর অবস্থান থেকে। তোমার স্কুলের বেলায় প্রসঙ্গ বিন্দু (origin) ছিল তোমার বাসার গেট। সেটি তোমার বাসার গেট না হয়ে একটা বাস স্টপ কিংবা একটা শপিং মল হতে পারত। তাহলে অবশ্যই দূরত্ব এবং দিকটির ভিন্ন মান হতো কিন্তু অবস্থানটি অবশ্যই এই নতুন প্রসঙ্গ বিন্দুর সাপেক্ষে বলে দিতে পারতাম। অর্থাৎ কোনো কিছুর অবস্থান বলতে হলে সেটি বলতে হয় কোনো একটি প্রসঙ্গ বিন্দুর সাপেক্ষে। এই প্রসঙ্গ বিন্দুটি চূড়ান্ত কোনো বিষয় নয়, আমরা আমাদের সুবিধা অনুযায়ী যেকোনো বিন্দুকে প্রসঙ্গ বিন্দু বা মূল বিন্দু হিসেবে ধরতে পারি।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে অবস্থান নির্দিষ্ট করার জন্য আমাদের যে প্রসঙ্গ বিন্দু বা মূল বিন্দু ধরে নিতে হয় সেই বিন্দুটি কি স্থির একটি বিন্দু হওয়া প্রয়োজন? ধরা যাক তোমার সামনে আরেকজন চেয়ারে স্থির হয়ে বসে আছে। তোমার চেয়ারটাকে যদি প্রসঙ্গ বা মূল বিন্দু ধরে নিই তাহলে নিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে তোমার বন্ধুর অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না।

কিন্তু যদি এমন হয় তোমরা আসলে চলন্ত একটি ট্রেনে বসে আছ তাহলে কী হবে? ট্রেনের বাইরে স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা একজন মানুষ বলবে, তুমি কিংবা তোমার বন্ধু দুজনেই গতিশীল, কেউ স্থির নয়! তাহলে কার কথাটি সত্যি? তোমার, নাকি স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটির? আসলে তোমার কিংবা স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটির, দুজনের কথাই সত্যি! তার কারণ মূল বিন্দু বা প্রসঙ্গ বিন্দু যদি সমবেগে চলতে থাকে তাহলে আমরা কখনোই জোর দিয়ে বলতে পারব না যে প্রসঙ্গ বিন্দুটি কি সমবেগে চলছে নাকি এটা আসলে স্থির এবং অন্য সবকিছু উল্টো দিকে সমবেগে চলছে! কাজেই আমরা বলতে পারি যদি কোনো একটি মূল বিন্দুর সাপেক্ষে কোনো বস্তুর অবস্থানের পরিবর্তন হয় তাহলে সেই বস্তুটি ঐ বিন্দুর সাপেক্ষে গতিশীল। মূল বিন্দুটি কি আসলে স্থির নাকি সমবেগে চলছে সেটি নিয়ে আমরা মাথা ঘামাব না। সেটি গুরুত্বপূর্ণ নয়, তার কারণ সব গতিই আপেক্ষিক।

শুধু তাই নয়, আমরা যদি সত্যিকারের স্থির কোনো একটি প্রসঙ্গ বিন্দু খুঁজে বেড়াই তাহলে বিপদে পড়ে যাব। পৃথিবীর পৃষ্ঠে কোনো কিছুকে মূল বিন্দু ধরে নিলে একজন আপত্তি করে বলতে পারে পৃথিবী তো স্থির নয় সেটা নিজের অক্ষের উপর ঘুরছে কাজেই পৃথিবী পৃষ্ঠের সবকিছু ঘুরছে। আমরা বুদ্ধি করে বলতে পারি পৃথিবীর কেন্দ্র হচ্ছে মূল বিন্দু। তখন আরেকজন আপত্তি করে বলতে পারে যে সেটিও স্থির নয়, সেটি সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। আমরা তখন আরো বুদ্ধি খরচ করে বলতে পারি সূর্যের কেন্দ্রবিন্দুটিই হোক মূল বিন্দু! তখন অন্য কেউ আপত্তি করে বলতেই পারে সূর্যও তো স্থির নয়, সেটাও তো আমাদের গ্যালাক্সির (বাংলায় নামটি ছায়াপথ, ইংরেজিতে Milky Way) কেন্দ্রকে ঘিরে ঘুরছে। বুঝতেই পারছ তখন কেউ আর সাহস করে গ্যালাক্সির কেন্দ্রকে মূল বিন্দু বলবে না! গ্যালাক্সি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড স্থির কে বলেছে? শুধু তাই নয়, গ্যালাক্সির কেন্দ্রবিন্দুকে মূল বিন্দু ধরা হলে পৃথিবী পৃষ্ঠের একটা অবস্থান বর্ণনা করতে আমরা কী পরিমাণ জটিলতায় পড়ে যাব কেউ চিন্তা করেছ?

আসলে এত জটিলতার কোনো প্রয়োজন নেই, আমাদের কাজ চালানোর জন্য আমাদের কাছে স্থির মনে হয় এরকম যেকোনো বিন্দুকে মূল বিন্দু ধরে সব কাজ করে ফেলতে পারব, শুধু বলে নিতে হবে সব মাপজোখ এই মূল বিন্দুর সাপেক্ষে করা হয়েছে। বিজ্ঞানীরা এভাবে পরমাণুর ভেতরে নিউক্লিয়াস থেকে শুরু করে মহাকাশে পাঠানো উপগ্রহ সবকিছুর মাপজোখ করে ফেলতে পারেন, কখনো কোনো সমস্যা হয়নি!

2.2 বিভিন্ন প্রকার গতি (Different Types of Motion)

আমরা আমাদের চারপাশে অনেক রকম গতি দেখতে পাই, কোনো কিছু নড়ছে, কোনো কিছু কাঁপছে, কোনো কিছু ঘুরছে, কোনো কিছু সরে যাচ্ছে—এই সবই হচ্ছে নানা রকম গতির উদাহরণ। সম্ভাব্য গতির কোনো শেষ নেই কিন্তু আমরা ইচ্ছে করলে কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ গতির কথা আলাদা করে বলতে পারি।

সরলরৈখিক গতি (Linear Motion)

এটি সবচেয়ে সহজ গতির উদাহরণ। কোনো কিছু যদি সরলরেখায় যায় তাহলে তার গতিটি হচ্ছে সরলরৈখিক গতি। কোনো কিছুকে সমতলপৃষ্ঠে ধাক্কা দিয়ে ছেড়ে দিলে সেটা সরলরেখায় যেতে থাকে। একটা বলকে উপর থেকে ছেড়ে দিলে সেটা সোজা নিচের দিকে পড়ে, কাজেই সেটাও রৈখিক গতি।

ঘূর্ণন গতি (Circular Motion)

কোনো কিছু যদি একটা নির্দিষ্ট বিন্দুর সমদূরত্বে থেকে ঘুরতে থাকে তাহলে সেটাকে বলে ঘূর্ণন গতি। বৈদ্যুতিক পাখা, ঘড়ির কাঁটা এগুলো ঘূর্ণন গতির উদাহরণ হলেও চমকপ্রদ একটা উদাহরণ হচ্ছে আকাশের চাঁদ। চাঁদকে কোনো কিছু দিয়ে পৃথিবীর সাথে বেঁধে রাখা নেই তবু এটা পৃথিবীকে ঘিরে ঘুরছে, শুধু তাই নয়, এটা টুপ করে পৃথিবীতে পড়েও যাচ্ছে না!

চলন গতি (Translational Motion)

কোনো কিছু যদি এমনভাবে চলতে থাকে যেন বস্তুর সকল কণা একই সময় একই দিকে যেতে থাকে তাহলে সেটা হচ্ছে চলন গতি। আমরা আমাদের চারপাশে মাঝে মাঝে এরকম অনেক উদাহরণ দেখতে পাই। কোনো কিছু যখন সোজা (রৈখিক গতি) যায় তখন তার উদাহরণ দেখা খুব সহজ। গাড়ির ঘূর্ণায়মান চাকা বিবেচনায় না আনলে সোজা এগিয়ে যাওয়া একটা গাড়ি চলন গতির উদাহরণ, তখন গাড়ির প্রতিটি বিন্দু একই সময় একই দিকে একই দূরত্ব অতিক্রম করছে।

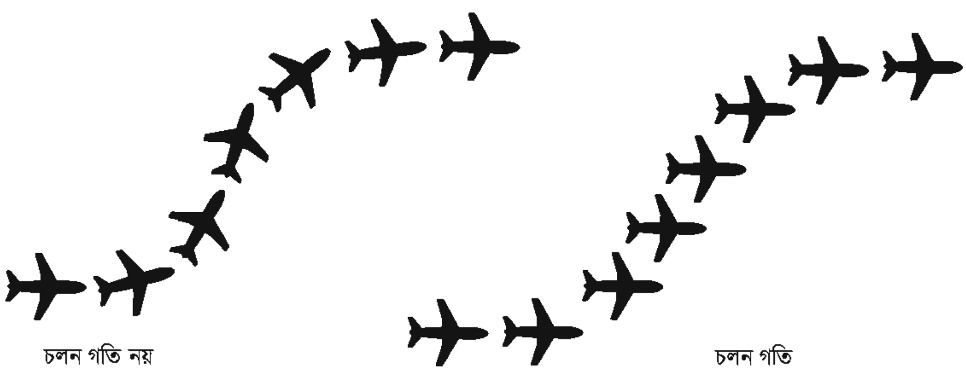

চিত্র 2.01: চলন গতির উদাহরণ

চলন গতি সোজা হতেই হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই কিন্তু আঁকাবাঁকা পথে চলন গতির উদাহরণ সহজে পাওয়া যাবে না। একটা প্লেনের প্রতিটি বিন্দুকে একই গতিপথে যেতে হলে সেটিকে কীভাবে যেতে হবে 2.01 চিত্রে দেখানো হয়েছে। দেখেই বুঝতে পারছ আঁকাবাঁকা চলন গতি পাওয়া কেন এত কঠিন।

পর্যায়বৃত্ত গতি (Periodic Motion)

কোনো গতিশীল বস্তু যদি নির্দিষ্ট সময় পর পর একটি নির্দিষ্ট বিন্দু দিয়ে একই দিকে একইভাবে অতিক্রম করে তাহলে সেটাকে পর্যায়বৃত্ত গতি বলা যায়। আমাদের হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন পর্যায়বৃত্ত কারণ সেটি নির্দিষ্ট সময় পর পর একইভাবে একই দিকে স্পন্দিত বা গতিশীল হয়। পর্যায়বৃত্ত গতি বৃত্তাকার (ফ্যানের পাখা), উপবৃত্তাকার (সূর্যকে ঘিরে হ্যালির ধূমকেতুর কক্ষপথ), কিংবা সরলরৈখিক (স্প্রিংয়ে ঝুলিয়ে রাখা দুলতে থাকা বস্তু) হতে পারে। ঘূর্ণন গতি একটি বিশেষ ধরনের পর্যায়বৃত্ত গতি।

চিত্র 2.02: দোলনা সরল স্পন্দন গতির একটি উদাহরণ

সরল স্পন্দন গতি (Simple Harmonic Motion)

একটি বিশেষ ধরনের পর্যায়বৃত্ত গতি হচ্ছে **সরল** স্পন্দন গতি। স্পন্দন গতির বেলায় একটি নির্দিষ্ট বিন্দুর দুই পাশে বস্তুটি স্পন্দিত হয়। বস্তুটি একেবারে স্থির অবস্থা থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে গতিশীল হয়। কেন্দ্রবিন্দুতে সর্বোচ্চ গতিতে পৌঁছায় তখন এর গতি কমতে থাকে। গতি কমতে কমতে এটি এক সময় থেমে যায় তখন এটি গতিপথ পরিবর্তন করে বিপরীত দিকে গতিশীল হয়। বিপরীত দিকে সর্বোচ্চ গতিশীল হওয়ার পর আবার এর গতি কমতে থাকে, এক সময় পুরোপুরি থেমে আবার আগের দিকে ধীরে ধীরে গতিশীল হয় এবং এভাবে চলতেই থাকে।

আমাদের চারপাশে স্পন্দন গতির অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। স্প্রিং থেকে দুলিয়ে দেওয়া একটা বস্তুর গতি হচ্ছে স্পন্দন গতি। দোলনায় দুলতে থাকা শিশু (চিত্র 2.02) কিংবা ঘড়ির পেন্ডুলাম এর উদাহরণ। আমরা যখন কথা বলি তখন বাতাসের অণু এই গতি দিয়ে শব্দকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যায়। আমরা এতক্ষণ বিশেষ কয়েক ধরনের গতির কথা বলেছি, কিন্তু এই গতিগুলোর কারণটি কোথাও বলিনি। পদার্থবিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় সাফল্য হচ্ছে যে, এটি শুধু যে বস্তুর বিচিত্র গতির কারণটি খুঁজে বের করবে তা নয় এর গতিটি সুনির্দিষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতে পারবে।

তুমি কি গতির কারণটি অনুমান করতে পারবে?

2.3 স্কেলার ও ভেক্টর রাশি (Scalars and Vectors)

আমাদের পরিচিত জগতে আমরা যা কিছু পরিমাপ করতে পারি সেটাই রাশি—আনন্দ কিংবা দুঃখ রাশি নয় কিন্তু তাপমাত্রা রাশি। তার কারণ আনন্দ কিংবা দুঃখকে মেপে একটা মান দেওয়া যায় না কিন্তু তাপমাত্রা মেপে মান দেওয়া সম্ভব। তোমার শরীরের তাপমাত্রা 37° C কিংবা 98.4° F। তাপমাত্রা বোঝানোর জন্য একটি সংখ্যা বললেই চলে কিন্তু অনেক রাশি আছে, যেগুলোকে একটি সংখ্যা দিয়ে পুরোপুরি প্রকাশ করা যায় না, হয় তার মানের সাথে একটা দিক বলে দিতে হয়, কিংবা একাধিক মান বলে দিতে হয় যেন সেগুলো মিলিয়ে তার মান এবং দিক দুটোই নির্দিষ্ট করে দেওয়া যায়। অবস্থান ছিল সে রকম একটি রাশি, সেটা বোঝানোর জন্য আমাদের শুধু দূরত্ব দিয়ে কাজ হয়নি, তার দিকটিও নির্দেশ করতে হয়েছিল! কাজেই যে রাশি শুধু একটি সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করা যায় সেটা হচ্ছে স্কেলার আর যেটা প্রকাশ করার জন্য একটা দিকও (চিত্র 2.03) বলে দিতে হয়, সেটা হচ্ছে ভেক্টর।

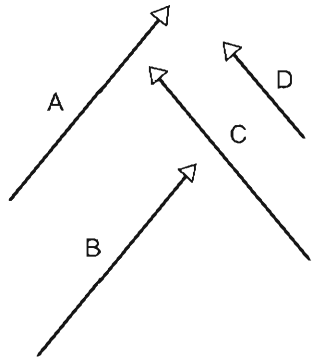

চিত্র 2.03: A ও B ভেক্টর হুবহু এক, যদিও ভিন্ন অবস্থানে রয়েছে, C ভেক্টর A ও B থেকে ভিন্ন, কারণ মান সমান হলেও দিক ভিন্ন। D ভেক্টর C ভেক্টর থেকে ভিন্ন, কারণ দিক একই হলেও মান সমান নয়।

তাপমাত্রা ছাড়াও স্কেলারের উদাহরণ হচ্ছে সময়, দৈর্ঘ্য কিংবা ভর। কারণ এগুলো শুধু একটা সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করে ফেলা যায়। তোমরা দেখবে অবস্থান ছাড়াও ভেক্টরের উদাহরণ হচ্ছে বেগ কিংবা বল। তোমাদের পরের অধ্যায়েই এই বেগ এবং বলের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হবে। কারণ এগুলো প্রকাশ করতে হলে মানের সাথে সাথে দিকটাও বলে দিতে হয়।

ভেক্টর রাশিকে স্কেলার রাশি থেকে আলাদা করে লেখার জন্য সেটাকে মোটা (Bold) করে লেখা হয় (**x, y** কিংবা **A, B**)। বইয়ে কিংবা কম্পিউটারে প্রিন্ট করার সময় যেকোনো কিছু মোটা করে লেখা সহজ। কিন্তু যখন কেউ হাতে কাগজে লিখে তখন কোনো কিছুকে ভেক্টর বোঝানোর জন্য তার উপরে ছোট করে একটা তীর চিহ্ন দেওয়া হয় ($\vec{x}, \vec{y}$ কিংবা $\vec{A}, \vec{B}$)।

তোমাদের এখানে যেটুকু পদার্থবিজ্ঞান শেখানো হবে সেখানে আসলে সত্যিকার অর্থে ভেক্টরের ব্যবহারের প্রয়োজন হবে না, বড়জোর কোনটা স্কেলার কোনটা ভেক্টর মাঝে মাঝে সেটা মনে করিয়ে দেওয়া হবে।

২০২২

2.4 দূরত্ব ও সরণ (Distance and Displacement)

আমরা দূরত্ব শব্দটির সাথে খুব ভালোভাবে পরিচিত, তবে সরণ (displacement) শব্দটি দৈনন্দিন কথাবার্তায় সেভাবে ব্যবহার করি না। আমরা একটি উদাহরণ দিয়ে দূরত্ব এবং সরণ শব্দ দুটির মাঝে সম্পর্কটি বোঝার চেষ্টা করি। 2.04 চিত্রে একটি আঁকাবাঁকা রাস্তা দেখানো হয়েছে। এই রাস্তাটিতে A বিন্দুর সাপেক্ষে রাস্তার অতিক্রান্ত দূরত্বগুলো কিলোমিটারে 1, 2, 3 সংখ্যা দিয়ে দেখানো হয়েছে।

ধরা যাক তুমি A বিন্দুতে আছ, (অর্থাৎ তোমার অবস্থান A বিন্দু) এখন তুমি সাইকেল চালিয়ে আঁকাবাঁকা পথটি ধরে 4 km রাস্তা অতিক্রম করে B বিন্দুতে পৌঁছেছ। আমরা বলতে পারব A এবং B বিন্দুর ভেতরকার দূরত্ব 4 km। দূরত্ব একটি স্কেলার রাশি, কাজেই A এবং B বিন্দুর ভেতরকার দূরত্ব বোঝানোর জন্য কোনো দিকের কথা বলে দিতে হবে না।

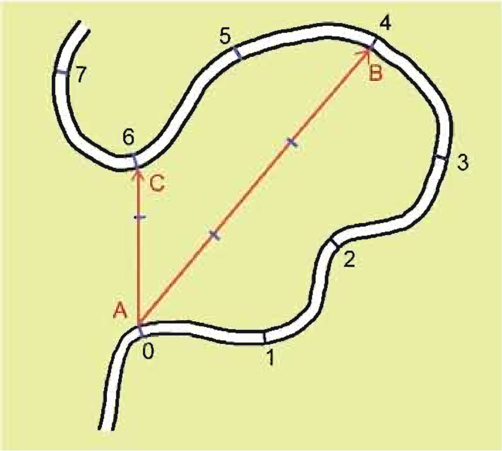

চিত্র 2.04: A বিন্দু থেকে শুরু করে আঁকাবাঁকা পথে সাইকেল চালিয়ে যাওয়া।

আমরা A বিন্দুর সাপেক্ষে এই পথটি ধরে B বিন্দুর "দূরত্ব" বের করেছি। এখন ইচ্ছে করলে A বিন্দুর সাপেক্ষে B বিন্দুর "সরণ" বের করতে পারি। সরণ বলতে বোঝানো হয় A বিন্দুর অবস্থানের সাপেক্ষে B বিন্দুর অবস্থান। ছবিতে A বিন্দু থেকে B বিন্দু পর্যন্ত একটা তীর চিহ্নিত সরলরেখা দিয়ে সরণটি দেখানো হয়েছে। এই ছবিতে সরণের মান 3 km এবং তীরের দিকটি হচ্ছে সরণের দিক। অর্থাৎ সরণ হচ্ছে ভেক্টর রাশি, এর মান এবং দিক দুটিই আছে।

যদি তুমি সাইকেল দিয়ে আরো দুই কিলোমিটার অতিক্রম করে মোট ছয় কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে C বিন্দুতে পৌঁছাও তোমার সরণ হবে তীর চিহ্নিত সরলরেখা AC, যার মান 1.5 কিলোমিটার এবং এখানেও তীরের দিকটি তোমার সরণের দিক। যদিও তুমি আঁকাবাঁকা পথ ধরে বেশি দূরত্ব অতিক্রম করেছ কিন্তু সরণ হয়েছে কম! অর্থাৎ বেশি দূরত্ব অতিক্রম করলেই বেশি সরণ হবে সেটি সত্যি নয়। শুরু থেকে শেষ অবস্থানের পার্থক্য হচ্ছে সরণ।

A থেকে শুরু করে আঁকাবাঁকা পথে B পর্যন্ত দূরত্ব 4 km ঠিক একইভাবে B থেকে A পর্যন্ত হচ্ছে 4 km, দুটোই সমান। কিন্তু লক্ষ করে দেখো A থেকে B পর্যন্ত সরণ আর B থেকে A পর্যন্ত সরণ কিন্তু সমান নয়। একটি আরেকটির নিগেটিভ বা ঋণাত্মক। ভেক্টর হিসেবে লিখতে পারি:

$$\overrightarrow{AB} = -\overrightarrow{BA}$$

দূরত্ব কিংবা সরণ, দুটোর মাত্রাই হলো দৈর্ঘ্যের মাত্রা।

[সরণ] = **L** (ভেক্টর)

[দূরত্ব] = L (স্কেলার)

2.5 দ্রুতি এবং বেগ (Speed and Velocity)

বেগ বলতে কী বোঝানো হয় আমরা সবাই সেটা মোটামুটি জানি। কোনো কিছু কত দ্রুত যাচ্ছে তার পরিমাপটা হচ্ছে বেগ। তবে পদার্থবিজ্ঞানের ভাষায় বেগের একটা সুনির্দিষ্ট অর্থ আছে এবং বেগের পাশাপাশি আমরা দ্রুতি (speed) নামে আরো একটা রাশি ব্যবহার করি। আমরা যদি দূরত্ব এবং সরণ এই বিষয় দুটো ভালোভাবে বুঝে থাকি তাহলে দ্রুতি এবং বেগ এই রাশি দুটোও খুব সহজে বুঝতে পারব।

দ্রুতি হচ্ছে সময়ের সাথে দূরত্বের পরিবর্তনের হার। অর্থাৎ তুমি যদি 20 সেকেন্ডে 100 m দূরত্ব অতিক্রম করে থাকো তাহলে তোমার দ্রুতি v হচ্ছে:

$$v = \frac{100\ \mathrm{m}}{20\ \mathrm{s}} = 5\ \mathrm{m/s}$$

দ্রুতির মাত্রা $[v] = LT^{-1}$

বেগ হচ্ছে সময়ের সাথে সরণের পরিবর্তনের হার অর্থাৎ যদি 20 সেকেন্ডে কোনো নির্দিষ্ট দিকে তোমার অবস্থানের পরিবর্তন হয় 50 m তাহলে তোমার বেগের মান হচ্ছে:

$$v = \frac{50\ \mathrm{m}}{20\ \mathrm{s}} = 2.5\ \mathrm{m/s}$$

বেগ যেহেতু ভেক্টর তাই তার দিকটি নির্দিষ্ট করে দিতে হবে।

বেগের মাত্রা: $[\boldsymbol{v}] = LT^{-1}$

এখানে একটা বিষয় লক্ষ করা যেতে পারে, আমরা যদি শুধু রৈখিক গতি বিবেচনা করি তাহলে বেগ আর দ্রুতির মাঝে কোনো পার্থক্য নেই, বেগের মানটিই হচ্ছে দ্রুতি। তোমাদের এই বইয়ে আমরা শুধু

২০২৫

রৈখিক গতিই বিবেচনা করব তাই দ্রুতি এবং বেগের মাঝে পার্থক্য খুঁজে পাব না। তাই দ্রুতি এবং বেগের ভেতরকার সম্পর্ক বোঝানোর জন্য রৈখিক গতির বাইরে কয়েকটা উদাহরণ নেওয়া যাক:

2.04 চিত্রে আমরা দূরত্ব এবং সরণ বোঝানোর জন্য একটি আঁকাবাঁকা রাস্তা এবং সেখানে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান দেখিয়েছি। দ্রুতি এবং বেগ বোঝানোর জন্য আমরা সেই একই উদাহরণ নিতে পারি তবে এবারে কতটুকু সময়ে তুমি একটি অবস্থান থেকে অন্য অবস্থানে গিয়েছ সেটি বলে দিতে হবে। ধরা যাক সাইকেলে A থেকে B অবস্থানে আসতে তোমার সময় লেগেছে 20 minutes. তাহলে তোমার গড় দ্রুতি হচ্ছে:

গড় দ্রুতি = অতিক্রান্ত দূরত্ব / সময়

অর্থাৎ,

$$v = \frac{4\ \text{km}}{20\ \text{minutes}} = \frac{4 \times 1000\ \text{m}}{20 \times 60\ \text{s}} = 3.33\ \text{m/s}$$

এখানে লক্ষ করো আমরা দ্রুতি শব্দটি ব্যবহার না করে গড় দ্রুতি শব্দটি ব্যবহার করেছি। কারণ তুমি সাইকেল চালানোর সময় হয়তো কখনো একটু জোরে কখনো একটু আস্তে সাইকেল চালিয়েছ। তাই "তাৎক্ষণিক" দ্রুতি আমরা বলতে পারব না, 20 minutes সময়টুকুর গড় দ্রুতিটুকুই শুধু বলতে পারব।

এবারে আমরা বেগ বের করার চেষ্টা করি। দ্রুতির মতোই আমরা কিন্তু তাৎক্ষণিক বেগ বের করতে পারব না, এই পুরো সময়টিতে তুমি ভিন্ন ভিন্ন বেগে সাইকেল চালিয়েছ। গতি বেশি কিংবা কম হওয়ার কারণে বেগের পরিবর্তন হয়েছে আবার দিক পরিবর্তন হওয়ার কারণেও বেগের পরিবর্তন হয়েছে। এই সবগুলো পরিবর্তন মিলিয়ে গড় বেগের মান হচ্ছে:

গড় বেগ = সরণ / সময়

অর্থাৎ,

$$v = \frac{3\ \text{km}}{20\ \text{minutes}} = \frac{3 \times 1000\ \text{m}}{20 \times 60\ \text{s}} = 2.5\ \text{m/s}$$

তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই উদাহরণটিতে গড় দ্রুতির মান থেকে গড় বেগের মান কম। পথটি যদি আঁকাবাঁকা না হয়ে সোজা হতো তাহলে গড় বেগের মান আর গড় দ্রুতি দুটোই সমান হতো। আমাদের এই উদাহরণে তুমি যদি সব সময় একই গতিতে সাইকেল চালিয়ে যেতে তাহলে আমরা বলতাম তুমি সুষম দ্রুতিতে সাইকেল চালিয়ে এসেছ। যখন কোনো কিছু সুষম দ্রুতিতে যায় তখন তার তাৎক্ষণিক দ্রুতি এবং গড় দ্রুতির মান একই হয়ে যায়।

লক্ষ করো, পথটি যেহেতু আঁকাবাঁকা তাই এই পথে গেলে ক্রমাগত তোমার দিক পরিবর্তন হচ্ছে, তাই এই পথে তুমি সুষম দ্রুতিতে গেলেও সুষম বেগে যেতে পারবে না। শুধু রৈখিক গতিতে সরলরেখায় গেলেই সুষম বেগে কিংবা সমবেগে যাওয়া সম্ভব।

উদাহরণ

প্রশ্ন: বেগ আর দ্রুতির মাঝে সম্পর্কটা আরো ভালো করে বোঝার জন্য আমরা আরেকটা উদাহরণ নিই। ধরা যাক, একটু সুতা দিয়ে ছোট একটা পাথরকে বেঁধে তুমি সেটাকে মাথার উপর ঘোরাচ্ছ (চিত্র 2.05)। পাথরটা কি সমবেগে যাচ্ছে নাকি সমদ্রুতিতে যাচ্ছে? নাকি সমদ্রুতি এবং সমবেগে যাচ্ছে?

উত্তর: একটু চিন্তা করলেই তুমি বুঝতে পারবে যে পাথরটার দ্রুতির কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না কিন্তু প্রতি মুহূর্তে বেগের পরিবর্তন হচ্ছে। কারণ প্রতি মুহূর্তে পাথরটার গতির দিক পাল্টে যাচ্ছে। এটি যদি সোজা যেত তাহলে গতির দিকের পরিবর্তন হতো না কিন্তু যেহেতু ঘুরছে তাই দিকটা পাল্টে যাচ্ছে। কাজেই এটি হচ্ছে সমদ্রুতির উদাহরণ—সমবেগের নয়! সমবেগ হলে সমদ্রুতি হতেই হবে কিন্তু সমদ্রুতি হলেই যে সমবেগ হতে হবে, তার কোনো গ্যারান্টি নেই।

চিত্র 2.05: সুতায় বেঁধে একটি পাথর ঘোরানো হলে দ্রুতি এক থাকলেও বেগের পরিবর্তন হয়।

প্রশ্ন: পাথরটিকে হঠাৎ ছেড়ে দিলে তখন কি সেটা সমবেগ এবং সমদ্রুতিতে যাবে?

উত্তর: পাথরটি হঠাৎ ছেড়ে দিলে এটা সোজা সমবেগ এবং সমদ্রুতিতে ছুটে যাবে। বাতাসের ঘর্ষণ মাধ্যাকর্ষণ বল এসব যদি না থাকত তাহলে সমবেগ এবং সমদ্রুতিতে যেতেই থাকত।

2.6 ত্বরণ ও মন্দন
(Acceleration and Deceleration or Retardation)

যখন কোনো বস্তু সমবেগে যায় তখন তার কোনো ত্বরণ নেই। বেগের পরিবর্তন হলেই বুঝতে হবে সেখানে ত্বরণ রয়েছে। আরো সুস্পষ্ট করে বললে বলতে হবে ত্বরণ হচ্ছে সময়ের সাথে বেগের পরিবর্তনের হার।

বেগের যেহেতু দিক এবং মান দুটিই আছে তাই বেগের পরিবর্তন দুভাবেই হতে পারে। আমাদের আগের উদাহরণে তুমি যখন আঁকাবাঁকা পথে সাইকেল চালিয়ে গিয়েছ, তখন যতবার তুমি বাঁক নিয়েছ ততবার তোমার বেগের পরিবর্তন হয়েছে অর্থাৎ তোমার ত্বরণ হয়েছে। তুমি পুরো পথটুকু সমদ্রুতিতে গিয়ে থাকলেও শুধু দিক পরিবর্তনের জন্য ত্বরণ হয়েছে। তুমি যদি আগের উদাহরণের মতো একটা পাথরকে সুতা দিয়ে বেঁধে মাথার উপর সমদ্রুতিতে ঘোরাতে থাক তাহলে ঘুরতে থাকা পাথরটির ক্রমাগত দিক পরিবর্তন হবে। অর্থাৎ তার বেগের পরিবর্তন হবে বা ত্বরণ হবে।

যদি তোমার গতি সরলরৈখিক হয়ে থাকে তাহলে দিক পরিবর্তনের কোনো সুযোগ নেই। তার ত্বরণ হতে পারে শুধু বেগের মানের (দ্রুতির) পরিবর্তনের কারণে। যদি বেগের মান বাড়তে থাকে তাহলে আমরা বলি বেগের দিকে বস্তুটির ত্বরণ হচ্ছে। যদি বেগের মান কমতে থাকে আমরা বলি বস্তুটির ঋণাত্মক ত্বরণ বা মন্দন হচ্ছে। আমরা এখন সরলরেখায় চলমান কোনো একটি বস্তুর ত্বরণ বের করতে পারি।

উদাহরণ

প্রশ্ন: 2.06 চিত্রে কোনো একটা বস্তুর সময়ের সাথে বেগের পরিবর্তন দেখানো হয়েছে। কোথায় ত্বরণ আছে কোথায় নেই বলো।

উত্তর: A তে ত্বরণ আছে, B তে ত্বরণ নেই, C তে ত্বরণ আছে, D তে মন্দন বা নেগেটিভ ত্বরণ আছে।

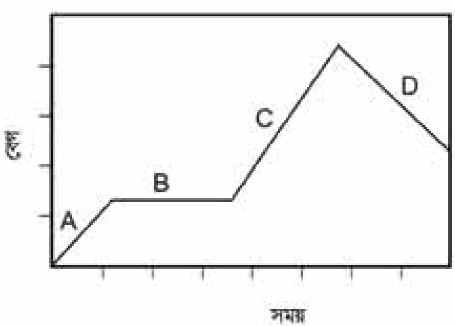

চিত্র 2.06: কোনো একটি বস্তুর সময়ের সাথে বেগের পরিবর্তন।

এই অধ্যায়ে আমরা শুধু রৈখিক গতি নিয়ে আলোচনা করব, অর্থাৎ যদি বেগের মানের পরিবর্তন হয় শুধু তাহলেই ত্বরণ হবে।

ত্বরণ হচ্ছে বেগের পরিবর্তনের হার, যদি সমত্বরণ হয়, অর্থাৎ সময়ের সাথে সাথে ত্বরণের পরিবর্তন না হয় তাহলে আমরা লিখতে পারি:

$$\text{ত্বরণ} = \frac{(\text{শেষ বেগ} - \text{আদি বেগ})}{\text{অতিক্রান্ত সময়}}$$

অর্থাৎ যদি প্রথমে কোনো কিছুর বেগ হয় u এবং t সময় পর তার বেগ হয় v তাহলে ত্বরণ a হচ্ছে

$$a = \frac{v - u}{t}$$

ত্বরণের মাত্রা $[a] = LT^{-2}$
ত্বরণের একক ms^{-2}

কাজেই যদি ত্বরণ a জানা থাকে তাহলে কোনো বস্তুর আদি বেগ u হলে t সময় পর তার বেগ v বের করা খুব সোজা। (চিত্র 2.07)

$$v = u + at$$

বস্তুটি যদি স্থির অবস্থা থেকে শুরু করে তাহলে

$$v = at$$

আমরা ইতিমধ্যে বলেছি এখন পর্যন্ত যা বলা হয়েছে তার সবকিছু সত্যি সমত্বরণের জন্য। যদি সমত্বরণ না হয় তাহলে কিন্তু এত সহজে শুধু আদি বেগ আর শেষ বেগ থেকে ত্বরণ বের করে ফেলা যাবে না।

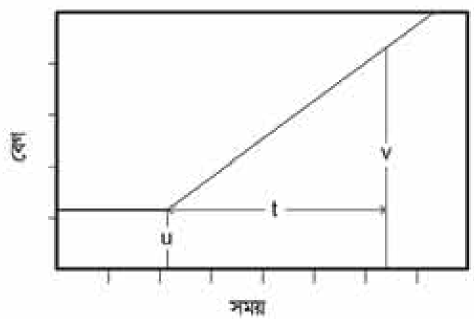

চিত্র 2.07: স্থির অবস্থায় শুরু করে সমত্বরণে গতিশীল বস্তুর বেগ বেড়ে যাওয়া।

আমরা আমাদের চারপাশে গতির যেসব উদাহরণ দেখি, গাড়ি, ট্রেন বা সাইকেলের গতি তাদের ত্বরণ প্রায় সব সময়ই অসম ত্বরণ। যেমন একটি গাড়ি যদি স্থির অবস্থা থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে বেগবান হয় তাহলে তার ত্বরণ শূন্য থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে একটি মানে পৌঁছায়, গাড়ি যখন তার পূর্ণ বেগে পৌঁছায় তখন তার গতি আর বাড়ে না অর্থাৎ ত্বরণ আবার শূন্য হয়ে যায়, আবার গাড়িটি যদি বেগ কমিয়ে থামতে শুরু করে তাহলে মন্দন হতে থাকে। গাড়িটি যদি পুরোপুরি থেমে যায়

২০২৫

তাহলে তার বেগ এবং ত্বরণ দুটিই শূন্য হয়ে যায়। তোমাদের মনে হতে পারে সমত্বরণের উদাহরণ খুঁজে পাওয়া বুঝি খুব কঠিন।

আসলে আমরা আমাদের চারপাশে যা কিছু দেখি তার মাঝে কিন্তু সমত্বরণের খুব চমকপ্রদ একটা উদাহরণ আছে। সেটি হচ্ছে মাধ্যাকর্ষণজনিত ত্বরণ (g)। পৃথিবীপৃষ্ঠের কাছাকাছি তার মান $9.8\ \text{m/s}^2$ আমরা যদি কোনো একটা বস্তু স্থির অবস্থা থেকে ছেড়ে দিই তাহলে দেখতে পাই তার গতিবেগ $v = gt$ হিসেবে বাড়তে থাকে।

2.7 গতির সমীকরণ (Equations of Motion)

আমরা যেহেতু শুধু রৈখিক গতি নিয়ে আলোচনা করব তাই গতি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা এখন পর্যন্ত যে যে রাশিগুলোর কথা বলেছি সেগুলো হচ্ছে:

u: আদি বেগ, সময়ের শুরুতে যে বেগ
a: ত্বরণ
t: যে সময়টুকু অতিক্রান্ত হয়েছে
v: অতিক্রান্ত সময়ের পর বেগ
s: অতিক্রান্ত সময়ে যে দূরত্ব অতিক্রম করেছে।

অর্থাত এই রাশিগুলোর কখনোই দিকের পরিবর্তন হবে না। অর্থাৎ আমরা এগুলোকে ভেক্টর হিসেবে বিবেচনা না করে শুধু এগুলোর মান নিয়ে আলোচনা করা হলেই কাজ চলে যাবে।

এই রাশিগুলোর মাঝে যে সম্পর্ক রয়েছে তার প্রায় সবগুলো এর মাঝে আমরা বের করে ফেলেছি, শুধু একটি বাকি রয়ে গেছে সেটি হচ্ছে s বা অতিক্রান্ত দূরত্ব। যদি কোনো ত্বরণ না থাকে তাহলে বেগের পরিবর্তন হয় না তাই আদি বেগ আর শেষ বেগ সমান ($v = u$) আর অতিক্রান্ত দূরত্ব হচ্ছে

$$s = vt$$

যদি সমত্বরণ থাকে তাহলে

$$v = u + at$$

যার অর্থ সময়ের সাথে সাথে বেগের পরিবর্তন হচ্ছে। কাজেই অতিক্রান্ত দূরত্ব বের করতে হলে প্রতি মুহূর্তের বেগের সাথে সেই মুহূর্তের সময় গুণ করে পুরো সময়ের জন্য হিসাব করতে হবে। এই ধরনের হিসাব-নিকাশ করার জন্য বিশেষ গণিত (ক্যালকুলাস) জানতে হয়, আমরা সেগুলো ছাড়াই কাজটা করে ফেলব। সেটা সম্ভব হবে কারণ আমরা শুধু সমত্বরণ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি। সমত্বরণ না হলে এটি সম্ভব হতো না।

প্রতি মুহূর্তে বেগের পরিবর্তন হচ্ছে তাই আমরা $s = vt$ লিখতে পারছি না কিন্তু আমরা যদি একটা গড় বেগ V ধরে নিই তাহলে কিন্তু লিখতে পারতাম

$$s = Vt$$

তার অর্থ অতিক্রান্ত দূরত্ব বের করার জন্য আমাদের শুধু গড় বেগটি বের করতে হবে। সমত্বরণের জন্য বিষয়টি সহজ। কোনো কিছু যদি সমহারে বাড়তে থাকে তাহলে তার গড় মান হচ্ছে ঠিক মাঝামাঝি সময়ের মান। অন্যভাবে বলা যায় যদি কোনো কিছু সমহারে বাড়তে থাকে তাহলে শুরু এবং শেষ মানের গড় হচ্ছে গড় মান।

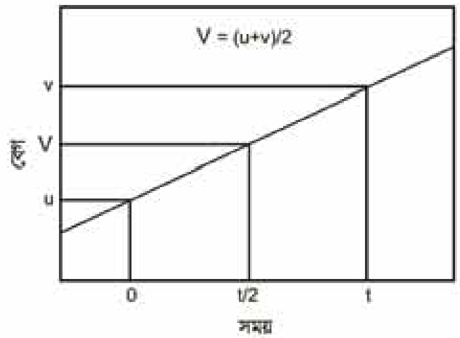

চিত্র 2.08: সমত্বরণের গতিতে গড় বেগ হচ্ছে আদি বেগ ও শেষ বেগের মাঝামাঝি সময়ের বেগ।

অর্থাৎ

$$V = \frac{u+v}{2} = \frac{u+(u+at)}{2}$$

$$V = u + \frac{1}{2}at$$

কাজেই অতিক্রান্ত দূরত্ব

$$s = Vt$$

$$s = \left(u + \frac{1}{2}at\right)t$$

$$\boxed{s = ut + \frac{1}{2}at^2}$$

এখন পর্যন্ত আমরা গতির যে সমীকরণগুলো বের করেছি তার প্রত্যেকটিতেই সময় বা t আছে। আমরা ইচ্ছে করলে এই সমীকরণগুলো ব্যবহার করে একটা সমীকরণ বের করতে পারি যেখানে t নেই। যেমন:

$$v = u + at$$

$$v^2 = u^2 + 2uat + a^2t^2 = u^2 + 2a\left(ut + \frac{1}{2}at^2\right)$$

$$\boxed{v^2 = u^2 + 2as}$$

এই সমীকরণটি অন্য একটি সাধারণ সমীকরণের মতো দেখলেও এর মাঝে কিছু চমকপ্রদ পদার্থবিজ্ঞান লুকিয়ে আছে, যেটি আমরা চতুর্থ অধ্যায়ে তোমাদের দেখাব।

উদাহরণ

প্রশ্ন: একটা গাড়ির বেগ 1 মিনিটে স্থির অবস্থা থেকে বেড়ে 60 km/hour হয়েছে, গাড়িটির ত্বরণ কত?

উত্তর: আমরা সময়ের জন্য মিনিট বা ঘণ্টা ব্যবহার না করে এখন থেকে সেকেন্ড (s) এবং দূরত্বের জন্য মাইল বা km ব্যবহার না করে m ব্যবহার করব।

গাড়ির চূড়ান্ত বেগ

$$v = 60\frac{\text{km}}{\text{hour}} = \frac{60 \times 1000\ \text{m}}{60 \times 60\ \text{s}} = 16.67\ \text{m/s}$$

কাজেই সমস্যাটি হচ্ছে এ রকম, 60 s এ একটা গাড়ি স্থির অবস্থা থেকে শুরু করে 16.67 m/s গতিতে পৌঁছে গেছে, গাড়িটির ত্বরণ কত?

$$v = at$$

$$a = \frac{v}{t} = \frac{16.67\ \text{m/s}}{60\ \text{s}} = 0.278\ \text{m/s}^2$$

প্রশ্ন: একটা গাড়ি 60 miles/hour বেগে চলতে চলতে হঠাৎ তার ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে যায়। গাড়িটি থামতে 5 minutes সময় নেয়। গাড়িটির মন্দন কত?

উত্তর: ত্বরণ থাকলে বেগ বাড়তে থাকে, আর বেগ কমতে থাকার অর্থ ঋণাত্মক বা নেগেটিভ ত্বরণ বা মন্দন রয়েছে।

আবার আমরা সময়ের জন্য s এবং দূরত্বের জন্য m ব্যবহার করব।

$$1\ \text{mile} = 1.6\ \text{km} = 1600\ \text{m}$$

গাড়িটির আদি বেগ

$$u = 60\ \frac{\text{miles}}{\text{hour}} = \frac{60 \times 1.6 \times 1000\ \text{m}}{60 \times 60\ \text{s}} = 26.8\ \text{m/s}$$

গাড়িটির শেষ বেগ $v = 0$

ত্বরণ

$$a = \frac{v-u}{t} = \frac{0 - 26.8\ \text{m/s}}{300\,\text{s}} = -0.089\ \text{m/s}^2$$

অর্থাৎ গাড়িটির ত্বরণ $-0.089\ \text{m/s}^2$ কিংবা মন্দন $0.089\ \text{m/s}^2$

প্রশ্ন: একটি বুলেট $1.5\ \text{km/s}$ বেগে ছুটে একটি দেয়ালের মাঝে $10\ \text{cm}$ ঢুকতে পেরেছে। বুলেটের মন্দন কত?

উত্তর: এটা করার একমাত্র উপায় হচ্ছে $v^2 = u^2 - 2as$ সূত্রটি ব্যবহার করা:

শেষ বেগ $v = 0$

$$0 = (1.5 \times 1000)^2 - 2a\left(\frac{10}{100}\right)$$

$$a = \frac{(1.5 \times 1000)^2}{0.2} = 11{,}250{,}000\ \text{m/s}^2$$

মন্দন: $11{,}250{,}000\ \text{m/s}^2$ (কিংবা ত্বরণ $-11{,}250{,}000\ \text{m/s}^2$)

2.8 পড়ন্ত বস্তুর সূত্র (Laws of Falling Bodies)

আমরা বলেছি যে সমত্বরণের একটি চমকপ্রদ উদাহরণ হচ্ছে মাধ্যাকর্ষণজনিত ত্বরণ g, এর প্রভাবে যেকোনো বস্তু উপর থেকে ছেড়ে দিলে এটি গতিশীল হয়ে নিচের দিকে নামতে থাকে। এ ধরনের পড়ন্ত বস্তু দেখে গ্যালিলিও তিনটি সূত্র বের করেন। সূত্রগুলো স্থির অবস্থা থেকে মুক্তভাবে পড়তে থাকা বস্তুর বেলায় ব্যবহার করা যায়। সূত্রগুলো হচ্ছে:

প্রথম সূত্র: স্থির অবস্থান ও একই উচ্চতা থেকে বিনা বাধায় পড়ন্ত বস্তু সমান সময়ে সমান পথ অতিক্রম করবে।

দ্বিতীয় সূত্র: স্থির অবস্থান থেকে বিনা বাধায় পড়ন্ত বস্তুর নির্দিষ্ট সময়ে (t) প্রাপ্ত বেগ (v) ঐ সময়ের সমানুপাতিক। অর্থাৎ $v \propto t$

তৃতীয় সূত্র: স্থির অবস্থান থেকে বিনা বাধায় পড়ন্ত বস্তু নির্দিষ্ট সময়ে যে দূরত্ব (h) অতিক্রম করে তা ঐ সময়ের (t) বর্গের সমানুপাতিক। অর্থাৎ $h \propto t^2$

আমরা সমত্বরণের উদাহরণ হিসেবে g বা মাধ্যাকর্ষণজনিত ত্বরণের কথা বলেছিলাম। গতি সম্পর্কে আমরা যে সমীকরণগুলো বের করেছি সেগুলোকে খুব সহজেই আমরা পড়ন্ত বস্তুর গতি ব্যবহার করার জন্য বের করতে পারি। অতিক্রান্ত দূরত্বের বেলায় s ব্যবহার করা হয়েছিল, এবারে উচ্চতা বোঝানোর জন্য h ব্যবহার করব, ত্বরণের জন্য a না লিখে g লিখব, শুধু এ দুটোই হবে পার্থক্য।

$$v = u + gt$$

$$h = ut + \frac{1}{2}gt^2$$

$$v^2 = u^2 + 2gh$$

গ্যালিলিওর পড়ন্ত বস্তুর যে তিনটি সূত্র আছে সেগুলো আসলে এই সূত্রগুলো ছাড়া আর কিছু নয়।

প্রথম সূত্রটি বলছে যে একই উচ্চতা থেকে ছেড়ে দেওয়া হলে যেকোনো বস্তু একই সময়ে নিচে পড়বে অর্থাৎ এটি বস্তুর ভরের উপর নির্ভর করবে না। এটি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতার সাথে খাপ খায় না। এক টুকরো কাগজ আর একটি ছোট পাথর উপর থেকে ছেড়ে দিলে আমরা দেখি পাথরটি আগে এবং কাগজটি পরে নিচে এসে পড়ে। এটি ঘটে বাতাসের বাধার কারণে, বাতাসহীন একটি টিউবে এরকম পরীক্ষা করা হলে কাগজ এবং পাথর একই সময়ে নিচে এসে পড়ত। পড়ন্ত বস্তুর সূত্রগুলো থেকে গ্যালিলিওর প্রথম সূত্রটি বোঝা যায়। তার কারণ পড়ন্ত বস্তুর বেগ বা অতিক্রান্ত উচ্চতার সমীকরণগুলোতে কোথাও বস্তুর ভর নেই, অর্থাৎ ভারী এবং হালকা সব বস্তুর উপরেই মাধ্যাকর্ষণজনিত ত্বরণ সমানভাবে কাজ করে। কাজেই সমান সময়ে বেগ এবং অতিক্রান্ত দূরত্ব সমান।

গ্যালিলিওর দ্বিতীয় সূত্রটি g এর কারণে বেগ বৃদ্ধির সূত্র। আদি বেগ u শূন্য হলে বেগ v এর সাথে সমানুপাতিক। গ্যালিলিও এর তৃতীয় সূত্রটি অতিক্রান্ত উচ্চতা h এর সূত্রটি ছাড়া আর কিছু নয়। এই সূত্রটিতে $u = 0$ ধরে নেওয়া হলে আমরা দেখতে পাই অতিক্রান্ত উচ্চতা t^2 এর সমানুপাতিক।

উদাহরণ

প্রশ্ন: ক্রিকেটের একজন ভালো পেস বোলার ঘণ্টায় 150 km/hour বেগে বল ছুড়তে পারে। সে যদি খাড়া উপরের দিকে বলটা ছুড়ে বলটা কত উপরে উঠবে?

উত্তর:

$$150\ \text{km/hour} = \frac{150 \times 1000\ \text{m}}{60 \times 60\ \text{s}} = 41.67\ \text{m/s}$$

বল উপরে ছুড়লে মাধ্যাকর্ষণজনিত ত্বরণ এই বলটার ওপর মন্দন হিসাবে কাজ করবে। শেষ পর্যন্ত বলটি থেমে যাবে। সেই উচ্চতাটাকে h হিসাবে লিখলে

$$v^2 = u^2 - 2gh$$
$$v = 0, \qquad u = 41.67\ \text{m/s}, \qquad g = 9.8\ \text{m}/s^2$$

কাজেই

$$h = \frac{u^2}{2g} = \frac{(41.67)^2}{2 \times 9.8}\ \text{m} = 88.59\ \text{m}$$

(প্রায় 30 তলা দালানের ছাদ পর্যন্ত!)

প্রশ্ন: পৃথিবীকে ঘিরে মহাকাশযান যখন ঘুরতে থাকে তাদের দ্রুতি অনেক বেশি, প্রায় 10 km/s! এ রকম গতিতে যদি আকাশের দিকে একটা কামানের গোলা ছুড়ে দিই সেটা কত উপরে উঠবে?

উত্তর: ক্রিকেট বলের মতো বের করার চেষ্টা করি, শুধু আদি বেগ 41.67 m/s এর বদলে হবে 10,000 m/s

কাজেই

$$h = \frac{(10{,}000)^2}{2 \times 9.8}\text{m} = 5{,}102{,}000\ \text{m} = 5{,}102\ \text{km}$$

যদিও দেখে মনে হচ্ছে কোথাও কোনো ভুল হয়নি কিন্তু আসলে উত্তরটা সঠিক নয়! তার কারণ হচ্ছে আমরা মাধ্যাকর্ষণজনিত ত্বরণের মান ধরেছি $9.8\ \text{m}/s^2$, পৃথিবীর কাছাকাছি দূরত্বের জন্য এটা সঠিক, কিন্তু যদি পৃথিবী থেকে অনেক উপরে উঠে যাওয়া যায় এর মান কমতে থাকবে! আমরা যখন

$$v^2 = u^2 - 2gh$$

সমীকরণটি বের করেছি সেখানে ধরে নিয়েছি g এর মানের পরিবর্তন হচ্ছে না। এই সমস্যার বেলায় সেটা সত্যি না। তাই আমরা এখন পর্যন্ত যেটুকু শিখেছি সেই বিদ্যা দিয়ে এটা সমাধান করতে পারব না! না পারলেও খুব একটা ক্ষতি হবে না, কারণ এত তীব্র গতিতে কোনো কিছু ছুড়ে দিলে বাতাসের সাথে ঘর্ষণে যে তাপ সৃষ্টি হবে সেই তাপে এটা জ্বলেপুড়ে শেষ হয়ে যাবে!

নিজে করো

সময়–দূরত্বের লেখচিত্র থেকে যেকোনো সময়ের বেগ এবং ত্বরণ নির্ণয়।

(গতি ও লেখচিত্র)

আমরা আগের অধ্যায়গুলোতে গতির সমীকরণগুলো বের করেছি এবং অতিক্রান্ত দূরত্ব, বেগ এবং ত্বরণের ভেতর সম্পর্কগুলো বিশ্লেষণ করেছি। এই অধ্যায়ে আমরা একই বিষয়গুলো শুধু লেখচিত্র দিয়ে বিশ্লেষণ করে দেখব। লেখচিত্র দিয়ে বিভিন্ন রাশি বিশ্লেষণ করা হলে আমরা গতির বিভিন্ন রাশি নিয়ে এক ধরনের বাস্তব অনুভূতি পেতে পারি।

টেবিল 2.01

সময় (s)	দূরত্ব (m)
0	0
1	1
2	4
3	9
4	16
5	25

সময় (s)	দূরত্ব (m)
0	0
2	6
4	24
6	54
8	96
10	150

এখানে একটা বিষয় একটুখানি উল্লেখ করা দরকার। আমরা যখন অতিক্রান্ত দূরত্ব, বেগ কিংবা ত্বরণ নিয়ে আলোচনা করেছি আমরা সব সময়ই একটি আদর্শ পরিবেশ কল্পনা করে নিয়েছি। আমরা ধরে নিয়েছি কোনো ঘর্ষণ নেই এবং একটি বস্তু যখন গতিশীল হয় তার অন্য কোনোভাবে শক্তি ক্ষয় হয় না। বাস্তব জীবনে সেটি ঘটে না, তাই অতিক্রান্ত দূরত্ব, বেগ কিংবা ত্বরণ নিয়ে কোনো সত্যিকার উপাত্ত সংগ্রহ করা খুব সহজ নয়। সত্যিকারের পরীক্ষা করার জন্য ল্যাবরেটরিতে air track ব্যবহার করা হয় যেখানে বাতাসের একটি আস্তরণে একটি বস্তুকে ভাসমান রেখে ঘর্ষণবিহীন অবস্থান তৈরি করার চেষ্টা করা হয়। সময়ের সাথে বস্তুর অবস্থানের পরিবর্তন মাপার জন্য বৈদ্যুতিক স্পার্ক কিংবা ইলেকট্রনিকস সংকেত ব্যবহার করা হয়। আমরা দৈনন্দিন জীবনে সহজে সেরকম উপাত্ত পাব না। তাই আপাতত আমরা ধরে নেব আমাদের লেখচিত্র ব্যবহার করার জন্য এরকম আদর্শ পরিবেশে কিছু উপাত্ত সংগ্রহ করেছি। সময়ের সাথে অবস্থানের পরিবর্তনের এরকম দুই সেট উপাত্ত টেবিল 2.01

এ দেখানো হলো। প্রথম সেটটি আমরা এখানে করে দেখাব, তোমরা দ্বিতীয় সেটটি নিজে নিজে করবে।

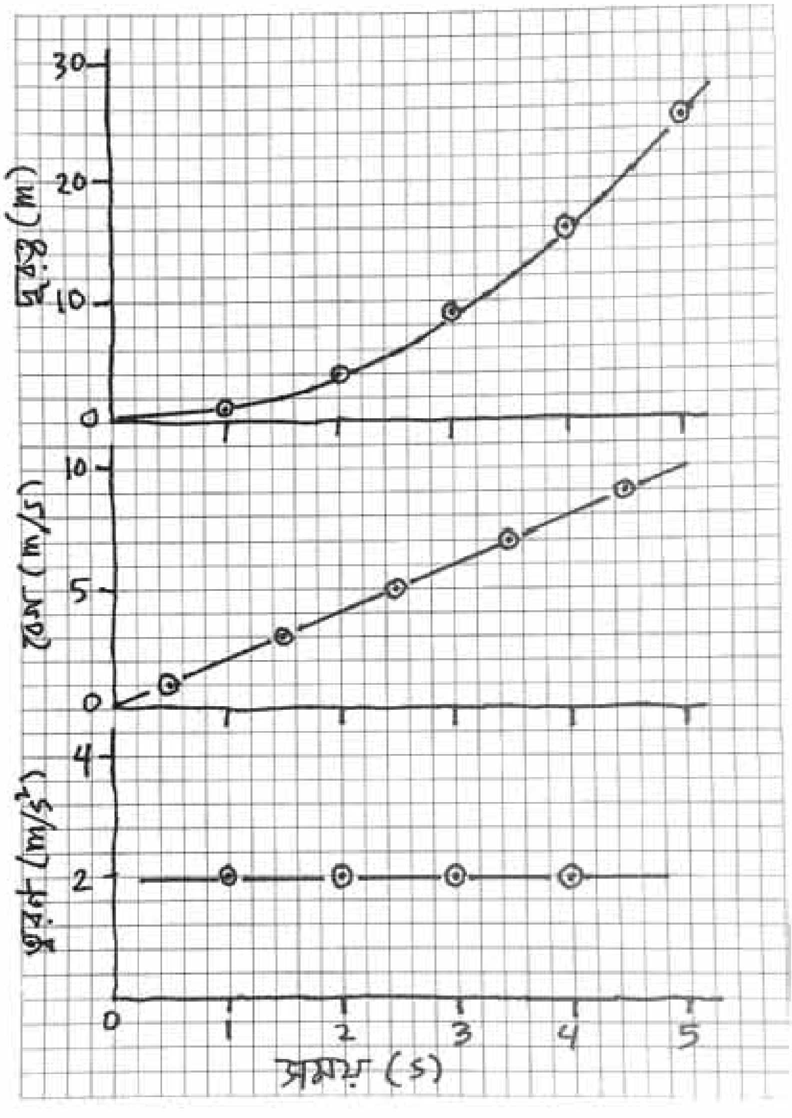

চিত্র 2.09: দূরত্ব-সময় থেকে বেগ-সময় এবং বেগ-সময় থেকে ত্বরণ-সময় বের করে একটি গ্রাফ পেপারে লেখচিত্র আঁকা হয়েছে।

এই সারণি বা টেবিলের প্রথম সেটটির উপাত্ত দূরত্ব-সময় 2.09 চিত্রটিতে দেখানো হয়েছে। আমাদের উপাত্তগুলো রয়েছে শুধু পূর্ণ সেকেন্ডের জন্য। কিন্তু লেখচিত্রটি আঁকার কারণে

আমরা 0 থেকে 5 s এর ভেতর যেকোনো সময়ের জন্য দূরত্বটি বের করতে পারব। যেমন: 2.5 সেকেন্ডে বস্তুটির দূরত্ব 6.25 m এর কাছাকাছি।

আমাদের কাছে যদি সময় এবং দূরত্বের একটি লেখচিত্র থাকে তাহলে সেখান থেকে আমরা খুব সহজেই বস্তুটির বেগ বের করতে পারব। বেগ হচ্ছে অবস্থানের পরিবর্তনের হার। কাজেই আমরা লেখচিত্রে দেখতে পাই বস্তুটি 0 থেকে 1 সেকেন্ডে 0 m থেকে 1 m দূরত্ব অতিক্রম করেছে।

কাজেই এই সময়ের গড় বেগ

$$v = \frac{(1-0)\,\mathrm{m}}{1\,\mathrm{s}} = 1\,\mathrm{m/s}$$

আমরা গড় বেগটি 0 থেকে 1 s সময়ের মাঝামাঝি বসাতে পারি। একইভাবে 1 থেকে 2 s এর ভেতরকার গড় বেগ হচ্ছে

$$v = \frac{(4-1)\,\mathrm{m}}{(2-1)\,\mathrm{s}} = 3\,\mathrm{m/s}$$

এই বেগটি একটি উপাত্ত হিসেবে 1 থেকে 2 s এর মাঝামাঝি 1.5 s এ বসাতে পারি। একইভাবে আমরা দেখতে পাই 2 এবং 3 s এর মাঝখানে গড় বেগ 5 m/s, 3 এবং 4 s এর মাঝখানে গড় বেগ 7 m/s এবং 4 এবং 5 s এর মাঝখানে গড় বেগ 9 m/s. এই উপাত্ত বিন্দুগুলো গ্রাফ পেপারে দেখতে পাই মোটামুটি একটি সরলরেখা এবং বিন্দুগুলো সরলরেখা এঁকে এঁকে যুক্ত করে দিয়েছি। আমরা যদিও শুধু 0.5, 1.5, 2.5, 3.5 এবং 4.5 s এ উপাত্তগুলো বসিয়েছি, কিন্তু এই বিন্দুগুলোর ভেতর দিয়ে একটা সরলরেখা টেনে দেওয়ার পর আমরা যেকোনো সময়ে বেগ বের করতে পারব। যেমন: 3 s এ বেগ হচ্ছে 6 m/s।

2.09 চিত্রে বেগ-সময় লেখচিত্র আঁকার পর একই পদ্ধতিতে আমরা ত্বরণ বের করতে পারব।

ত্বরণ হচ্ছে বেগের পরিবর্তনের হার। বেগ যেহেতু একটি সরলরেখা তাই এক্ষেত্রে যেখানেই ত্বরণ বের করি না কেন আমরা একই মান পাব। যেমন 2 এবং 3 s এর মাঝখানে বেগের পরিবর্তনের হার হচ্ছে।

$$a = \frac{(6-4)\,\mathrm{m/s}}{(3-2)\,\mathrm{s}} = 2\,\mathrm{m/s^2}$$

অন্য যেকোনো সময়েও এই ত্বরণ বের করলে আমরা একই মান পাব। 2.09 চিত্রে ত্বরণ-সময় লেখচিত্রে এটি দেখানো হয়েছে।

২০২২

কাজেই তোমরা দেখতে পেলে সময়–দূরত্বের একটি লেখচিত্র থেকে শুরু করে আমরা যেকোনো সময়ের বেগ কিংবা ত্বরণ বের করতে পেরেছি। আমরা যত নিখুঁতভাবে এই লেখচিত্র আঁকতে পারব তত সূক্ষ্মভাবে এই রাশিগুলো বের করতে পারব। এবারে দ্বিতীয় সেটটি নিয়ে লেখচিত্র এঁকে তোমরা বেগ এবং ত্বরণ বের করো।

অনুসন্ধান 2.01

ঢালু তলের উপর গড়াতে থাকা বস্তুর গড় দ্রুতি বের করা।

উদ্দেশ্য: বিভিন্ন ঢালে অতিক্রান্ত একই দূরত্বের জন্য দ্রুতি বের করে লেখচিত্রের সাহায্যে ঢালের সাথে সম্পর্ক বের করা।

যন্ত্রপাতি:

1. একটি সমতল তক্তা বা বেঞ্চ বা টেবিল
2. একটি রুলার বা মিটার স্কেল
3. একটি মারবেল অথবা সিলিন্ডারের আকারের কলম বা পেনসিল যেটি গড়িয়ে যেতে পারে

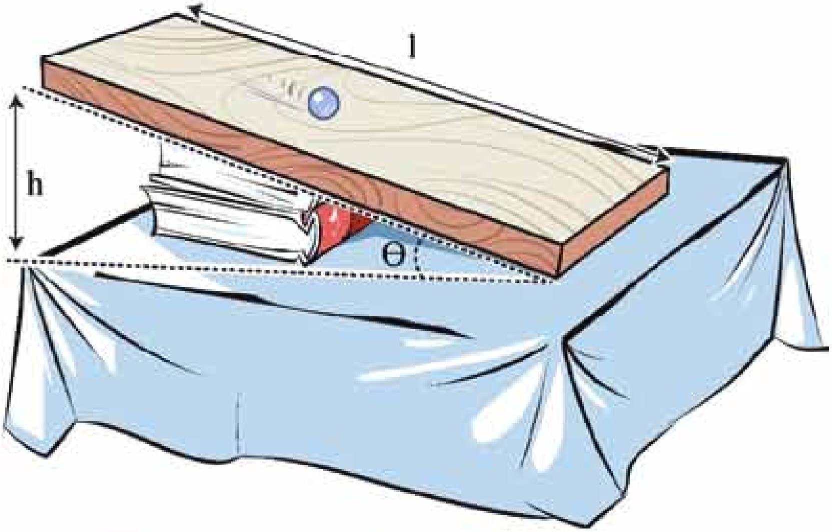

চিত্র 2.10: ঢালু পথে একটি মারবেল গড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

কাজের ধারা:

1. একটি সমতল তক্তা বা বেঞ্চ বা টেবিল নিয়ে তার দৈর্ঘ্যটি (L) একটি রুলার বা মিটার স্কেলে মেপে নাও। এই দূরত্বটি হবে আমাদের অতিক্রান্ত দূরত্ব।

2. সমতল তক্তা বা বেঞ্চ অথবা টেবিলটির এক পাশে একটা বই দিয়ে সমতল পৃষ্ঠটি ঢালু করে নাও। বইটির উচ্চতা (h) মেপে নাও। উচ্চতাকে দৈর্ঘ্য দিয়ে ভাগ দিয়ে কতটুকু ঢালু ($\sin\theta = h/L$) বের করো।

3. ঢালু পৃষ্ঠে একটা মারবেল অথবা পেনসিল বা কলম রেখে নিশ্চিত করো যেন সেটি গড়িয়ে যায়।

4. এখন ঢালু পৃষ্ঠে মারবেল, পেনসিল বা কলমটি গড়িয়ে যেতে কতক্ষণ সময় নেয় সেই সময়টি মাপতে হবে। এটি ঠিক করে মাপার জন্য একটি স্টপ ওয়াচ বা থামা ঘড়ির প্রয়োজন। কিন্তু তোমাদের কাছে সেটি থাকার সম্ভাবনা কম। (আজকাল অনেক মোবাইল ফোনেও থামা ঘড়ি থাকে) তোমরা নিচের পদ্ধতি ব্যবহার করো) যদি তোমাদের কাছে সত্যিকার থামা ঘড়ির পরিবর্তে সাধারণ ঘড়ি থাকে তাহলেও খুব একটা লাভ হবে না, কারণ সাধারণ ঘড়ি এক সেকেন্ড থেকে কম মাপতে পারে না, আমাদের আরেকটু সূক্ষ্মভাবে মাপা দরকার। যদি থামা ঘড়ি না থাকে আমরা অন্য কোনোভাবে সময়টি মাপার চেষ্টা করতে পারি। তোমরা স্বাভাবিক দ্রুততার এক দুই তিন... গুনে দেখো পনেরো সেকেন্ড কত পর্যন্ত গুনতে পারো। ধরা যাক পনেরো সেকেন্ডে তুমি পঁয়তাল্লিশ পর্যন্ত গুনতে পারো, তাহলে ধরে নেব, প্রতিটি সংখ্যা উচ্চারণ করতে আনুমানিক $15/45 = 1/3$ সেকেন্ড সময় নেয়।

এখন ঢালু পৃষ্ঠটিতে মারবেল পেনসিল বা কলমটিকে গড়িয়ে যেতে দিয়ে এক দুই তিন করে সংখ্যা গুনতে থাকো। মারবেল, পেনসিল বা কলমটি ঢালু পৃষ্ঠের শেষ প্রান্তে পৌঁছানোর জন্য কত পর্যন্ত গুনতে হয় সেটি বের করো। তাকে সঠিক গুণিতক দিয়ে গুণ করে প্রকৃত সময় বের করে নাও।

5. একাধিক বার এই পরীক্ষাটি করে সময়ের গড় নাও।

6. ঢালু পৃষ্ঠের দৈর্ঘ্যকে সময় দিয়ে ভাগ দিয়ে দ্রুতি বের করে নাও। এটি গড় দ্রুতি।

7. দ্বিতীয় আরেকটি বই ব্যবহার করে ঢালু পৃষ্ঠটি আরেকটু বেশি ঢালু করো। বইয়ের কারণে উচ্চতা মেপে নাও। এই উচ্চতার জন্য ঢাল বের করো।

8. আবার মারবেল, পেনসিল বা কলমটি ঢালু পৃষ্ঠে গড়িয়ে দাও, সংখ্যা গুনে সময় পরিমাপ করে আবার গড় দ্রুতি বের করো। এভাবে ঢালুটা ধীরে ধীরে বাড়িয়ে প্রত্যেকবার গড় দ্রুতি বের করো।

9. একটি গ্রাফ পেপারে X অক্ষে sinθ এবং Y অক্ষে গড় দ্রুতি স্থাপন করে একটি লেখচিত্র আঁকো। লেখচিত্র থেকে যেকোনো ঢালের জন্য দ্রুতি বের করো।

পাঠ	দূরত্ব L cm	উচ্চতা h cm	sinθ = h/L	সময় t s	দ্রুতি = দূরত্ব/ সময় m/s	গড় দ্রুতি m/s
1 2 3						
1 2 3						
1 2 3						

আলোচনা: ঢালের সাথে দ্রুতির কী সম্পর্ক সেটি আলোচনা করো। পরীক্ষাটি আরো নিখুঁতভাবে করার জন্য আর কী কী করা সম্ভব আলোচনা করো।

অনুসন্ধান 2.02

বিভিন্ন প্রকার গতি নিয়ে খেলা

উদ্দেশ্য: খেলার মাধ্যমে নানা ধরনের গতির পার্থক্য খুঁজে বের করা।

যন্ত্রপাতি: একটুখানি খালি জায়গা

কাজের ধারা:

1. বিভিন্ন ধরনের গতি বোঝানোর জন্য নির্দিষ্ট কার্যক্রম ঠিক করে নিতে হবে:

রৈখিক গতি: সোজা দৌড়ে যেতে হবে, কোথাও বাধা পেলে ঘুরে উল্টা দিকে সোজা দৌড়ে যাবে।

ঘূর্ণন গতি: দুই হাত দুই পাশে ছড়িয়ে এক জায়গায় ঘুরতে থাকবে।

চলন গতি: একই দিকে তাকিয়ে সামনে-পেছনে ডানে-বামে নড়তে হবে।

পর্যায়বৃত্ত গতি: বৃত্তাকারে দৌড়াতে হবে

স্পন্দন গতি: দুই হাত উপরে তুলে ডানে-বামে দোলাতে হবে।

2. যে কয়জন এই গতির খেলা খেলতে চায় তারা ঘরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দাঁড়াবে।
3. একজন খেলার পরিচালক উচ্চ স্বরে রৈখিক, ঘূর্ণন, চলন, পর্যায়বৃত্ত বা স্পন্দন কথাটি উচ্চারণ করবে।
4. যে গতির কথা বলা হয়েছে সবাইকে সেই গতির কার্যক্রম করতে হবে। যে সাথে সাথে করতে পারবে না সে কার্যক্রম খেলা থেকে বাদ পড়ে যাবে।
5. খেলার পরিচালক একেক সময় একেক গতির কথা বলতে থাকবে এবং ছেলেমেয়েদের সাথে সাথে সেই গতিটি করে দেখাতে হবে।

শেষ পর্যন্ত যে সঠিকভাবে সবগুলো গতি দেখিয়ে টিকে থাকতে পারবে, তাকে বিজয়ী ঘোষণা করা হবে।

গতিগুলোর মূল বৈশিষ্ট্য ঠিক রেখে বিভিন্ন গতির কার্যক্রমগুলো প্রয়োজনমতো পরিবর্তন করা যেতে পারে। যেমন একই সাথে দুটি ভিন্ন ভিন্ন গতি প্রদর্শন করার নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে। "রৈখিক ও স্পন্দন গতি" তখন হাত ডানে-বামে দোলাতে দোলাতে ছুটে যেতে হবে।

আলোচনা: এখানে উল্লেখ করা পদ্ধতিগুলো ছাড়াও আর কীভাবে বিভিন্ন প্রকার গতির প্রদর্শন করা যায় লিখ।

অনুসন্ধান 2.03

চলন্ত যানবাহনের দ্রুতি বের করা

উদ্দেশ্য: ভিন্ন ভিন্ন সময়ে অতিক্রান্ত দূরত্ব থেকে নানা ধরনের যানবাহনের দ্রুতি বের করা।

যন্ত্রপাতি: রুলার

কাজের ধারা:

1. এটি করার জন্য প্রথমে একটি রাস্তার পাশে দুটি স্থির বস্তুর (লাইট পোস্ট, গাছ, দোকান ইত্যাদি) মাঝখানের দূরত্ব বের করতে হবে। সেটি নিখুঁতভাবে বের করার বিষয়টি জটিল হতে পারে বলে আমরা একটি সহজ উপায় ব্যবহার করব। প্রথমে তোমার পদক্ষেপের দৈর্ঘ্যটি রুলার দিয়ে মেপে নেবে। (সঠিকভাবে মাপার জন্য দশ পদক্ষেপে অতিক্রান্ত দূরত্ব মেপে দশ দিয়ে ভাগ করে নেওয়া যেতে পারে।)

2. এখন রাস্তার পাশে স্থির বস্তু দুটির একটি থেকে অন্যটিতে হেঁটে যাও, কত পদক্ষেপে দূরত্বটি অতিক্রম করেছ সেটি গুনে তাকে তোমার পদক্ষেপের দূরত্ব দিয়ে গুণ করে মোট দূরত্ব বের করে নাও। আনুমানিক দূরত্ব একশ মিটারের কাছাকাছি হলে ভালো।

3. এবারে রাস্তার পাশে একটা নিরাপদ দূরত্বে থেকে সাইকেল রিকশা, টেম্পো কিংবা কোনো পথচারীর দ্রুতি মাপার চেষ্টা করো। যেহেতু দূরত্বটি জানা আছে তাই এ দূরত্ব অতিক্রম করার সময়টুকু মাপতে পারলেই দ্রুতিটুকু বের করা যাবে।

4. সঠিকভাবে সময় মাপার জন্য স্টপ ওয়াচ বা থামা ঘড়ির প্রয়োজন কিংবা সাধারণ ঘড়ি হলেই কাজ চলে যাবে। কিছুই যদি না থাকে তাহলে সময় মাপার জন্য আমরা একটি সহজ পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারি। "এক হাজার এক", "এক হাজার দুই" "এক হাজার তিন" এই কথাগুলো স্বাভাবিক দ্রুততার উচ্চারণ করতে মোটামুটি এক সেকেন্ড সময় লাগে। কাজেই এভাবে গুনে আমরা সময় পরিমাপ করতে পারি।

5. রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে যখনই দেখবে একটি সাইকেল, রিকশা, টেম্পো বা পথচারী প্রথম স্থির বস্তুটি অতিক্রম করেছে সাথে সাথে ঘড়ি দেখা শুরু করো কিংবা "এক হাজার এক" "এক হাজার দুই" এভাবে গুনতে শুরু করো। যখন দেখবে এই যানটি দ্বিতীয় স্থির বস্তু অতিক্রম করেছে সাথে সাথে ঘড়িতে সময় দেখো কিংবা গোনা বন্ধ করো। ঘড়ি দেখে সময় বের করো কিংবা তুমি যত পর্যন্ত গুনেছ তত সেকেন্ড সময় লেগেছে। দূরত্বটি অতিক্রম করতে এই সময়টি লেগেছে।

দূরত্বকে সময় দিয়ে ভাগ করে দ্রুতি বের করে নাও।

আলোচনা: একটি ঘড়ির সময়ের সাথে তোমার সময় মাপার পদ্ধতিটি মিলিয়ে দেখো সেটি কতটুকু নির্ভুল। তোমার পদক্ষেপ মাপার প্রক্রিয়াটি কতটুকু নির্ভুল সেটি বিবেচনায় এনে তোমার বের করা দ্রুতিটি কত শতাংশ ভুল থাকতে পারে অনুমান করো।

যানবাহন	পদক্ষেপের সংখ্যা	অতিক্রান্ত দূরত্ব L (m)	সময় t (s)	গড় দ্রুতি = L/t (m/s)

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন

1. গতি শূন্য কিন্তু ত্বরণ শূন্য নয় এটি কি সম্ভব? সম্ভব হলে দেখাও।
2. বেগের পরিবর্তন হচ্ছে কিন্তু দ্রুতির পরিবর্তন হচ্ছে না। এটা কি সম্ভব? সম্ভব হলে দেখাও।
3. চাঁদে মাধ্যাকর্ষণজনিত ত্বরণ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণজনিত ত্বরণ থেকে 6 গুণ কম। পৃথিবীতে একটা পাথর একটা উচ্চতা থেকে ছেড়ে দিলে এটি যে বেগে নিচে আঘাত করবে, চাঁদে একই উচ্চতা থেকে ছেড়ে দিলে কি ছয় গুণ কম বেগে আঘাত করবে? (চাঁদে বাতাস নেই, ধরা যাক পৃথিবীতেও বাতাসের বাধা সমস্যা নয়)।
4. পৃথিবীতে কি এমন কোনো জায়গা আছে যেখান থেকে তুমি দক্ষিণ দিকে 1 km গিয়ে যদি পূর্ব দিকে 1 km যাও এবং তখন উত্তর দিকে 1 km গেলে আগের জায়গায় পৌঁছে যাবে?
5. সমত্বরণের বেলায় দ্বিগুণ সময়ে কি দ্বিগুণ দূরত্ব অতিক্রম করি?

গাণিতিক প্রশ্ন

1. একটি গাড়ি তোমার স্কুল থেকে 40 km পূর্ব দিকে গিয়েছে, তারপর 40 km উত্তর দিকে গিয়েছে, তারপর 30 km পশ্চিম দিকে গিয়েছে, তারপর 30 km দক্ষিণ দিকে গিয়েছে, তারপর 20 km পূর্ব দিকে গিয়েছে, তারপর 20 km উত্তর দিকে গিয়েছে, তারপর 10 km পশ্চিম দিকে গিয়েছে, তাপরপর 10 km দক্ষিণ দিকে গিয়েছে। গাড়িটি তোমার থেকে কোন দিকে কত দূরে আছে?

2. চিত্র 2.11 এ OA, AB, BC এবং CD তে কখন বেগ এবং ত্বরণ পজিটিভ নেগেটিভ এবং শূন্য সেটি দেখাও।

3. চিত্র 2.11 এ y অক্ষ যদি বেগ না হয়ে অবস্থান হতো তাহলে বেগ এবং ত্বরণের মান OA, AB, BC এবং CD তে কী হতো বলো।

4. একটি গাড়ির বেগ 30 km/hour, 1 minute পর গাড়িটির গতিবেগ সমত্বরণে বেড়ে হলো 50 km/hour. এই সময়ে গাড়িটি কত দূরত্ব অতিক্রম করেছে?

5. তুমি 10 m/s বেগে একটা বল আকাশের দিকে ছুড়ে দিয়েছ। সেটা কতক্ষণে কত উঁচুতে উঠবে?

২০২৩

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটির পাশে ঠিক (√) চিহ্ন দাও

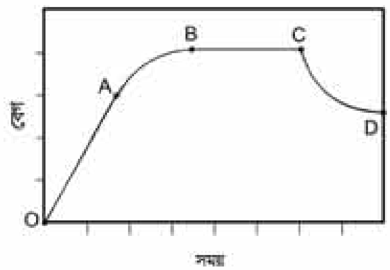

চিত্র 2.11

1. ত্বরণের একক কোনটি?

(ক) ms^{-1} (খ) ms^{-2}
(গ) Ns (ঘ) kgs^{-2}

2. ঘড়ির কাঁটার গতি কী রকম গতি?

(ক) রৈখিক গতি (খ) উপবৃত্তাকার গতি
(গ) পর্যায়বৃত্ত গতি (ঘ) স্পন্দন গতি

3. স্থির অবস্থান থেকে বিনা বাধায় পড়ন্ত বস্তু নির্দিষ্ট সময়ে যে দূরত্ব অতিক্রম করে তা ঐ সময়ের-

(ক) সমানুপাতিক (খ) বর্গের সমানুপাতিক
(গ) ব্যস্তানুপাতিক (ঘ) বর্গের ব্যস্তানুপাতিক

4. একটি বস্তু স্থির অবস্থান থেকে a সমত্বরণে চলছে। নির্দিষ্ট সময়ে এই বস্তুর অতিক্রান্ত দূরত্ব হবে:

(i) $s = \frac{(u+v)}{2}t$
(ii) $s = ut + \frac{1}{2}at^2$
(iii) $s^2 = u + 2a$

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) ii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

5. 2.12 চিত্রের বেগ-সময় লেখচিত্রের কোনটি মুক্তভাবে পড়ন্ত বস্তুর লেখচিত্র নির্দেশ করে?

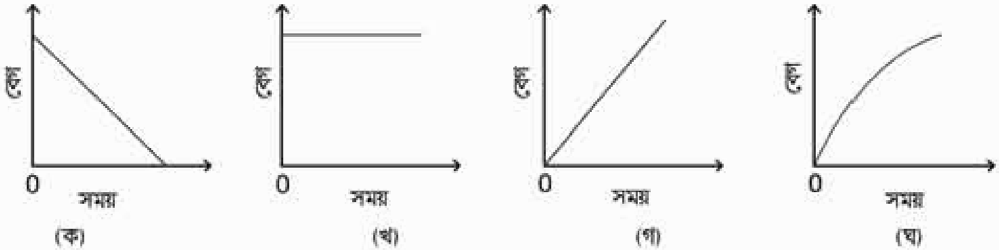

চিত্র 2.12

সৃজনশীল প্রশ্ন

1. রাজীবরা সপরিবারে সিলেটের জাফলং বেড়াতে যাবার জন্য একটি মাইক্রোবাসে রওনা হলো। সে যাত্রার শুরু থেকে সিলেট যাওয়া পর্যন্ত প্রতি 5 minute পরপর গাড়ির স্পিডোমিটার থেকে বেগের মান তথা দ্রুতি লিখে নিল। বেগের মান পেল যথাক্রমে প্রতি ঘণ্টায় 18, 36, 54, 54, 54, 36 ও 18 কিলোমিটার।

   (ক) তাৎক্ষণিক দ্রুতি কী?
   (খ) বৃত্তাকার পথে গতিশীল কোনো বস্তুর ত্বরণ ব্যাখ্যা করো।
   (গ) প্রথম 5 মিনিটে গাড়িটির অতিক্রান্ত দূরত্ব নির্ণয় করো।
   (ঘ) সংগৃহীত উপাত্ত দিয়ে বেগ-সময় লেখচিত্র অঙ্কন করে তা ব্যাখ্যা করো।

2. m গ্রাম ভরের একটি বস্তু a ত্বরণে চলমান অবস্থায় রয়েছে। আদি বেগ u, শেষ বেগ v ও t সময়ে অতিক্রান্ত দূরত্ব s, বস্তুটির গতির অবস্থা নিচের টেবিলে দেওয়া হলো।

ঘটনা নং	u (m/s)	v (m/s)	t (s)	s (m)	a (m/s^2)
1	10	30	5	-	-
2	5	20	4	44	3

(ক) ত্বরণ এর সংজ্ঞা লিখ?
(খ) পৃথিবীর অভিকর্ষজ ত্বরণ কেন সুষম ত্বরণের উদাহরণ?
(গ) টেবিলের 1 নং ঘটনায় s এর মান হিসাব করো।
(ঘ) গাণিতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে 2 নং ঘটনাটি সম্বন্ধে মন্তব্য করো।

তৃতীয় অধ্যায়

বল

(Force)

বল প্রয়োগ করে ভারোত্তোলন করছেন সাউথ এশিয়ান গেমসে স্বর্ণবিজয়ী মাবিয়া আখতার সীমান্ত।

আগের অধ্যায়ে আমরা বস্তুর গতি নিয়ে আলোচনা করেছি কিন্তু কেন বস্তু গতিশীল হয় সেটি নিয়ে কিছু বলা হয়নি। এই অধ্যায়ে আমরা দেখব বস্তু গতিশীল হয় বলের কারণে এবং বল নিয়ে আইজাক নিউটনের তিনটি যুগান্তকারী সূত্র নিয়ে আলোচনা করব। বল কীভাবে বস্তুর উপর কাজ করে সেটি নিয়ে আলোচনা করার সময় খুব স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন ধরনের বল, বস্তুর জড়তা, বলের প্রকৃতি, ঘর্ষণ বল এই বিষয়গুলোও আলোচনায় উঠে আসবে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- বস্তুর জড়তা ও বলের গুণগত ধারণা নিউটনের গতির প্রথম সূত্র ব্যবহার করে ব্যাখ্যা করতে পারব।
- মৌলিক বলের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে পারব।
- সাম্য ও অসাম্য বলের প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ভরবেগ এবং সংঘর্ষ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- গতির উপর বলের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব।
- নিউটনের গতির দ্বিতীয় সূত্র ব্যবহার করে বল পরিমাপ করতে পারব।
- নিউটনের গতির তৃতীয় সূত্র ব্যবহার করে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া বল ব্যাখ্যা করতে পারব।
- নিরাপদ ভ্রমণে গতি এবং বলের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব।
- ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র ও সংঘর্ষ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বিভিন্ন প্রকার ঘর্ষণ এবং ঘর্ষণ বল ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বস্তুর গতির উপর ঘর্ষণের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব।
- ঘর্ষণ হ্রাস-বৃদ্ধি করার উপায় ব্যাখ্যা করতে পারব।
- আমাদের জীবনে ঘর্ষণের ইতিবাচক প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব।

3.1 জড়তা এবং বলের ধারণা: নিউটনের প্রথম সূত্র (Inertia and Concept of Force: Newton's First Law)

এর আগের অধ্যায়ে আমরা বেগ, দ্রুতি, ত্বরণ (এবং মন্দন), অতিক্রান্ত দূরত্ব এবং তাদের একটির সাথে অন্যটির সম্পর্ক শিখেছি, গতির সমীকরণগুলো বের করেছি এবং গতিসংক্রান্ত সমস্যা সমাধান করতে সেগুলো ব্যবহারও করেছি। এই অধ্যায়ে আমরা বল প্রয়োগ করে কীভাবে গতির সৃষ্টি করা যায় কিংবা গতিকে প্রভাবিত করা যায় সেটি শিখব। আমরা নিউটনের প্রথম সূত্রটি দিয়ে শুরু করতে পারি:

নিউটনের প্রথম সূত্র: বল প্রয়োগ না করলে স্থির বস্তু স্থির থাকবে এবং সমবেগে চলতে থাকা বস্তু সমবেগে চলতে থাকবে। (বুঝতেই পারছ বেগ যেহেতু ভেক্টর তাই সমবেগে চলতে হলে দিক পরিবর্তন করতে পারবে না, সোজা সরলরেখায় সমান দ্রুতিতে যেতে হবে।)

নিউটনের প্রথম সূত্রের প্রথম অংশ নিয়ে কারো সমস্যা হয় না কারণ আমরা সব সময়ই দেখেছি স্থির বস্তুকে ধাক্কা না দেওয়া পর্যন্ত সেটা নিজে থেকে নড়ে না, স্থির থেকে যায়। দ্বিতীয় অংশটি নিয়ে সমস্যা, কারণ আমরা কখনোই কোনো চলন্ত বস্তুকে অনন্তকাল চলতে দেখি না। ধাক্কা দিয়ে কোনো বস্তুকে গতিশীল করে ছেড়ে দিলেও দেখা যায় কোনো বল প্রয়োগ না করলেও শেষ পর্যন্ত বস্তুটা থেমে যায়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে মনে হয় যেকোনো কিছুকে সমবেগে চালিয়ে নিতে হলে ক্রমাগত বুঝি সেটাতে বল প্রয়োগ করে যেতে হয়। নিউটনের প্রথম সূত্র থেকে আমরা জানতে পেরেছি সেটা সত্যি নয়। সমবেগে চলতে থাকা কোনো বস্তু যদি থেমে যায় তাহলে বুঝতে হবে সেখানে কোনো না কোনোভাবে বল প্রয়োগ করা হয়েছে। ঘর্ষণ, বাতাসের বাধা এ রকম অনেক কিছু আসলে উল্টো দিক থেকে বল প্রয়োগ করে চলমান একটা বস্তুকে থামিয়ে দেয়। যদি সত্যি সত্যি সব বল বন্ধ করে দেওয়া যেত তাহলে আমরা সত্যিই দেখতে পেতাম সমবেগে চলতে থাকা একটা বস্তু অনন্তকাল ধরে চলছে।

3.1.1 জড়তা

বল প্রয়োগ না করা পর্যন্ত স্থির বস্তু যে স্থির থাকতে চায় কিংবা গতিশীল বস্তু যে গতিশীল থাকতে চায়, বস্তুর এই বৈশিষ্ট্যটাই হচ্ছে জড়তা। হঠাৎ গাড়ি চলতে শুরু করলে আমরা যেভাবে পেছনের দিকে একটা ঝাঁকুনি খাই সেটা হচ্ছে জড়তার উদাহরণ। শরীরের নিচের অংশ গাড়ির সাথে লেগে

আছে। গাড়ির সাথে সাথে সেটা চলতে শুরু করেছে কিন্তু শরীরের ওপরের অংশ এখনো স্থির এবং স্থির থাকতে চাইছে। তাই শরীরের ওপরের অংশ পেছনের দিকে ঝাঁকুনি খাচ্ছে। যেহেতু এটা স্থির থাকার জড়তা তাই এটাকে বলে স্থিতি জড়তা।

গতি জড়তার কারণে আমরা মানুষজনকে চলন্ত বাস ট্রেন থেকে নামতে গিয়ে আছাড় খেতে দেখি। চলন্ত বাস ট্রেনের মানুষটির পুরো শরীরটাই গতিশীল, সে যখন মাটিতে পা দিয়েছে তখন নিচের অংশ থেমে গিয়েছে, ওপরের অংশ গতি জড়তার কারণে তখনো ছুটছে। তাই সে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে।

নিজে করো

গ্লাসের উপর একটা কার্ড রেখে কার্ডের উপর একটা ধাতব মুদ্রা রেখে কার্ডটিকে টোকা দিয়ে সরিয়ে দাও। মুদ্রাটি গ্লাসের ভেতর পড়বে। কেন?

জড়তার বিষয়টি যদি শুধু একটা সংজ্ঞা হতো তাহলে এটাকে এত গুরুত্ব দিয়ে শেখানো হতো না। আসলে এটা পদার্থবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। আমরা এখন পর্যন্ত ভর নিয়ে একটি কথাও বলিনি কিন্তু কোনো কিছুর গতি সম্পর্কে জানতে চাইলে আমাদের সেটির ভর সম্পর্কে জানতে হয়। একই গতিতে ছুটে আসা একটা হালকা সাইকেল আর একটা ভারী ট্রাককে আমরা একদৃষ্টিতে দেখি না, তার কারণটা হচ্ছে ভরের পার্থক্য। কিন্তু ভরটা আসলে কী? আমরা অনেক সময়েই বলি ভর হচ্ছে কতটা বস্তু আছে তার একটা পরিমাপ। এর চাইতে অনেক বিজ্ঞানসম্মত উত্তর হচ্ছে ভর হচ্ছে জড়তার পরিমাপ। (তোমরা বিষয়টা ভালো করে লক্ষ করো খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা বলা হয়েছে।) কোনো কিছুর জড়তা যদি বেশি হয় তাহলে বুঝতে হবে তার ভরও নিশ্চয়ই বেশি। জড়তা যদি কম হয় তাহলে ভরও কম। তোমরা নিশ্চয়ই এটা লক্ষ করেছ সমান পরিমাণ বল প্রয়োগ করা হলে যার ভর বেশি সেটাকে বেশি বিচ্যুত করা যায় না। কিন্তু যার ভর কম সেটাকে সহজে বিচ্যুত করা যায়। কিংবা অন্যভাবে বলা যায়, ভর কম হলে জড়তার প্রভাবটা তুলনামূলকভাবে কম হয়।

উদাহরণ

প্রশ্ন: 3.01 চিত্রের গ্রাফ দুটিতে সময়ের সাথে সরণ এবং বেগের মান দেখানো হয়েছে, কোথায় কতক্ষণ বল প্রয়োগ করা হয়েছে ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: দুটি গ্রাফই দেখতে একই রকম কিন্তু এদের মাঝে সম্পূর্ণ ভিন্ন তথ্য রয়েছে।

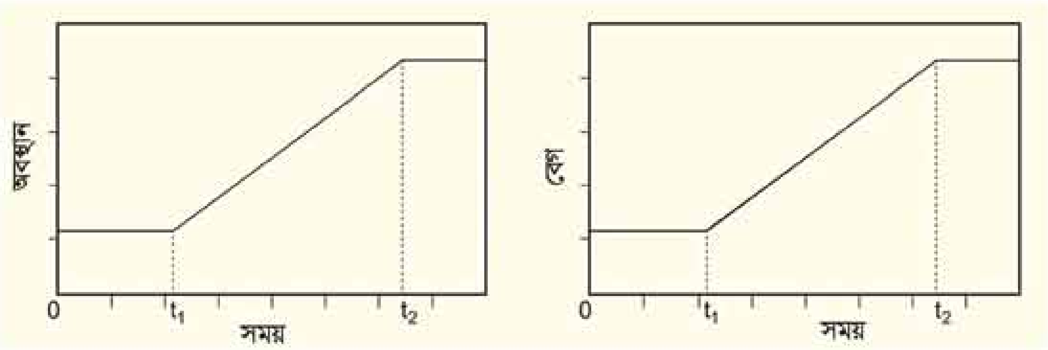

চিত্র 3.01: অবস্থান-সময় ও বেগ-সময়ের দুটি লেখচিত্র।

(i) প্রথম গ্রাফে 0 থেকে t_1 কিংবা t_2 থেকে শেষ পর্যন্ত সময় দুটিতে অবস্থানের পরিবর্তন হচ্ছে না, যার অর্থ কোনো বেগ নেই, কাজেই বেগের পরিবর্তনের প্রশ্নই আসে না যার অর্থ এ দুটো সময়ে নিশ্চয়ই কোনো বল প্রয়োগ করা হচ্ছে না। t_1 থেকে t_2 সময়ে অবস্থানের পরিবর্তন হচ্ছে কিন্তু যেহেতু সমহারে পরিবর্তন (রেখাটি যেহেতু সরলরেখা) হচ্ছে তার অর্থ সমবেগ। অর্থাৎ বেগের কোনো পরিবর্তন নেই। কাজেই t_1 থেকে t_2 সময়েও কোনো বল প্রয়োগ করা হচ্ছে না। শুধু t_1 মুহূর্তে কোনোভাবে বল প্রয়োগ করে স্থির বস্তুটিকে সমবেগে গতিশীল করা হয়েছে। আবার ঠিক t_2 মুহূর্তে বল প্রয়োগ করে গতিশীল বস্তুটিকে থামিয়ে দেওয়া হয়েছে, অন্য কোথাও কোনো বল প্রয়োগ করা হয়নি।

অর্থাৎ $0 < t < t_1$, $t_1 < t < t_2$ এবং $t_2 < t$ তে কোনো বল নেই।

শুধু $t = t_1$ এবং $t = t_2$ তে মুহূর্তের জন্য বল প্রয়োগ করা হয়েছে।

(ii) দ্বিতীয় গ্রাফে 0 থেকে t_1 এবং t_2 থেকে শেষ পর্যন্ত বস্তুটি সমবেগে যাচ্ছে, কাজেই কোনো বল প্রয়োগ করা হয়নি। t_1 থেকে t_2 সময়ে বেগটি সমহারে পরিবর্তিত হচ্ছে কাজেই এখানে নিশ্চয়ই বল প্রয়োগ করা হচ্ছে।

অর্থাৎ $0 < t < t_1$ এবং $t_2 < t$ কোনো বল নেই।

$t_1 < t < t_2$তে বল প্রয়োগ করা হয়েছে।

3.1.2 বল

নিউটনের প্রথম সূত্রে প্রথমবার "বল" শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে বল বলতে আমরা কী বোঝাই, সেটা এখনো বলা হয়নি। এটা যদি পদার্থবিজ্ঞানের বই না হয়ে অন্য কোনো বই হতো তাহলে "বল প্রয়োগ"-এর জায়গায় "শক্তি প্রয়োগ" কথাটা ব্যবহার করলেও বাক্যটায় অর্থের কোনো উনিশ-বিশ হতো না। কিন্তু যেহেতু এটা পদার্থবিজ্ঞানের বই, তাই আমরা এখানে শক্তি কথাটা ব্যবহার করতে পারব না। পদার্থবিজ্ঞানের ভাষায় শক্তি সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা রাশি! এখানে আমাদের বল কথাটাই ব্যবহার করতে হবে! কিন্তু বল মানে কী? আমরা তো এখন পর্যন্ত বলের কোনো সংজ্ঞা দিইনি!

আসলে নিউটনের প্রথম সূত্রটাই বলের সংজ্ঞা হতে পারে! যার প্রয়োগের কারণে স্থির বস্তু চলতে শুরু করে আর সমবেগে চলতে থাকা বস্তুর বেগের পরিবর্তন হয় সেটাই হচ্ছে বল। নিউটনের প্রথম সূত্র থেকে বলটা কী, সেটা বুঝতে পারি কিন্তু পরিমাপ করতে পারি না। দ্বিতীয় সূত্র থেকে আমরা বল পরিমাপ করা শিখব।

তোমরা যখন তোমাদের দৈনন্দিন জীবনে নানা কাজে বল ব্যবহার করো তখন তোমাদের মনে হতে পারে কোনো কোনো বল প্রয়োগ করতে হলে স্পর্শ করতে হয় (ক্রেন দিয়ে ভারী জিনিস তোলা, কোনো কিছুকে ধাক্কা দেওয়া, কিংবা চলতে চলতে ঘর্ষণের জন্য চলন্ত বস্তুর থেমে যাওয়া) আবার তোমরা লক্ষ করেছ কোনো কোনো বল প্রয়োগের জন্য স্পর্শ করতে হয় না। কোনো কিছু ছেড়ে দিলে মাধ্যাকর্ষণ বলের জন্য নিচে পড়া, চুম্বকের আকর্ষণ!) কাজেই আমরা বলকে স্পর্শ এবং অস্পর্শ দুই ধরনের বলে ভাগ করতে পারি। কিন্তু তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ আমরা যেখানে স্পর্শ করছি বলে ধারণা করছি, সেখানে কিন্তু পরস্পরের অণু-পরমাণু, তাদের ঘিরে ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রন সরাসরি স্পর্শ দিয়ে নয় তাদের তড়িৎ চৌম্বক বল দিয়ে একে অন্যের সাথে কাজ করছে। অন্য কথায় বলা যায় আমরা যদি পারমাণবিক পর্যায়ে চলে যাই তাহলে সব বলই অস্পর্শক, এক পরমাণু অন্য পরমাণুকে আকর্ষণ-বিকর্ষণ করে দূর থেকে, তাদেরকে আক্ষরিক অর্থে স্পর্শ করতে হয় না।

3.2 মৌলিক বলের প্রকৃতি (Nature of Force)

পৃথিবীতে কত ধরনের বল আছে জিজ্ঞেস করা হলে তোমরা নিশ্চয়ই বলবে অনেক ধরনের! কোনো কিছুকে যদি ধাক্কা দিই সেটা একটা বল, ট্রাক যখন বোঝা টেনে নিয়ে যায় সেটা একটা বল, ঝড়ে যখন গাছ উপড়ে পড়ে সেটা একটা বল, চুম্বক যখন লোহাকে আকর্ষণ করে সেটা একটা বল, বোমা বিস্ফোরণে যখন ঘরবাড়ি উড়িয়ে দেয় সেটা একটা বল, ক্রেন যখন কোনো কিছুকে টেনে তুলে সেটা একটা বল। একটুখানি সময় দিলেই এ রকম নানা ধরনের বলের তোমরা একটা বিশাল তালিকা তৈরি করতে পারবে।

কিন্তু চমকপ্রদ ব্যাপারটি কী জানো? প্রকৃতিতে মাত্র চার রকমের বল রয়েছে, ওপরে যে তালিকা দেওয়া হয়েছে সেগুলোকে বিশ্লেষণ করা হলে দেখা যাবে এগুলো ঘুরে-ফিরে এই চার রকমের বাইরে কোনোটা নয়! আসলে মৌলিক বল মাত্র চারটি। সেগুলো হচ্ছে: মহাকর্ষ বল, তড়িৎ চৌম্বক বা বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় বল, দুর্বল নিউক্লিয় বল ও সবল নিউক্লিয় বল।

3.2.1 মহাকর্ষ বল (Gravitation)

এই সৃষ্টিজগতের সকল বস্তু তাদের ভরের কারণে একে অপরকে যে বল দিয়ে আকর্ষণ করে সেটাই হচ্ছে মহাকর্ষ বল। এই মহাকর্ষ বলের কারণে গ্যালাক্সির ভেতরে নক্ষত্ররা ঘুরপাক খায় কিংবা সূর্যকে ঘিরে পৃথিবী ঘোরে, পৃথিবীকে ঘিরে চাঁদ ঘোরে! পৃথিবীর মহাকর্ষ বল যখন আমাদের ওপর কাজ করে আমরা সেটাকে বলি মাধ্যাকর্ষণ। এই মাধ্যাকর্ষণ বল আমাদের পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে, অর্থাৎ নিচের দিকে টেনে রেখেছে এবং এর কারণেই আমরা নিজেদের ওজনের অনুভূতি পাই।

পদার্থবিজ্ঞানের একটি চমকপ্রদ বল হচ্ছে মহাকর্ষ বল। ভর আছে সেরকম যেকোনো বস্তু অন্য বস্তুকে মহাকর্ষ বল দিয়ে আকর্ষণ করে। আমরা এই অধ্যায়ে মহাকর্ষ বল নিয়ে আরেকটু বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব।

3.2.2 তড়িৎ চৌম্বক বল বা বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় বল (Electromagnetic Force)

চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়ে সেটা দিয়ে কাগজের টুকরোকে আকর্ষণ করা বা চুম্বক দিয়ে অন্য চুম্বককে আকর্ষণ-বিকর্ষণ আমাদের অনেকেই কখনো না কখনো করেছি। যদিও তড়িৎ বা বিদ্যুৎ এবং চুম্বকের বলকে আলাদা ধরনের বল মনে হয় আসলে দুটি একই বল। শুধু দুইভাবে দেখা যায়। শুধু এই বলটা আকর্ষণ এবং বিকর্ষণ দুটোই করতে পারে, অন্যগুলো শুধু আকর্ষণ করতে পারে বিকর্ষণ করতে পারে না। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির তুলনায় এটা অনেক শক্তিশালী (10^{36} গুণ বা ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন গুণ শক্তিশালী!) কথাটা যে সত্যি সেটা নিশ্চয়ই তোমরা অনুমান করতে পারবে, কারণ যখন একটা চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়ে একটা কাগজকে আকর্ষণ করে তুলে নাও তখন কিন্তু সেই কাগজটাকে পুরো পৃথিবী তার সমস্ত ভর দিয়ে তৈরি মাধ্যাকর্ষণ বল দিয়ে টেনে রাখার চেষ্টা করে, তবু তোমার চিরুনির অল্প একটু বিদ্যুৎ সেই বিশাল পৃথিবীর পুরো মাধ্যাকর্ষণকে হারিয়ে দেয়।

3.2.3 দুর্বল নিউক্লিয় বল (Weak Force)

এটাকে দুর্বল বলা হয় কারণ এটা তড়িৎ চৌম্বক বল থেকে দুর্বল (প্রায় ট্রিলিয়ন গুণ) কিন্তু মোটেও মহাকর্ষ বলের মতো এত দুর্বল নয়। মহাকর্ষ এবং তড়িৎ চৌম্বক বল যেকোনো দূরত্ব থেকে কাজ

করতে পারে কিন্তু এই বলটা খুবই অল্প দূরত্বে ($10^{-18}\,m$) কাজ করে! তেজস্ক্রিয় নিউক্লিয়াস থেকে যে বেটা (β) রশ্মি বা ইলেকট্রন বের হয় সেটার কারণ এই দুর্বল নিউক্লিয় বল।

3.2.4 সবল নিউক্লিয় বল (Strong Nuclear Force)

এটি হচ্ছে সৃষ্টিজগতের সবচেয়ে শক্তিশালী বল, তড়িৎ চৌম্বক বল থেকেও একশ গুণ বেশি শক্তিশালী কিন্তু এটাও খুবই অল্প দূরত্বে ($10^{-15}\,m$) কাজ করে। পরমাণুর কেন্দ্রে যে নিউক্লিয়াস রয়েছে তার ভেতরকার প্রোটন এবং নিউট্রনের নিজেদের মাঝে এই প্রচণ্ড শক্তিশালী বল কাজ করে নিজেদের আটকে রাখে। প্রচণ্ড বলে আটকে থাকার কারণে এর মাঝে অনেক শক্তি জমা থাকে। তাই বড় নিউক্লিয়াসকে ভেঙে কিংবা ছোট নিউক্লিয়াসকে জোড়া দিয়ে এই বলের কারণে অনেক শক্তি তৈরি করা সম্ভব। নিউক্লিয়ার বোমা সে জন্য এত শক্তিশালী। সূর্য থেকে আলোর তাপও এই বল দিয়ে তৈরি হয়।

বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন, এই চার ধরনের বলের মূল এক জায়গায় এবং তাঁরা সবগুলোকে এক সূত্র দিয়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছেন। তড়িৎ চৌম্বক (বিদ্যুৎ চৌম্বকীয়) এবং দুর্বল নিউক্লিয়ার বলকে এর মাঝে একই সূত্র দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়েছে এবং সেটি তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানের একটি আকাশছোঁয়া সাফল্য! (কাজেই তুমি ইচ্ছে করলে বলতে পারো বল তিন ধরনের: মহাকর্ষ, ইলেকট্রো উইক (Electro-weak) এবং নিউক্লিয়ার বল। কেউ এটাকে ভুল বলতে পারবে না!) অন্যগুলোকেও এক সূত্রে গাঁথার জন্য বিজ্ঞানীরা কাজ করে যাচ্ছেন।

3.3 সাম্যতা ও সাম্যতাবিহীন বল (Balanced and Unbalanced Forces)

বল একটি ভেক্টর, কাজেই কোনো বস্তুর উপর যদি বল প্রয়োগ করা হয় তাহলে বিপরীত দিক থেকে অন্য একটি বল প্রয়োগ করে সেই বলটিকে কাটাকাটি করে দেওয়া সম্ভব। আমরা তখন বলি বলটি সাম্যাবস্থায় আছে। দুই বা ততোধিক বল একটি বস্তুর উপর প্রয়োগ করার পর বলগুলোর সম্মিলিত লব্ধি যদি শূন্য হয় তাহলে বস্তুটি স্থির থাকে।

3.02 চিত্রে দেখানো হচ্ছে একটা বস্তুকে সুতা দিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া আছে। বস্তুটির উপর পৃথিবীর আকর্ষণ বল (অর্থাৎ বস্তুর ওজন W), সোজা নিচের দিকে কাজ করছে। আবার আরেকটি বল যা সুতার টান খাড়া উপরের দিকে কাজ করছে। এখানে দুটি বল, একটি আরেকটির বিপরীত দিকে কাজ করে পরস্পরকে নিষ্ক্রিয় করে সাম্যাবস্থার সৃষ্টি করেছে।

যদি এখন সুতাটিকে কেটে দেওয়া যায় তাহলে সুতার টান T আর বস্তুটির উপর কাজ করবে না। শুধু পৃথিবীর অভিকর্ষ বল বা ওজন নিচের দিকে কাজ করবে, এখানে অভিকর্ষ বল বস্তুর ওজন

হচ্ছে অসাম্য বল। এই অসাম্য বলের কারণে বস্তুটি মাধ্যাকর্ষণজনিত ত্বরণে নিচের দিকে পড়তে শুরু করবে।

সুতাটি না কেটেও আমরা বস্তুটির উপর অসাম্য বল প্রয়োগ করতে পারি। আমরা যদি বস্তুটিকে টেনে এক পাশে একটুখানি সরিয়ে নিই তাহলে ওজন আর সুতার টান বিপরীত দিকে থাকবে না, তখন সুতার টান আর বস্তুটির ওজন এই দুটি বল মিলে একটি লব্ধি বল কাজ করবে এবং বস্তুটি ছেড়ে দেওয়া মাত্র এই লব্ধি বলটি বস্তুটির উপর কাজ করতে শুরু করবে এবং বস্তুটি দুলতে থাকবে। এটি অসাম্য বলের আরেকটি উদাহরণ।

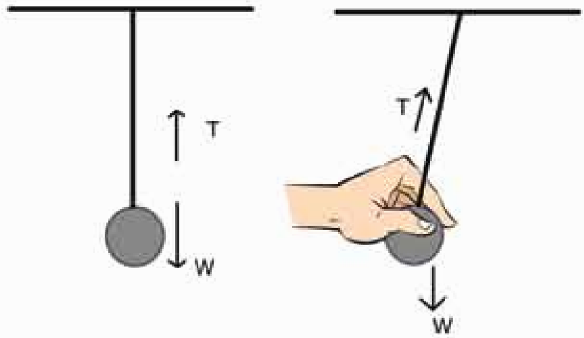

চিত্র 3.02: প্রথম ছবিতে বলের একটি সাম্যাবস্থা আছে। দ্বিতীয় ছবিতে পেন্ডুলামটি ছেড়ে দেওয়া মাত্র একটি লব্ধি বল কাজ করবে, যে কারণে পেন্ডুলামটি নড়তে শুরু করবে।

তিনটি বল মিলেও সাম্যাবস্থা তৈরি করা যেতে পারে। একটি ভারী বই একটি দড়ি দিয়ে বেঁধে দুই পাশ থেকে দড়ির দুই প্রান্ত টেনে ধরে বইটিকে স্থির অবস্থায় ঝুলিয়ে রাখা সম্ভব (চিত্র 3.03)। বইটি যেহেতু স্থির অবস্থায় আছে তাই এখানে বইটির ওজন W এবং দড়ির দুই প্রান্তের দুটি টান T_1 এবং T_2 মিলে বলের লব্ধি শূন্য হয়েছে।

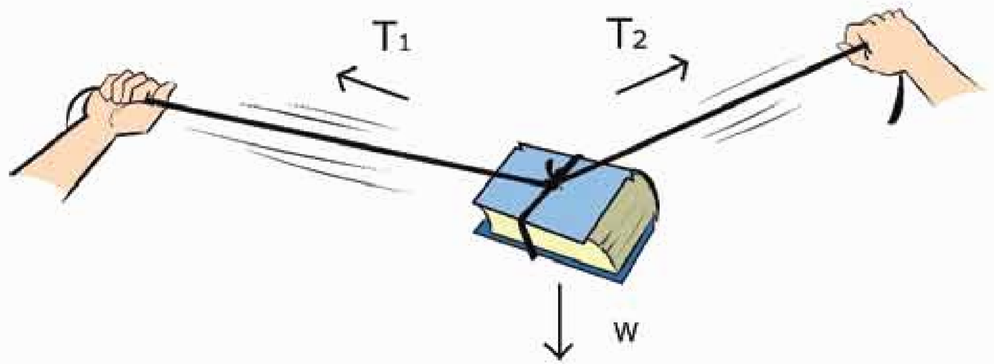

চিত্র 3.03: দুই পাশ থেকে তুমি যত জোরেই টানার চেষ্টা করো না কেন, তুমি কখনোই দড়িটা পুরোপুরি সোজা করতে পারবে না, কারণ তাহলে বইয়ের ওজনের বলটিকে নিষ্ক্রিয় করা যাবে না।

নিজে করো

একটি ভারী বই দড়ি দিয়ে বেঁধে দড়িটি টেনে একেবারে সোজা করার চেষ্টা করো। তুমি দড়ির দুই প্রান্তে যত বলই প্রয়োগ করো না কেন দড়িটি টেনে কখনোই পুরোপুরি সোজা করতে পারবে না। তার কারণ দড়িটা পুরোপুরি সোজা হলে বইয়ের ওজন W কে নিষ্ক্রিয় করে বলের মোট লব্ধি কোনোভাবে শূন্য করা সম্ভব নয়।

3.4 ভরবেগ (Momentum)

ধরা যাক একটি ট্রাক এবং একটি বাইসাইকেল একই বেগে গিয়ে একটি ছোট গাড়িকে আঘাত করেছে। এই সংঘর্ষে সাইকেল নাকি ট্রাক, কোনটি ছোট গাড়িটার বেশি ক্ষতি করতে পারবে? অবশ্যই ট্রাক, কারণ তার ভর অনেক বেশি। সাইকেল এবং ট্রাক দুটোর বেগ এক হলেও ট্রাকের ভর অনেক বেশি, সেজন্য তার ভরবেগ অনেক বেশি। ভরবেগ সহজভাবে ভর এবং বেগের গুণফলকে বলা হয়। ভর যদি m হয় এবং বেগ যদি v হয় তাহলে ভরবেগ p হচ্ছে:

$$p = mv$$

এখানে ভর স্কেলার রাশি, কিন্তু বেগ ভেক্টর, তাই ভরবেগ ভেক্টর। তোমরা ধারণা করতে পারো যে সাধারণভাবে যেহেতু কোনো কিছুর ভরের পরিবর্তন হয় না তাই ভরবেগের পরিবর্তন হতে পারে শুধু বেগের পরিবর্তন থেকে। কিন্তু আমরা বিশেষ কোনো ক্ষেত্রে দেখতে পারি গতিশীল কোনো কিছুর বেগের পরিবর্তন হয়নি, কিন্তু ভরের পরিবর্তন হওয়ার কারণে তার ভরবেগের পরিবর্তন হয়ে গেছে। তোমাদের মনে হতে পারে ভরবেগ নামে নতুন একটা রাশির প্রচলন না করে এটিকে সব সময় ভর এবং বেগের গুণফল হিসেবে বিবেচনা করা হলে কী সমস্যা ছিল? সাধারণভাবে বড় কোনো সমস্যা না থাকলেও আলোর কণার ব্যাপারে এটি অনেক বড় সমস্যা হতে পারে। আলোর কণা বা ফোটনের কোনো ভর নেই কিন্তু তার ভরবেগ আছে। অর্থাৎ ভর এবং বেগ থেকে ভরবেগ বেশি মৌলিক একটি রাশি।

ভরবেগের একক হলো kg m/s
ভরবেগের মাত্রা হলো $[p] = MLT^{-1}$

যদি একাধিক বস্তু গতিশীল হয় এবং তারা ভিন্ন ভিন্ন বেগে যেতে থাকে তাহলে তাদের একটা সম্মিলিত ভরবেগ থাকে। বস্তুগুলোর ভিন্ন ভিন্ন বেগ থাকার কারণে চলার পথে একটির সাথে

অন্যটির সংঘর্ষ হতে পারে এবং সংঘর্ষের কারণে তাদের বেগের পরিবর্তনও হতে পারে। কিন্তু যদি বাইরে থেকে কোনো বল প্রয়োগ করা না হয় তাহলে সংঘর্ষের পরেও সম্মিলিত ভরবেগের কোনো পরিবর্তন হয় না। এই প্রক্রিয়াটির নাম ভরবেগের নিত্যতার সূত্র।

উদাহরণ

প্রশ্ন: তুমি একটি টেনিস বল 10 m/s বেগে একটা দেয়ালে ছুড়ে দেওয়ার পর এটা একই দ্রুতিতে ঠিক তোমার দিকে ফিরে এসেছে। বলটার ভর 100 gm হলে ভরবেগের পরিবর্তন কত?

উত্তর: বলটি ছুড়ে দেওয়ার সময় ভরবেগ $p = mv$, দেয়ালে আঘাত করে ঠিক উল্টো দিকে ফিরে আসার সময় ভরবেগ হচ্ছে $p' = -mv$ কাজেই ভরবেগের পরিবর্তন:

$$p - (p') = mv - (-mv) = 2mv$$

এই পরিবর্তনের জন্য টেনিস বলটার উপর দেয়ালটা খুব অল্প সময়ের জন্য বল প্রয়োগ করেছে। ক্রিকেট খেলার সময় ব্যাটসম্যানরা এভাবে ব্যাট দিয়ে খুব অল্প সময়ের জন্য ক্রিকেট বলকে আঘাত করে সেটার ভরবেগের পরিবর্তন করে ফেলে। আমরা যেগুলোকে বাউন্ডারি কিংবা ছক্কা বলি।

3.5 সংঘর্ষ (Collision)

3.5.1 ভরবেগ এবং শক্তির সংরক্ষণশীলতা

মনে করি, একটি সমতলে m_1 এবং m_2 ভর u_1 এবং u_2 বেগে সরলরেখায় যাচ্ছে। তাদের বেগের ভিন্নতার কারণে ধরা যাক তাদের মাঝে সংঘর্ষ হলো এবং সে কারণে তাদের বেগ পাল্টে গেল, m_1 ভরটির বেগ এখন v_1 এবং m_2 ভরটির বেগ v_2 (চিত্র 3.04)। আমরা কি সংঘর্ষের পর বেগ v_1 এবং v_2 কত, সেটা বের করতে পারব?

সংঘর্ষের আগে ভর দুটির সম্মিলিত ভরবেগ $m_1u_1 + m_2u_2$
সংঘর্ষের পর ভর দুটির সম্মিলিত ভরবেগ $m_1v_1 + m_2v_2$

যেহেতু বাইরে থেকে কোনো বল দেওয়া হয়নি তাই সংঘর্ষের আগে যেটুকু ভরবেগ ছিল সংঘর্ষের পরেও সেটুকু ভরবেগ থাকবে। এটা হচ্ছে ভরবেগের সংরক্ষণশীলতা বা নিত্যতা।

কাজেই আমরা লিখতে পারি

$$m_1u_1 + m_2u_2 = m_1v_1 + m_2v_2$$

এখানে একটি মাত্র সমীকরণ এবং দুটো অজানা রাশি v_1 এবং v_2, কাজেই আমরা v_1 এবং v_2 বের করতে পারব না। যদি v_1 এবং v_2 বের করতে চাই তাহলে আরেকটা সমীকরণ দরকার, সৌভাগ্যক্রমে আমাদের আরো একটি সমীকরণ আছে। পরের অধ্যায়ে আমরা যখন শক্তি সম্পর্কে জানব তখন শক্তির নিত্যতার সূত্র থেকে দ্বিতীয় আরেকটি সমীকরণ পেয়ে যাব, সেটি হচ্ছে শক্তির সংরক্ষণশীলতার সূত্র। তোমরা পরের অধ্যায়ে দেখবে m ভরের কোনো বস্তু যদি u বেগে যায় তাহলে তার গতি শক্তি $\frac{1}{2}mu^2$। কাজেই আমরা শক্তির সংরক্ষণশীলতা ব্যবহার করে লিখতে পারি:

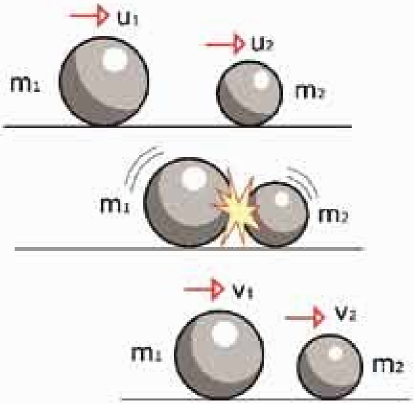

চিত্র 3.04: m_1 এবং m_2 পরস্পরকে আঘাত করার পর তাদের বেগ পরিবর্তিত হয়ে v_1 এবং v_2 হয়েছে।

$$\frac{1}{2}m_1u_1^2 + \frac{1}{2}m_2u_2^2 = \frac{1}{2}m_1v_1^2 + \frac{1}{2}m_2v_2^2$$

নিজে করো

তোমরা নিচের এই দুটো সূত্র ব্যবহার করে v_1এবং v_2 এর মান বের করো।

ভরবেগের সংরক্ষণশীলতা সূত্রটি এভাবে লিখতে পারি: $m_1(u_1 - v_2) = m_2(v_2 - u_2)$

শক্তির সংরক্ষণশীলতা সূত্রটি এভাবে লিখতে পারি: $m_1(u_1^2 - v_1^2) = m_2(v_2^2 - u_2^2)$

এবারে এই দুটো সমীকরণ ব্যবহার করে খুব সহজেই সংঘর্ষের পর m_1 এবং m_2 ভরের বেগ v_1 এবং v_2 বের করতে পারব। সেটি হচ্ছে:

$$v_1 = \frac{(m_1 - m_2)u_1 + 2m_2u_2}{m_1 + m_2}$$

এবং

$$v_2 = \frac{(m_2 - m_1)u_2 + 2m_1u_1}{m_1 + m_2}$$

সূত্র দুটোর দিকে তাকিয়েই তুমি বলতে পারবে দুটোর ভর যদি সমান হয়, অর্থাৎ $m_1 = m_2$ তাহলে $v_1 = u_2$ এবং $v_2 = u_1$ অর্থাৎ বস্তু দুটো একটি অন্যটির সাথে তাদের বেগ পাল্টে নেয়।

নিজে করো

তোমরা এক্ষুনি এই পরীক্ষাটি করতে পারো। একটা মারবেল স্থির রেখে অন্য একটা মারবেল দিয়ে সেটাকে টোকা দাও যেন সেটি ছুটে গিয়ে স্থির মারবেলকে আঘাত করে। দেখবে টোকা দেওয়া মারবেলটা স্থির হয়ে যাবে এবং স্থির মারবেলটা ছুটে আসা মারবেলের গতিতে বের হয়ে যাবে।

দুটো বস্তুর সংঘর্ষের পর তাদের বেগ কত হয় সেটি ব্যবহার করে আমরা সড়ক দুর্ঘটনার বিষয়গুলো খুব সহজে ব্যাখ্যা করতে পারব।

3.5.2 নিরাপদ ভ্রমণ: গতি ও বল

আমরা পরের অধ্যায়ে শক্তি সম্পর্কে জানার সময় গতিশক্তির বিষয়টি বিস্তারিতভাবে বুঝতে পারব কিন্তু "সংঘর্ষ" পড়ার সময় এর মাঝে জেনে গেছি যে গতিশক্তিকে $\frac{1}{2}mu^2$ হিসেবে প্রকাশ করতে হয়। ভ্রমণ সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শক্তির মাঝে বেগের বর্গ রয়েছে, যার অর্থ বেগ দ্বিগুণ করা হলে শক্তি চার গুণ বেড়ে যায়। যখন দুটো গাড়ির মাঝে সংঘর্ষ হয় তখন এই শক্তিটির কারণেই গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং আরোহীরা আঘাত পায়। কাজেই দুর্ঘটনার সময় ক্ষতি কমানোর সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে গতি কম রাখা। আমাদের দেশের বেশিরভাগ দুর্ঘটনা হয় গাড়ির বেগ বেশি রাখার কারণে। তখন গাড়িকে নিয়ন্ত্রণ করাও কঠিন হয় এবং দুর্ঘটনা ঘটার সময় সেখানে অনেক শক্তি ব্যয় হয়।

ধরা যাক পথে একটি অনেক ভারী পাথর বোঝাই ট্রাকের (m_1) সাথে একই বেগে আসা ছোট একটা গাড়ির (m_2) মুখোমুখি সংঘর্ষ হল। কে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে?

যেহেতু মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছে তাই ছোট গাড়ির বেগ ট্রাকের বেগের বিপরীত।

অর্থাৎ ট্রাকের বেগ u হলে গাড়ির বেগ $-u$

যেহেতু ছোট গাড়ির ভর m_2 ট্রাকের ভর m_1 এর তুলনায় অনেক কম সেটাকে শূন্য ধরে নিলে খুব বেশি ভুল হবে না কিন্তু আমাদের হিসাবটি খুব সহজ হবে। (তুমি ইচ্ছা করলে সত্যিকারের বাস-ট্রাক

এবং ছোট গাড়ির ভর নিয়ে হিসাবটি করে দেখতে পারো) m_2 কে শূন্য ধরে আমরা দেখি সংঘর্ষের পর ট্রাকের বেগ,

$$v_1 = \frac{(m_1 - 0)u + 2 \times 0 \times (-u)}{m_1 + 0} = u$$

এবং

$$v_2 = \frac{(0 - m_1)(-u) + 2m_1 u}{m_1 + m_2} = 3u$$

ফলাফলটি খুবই ভীতিজনক। সংঘর্ষের পর ট্রাকটি একই বেগে যেতে থাকবে, অর্থাৎ সংঘর্ষের ভয়াবহতা অনুভব করবে না। ছোট গাড়িটির বেগ $-u$ থেকে পরিবর্তিত হয়ে $3u$ হয়ে যাবে যার অর্থ বেগের পরিবর্তন $3u - (-u) = 4u$, ছোট গাড়ির বেগের দিক পরিবর্তিত হয়ে উল্টোদিকে চার গুণ বেগে ছিটকে যাবে। এই প্রক্রিয়ায় ছোট গাড়িটি দুমড়েমুচড়ে ধ্বংস হয়ে যাবে এবং আরোহীদের প্রাণ হারানো হবে খুবই স্বাভাবিক ঘটনা।

কাজেই আমাদের পথে ভারী ট্রাক এবং ভারী বাস খুব সতর্ক হয়ে চালাতে হবে, কারণ দুর্ঘটনায় তারা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত না হলেও তাদের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হলে ছোট গাড়ি অনেক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

নিজে করো

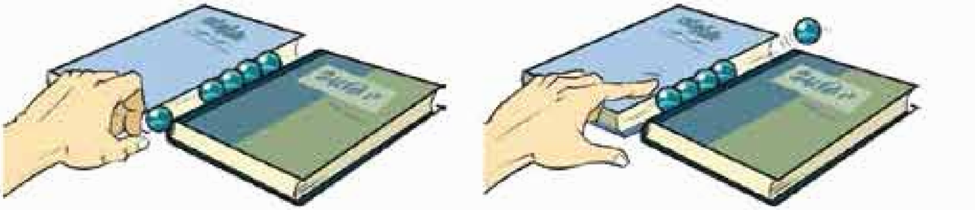

চিত্র 3.05: ভরবেগ এবং শক্তির সংরক্ষণশীলতার পরীক্ষা

দুটি বই সমান্তরালভাবে পাশাপাশি রেখে মাঝখানের ফাঁকাটিতে চার-পাঁচটি মারবেল রাখো যেন একটি আরেকটিকে স্পর্শ করে থাকে (চিত্র 3.05)। এখন একটি মারবেলকে টোকা দিয়ে বাকি মারবেলের সারিকে আঘাত করো। দেখবে একটি মারবেল দিয়ে এক পাশে আঘাত করলে অন্য পাশ দিয়ে একটি মারবেল বের হবে, দুটি দিয়ে আঘাত করলে দুটি মারবেল বের হবে। কখনোই একটি মারবেল দিয়ে আঘাত করে দুটি মারবেলকে কিংবা দুটি মারবেল দিয়ে আঘাত করে একটি মারবেলকে বের করতে পারবে না।

3.6 বস্তুর গতির উপর বলের প্রভাব: নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র (Effect of Force on Motion: Newton's Second Law)

ফুটবলের মাঠে আমরা সব সময়ই একজন খেলোয়াড়কে একটা স্থির ফুটবলকে কিক করে সেটা গতিশীল করে দূরে পাঠিয়ে দিতে দেখেছি। কিক করার সময় যখন ফুটবলটি স্পর্শ করে শুধু সেই মুহূর্তটিতে ফুটবলটিতে বল প্রয়োগ করা হয়, সেই বলের কারণে স্থির ফুটবলটি গতিশীল হয়।

আমরা শুধু এক মুহূর্তের জন্য বল প্রয়োগ না করে দীর্ঘ সময়ের জন্যও বল প্রয়োগ করতে পারি। একটা স্থির ঠেলাগাড়িকে বেশ কিছুক্ষণ ঠেলে তার ভেতরে একটা গতি তৈরি করে ছেড়ে দিতে পারি। ঘর্ষণের কারণে থেমে না যাওয়া পর্যন্ত সেটি বেশ খানিকক্ষণ গড়িয়ে যেতে পারে।

বল প্রয়োগ করে বেগের দিকও পরিবর্তন করা যায়। ক্রিকেট খেলার মাঠে যখন বোলার ব্যাটসম্যানের দিকে একটা ক্রিকেট বল ছুড়ে দেয়, ব্যাটসম্যান তখন ব্যাটের আঘাতে বলটিকে তার ব্যাট দিয়ে আঘাত করে বলটিকে সম্পূর্ণ অন্যদিকে পাঠিয়ে দিতে পারে।

উপরের তিনটি উদাহরণেই আমরা দেখেছি অল্প সময় বা বেশি সময়ের জন্য কোনো কিছুর উপর বল প্রয়োগ করে তার বেগের পরিবর্তন করা হয়েছে। আমরা আগের অধ্যায়ে দেখেছি যে বেগের পরিবর্তনের হার হচ্ছে ত্বরণ। কাজেই বলা যেতে পারে কোনো বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করা হলে তার ত্বরণ হয়। বস্তুর উপর প্রয়োগ করা বল এবং ত্বরণের সম্পর্কটি হচ্ছে নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র:

> **নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র:** বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তনের হার তার উপর প্রযুক্ত বলের সমানুপাতিক এবং যেদিকে বল প্রয়োগ করা হয় ভরবেগের পরিবর্তনও ঘটে সেদিকে।

ধরা যাক কোনো একটা বস্তুর আদি বেগ ছিল u এবং t সময় পর সেই বেগ পরিবর্তিত হয়ে (বেড়ে কিংবা কমে) হয়েছে v, কাজেই ভরবেগের পরিবর্তন হচ্ছে:

$$mv - mu$$

কাজেই ভরবেগের পরিবর্তনের হার:

$$\frac{mv - mu}{t} = m\frac{(v - u)}{t} = ma$$

যেহেতু এখানে ধরে নিয়েছি ভরের কোনো পরিবর্তন হয়নি তাই এভাবে লিখতে পারি। তাছাড়া আমরা জানি ত্বরণ হচ্ছে

$$a = \frac{v-u}{t}$$

সুতরাং প্রয়োগ করা বল যদি F হয় তাহলে আমরা নিউটনের দ্বিতীয় সূত্রকে লিখতে পারি:

$$F \propto ma$$

কিন্তু আমরা সূত্রটাকে সমানুপাতিকভাবে লিখতে চাই না, সমীকরণ হিসেবে লিখতে চাই! তাহলে একটা সমানুপাতিক ধ্রুব k ব্যবহার করে আমাদের লিখতে হবে

$$F = kma$$

নিউটনের দ্বিতীয় সূত্রটির বেলায় এবারে একটা চমকপ্রদ ব্যাপার ঘটানো সম্ভব। যেহেতু বল বিষয়টাই এর আগে কোথাও ব্যাখ্যা করা হয়নি, (নিউটনের প্রথম সূত্র দিয়ে শুধু সেটার একটা ধারণা দেওয়া হয়েছে) দ্বিতীয় সূত্র দিয়ে এই প্রথম সেটাকে প্রথমবার পরিমাপ করা হবে। তাই ধ্রুবকের একটি মান দিতে হবে। আমরা বলতে পারি নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র প্রয়োগ করার সময় সমানুপাতিক ধ্রুবককে 1 ধরা হলে যেটা পাব সেটাই হচ্ছে বলের পরিমাপ! কী সহজে একটা সমানুপাতিক সম্পর্ককে সমীকরণ বানিয়ে ফেলা যায়।

সুতরাং আমরা নিউটনের দ্বিতীয় সূত্রটাকে একটা সমীকরণ হিসেবে লিখতে পারি। বল যদি F হয় এবং সমানুপাতিক ধ্রুবককে যদি 1 ধরে নিই তাহলে

$$F = ma$$

এই ছোট এবং সহজ সমীকরণটি যে পদার্থবিজ্ঞানের জগতে কী বিপ্লব করে দিতে পারে সেটি বিশ্বাস করা কঠিন।

বলের একক হচ্ছে নিউটন N
বলের মাত্রা হচ্ছে $[F] = MLT^{-2}$

এখানে মনে রাখতে হবে, নিউটনের দ্বিতীয় সূত্রটি শুধু রৈখিক গতির জন্য সত্যি নয়, এটি যেকোনো গতির জন্য সত্যি। আমরা মাধ্যাকর্ষণ বল সম্পর্কে জেনেছি, নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র ব্যবহার করে মহাকর্ষ বলের কারণে সূর্যকে ঘিরে ঘুরতে থাকা গ্রহদের গতিও ব্যাখ্যা করতে পারব। তবে আমরা এই বইয়ে নিউটনের দ্বিতীয় সূত্রটি শুধু রৈখিক গতির মাঝে সীমাবদ্ধ রাখব।

একটি বস্তুর উপর যদি বল প্রয়োগ করা হয় তাহলে নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র ব্যবহার করে খুব সহজে তার ত্বরণ বের করা যায়। (বলকে ভর দিয়ে ভাগ করা হলে ত্বরণ বের হয়ে যাবে) ত্বরণ জানা থাকলে গতির সূত্রগুলো ব্যবহার করে তার বেগ কিংবা অতিক্রান্ত দূরত্ব বের করা সম্ভব। অন্যভাবে

আমরা বলতে পারি যে যদি আমরা কোনো বস্তুকে গতিশীল দেখি এবং তার ত্বরণটুকু বের করতে পারি তাহলে তার ভর জানা থাকলে তার উপর কতটুকু বল প্রয়োগ করা হয়েছে সেটিও বের করা সম্ভব।

এবারে আমরা কয়েকটি উদাহরণ দেখি।

উদাহরণ

প্রশ্ন: 5 kg ভরের একটি স্থির বস্তুর ওপর 100 N বল 10 s পর্যন্ত প্রয়োগ করা হলো। (a) বল প্রয়োগ করার কারণে ত্বরণ কত? (b) 10 s পরে বেগ কত? (c) 20 s পরে বেগ কত? (d) 20 s সময়ে কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করেছে? (e) বেগ এবং অতিক্রান্ত দূরত্ব গ্রাফ এঁকে দেখাও।

উত্তর: (a) ত্বরণ

$$a = \frac{F}{m} = \frac{100\,N}{5\,kg} = 20\ \mathrm{m}/s^2$$

(b) $10s$ পরে বেগ

$$v = u + at = 0 + 20 \times 10\ \mathrm{m/s} = 200\ \mathrm{m/s}$$

(c) 10 s পর্যন্ত বল প্রয়োগ করা হয়েছে, এরপর যেহেতু আর বল প্রয়োগ করা হয়নি কাজেই 200 m/s বেগ পৌঁছানোর পর বেগ অপরিবর্তিত থাকবে। অর্থাৎ 20 s পরে বেগ 200 m/s

(d) 20 s এ অতিক্রান্ত দূরত্ব দুইবারে বের করতে হবে।

প্রথম 10 s এ অতিক্রান্ত দূরত্ব:

$$s_1 = ut + \frac{1}{2}at^2 = \frac{1}{2} \times 20 \times 10^2\ \mathrm{m} = 1000\ \mathrm{m}$$

দ্বিতীয় 10 s এ অতিক্রান্ত দূরত্ব:

$$s_2 = vt = 200 \times 10\ \mathrm{m} = 2000\ \mathrm{m}$$

মোট অতিক্রান্ত দূরত্ব

$$s = s_1 + s_2 = 1000\ \mathrm{m} + 2000\ \mathrm{m} = 3000\ \mathrm{m} = 3\ \mathrm{km}$$

(e) 3.06 চিত্রে দেখানো হয়েছে।

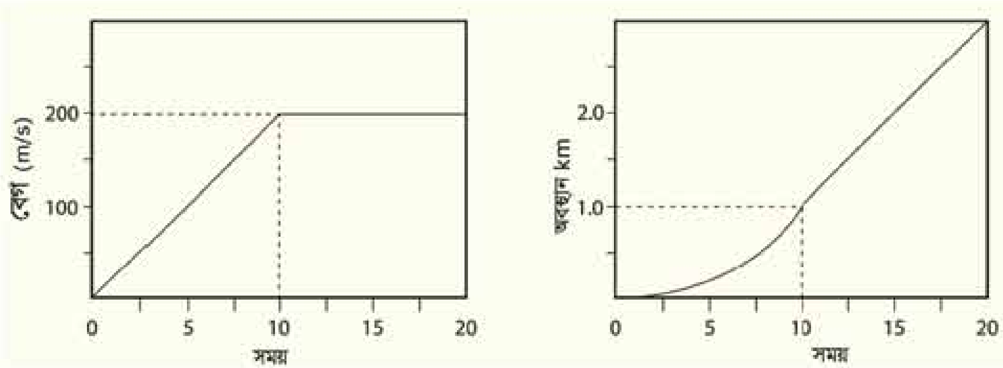

চিত্র 3.06: বেগ-সময় এবং অবস্থান-সময়ের দুটি গ্রাফ বা লেখচিত্র

প্রশ্ন: স্থির অবস্থা থেকে শুরু করে 10 সেকেন্ডে একটা বস্তু 100 m দূরত্ব অতিক্রম করাতে 20 N বল দিতে হয়েছে। বস্তুটির ভর কত?

উত্তর:

$$s = ut + \frac{1}{2}at^2$$

$$u = 0$$

$$a = \frac{2s}{t^2} = \frac{2 \times 100}{10^2}\ \text{m/s}^2 = 2\ \text{m/s}^2$$

$$F = ma$$

$$m = \frac{F}{a} = \frac{20}{2}\ \text{kg} = 10\ \text{kg}$$

3.7 মহাকর্ষ বল (Gravitational Force)

আমরা বল কী সেটা বলেছি (যেটা ত্বরণের জন্ম দেয়) সেটা কেমন করে পরিমাপ করতে হয় সেটাও বলেছি (ভর আর ত্বরণের গুণফল) কিন্তু এখনো তোমাদের সত্যিকার কোনো বলের সাথে পরিচয় করিয়ে দিইনি। পদার্থবিজ্ঞানের একটি চমকপ্রদ বল হচ্ছে মহাকর্ষ বল, ভর আছে সে রকম যেকোনো

বস্তু অন্য বস্তুকে মহাকর্ষ বল দিয়ে আকর্ষণ করে। ধরা যাক, দুটি ভর m_1 এবং m_2 তাদের মাঝে দূরত্ব r তাহলে তাদের মাঝে যে বল সৃষ্টি হবে (চিত্র 3.07) সেটাকে যদি আমরা F বলি তাহলে

$$F = G\frac{m_1 m_2}{r^2}$$

এখানে G হচ্ছে মহাকর্ষীয় ধ্রুবক এবং তার মান হচ্ছে:

$$6.67 \times 10^{-11}\ \mathrm{Nm^2kg^{-2}}$$

এখানে মনে রাখতে হবে m_1 ভরটি m_2 কে নিজের দিকে F বলে আকর্ষণ করে আবার m_2 ভরটি m_1 কে নিজের দিকে আকর্ষণ করে।

এই দুটো ভরের একটা যদি আমাদের পৃথিবী হয় এবং আমরা যদি ধরে নিই তার ভর M এবং পৃথিবীর উপরে m ভরের অন্য একটা জিনিস রাখা হয় তাহলে পৃথিবী m ভরকে তার কেন্দ্রের দিকে F বলে আকর্ষণ করবে।

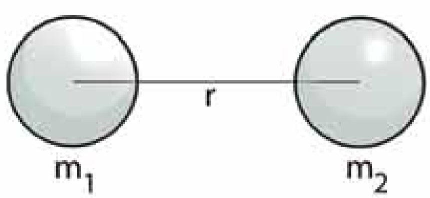

চিত্র 3.07: দুটি ভরের ভেতর মাধ্যাকর্ষণ বল

$$F = G\frac{mM}{R^2}$$

এই বলটিই আসলে বস্তুটির ওজন। মনে রাখতে হবে এখানে R পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে m ভরটি পর্যন্ত দূরত্ব। পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে m ভরের দূরত্ব নয়। যেহেতু পৃথিবীর ব্যাসার্ধ অনেক (প্রায় 6000 km) কাজেই পৃথিবীর পৃষ্ঠে ছোটখাটো উচ্চতাকে ধর্তব্যের মাঝে আনার প্রয়োজন নেই। পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে দূরত্ব মাপা হয় কারণ যদি গোলাকার কোনো বস্তু হয় তাহলে তার সমস্ত ভর কেন্দ্রবিন্দুতে জমা হয়ে আছে ধরে নিলে কোনো ভুল হয় না। (তার কারণ পৃথিবীর প্রত্যেকটা বিন্দুই m ভরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে এবং সবগুলো আকর্ষণ একত্র করা হলে মনে হয় যেন পৃথিবীর সমস্ত ভরটুকুই কেন্দ্রবিন্দুতে জমা হয়ে আছে।)

পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ বলের জন্য m ভরটি একটি ত্বরণ অনুভব করবে। মাধ্যাকর্ষণের জন্য যে ত্বরণ হয় সেটাকে a না লিখে g লেখা হয় সেটা আমরা আগেই বলেছি। কাজেই $F = ma$ এর পরিবর্তে লিখতে পারি:

$$G\frac{mM}{R^2} = mg$$

কিংবা,

$$g = G\frac{M}{R^2}$$

পৃথিবীর ভর $M = 5.98 \times 10^{24}$ kg, পৃথিবীর ব্যাসার্ধ $R = 6.37 \times 10^6$ m

অতএব,

$$g = \frac{GM}{R^2} = \frac{6.67 \times 10^{-11} \times 5.98 \times 10^{24}}{(6.37 \times 10^6)^2} \text{ m/s}^2 = 9.8 \text{ m/s}^2$$

আমরা এর আগের অধ্যায়েই গতির সমীকরণে g এর এই মান ব্যবহার করেছি, এখন তোমরা জানতে পারলে কেন g এর এই মান ব্যবহার করা হয়েছিল।

উদাহরণ

প্রশ্ন: স্পেস স্টেশনের উচ্চতা পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে আনুমানিক 100 km, সেখানে g এর মান কত?

চিত্র 3.08: মহাকাশযানে ভাসমান এস্ট্রোনট

উত্তর: স্পেস স্টেশনে মাধ্যাকর্ষণজনিত ত্বরণ g' হলে

$$g' = \frac{GM}{(R+r)^2}$$

এখানে R পৃথিবীর ব্যাসার্ধ 6000 km এবং স্পেস স্টেশনের উচ্চতা $r =$ 100 km

$$g' = \frac{GM}{(R+r)^2} = \frac{GM}{R^2(1+r/R)^2} = \frac{g}{(1+r/R)^2}$$

$$g' = \frac{g}{1.016^2} = 9.49 \text{ m/s}^2$$

g' এর মান মোটেই শূন্য নয় তাহলে সেখানে মহাকাশচারীরা ওজনহীন (চিত্র 3.08) কেন?

মাধ্যাকর্ষণজনিত ত্বরণ g জানা থাকলে আমরা খুব সহজেই যেকোনো ভর m এর জন্য মাধ্যাকর্ষণ বল বের করতে পারব। সেটি হবে

$$F = G\frac{mM}{R^2} = m\frac{GM}{R^2} = mg$$

একটি বস্তুর উপর মাধ্যাকর্ষণজনিত বলটি আসলে বস্তুটির ওজন। কাজেই একটি ভর ব্যবহার করে আমরা অন্য একটি বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করতে পারি। ছবিতে M ভর ঝুলিয়ে রাখার জন্য তার উপর মাধ্যাকর্ষণ বল Mg নিচের দিকে কাজ করছে। সেটি একটি কপিকল এবং সুতো দিয়ে টেবিলের উপর রাখা m ভরটির উপর প্রয়োগ করা হচ্ছে। নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র অনুযায়ী m ভরটির একটি ত্বরণ হবে। অর্থাৎ

$$a = \frac{F}{m} = \frac{Mg}{m}$$

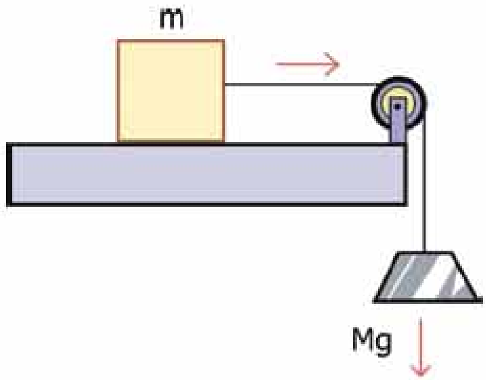

চিত্র 3.09: একটি বস্তুর ওজন অন্য বস্তুর উপরে বল প্রয়োগ করছে।

এই ত্বরণ ব্যবহার করে আমরা টেবিলের উপর রাখা বস্তুটির গতি বিশ্লেষণ করতে পারব।

উদাহরণ

প্রশ্ন: 3.10 চিত্রে দেখানো উপায়ে একটি m ভরের দুই পাশে দুটি কপিকল ব্যবহার করে 10 kg এবং 5 kg ভরের দুটি ওজন ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। m ভরটির উপর কত বল কাজ করছে?

উত্তর: 10 kg এবং 5 kg ভর কোনো বল নয়, এগুলো ভর, কাজেই এগুলোকে প্রথমে g দিয়ে গুণ দিয়ে বলে পরিণত করে নিতে হবে।

$$10\,\text{kg} \times 9.8\,\text{m/s}^2 = 98\,\text{N}$$

$$5\,\text{kg} \times 9.8\,\text{m/s}^2 = 49\,N$$

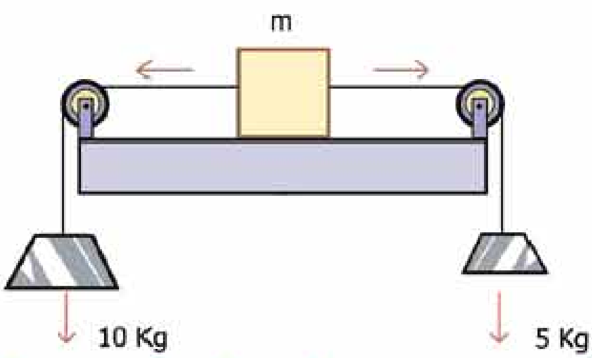

চিত্র 3.10: কপিকল দিয়ে একটি ভরকে দুইপাশ থেকে দুটি ওজনের মাধ্যমে বল প্রয়োগ করা হচ্ছে

কাজেই m ভরটির উপর বাম দিকে 98 N দিয়ে এবং ডান দিকে 49 N দিয়ে টানা হচ্ছে। বলা যায় দুটো যোগ হয়ে বাম দিকে 49 N বল কাজ করছে। (m ভরটির উপর আরেকটি mg বল সোজা নিচের দিকে কাজ করছে, কিন্তু সেটি টেবিলের প্রতিক্রিয়া বল দিয়ে কাটাকাটি হয়ে আছে। সেটি কেমন করে হয় তা একটু পরেই জানতে পারবে।)

নিজে করো

রাবার ব্যান্ডের ব্যালেন্স (Rubber Band Spring Balance)

ছোটখাটো জিনিসের ওজন মাপার জন্য স্প্রিং ব্যালেন্স ব্যবহার করা হয়। তোমাদের সবার কাছে স্প্রিং ব্যালেন্স থাকার সম্ভাবনা কম। কাজেই কাজ চালানোর জন্য তোমরা একটি রাবার ব্যান্ড দিয়ে স্প্রিং ব্যালেন্স তৈরি করে নিতে পারবে। একটা কৌটার প্লাস্টিকের ঢাকনাকে ওজন রাখার প্যান হিসেবে ব্যবহার করতে পারো, চারপাশে চারটি ফুটো করে সুতা দিয়ে

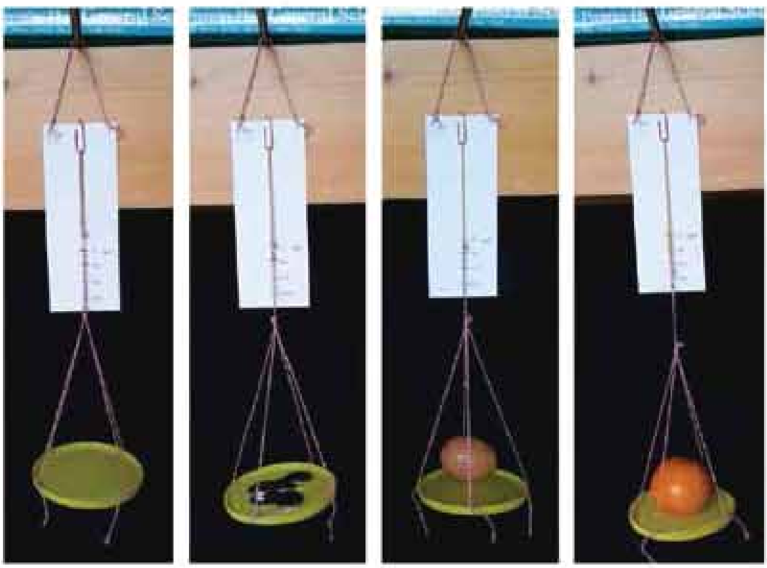

চিত্র 3.11: রাবার ব্যান্ড দিয়ে তৈরি স্প্রিং ব্যালেন্স।

বেঁধে নাও। সেটি রাবার ব্যান্ডের এক পাশ থেকে ঝুলিয়ে নাও। রাবার ব্যান্ডের অন্য পাশটি একটি পেপার ক্লিপ দিয়ে একটা বোর্ডের সাথে লাগিয়ে নাও। বোর্ডটি কোনো জায়গায় ঝুলিয়ে দাও।

তুমি যে সুতা দিয়ে প্যানটি রাবার ব্যান্ডের সাথে ঝুলিয়ে দিয়েছ, সেখানে একটা কালো বিন্দু দিয়ে নাও। প্যানে কোনো ওজন না থাকা অবস্থায় সুতার কালো বিন্দুটি যেখানে থাকবে সেখানে বোর্ডে একটি দাগ দাও, এটি শূন্য ভর। এবারে প্যানে পাঁচটি পাঁচ টাকার কয়েন রাখো, একেকটি কয়েনের ভর 8 gm, কাজেই মোট ভর হবে 40 gm। তখন সুতার কালো বিন্দুটি যেখানে থাকবে সেখানে আরেকটি দাগ দাও, এটি হচ্ছে 40 gm।

এবারে 0 থেকে 40 gm অংশটিতে একটি রেখা টেনে রেখাটি 4 ভাগ করো, প্রতিটি ভাগ হচ্ছে 10 gm করে। এখন রেখাটিকে আরো লম্বা করে আরও বেশি ভর মাপার জন্য কেলিব্রেট করে নাও। তুমি যতো নিখুঁতভাবে মাপতে চাও রেখাটিকে সেভাবে ভাগ করে নাও।

তোমার রাবার ব্যান্ড ব্যালেন্স তৈরি হয়ে গেছে, এখন এটি দিয়ে তুমি তোমার আশে পাশের ছোটখাটো জিনিসপত্রের ভর মেপে দেখতে পারবে। তোমার কাছে সত্যিকারের স্প্রিং ব্যালেন্স থাকলে আরো সূক্ষ্মভাবে ভর এবং সেখান থেকে ওজন বের করতে পারবে।

ক্রমিক সংখ্যা	বস্তুর নাম	ব্যালেন্স থেকে গ্রামে পাওয়া বস্তুর ভর m	কেজিতে বস্তুর ভর M = m/1000 kg	বস্তুর ওজন w = Mg নিউটন

3.8 নিউটনের তৃতীয় সূত্র (Newton's Third Law)

কোনো বল প্রয়োগ না করলে কী হয় সেটি আমরা জানতে পেরেছি নিউটনের প্রথম সূত্র থেকে। বল প্রয়োগ করলে কী হয় সেটা আমরা জেনেছি নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র থেকে। যখন একটি বস্তু অন্য বস্তুর ওপর বল প্রয়োগ করে তখন বস্তু দুটির মাঝে কী ধরনের প্রতিক্রিয়া হয়, সেটি আমরা জানতে পারব নিউটনের তৃতীয় সূত্র থেকে। সূত্রটি এ রকম:

নিউটনের তৃতীয় সূত্র: যখন একটি বস্তু অন্য একটি বস্তুর ওপর বল প্রয়োগ করে তখন সেই বস্তুটিও প্রথম বস্তুটির ওপর বিপরীত দিকে সমান বল প্রয়োগ করে।

পদার্থবিজ্ঞানের বইয়ে সাধারণত যেভাবে নিউটনের তৃতীয় সূত্র লেখা হয়, "প্রত্যেকটি ক্রিয়ার (action) একটা সমান এবং বিপরীত প্রতিক্রিয়া (Reaction) থাকে", আমরা এখানে সেভাবে লিখিনি। আমাদের এতক্ষণে যেহেতু বল সম্পর্কে খানিকটা ধারণা হয়েছে হঠাৎ করে বলকে "ক্রিয়া" কিংবা "প্রতিক্রিয়া" বললে বিভ্রান্তি হতে পারে! তার চেয়ে বড় কথা যারা নতুন পদার্থবিজ্ঞান শেখে তাদের প্রথম প্রশ্নই হয় যে যদি সকল ক্রিয়ার (কোনো একটি বল) একটি বিপরীত প্রতিক্রিয়া

(আরেকটি বল) থাকে তাহলে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া একে অপরকে কাটাকাটি করে শূন্য হয়ে যায় না কেন! এ জন্য তৃতীয় সূত্রটিতে খুব স্পষ্ট করে লিখে দেওয়া দরকার, তৃতীয় সূত্র বলছে যে যদি দুটি বস্তু A এবং B থাকে তাহলে A যখন B বলের ওপর বল প্রয়োগ করে তখন B বল প্রয়োগ করে A এর ওপর। বিপরীত দুটি বল ভিন্ন ভিন্ন বস্তুতে কাজ করে, কখনোই এক বস্তুতে নয়। যদি একই বস্তুতে দুটি বল প্রয়োগ করা হতো শুধু তাহলেই একে অন্যকে কাটাকাটি করতে পারত। এখানে কাটাকাটির কোনো সুযোগ নেই।

কয়েকটা উদাহরণ দিলে বিষয়টা পরিষ্কার হবে। ধরা যাক ওপর থেকে আমরা m ভরের একটা বস্তু (আপেল) উপর থেকে ছেড়ে দিয়েছি (চিত্র 3.12)। আমরা জানি পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ বলের জন্য m ভর পৃথিবীর দিকে একটা বল F অনুভব করবে:

$$F = G\frac{mM}{R^2}$$

আমরা আগেই দেখেছি এই বলটাকে mg হিসেবে লেখা যায়।

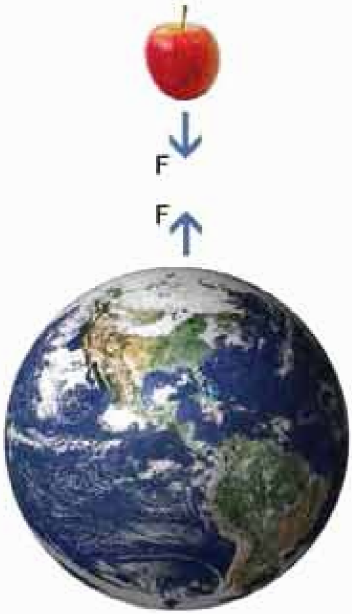

চিত্র 3.12: একটি ভরকে পৃথিবী যেমন আকর্ষণ করে ভরটি পৃথিবীকেও সেভাবে আকর্ষণ করে।

নিউটনের তৃতীয় সূত্র শেখার পর আমরা জানি m ভরটিও বিশাল পুরো পৃথিবীটাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করছে। সেই বলটিও F শুধু বিপরীত দিকে। আমরা এই বলটিকে নিয়ে মাথা ঘামাই না, তার কারণ এই বলটার কারণে পৃথিবীর কতটুকু ত্বরণ a হচ্ছে সেটা ইচ্ছে করলে বের করতে পারি:

$$F = Ma$$

এখানে M হচ্ছে পৃথিবীর ভর এবং a হচ্ছে পৃথিবীর ত্বরণ

কাজেই

$$a = \frac{F}{M} = \frac{mg}{M} = \left(\frac{m}{M}\right)g$$

যদি পৃথিবীর ভর $M = 5.98 \times 10^{24}$ kg হয় তাহলে আমরা যদি 1 kg ভরের একটা বস্তুর উপর থেকে ছেড়ে দিই তার জন্য পৃথিবীর ত্বরণ হবে

$$a = 1.6 \times 10^{-24}\ \text{m/s}^2$$

এটি এত ক্ষুদ্র যে কেউ এটা নিয়ে মাথা ঘামায় না! তুমি যখন পরেরবার কোনো জায়গায় লাফ দেবে তখন মনে রেখো নিচে পড়ার সময় পুরো পৃথিবীকে তুমি আকর্ষণ করে নিজের দিকে টেনে নিয়েছিলে। (যত কমই হোক তুমি সারা পৃথিবীকে নিজের দিকে টেনেছিলে, সেটা নিয়ে একটু গর্ব করতে পারো।)

নিউটনের তৃতীয় সূত্র বোঝার সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে আমরা কীভাবে হাঁটি সেটা বোঝা। আমরা সবাই হাঁটতে পারি এর পেছনে কী পদার্থবিজ্ঞান আছে সেটা না জেনেই সবাই হাঁটে। কিন্তু তোমরা যেহেতু পদার্থবিজ্ঞান শিখতে শুরু করেছ তোমাদের খুব সহজ একটা প্রশ্ন করা যায়। তুমি যেহেতু স্থির অবস্থা থেকে হাঁটতে পারো, কাজেই আসলে তোমার একটি ত্বরণ হচ্ছে, যার অর্থ তোমার উপর বল প্রয়োগ করা হচ্ছে। কিন্তু আমরা সবাই জানি কেউ আমাদের উপর বল প্রয়োগ করে না। আমরা নিজেরাই হাঁটি। কেমন করে সেটা সম্ভব?

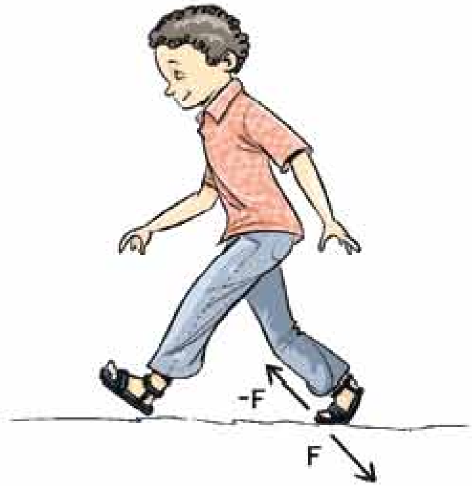

চিত্র 3.13: একজন মানুষ হাঁটার সময় পা দিয়ে যখন মাটিকে ধাক্কা দেয় তখন মাটিও মানুষটিকে পাল্টা ধাক্কা দেয়।

নিউটনের তৃতীয় সূত্র না জানা থাকলে আমরা কখনোই হাঁটার বিষয়টা ব্যাখ্যা করতে পারতাম না। আমরা যখন হাঁটি তখন আমরা পা দিয়ে মাটিতে ধাক্কা দিই (অর্থাৎ বল প্রয়োগ করি) তখন মাটিটা নিউটনের তৃতীয় সূত্র অনুযায়ী আমাদের শরীরে সমান এবং বিপরীত বল প্রয়োগ করে (চিত্র 3.13)। এই সমান এবং বিপরীত বলটা দিয়েই আমাদের ত্বরণ হয়, আমরা হাঁটি!

বিষয়টা যাদের বুঝতে একটু সমস্যা হচ্ছে তাদেরকে মনে করিয়ে দেওয়া যায়, শক্ত মাটিতে হাঁটা সোজা কিন্তু ঝুরঝুরে বালুর উপর হাঁটা সোজা না। তার কারণ বালুর ওপর বল প্রয়োগ করা যায় না, বালু সরে যায়। তাই নিউটনের তৃতীয় সূত্রের পাল্টা বলটাও ঠিকভাবে পাওয়া যায় না। ব্যাপারটা আরো অনেক স্পষ্ট করে দেওয়া যায় যদি কাউকে অসম্ভব মসৃণ একটা মেঝেতে সাবান পানি কিংবা তেল দিয়ে পিচ্ছিল করে হাঁটতে দেওয়া হয়! সেখানে ঘর্ষণ খুব কম, তাই আমরা পেছনে বল প্রয়োগ করতেই পারব না এবং সে জন্য তার প্রতিক্রিয়া হিসেবে আমাদের ওপর কোনো বলও পাব না! তাই হাঁটতেও পারব না (বিশ্বাস না হলে চেষ্টা করে দেখতে পারো)। বল প্রয়োগ করলে বিপরীত এবং সমান বল পাওয়া যায়, যদি প্রয়োগ করতেই না পারি তাহলে তার প্রতিক্রিয়া বল পাব কেমন করে? আর হাঁটব কেমন করে?

২০২৫

উদাহরণ

প্রশ্ন: (a) ধরা যাক তুমি সম্পূর্ণ ঘর্ষণহীন একটা সমতলে দাঁড়িয়ে আছো। তোমার ওজন 50 kg এবং তোমার সামনে একটা 100 kg ভরের পাথর। তুমি ঠিক করলে তুমি পাথরটাকে 50 N বল দিয়ে ধাক্কা দিয়ে এক মাথা থেকে অন্য মাথায় নিয়ে যাবে। 10 s পরে পাথরটার বেগ কত হবে? (চিত্র 3.14)

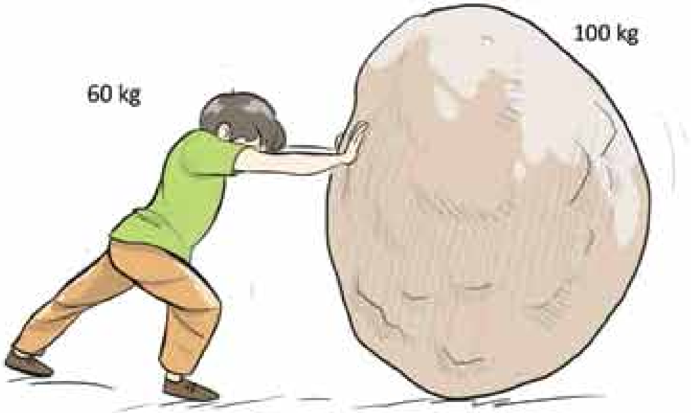

চিত্র 3.14: একজন মানুষ যখন একটা পাথরকে ধাক্কা দেয় তখন পাথরটিও মানুষটিকে পাল্টা ধাক্কা দেয়।

উত্তর: তুমি যখন পাথরটাকে 50 N বল দিয়ে ধাক্কা দেবে পাথরটাও কিন্তু নিউটনের তৃতীয় সূত্র অনুযায়ী তোমাকে 50 N বল দিয়ে ধাক্কা দেবে৷ পাথরটার ত্বরণ হবে ডান দিকে

$$a = \frac{F}{m} = \frac{50}{100}\ \mathrm{m/s^2} = 0.5\ \mathrm{m/s^2}$$

ঠিক সে রকম তোমারও ত্বরণ হবে বাম দিকে

$$a = \frac{F}{m} = \frac{50}{50}\ \mathrm{m/s^2} = 1\ \mathrm{m/s^2}$$

কাজেই তুমি এবং পাথর দুটি দুদিকে সরে যাবে৷ পাথরটাকে ধাক্কা দিয়ে এক মাথা থেকে অন্য মাথায় তুমি নিয়ে যেতে পারবে না৷ কারণ পাথর আর তোমার ভেতর একটা দূরত্ব তৈরি হয়ে যাবে। কাজেই টানা 10s পাথরটাকে ধাক্কা দেওয়া সম্ভব না৷ তবে পাথরটা নড়তে শুরু করার পর ঘর্ষণহীন সমতলে নিজেই সরে অন্য প্রান্তে পৌঁছে যাবে, তুমিও সেরকম উল্টো দিকে পৌঁছাবে, আরো আগে।

প্রশ্ন: ধরা যাক তুমি $2s$ পাথরটাকে ধাক্কা দিতে পেরেছ তখন কী হবে?

উত্তর: 2 s এ পাথরটার বেগ বেড়ে হবে:

$$v = u + at = 0 + 0.5 \times 2\ \text{m/s} = 1\ \text{m/s}$$

এরপর পাথরটা 1 m/s সমবেগে যেতে থাকবে।

2 s এ তোমার বেগ হবে:

$$u + at = 0 + 1 \times 2\ \text{m/s} = 2\ \text{m/s}$$

এরপর তুমি 2 m/s সমবেগে পেছনে সরে যেতে থাকবে।

3.9 ঘর্ষণ বল (Frictional Force)

আমরা এর আগে মহাকর্ষ কিংবা মাধ্যাকর্ষণ বল এবং স্থিতিস্থাপক বল নিয়ে আলোচনা করেছি, এবারে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি বল নিয়ে আলোচনা করব, সেটি হলো ঘর্ষণ বল।

ধরা যাক, একটা টেবিলে কোনো একটা কাঠের টুকরো রয়েছে এবং সেই কাঠের টুকরোর ওপর বল প্রয়োগ করে সেখানে ত্বরণ সৃষ্টি করতে চাচ্ছি। ধরা যাক, 3.15 চিত্রে যেভাবে দেখানো হয়েছে সেভাবে ভরটির ওপর বাম থেকে ডানে F বল প্রয়োগ করছি, দেখা যাবে কাঠের টুকরোয় টেবিলের সাথে কাঠের টুকরোর ঘর্ষণের কারণে একটা ঘর্ষণ বল f তৈরি হয়েছে এবং সেটি ডান থেকে বাম দিকে কাজ করে প্রয়োগ করা বলটিকে কমিয়ে দিচ্ছে।

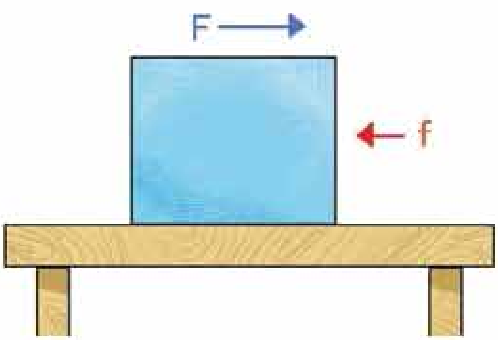

চিত্র 3.15: একটি ভরের উপর বল প্রয়োগ করলে ঘর্ষণের জন্যে বিপরীত দিকে একটি বল তৈরি হতে পারে।

এখন তুমি যদি মনে করো ঘর্ষণের ফলে ডান থেকে বাম দিকে একটা ঘর্ষণ বল তৈরি হয় কাজেই কাঠের টুকরোর ওপরেও যদি বাম দিকে বল প্রয়োগ করি তাহলে প্রয়োগ করা বল আর ঘর্ষণ বল একই দিকে হওয়ার কারণে বাড়তি একটা বল পেয়ে যাব! কিন্তু দেখা যাবে এবারেও ঠিক বিপরীত

দিকে ঘর্ষণ বল কাজ করছে। ঘর্ষণ বল সব সময়েই প্রয়োগ করা বলের বিপরীত দিকে কাজ করে। কাঠের টুকরোর ওপরে যদি খানিকটা ওজন বসিয়ে দিই দেখা যাবে ঘর্ষণ বল আরো বেড়ে গেছে, যদিও ওজন এবং ঘর্ষণ বল পরস্পরের ওপর লম্ব!

ঘর্ষণ বল কীভাবে তৈরি হয় ব্যাপারটা বুঝতে পারলেই আমরা দেখব এতে অবাক হবার কিছু নেই। যদিও আপাতদৃষ্টিতে কাঠ, টেবিলকে (কিংবা যে দুটো তলদেশের মাঝে ঘর্ষণ হচ্ছে) অনেক মসৃণ মনে হয় কিন্তু অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখলে দেখা যাবে (চিত্র 3.16) সব তলদেশেই এবড়োথেবড়ো এবং এই এবড়োথেবড়ো অংশগুলো একে অন্যকে স্পর্শ করে বা খাঁজগুলো একে অন্যের সাথে আটকে যায়, সেটার কারণেই গতি বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং আমরা বলি বিপরীত দিক থেকে ঘর্ষণ বলের জন্ম হয়েছে। যদি দুটো তলদেশকে আরো চাপ দেওয়া হয় তাহলে এবড়োথেবড়ো অংশ আরো বেশি একে অন্যকে স্পর্শ করবে, একটির খাঁজ অন্যটির আরো গভীর খাঁজে ঢুকে যাবে এবং ঘর্ষণ বল আরো বেড়ে যাবে।

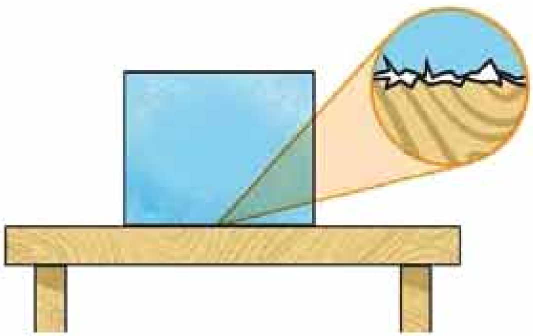

চিত্র 3.16: ঘর্ষণ প্রকৃতপক্ষে দুটো এবড়োথেবড়ো পৃষ্ঠের কারণে তৈরি হয়।

ঘর্ষণের জন্য তাপ সৃষ্টি হয়। সেটা অনেক সময়েই সমস্যা। যেমন গাড়ির সিলিন্ডারে পিস্টনকে ওঠানামা করার সময়ে সেখানে ঘর্ষণের জন্য তাপের সৃষ্টি হয় আর সেই তাপ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য গাড়ির ইঞ্জিনকে শীতল রাখতে হয়। তাই সেখানে ঘর্ষণ কমানোর জন্য নানা ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

3.9.1 ঘর্ষণের প্রকারভেদ

ঘর্ষণকে চারভাবে ভাগ করা যায়। স্থিতি ঘর্ষণ, গতি ঘর্ষণ, আবর্ত ঘর্ষণ এবং প্রবাহী ঘর্ষণ:

স্থিতি ঘর্ষণ (Static Friction):
দুটো বস্তু একে অন্যের সাপেক্ষে স্থির থাকা অবস্থায় যে ঘর্ষণ বল থাকে সেটা হচ্ছে স্থিতি ঘর্ষণ। স্থিতি ঘর্ষণের জন্য আমরা হাঁটতে পারি, আমাদের পা কিংবা জুতোর তলা মাটিতে স্থিতি ঘর্ষণের কারণে আটকে থাকে এবং পিছলে পড়ে যাই না!

গতি ঘর্ষণ (Sliding Friction):
একটি বস্তুর সাপেক্ষে অন্য বস্তু যখন চলমান হয় তখন যে ঘর্ষণ বল তৈরি হয় সেটি হচ্ছে গতি ঘর্ষণ। সাইকেলের ব্রেক চেপে ধরলে সেটি সাইকেলের চাকাকে চেপে ধরে এবং ঘুরন্ত চাকাকে গতি

ঘর্ষণের কারণে থামিয়ে দেয়। গতি ঘর্ষণ ওজনের উপর নির্ভর করে, ওজন যত বেশি হবে গতি ঘর্ষণ তত বেশি হবে। যদি কোনো কিছুর ভর M হয় তাহলে তার ওজন একটি বল, যার পরিমাণ $W = Mg$। তাহলে গতি ঘর্ষণ f কে লিখতে পারি $f = \mu W$ এখানে μ গতি ঘর্ষণ সহগ।

আবর্ত ঘর্ষণ (Rolling Friction):

একটি তলের উপর যখন অন্য একটি বস্তু গড়িয়ে বা ঘুরতে ঘুরতে চলে তখন সেটাকে বলে আবর্ত ঘর্ষণ। সবগুলো ঘর্ষণ বলের মধ্যে এটা সবচেয়ে ছোট তাই আমরা সব সময়ই সকল রকম যানবাহনের মাঝে চাকা লাগিয়ে নিই। চাকা লাগানো স্যুটকেস খুব সহজে টেনে নেওয়া যায়, যদি এর চাকা না থাকত তাহলে মেঝের উপর টেনে নিতে আমাদের অনেক বেগ পেতে হতো।

প্রবাহী ঘর্ষণ (Fluid Friction):

যখন কোনো বস্তু তরল বা বায়বীয় পদার্থ (Fluid) এর ভেতর দিয়ে যায় তখন সেটি যে ঘর্ষণ বল অনুভব করে সেটি হচ্ছে প্রবাহী ঘর্ষণ। প্যারাস্যুট নিয়ে যখন কেউ প্লেন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে তখন বাতাসের প্রবাহী ঘর্ষণের কারণে ধীরে ধীরে নিচে নেমে আসতে পারে (চিত্র 3.17)।

চিত্র 3.17: প্যারাস্যুট ব্যবহার করে এপোলো 15 সমুদ্রে অবতরণ করছে।

নিজে করো

একটা কাগজ উপর থেকে ছেড়ে দাও, নিচে পড়তে কতটুকু সময় লেগেছে অনুমান করো। এবারে কাগজটি দলামোচা করে ছোট একটা বলের মতো করে ছেড়ে দাও। এবারে নিচে পড়তে কত সময় লেগেছে? কেন?

নিজে করো

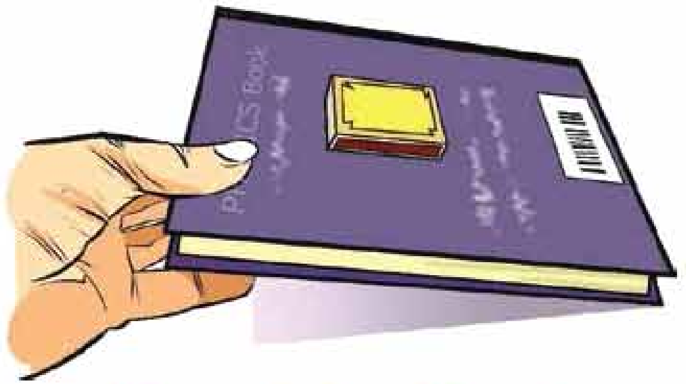

চিত্র 3.18: গতি ঘর্ষণ সহগ পরিমাপ করা।

স্থিতি ঘর্ষণ এবং গতি ঘর্ষণ: কয়েকটা ম্যাচের খালি বাক্স নিয়ে সেগুলোর ভেতরে মাটি ভরে বাক্সগুলো খানিকটা ভারী করে নাও। এবারে একটা বইয়ের উপর একটা ম্যাচ বাক্স রেখে বইটা ঢালু করতে থাকো (চিত্র 3.18)। স্থিতি ঘর্ষণের কারণে প্রথমে ম্যাচটি গড়িয়ে যাবে না। যখন বইটা ঢালু হতে থাকে তখন ঢালের দিকে একটা বল কাজ করতে থাকে, এই বলটা যে মুহূর্তে গতি ঘর্ষণের সমান হবে তখন ম্যাচ বাক্সটা গড়িয়ে পড়তে শুরু করবে। তুমি দেখবে একটা নির্দিষ্ট কোণে গেলেই শুধু ম্যাচ বাক্সটি নড়তে শুরু করবে। একটা ম্যাচ বাক্সের ওপর আরো একটি বা কয়েকটি ম্যাচ বাক্স রেখে পরীক্ষাটি আবার করো, দেখবে প্রতিবারই একটা নির্দিষ্ট কোণে গেলেই ম্যাচ বাক্সটি নড়তে শুরু করবে। একাধিক ম্যাচ বাক্স রেখে তুমি বেশি বল প্রয়োগ করে ঘর্ষণ বাড়িয়ে দিচ্ছ সত্যি, কিন্তু ঢালু করার সময় একই মাত্রায় ঢালের দিকে বলটিও বেড়ে যাচ্ছে। কাজেই ঢালের কোণটির মানের পরিবর্তন হচ্ছে না। তুমি ইচ্ছে করলে দেখাতে পারবে যে যদি θ কোণে ম্যাচ বাক্সগুলো গড়িয়ে যেতে শুরু করে তাহলে গতি ঘর্ষণ সহগ μ এর মান হবে $tan\theta$।

3.9.2 গতির উপর ঘর্ষণের প্রভাব

আমরা আগেই বলেছি ঘর্ষণ বল সব সময়ই প্রয়োগ করা বলের বিপরীত দিকে কাজ করে। সেজন্য স্বাভাবিকভাবেই ঘর্ষণ বল গতিকে কমিয়ে দেয় এবং আমাদের ধারণা হতে পারে আমরা সর্বক্ষেত্রে

বুঝি ঘর্ষণ কমানোর চেষ্টা করি। কিন্তু সেটি সত্যি নয়। তোমরা নিশ্চয়ই কখনো না কখনো কাদার মাঝে কোনো গাড়ি বা ট্রাককে আটকে যেতে দেখেছ। তখন গাড়ির চাকা ঘুরলেও ঘর্ষণ কম বলে কাদা থেকে গাড়ি বা ট্রাক উঠে আসতে পারে না। চাকা পিছলিয়ে যায়। তখন গাড়ি বা ট্রাকটিকে তুলে আনার জন্য অন্যভাবে চাকা এবং কাদার মধ্যে ঘর্ষণ বাড়ানোর চেষ্টা করা হয়।

টায়ারের পৃষ্ঠ: গাড়ির টায়ার এবং রাস্তার মাঝে ঘর্ষণ থাকে বলে রাস্তার উপর দিয়ে গাড়ি যেতে পারে, যদি এই ঘর্ষণ না থাকত তাহলে গাড়ির চাকা পিছলে যেত এবং গাড়ি সামনে যেতে পারত না। এই ঘর্ষণ বাড়ানোর জন্য গাড়ির টায়ারে অনেক ধরনের খাঁজ কাটা হয় (চিত্র 3.19)। যারা গাড়ি চালায় তার সব সময় লক্ষ রাখে তাদের গাড়ির চাকার খাঁজ কমে মসৃণ হয়ে যাচ্ছে কি না। যদি মসৃণ হয়ে যায় তাহলে ব্রেক করার পরও গাড়ি না থেমে পিছলে এগিয়ে যাবে!

রাস্তার মসৃণতা: গাড়ির টায়ারের সাথে রাস্তার ঘর্ষণ বাড়ানোর জন্য রাস্তাগুলো বিশেষভাবে তৈরি করা হয়। রাস্তা যদি ঠিক না থাকে তাহলে সেখানে গাড়ির চাকা পিছলিয়ে (Skid) যেতে পারে। শীতের দেশে তুষারপাতের পর রাস্তায় বরফ জমে গেলে রাস্তা অসম্ভব পিচ্ছিল হয়ে যেতে পারে এবং দুর্ঘটনার পরিমাণ দশ গুণ থেকে বেশি হয়ে যায়। আমাদের দেশে রাস্তায় পানি জমে কিংবা ছোট নুড়িপাথর বা কাঁকড়ের কারণে রাস্তার ঘর্ষণ কমে যেতে পারে। তোমরা সবাই পিচঢালা পথ দেখেছ, এই পিচঢালার কারণে টায়ারের সাথে রাস্তার ঘর্ষণ বেড়ে যায়। একই সাথে বৃষ্টির পানি চুইয়ে রাস্তার ভেতরে যেতে পারে না বলে রাস্তা বেশি দিন ব্যবহার করা যায়।

চিত্র 3.19: ঘর্ষণ বাড়ানোর জন্য টায়ারে অনেক ধরনের খাঁজ কাটা হয়

গতি নিয়ন্ত্রণ এবং ব্রেকিং বল: যানবাহন চালানোর সময় প্রয়োজন অনুসারে গাড়ির গতি বাড়াতে এবং কমাতে হয়। গাড়ির গতি যখন কম থাকে তখন সেটি নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হয়, তাই তোমরা সব সময়ই দেখে থাকবে রাস্তায় বাঁক নেওয়ার সময় বা অন্য গাড়িকে পাশ কাটিয়ে যাবার সময় ব্রেক করে গাড়ির গতি কমানো হয়।

গাড়ির ব্রেক প্যাডেলে চাপ দিলে সেই চাপটি চাকার সাথে লাগানো "সু" বা প্যাডে স্থানান্তরিত হয় এবং সেটি গাড়ির চাকার ভেতরকার চাকতিটিতে চাপ দেয়। এই চাপের কারণে প্যাড এবং চাকতিতে ঘর্ষণ হয় এবং এই ঘর্ষণ বল গাড়ির চাকাকে থামিয়ে দেয়।

3.9.3 ঘর্ষণ কমানো-বাড়ানো

আমরা এর মাঝে জেনে গেছি যে আমাদের প্রয়োজনে ঘর্ষণকে কখনো বাড়াতে হয় এবং কখনো কমাতে হয়।

ঘর্ষণ কমানো

ঘর্ষণ কমানোর জন্য আমরা যেসব কাজ করি সেগুলো হচ্ছে:

চিত্র 3.20: বল বিয়ারিং ব্যবহার করে ঘর্ষণ অনেক কমানো সম্ভব।

1. যে পৃষ্ঠটিতে ঘর্ষণ হয় সেই পৃষ্ঠটিকে যত সম্ভব মসৃণ করা। মসৃণ পৃষ্ঠে গতি ঘর্ষণ কম।
2. তেল মবিল বা গ্রিজ জাতীয় পদার্থ হচ্ছে পিচ্ছিলকারী পদার্থ বা লুব্রিকেন্ট। দুটি তলের মাঝখানে এই লুব্রিকেন্ট থাকলে ঘর্ষণ অনেকখানি কমে যায়।
3. চাকা ব্যবহার করে ঘর্ষণ কমানো যায়। চাকা ব্যবহার করা হলে বড় গতি ঘর্ষণের পরিবর্তে অনেক ছোট আবর্ত ঘর্ষণ দিয়ে কাজ করা যায়। ঘুরন্ত চাকাতে বল বিয়ারিং ব্যবহার করে (চিত্র 3.20) সরাসরি ঘর্ষণের বদলে ছোট স্টিলের বলগুলোর আবর্তন ঘর্ষণের সাহায্যে ঘর্ষণ অনেক কমানো সম্ভব।
4. গাড়ি, বিমান এ ধরনের দ্রুতগামী যানবাহনের ডিজাইন এমনভাবে করা হয় যেন বাতাস ঘর্ষণ তৈরি না করে স্ট্রিম লাইন করা পৃষ্ঠদেশের উপর দিয়ে যেতে পারে।
5. যে দুটি পৃষ্ঠদেশে ঘর্ষণ হয় তারা যদি খুব অল্প জায়গায় একে অন্যকে স্পর্শ করে তাহলে ঘর্ষণ কমানো যায়।
6. আমরা দেখেছি ঘর্ষণরত দুটো পৃষ্ঠে বল প্রয়োগ করা হলে ঘর্ষণ বেড়ে যায়, কাজেই লম্বভাবে আরোপিত বল কমানো হলে ঘর্ষণ কমানো যায়।

ঘর্ষণ বাড়ানো

ঘর্ষণ কমানোর জন্য যে প্রক্রিয়াগুলো করা হয় সেগুলো করা না হলে কিংবা তার বিপরীত কাজগুলো করা হলেই ঘর্ষণ বেড়ে যায়। তাই ঘর্ষণ বাড়ানোর জন্য আমরা যেসব কাজ করি সেগুলো হচ্ছে:

1. যে দুটো তলে ঘর্ষণ হচ্ছে সেগুলো অমসৃণ বা খসখসে করে তোলা।
2. যে দুটো তলে ঘর্ষণ হয় সেগুলো আরো জোরে চেপে ধরার ব্যবস্থা করা।
3. ঘর্ষণরত তল দুটোর মাঝে গতিকে থামিয়ে স্থির করে ফেলা, কারণ স্থির ঘর্ষণ গতি ঘর্ষণ থেকে বেশি।

4. ঘর্ষণরত তলের মাঝে খাঁজ কাটা, বা ঢেউ খেলানো করা। তাহলে এটি তলদেশকে জোরে আঁকড়ে ধরতে পারে। পানি বা তরল থাকলে সেটি খাঁজে ঢুকে গিয়ে পৃষ্ঠদেশের ঘর্ষণ বাড়াতে পারে।
5. বাতাস বা তরলের ঘনত্ব বাড়ানো।
6. বাতাস বা তরলে ঘর্ষণরত পৃষ্ঠদেশ বাড়িয়ে দেওয়া
7. চাকা বা বল বিয়ারিং সরিয়ে দেওয়া।

3.9.4 ঘর্ষণ: একটি প্রয়োজনীয় উপদ্রব

আমরা সবাই নিশ্চয়ই লক্ষ করেছি যে ঘর্ষণের কারণে তাপশক্তি তৈরি হয়। শীতের দিনে আমরা হাত ঘষে হাত উত্তপ্ত করি। গাড়ির ইঞ্জিন যে গরম হয়ে উঠে সেটিও ঘটে ঘর্ষণের কারণে। কাজেই ঘর্ষণের কারণে অপ্রয়োজনীয় তাপ সৃষ্টি করে শক্তির অপচয় হয়। গাড়ি, প্লেন, জাহাজ, সাবমেরিনকে ঘর্ষণ বলকে পরাস্ত করে এগিয়ে যেতে হয়, সেখানেও অতিরিক্ত জ্বালানি খরচ করতে হয়। এভাবে দেখা হলে মনে হতে পারে ঘর্ষণ বুঝি আমাদের জীবনের একটি উপদ্রব ছাড়া আর কিছু নয়।

আবার আমরা এর মাঝে দেখেছি ঘর্ষণ আছে বলেই আমরা হাঁটতে পারি, রাস্তায় গাড়ি চলতে পারে, কাগজে পেনসিল কলম দিয়ে লিখতে পারি, দালান গড়ে তুলতে পারি, প্যারাস্যুট দিয়ে নিরাপদে নিচে নামতে পারি। আমরা এ ধরনের অসংখ্য উদাহরণ দিতে পারি যেখানে ঘর্ষণ না থাকলে আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় কাজগুলো করতে পারতাম না।

কাজেই ঘর্ষণকে উপদ্রব মনে করা হলেও আমাদের মেনে নিতে হবে এটি আমাদের জীবনের জন্য খুবই প্রয়োজনীয় একটি উপদ্রব।

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন

1. চলন্ত ট্রেন থেকে নামার চেষ্টা করলে তুমি কেন সামনের দিকে আছাড় খেয়ে পড়?
2. চিত্র 3.21 এ দেখানো সুতায় হ্যাঁচকা টান দিলে A সুতাটি ছিঁড়বে, ধীরে ধীরে টান দিলে B সুতাটি ছিঁড়বে। কেন?

3. বেশি ভরের বস্তুর ওজন বেশি বা বল বেশি তাই উপর থেকে ছেড়ে দিলে তার ত্বরণ বেশি হবে, কথাটি কি সত্যি?
4. তুমি একটি লিফটের ভেতর ওজন মাপার যন্ত্রের ওপর দাঁড়িয়ে আছো। লিফটের ক্যাবল ছিঁড়ে গেল। তোমার ওজন কত দেখাবে?
5. পুরোপুরি ঘর্ষণহীন একটা পৃষ্ঠে একটা পাথরকে দড়ি দিয়ে বেঁধে টেনে নিজের দিকে আনার চেষ্টা করলে কী হবে?

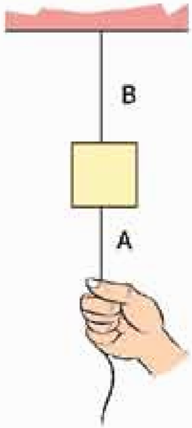

চিত্র 3.21: একটি ভরের সাথে লাগানো দুটি সুতা।

6. জড়তা কাকে বলে? জড়তা কয় প্রকার?
7. বল কাকে বলে?
8. কোনো স্থির বস্তুর জড়তা কী দ্বারা পরিমাপ করা হয়?
9. সাম্য বল ও অসাম্য বল বলতে কী বোঝ?
10. কোনো বস্তুর ভরবেগ কাকে বলে?
11. দেখাও যে, বল = ভর × ত্বরণ।
12. ভরবেগের সংরক্ষণ নীতি বলতে কী বোঝ?
13. ঘর্ষণ কাকে বলে? বিভিন্ন প্রকার ঘর্ষণের নাম লেখ।
14. ঘর্ষণ একটি প্রয়োজনীয় উপদ্রব—এর স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

গাণিতিক প্রশ্ন

1. চিত্র 3.22 এ দেখানো 1 kg ভরের একটি বেগ-সময় লেখচিত্র বা গ্রাফ দেখানো হয়েছে। বল-সময় লেখচিত্রটি আঁক।
2. স্থির অবস্থায় থাকা 5 kg ভরের একটা বস্তুর ওপর 10 N বল 2 s কাজ করেছে। তার 5 s পরে 20 N একটি বল 3 s কাজ করেছে। বস্তুটি কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করেছে?

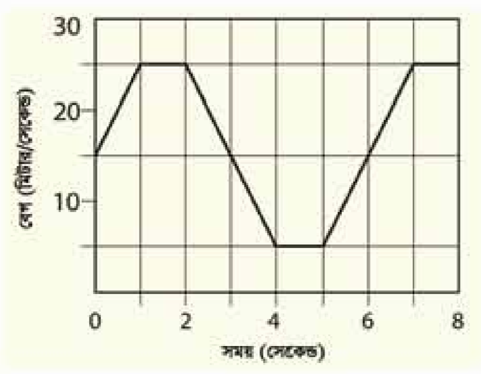

চিত্র 3.22: বেগ-সময় লেখচিত্র

3. স্থির অবস্থায় থাকা 10 kg ভরের একটা বস্তুর ওপর 10 N বল কাজ করেছে তার 10 s পরে 20 N বল বিপরীত দিকে 5 s কাজ করেছে। বস্তুটি কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করেছে?

4. একটি নৌকা থেকে তুমি 10 m/s বেগে তীরে লাফ দিয়েছ। তোমার ভর 50 kg, নৌকার ভর 100 kg হলে নৌকাটি কোন দিকে কত বেগে যাবে?

5. মেঝেতে রাখা একটি কাঠের টুকরোর ঘর্ষণ সহগ μ এর মান 0.01, কাঠের ভর 10 kg হলে সেটাকে নাড়াতে কত বল প্রয়োগ করতে হবে? কাঠের উপর 100 kg ভরের একটি পাথর রাখা হলে কত বল প্রয়োগ করে নাড়ানো সম্ভব? মেঝে ঘর্ষণহীন হলে কী হতো?

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও

1. বস্তু যে অবস্থায় আছে চিরকাল সে অবস্থায় থাকতে চাওয়ার যে প্রবণতা বা ধর্ম তাকে কী বলে?
   (ক) বল (খ) ত্বরণ
   (গ) জড়তা (ঘ) বেগ

2. বলের মাত্রা কোনটি?
   (ক) MLT^{-2} (খ) MLT^{-1}
   (গ) $ML^{-2}T^{2}$ (ঘ) $M^{-1}LT^{-2}$

3. ভরবেগের একক কোনটি?
   (ক) kg m (খ) kg m s^{-1}
   (গ) kg $m^2 s^{-1}$ (ঘ) kg m s^{-2}

4. 5 kg ভরের একটি বস্তুর ওপর 50 N বল প্রয়োগ করা হলে, এর ত্বরণ হবে–
   (ক) 12 ms^{-2} (খ) 8 ms^{-2}
   (গ) 13 ms^{-2} (ঘ) 10 ms^{-2}

5. 10 kg ভরের কোনো বস্তু 10 ms^{-1} বেগে গতিশীল হলে এর ভরবেগ হবে:
   (ক) 10 kg ms^{-1} (খ) 120 kg ms^{-1}
   (গ) 100 kg ms^{-1} (ঘ) 1 kg ms^{-1}

২০২৩

সৃজনশীল প্রশ্ন

1. কারুক 10 kg ভরের একটি বাক্স একটি মেঝের উপর দিয়ে সমবলে টেনে নিল। বাক্স ও মেঝের মধ্যকার ঘর্ষণ বলের মান হলো 1.5 N। বক্সটিকে টেনে নেয়ায় এর ত্বরণ হলো $0.8\ ms^{-2}$। এরপর বক্সটিকে ঘর্ষণবিহীন মেঝেতে একই বল প্রয়োগ করে টানা হলো।

   (ক) সাম্য বল কাকে বলে?

   (খ) ঘর্ষণ বল কেন উৎপন্ন হয়?

   (গ) প্রথম ক্ষেত্রে বাক্সটির উপর প্রযুক্ত বলের মান নির্ণয় কর।

   (ঘ) ঘর্ষণযুক্ত ও ঘর্ষণবিহীন মেঝেতে ত্বরণের কীরূপ পরিবর্তন হবে? গাণিতিকভাবে ব্যাখ্যা করো।

2. সরলরৈখিক পথে গতিশীল 5 kg ভরের একটি বস্তু 5 m/s বেগে অপর আরেকটি বস্তুকে আঘাত করে দ্বিতীয় বস্তুটির ভরবেগ 4 kg m/s পরিমাণ পরিবর্তন করে। এই সংঘর্ষের পর উভয় বস্তুর ভর অপরিবর্তিত থাকে।

   (ক) পদার্থের কোন ধর্ম জড়তার পরিমাপক?

   (খ) প্রযুক্ত বল ভরবেগের পরিবর্তনের সমানুপাতিক বলতে কী বোঝ?

   (গ) প্রথম বস্তুর শেষ বেগ কত হবে?

   (ঘ) যখন ভরবেগের কোনো পরিবর্তন হয় না তখন গাণিতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে দ্বিতীয় বস্তুটি সম্পর্কে মন্তব্য করো।

চতুর্থ অধ্যায়

কাজ, ক্ষমতা ও শক্তি

(Work, Power and Energy)

প্রস্তাবিত রূপপুর নিউক্লিয়ার শক্তি কেন্দ্র।

এই অধ্যায়ে আমরা দেখব একটি বল কীভাবে "কাজ" করে। পদার্থবিজ্ঞানের ভাষায় এই "কাজ" শব্দটির একটি সুনির্দিষ্ট অর্থ আছে। আমরা দেখব কোনো কিছুর উপর একটি বল কাজ করে সেটাকে গতিশীল করে গতিশক্তির জন্ম দিতে পারে। এই গতিশক্তি স্থিতিশক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে এবং শক্তির এই রূপান্তর খুবই স্বাভাবিক একটি প্রক্রিয়া এবং নানা ধরনের শক্তি একে অন্যটিতে রূপান্তরিত হতে পারে। বিজ্ঞানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে শক্তি এবং এই শক্তি মানবসভ্যতার বিকাশে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই কীভাবে প্রকৃতি থেকে এই শক্তি আহরণ করা যায় সেটি নিয়েও আলোচনা করা হবে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- কাজ ও শক্তির সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারব।
- কাজ, বল ও সরণের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারব।
- গতিশক্তি ও বিভব শক্তি ব্যাখ্যা করতে পারব।
- উৎসে শক্তির রূপান্তর ব্যাখ্যা করতে পারব।
- অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাব বিবেচনায় শক্তির প্রধান উৎসসমূহের অবদান বিশ্লেষণ করতে পারব।
- শক্তির রূপান্তর এবং শক্তির নিত্যতার মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারব।
- শক্তির রূপান্তর ও এর ব্যবহার পরিবেশের ভারসাম্য ব্যাহত করে ব্যাখ্যা করতে পারব।
- উন্নয়ন কার্যক্রমে শক্তির কার্যকর ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে পারব।
- শক্তির কার্যকর ও নিরাপদ ব্যবহারে সচেতন হব।
- ভর-শক্তির সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ক্ষমতা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- কর্মদক্ষতা পরিমাপ করতে পারব।

4.1 কাজ (Work)

আমরা দৈনন্দিন জীবনে কাজ শব্দটা অনেকভাবে ব্যবহার করি। একজন দারোয়ান গেটের সামনে একটি টুলে বসে সারাদিন বাসা পাহারা দিয়ে দাবি করতে পারেন তিনি অনেক কাজ করেছেন কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানের ভাষায় সেটি কোনো কাজ নয়। পদার্থবিজ্ঞানের ভাষায় কাজ কথাটার সুনির্দিষ্ট অর্থ আছে। কোনো বস্তুর উপর যদি F বল প্রয়োগ করা হয় এবং বল প্রয়োগ করার সময়টুকুতে যদি বস্তুটি বলের দিকে s দূরত্ব অতিক্রম করে (অর্থাৎ সরণ হয়) তাহলে ঐ বল দিয়ে করা কাজের পরিমাণ W হচ্ছে:

$$W = Fs$$

কাজের একক J (জুল)
কাজের মাত্রা $[W] = ML^2T^{-2}$

বল ভেক্টর এবং অতিক্রান্ত দূরত্ব বা সরণ ভেক্টর কিন্তু কাজের বেলায় এই দুটো ভেক্টরের গুণফল স্কেলার। আলাদা ভেক্টর হিসেবে বল এবং অতিক্রান্ত দূরত্বের দিক একই দিকে হতে হবে এমন কোনো কথা নেই কিন্তু তোমাদের এই বইয়ে আমরা শুধু একই দিকে প্রয়োগ করা বল এবং অতিক্রান্ত দূরত্বের বিষয়টি আলোচনা করব।

তোমরা কি লক্ষ করেছ কাজ করার কথা বলার সময় আমরা বলেছি "বল"টি কাজ করেছে। একজন মানুষ বা একটি যন্ত্র হয়তো বল প্রয়োগ করে কোনো বস্তুকে ঠেলে খানিকটা দূরত্বে নিয়ে যায়। দৈনন্দিন জীবনের ভাষায় আমরা বলি মানুষটি বা যন্ত্রটি কাজ করেছে। পদার্থবিজ্ঞানের ভাষায় সব সময়েই কিন্তু মানুষ বা যন্ত্র নয় প্রয়োগ করা বলটি কাজ করে। এই বলটি হয়তো একটি মানুষ বা যন্ত্র প্রয়োগ করেছে।

ধরা যাক তুমি F বল প্রয়োগ করে একটা বস্তুকে s দূরত্বে ঠেলে নিয়ে বস্তুটিকে গতিশীল করে ছেড়ে দিয়েছ, বস্তুটি তখন আরো d দূরত্ব অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত থেমে গিয়েছে। কতটুকু কাজ হয়েছে?

কাজের পরিমাণ $W = Fs$, পরের d দূরত্ব অতিক্রম করার সময় কোনো বল প্রয়োগ করা হয়নি বলে তখন কোনো কাজ হয়নি।

২০২২

উদাহরণ

প্রশ্ন: তোমার ভর 50 kg তুমি 10 তলা বিল্ডিংয়ের উপরে উঠেছ, তুমি কত কাজ করেছ? (প্রতি তলার উচ্চতা 3 m)

উত্তর: তোমার ভর 50 kg হলে ওজন $50 \times 9.8 = 490$ N এই ওজন একটা বল, সেটা নিচের দিকে কাজ করছে। তুমি যদি উপরে উঠতে চাও তাহলে তোমাকে এই বলের সমান একটা বল উপরের দিকে প্রয়োগ করে নিজেকে উপরে তুলতে হবে।

কাজেই উপরের দিকে তোমার প্রয়োগ করা বল 490 N
উপরে দিকে অতিক্রান্ত দূরত্ব: 10×3 m $= 30$ m
কাজেই সেই কাজের পরিমাণ 490 N $\times$ 30 m $= 14700$ J $= 14.7$ kJ

ধরা যাক গতিশীল একটা বস্তু তোমার দিকে এগিয়ে আসছে, তুমি F বল প্রয়োগ করে বস্তুটিকে থামানোর চেষ্টা করলে, বস্তুটি তোমাকে ঠেলে s দূরত্ব পেছনে নিয়ে গেল। তোমার প্রয়োগ করা বল কতটুকু কাজ করেছে? নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ এবারে অতিক্রান্ত দূরত্ব বলের দিকে নয়, বলের বিপরীত দিকে, কাজেই কাজের পরিমাণ

$$W = F(-s) = -Fs$$

অর্থাৎ কাজটি ঋণাত্মক বা নেগেটিভ। দৈনন্দিন কথাবার্তায় আমরা কাজ এবং অকাজ বলে থাকি কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানের ভাষায় পজিটিভ এবং নেগেটিভ কাজের অর্থ কী? কাজটি ধনাত্মক বা পজিটিভ হলে বলা হয় বলটি কাজ করেছে। যদি ঋণাত্মক হয় তাহলে বলা হয় বলটির "উপর" কাজ করা হয়েছে বা বলের বিরুদ্ধে কাজ হয়েছে। সেটি বোঝার আগে আমাদের শক্তি সম্পর্কে পরিষ্কার একটা ধারণা থাকতে হবে।

4.2 শক্তি (Energy)

আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও আমরা শক্তি শব্দটা অনেকভাবে ব্যবহার করি কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানের ভাষাতে শক্তি শব্দটার একটা নির্দিষ্ট অর্থ আছে। সাধারণ মুখের ভাষায় বল প্রয়োগ করা আর শক্তি প্রয়োগ করার মাঝে কোনো পার্থক্য নেই, কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানের ভাষায় এই দুটি বাক্যাংশ সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয় বোঝায়। বল বলতে কী বোঝায় সেটা আমরা আগের অধ্যায়ে পড়ে এসেছি, এই অধ্যায়ে শক্তি বলতে কী বোঝায় সেটা নিয়ে আলোচনা করা হবে।

শক্তি বলতে কী বোঝায় আমাদের সবার মাঝে তার একটা ভাসাভাসা ধারণা আছে, কারণ আমরা কথাবার্তায় বিদ্যুৎ শক্তি, তাপ শক্তির কথা বলে থাকি। মাঝে মাঝে আমরা রাসায়নিক শক্তি বা নিউক্লিয়ার শক্তির কথাও শুনে থাকি। আলোকে শক্তি হিসেবে সেভাবে বলা না হলেও আমরা অনুমান করতে পারি আলোও হচ্ছে এক ধরনের শক্তি। দৈনন্দিন কথাবার্তায় যে শক্তিটার কথা খুব বেশি বলা হয় না, কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানে অসংখ্যবার যে শক্তির কথা বলা হবে সেটা হচ্ছে গতিশক্তি। কাজেই আমাদের ধারণা হতে পারে প্রকৃতিতে বুঝি অনেক ধরনের শক্তি আছে, কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে সব শক্তিই কিন্তু এক এবং আমরা শুধু এক ধরনের শক্তিকে অন্য ধরনের শক্তিতে রূপান্তর করি। তাহলে শক্তিটা কী?

শক্তি হচ্ছে কাজ করার সামর্থ্য। শুধু তা-ই না, যখন কোনো বস্তুর ওপর কোনো বল প্রয়োগ করে ধনাত্মক কাজ করা হয় তখন সেই বলটি আসলে বস্তুটির মাঝে একটা শক্তি সৃষ্টি করে। বস্তুটির মাঝে যতটুকু কাজ করা হয়েছে বস্তুটির মাঝে ততটুকু শক্তি সৃষ্টি হয় এবং যে বল প্রয়োগ করছে তাকে ঠিক সেই পরিমাণ শক্তি দিতে হয়।

কাজেই এবারে তুমি নিশ্চয়ই ঋণাত্মক বা নেগেটিভ কাজের অর্থ বুঝতে পেরেছ। কোনো বল যদি কোনো বস্তুর উপর নেগেটিভ কাজ করে তাহলে বুঝতে হবে বস্তুর যেটুকু শক্তি ছিল সেখান থেকে খানিকটা শক্তি সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। যেটুকু ঋণাত্মক বা নেগেটিভ কাজ করা হয়েছে ঠিক ততটুকু শক্তি সরিয়ে নেওয়া হয় এবং যে বল প্রয়োগ করেছে সে এই শক্তিটুকু কোনো না কোনোভাবে পেয়ে যায়। অর্থাৎ কোনো বস্তুর উপর

ধনাত্মক কাজ করা $\rightarrow$ বস্তুটিকে শক্তি দেওয়া
ঋণাত্মক কাজ করা $\rightarrow$ বস্তুটি থেকে শক্তি সরিয়ে নেওয়া

তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ শক্তির কোনো দিক নেই এবং এটি একটি স্কেলার। যেহেতু কাজ করে আমরা শক্তি তৈরি করি কিংবা শক্তি খরচ করে কাজ করি তাই দুটোরই একই একক এবং একই মাত্রা।

শক্তির একক J (জুল)
শক্তির মাত্রা $[W] = ML^2T^{-2}$

উদাহরণ

প্রশ্ন: একটা বস্তুর ওপর 100 N বল প্রয়োগ করে 10m নিয়ে গেছ। ঘর্ষণ বল যদি বিপরীত দিকে 10 N হয় তাহলে তুমি কতটুকু কাজ করছ? ঘর্ষণ বল কতটুকু কাজ করেছে? (চিত্র 4.01)

উত্তর: তুমি $W = F \times s = 100\ \text{N} \times 10\ \text{m} = 1000\ \text{J} = 1\ \text{kJ}$ কাজ করেছ।

ঘর্ষণ বল $W = f \times s = -10\ \text{N} \times 10\ \text{m} = -100\ \text{J}$ কাজ করেছে।

তোমার কাজের কারণে পাথরটা শক্তি অর্জন করেছে। ঘর্ষণ বলের কারণে শক্তি ক্ষয় হয়েছে, হয়তো তাপ সৃষ্টি হয়েছে।

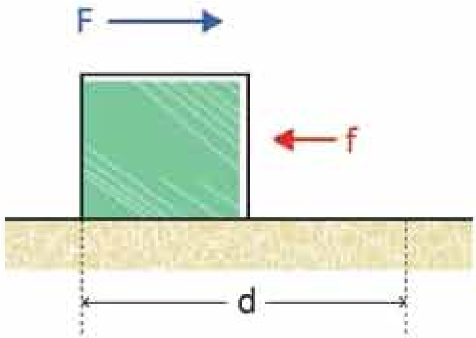

চিত্র 4.01: একটি স্তরের ওপর বল প্রয়োগ করা হলে ঘর্ষণ বল উল্টো দিকে কাজ করে।

4.3 শক্তির বিভিন্ন রূপ

নানা ধরনের কাজের জন্য আমরা নানা ধরনের শক্তি ব্যবহার করি। যেমন পানি গরম করার জন্য তাপ শক্তির প্রয়োজন হয়, দেখার জন্য আমাদের আলো শক্তি লাগে, আমরা শুনি শব্দ শক্তি দিয়ে। বৈদ্যুতিক শক্তি দিয়ে আমরা যন্ত্রপাতি চালাই আবার রাসায়নিক শক্তি ব্যবহার করে তড়িৎ কোষ বিদ্যুৎ তৈরি করি। ভারী নিউক্লিয়াস ভেঙে বা হালকা নিউক্লিয়াস জোড়া দিয়ে আমরা যে নিউক্লিয়ার শক্তি পাই সেটা দিয়েও বিদ্যুৎ শক্তি তৈরি করি। খাবার থেকে পুষ্টি নিয়ে আমাদের শরীরে শক্তি তৈরি হয়, আমরা কাজকর্ম করি।

আমাদের সভ্যতার ইতিহাসটিই হচ্ছে শক্তি তৈরি করে সেই শক্তি ব্যবহারের ইতিহাস। আমরা আমাদের চারপাশে সেই শক্তির নানা রূপকে দেখতে পাই, যেমন—যান্ত্রিক শক্তি, তাপ শক্তি, শব্দ শক্তি, আলোক শক্তি, চৌম্বক শক্তি, বিদ্যুৎ শক্তি, রাসায়নিক শক্তি, নিউক্লিয় শক্তি এবং সৌর শক্তি।

শক্তির সবচেয়ে সাধারণ রূপ হচ্ছে যান্ত্রিক শক্তি, বস্তুর অবস্থান, আকার এবং গতির কারণে যে শক্তি পাওয়া যায় তাকেই যান্ত্রিক শক্তি বলে। যান্ত্রিক শক্তির দুটি রূপ হতে পারে গতিশক্তি এবং স্থিতিশক্তি।

4.3.1 গতিশক্তি (Kinetic Energy)

আমরা আগে বলেছি কাজ করার সামর্থ্য হচ্ছে শক্তি। আমরা সবাই জানি কোনো বস্তু গতিশীল হলে সেটা অন্য বস্তুকে ধাক্কা দিয়ে সেটাকেও গতিশীল করে খানিকটা দূরত্ব ঠেলে নিয়ে যেতে পারে। অন্য বস্তুকে গতিশীল করে ফেলার অর্থ নিশ্চয়ই সেখানে বল প্রয়োগ হয়েছে এবং সেই বলের জন্য খানিকটা দূরত্ব যাওয়ার অর্থ নিশ্চয়ই সেখানে কাজ হয়েছে। কাজেই আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি

গতির জন্য বস্তুর যে শক্তি হয় সেটা নিশ্চয়ই এক ধরনের শক্তি বা গতিশক্তি। আগের অধ্যায়ে আমরা বলেছি যে আমরা রাস্তাঘাটে যে ভয়ংকর দুর্ঘটনা ঘটতে দেখি সেখানে যে ক্ষয়ক্ষতি হয় তার প্রধান কারণ এই গতিশক্তি। একটা বাস-ট্রাক বা গাড়ি যখন প্রচণ্ড বেগে ছুটতে থাকে তখন তার অনেক বড় গতিশক্তি থাকে। দুঘর্টনার সময় এই পুরো শক্তিটার কারণে গাড়ি ভেঙেচুরে যায়, প্রচণ্ড ধাক্কায় মানুষ মারা যায়।

একটা বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করে কাজ করা হলে সেখানে কতটুকু গতিশক্তি হবে সেটা আমরা খুব সহজে বের করতে পারি।

ধরা যাক F বল প্রয়োগ করে m ভরের একটা বস্তুকে s দূরত্ব সরানো হলো। তাহলে এই F বলের সম্পাদিত কাজ W হচ্ছে

$$W = Fs$$

নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র থেকে আমরা জানি $F = ma$ গতির সমীকরণ থেকে আমরা জানি স্থির অবস্থা থেকে শুরু করা হলে

$$s = \frac{1}{2}at^2 \text{এবং } v = at$$

$$\text{কাজ} \quad W = Fs = mas = ma \times \frac{1}{2}at^2 = \frac{1}{2}ma^2t^2 = \frac{1}{2}mv^2$$

কাজেই আমরা বলতে পারি F বল কোনো বস্তুকে s দূরত্বে নিয়ে গেলে তার ভেতরে যে শক্তির সঞ্চার হয় সেটি হচ্ছে

$$T = \frac{1}{2}mv^2$$

গতিশক্তিতে v টি বর্গ হিসেবে আছে, কাজেই কোনো বস্তুর গতিশক্তিকে দ্বিগুণ বাড়াতে আমাদের চার গুণ বেশি শক্তি দিতে হয়।

গতির সমীকরণ শেখার সময় আমরা দেখেছিলাম $v^2 = u^2 + 2as$

দুইপাশে $\frac{1}{2}m$ দিয়ে গুণ করলে সূত্রটি দাঁড়ায়: $\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}mu^2 + mas$

ma এর পরিবর্তে যদি আমরা F লিখি এবং Fs এর পরিবর্তে W লিখি তাহলে সূত্রটি দাঁড়ায়:

$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}mu^2 + W$$

অর্থাৎ কোনো বস্তু যদি u বেগে থাকে তাহলে তার গতি $\frac{1}{2}mu^2$এবং তার উপর W কাজ করা হলে গতিশক্তি বেড়ে হয় $\frac{1}{2}mv^2$. গতির এই সমীকরণটি উল্লেখ করার সময় আমরা বলেছিলাম যে পরে

আমরা এর একটি চমকপ্রদ রূপ দেখব। এটি হচ্ছে সেই রূপ অর্থাৎ গতির সমীকরণটি আসলে গতিশক্তির একটি সমীকরণ ছাড়া কিছু নয়।

উদাহরণ

প্রশ্ন: 10 kg ভরের একটা স্থির বস্তুর ওপর 10 s ব্যাপী 10 N বল প্রয়োগ করা হয়েছে (a) বস্তুটির গতিশক্তি কত? (b) 20 s পরে গতিশক্তি কত? (c) যদি পুরো 20 s বল প্রয়োগ করা হয় তাহলে গতিশক্তি কত?

উত্তর: 10 N বল প্রয়োগ করলে ত্বরণ:

$$a = \frac{F}{m} = \frac{10N}{10kg} = 1\ \mathrm{m/s^2}$$

কাজেই $10s$ পরে বেগ

$$v = at = \frac{1\ \mathrm{m}}{\mathrm{s^2}} \times 10\ \mathrm{s} = 10\ \mathrm{m/s}$$

(a) কাজেই গতিশক্তি

$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \times 10 \times 10^2\ \mathrm{J} = 500\ \mathrm{J}$$

(b) 10 s পর্যন্ত ত্বরণ হবে এর পরে ত্বরণ নেই বলে বেগ অপরিবর্তিত কাজেই 20 s পরে গতিশক্তি একই থাকবে।

(c) পুরো 20 s বল প্রয়োগ করা হলে $v = at = 1\ \mathrm{m/s^2} \times 20\ \mathrm{s} = 20\ \mathrm{m/s}$

কাজেই গতিশক্তি

$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \times 10 \times 20^2\ \mathrm{J} = 2000\ \mathrm{J}$$

প্রশ্ন: 10 kg ভরের একটি বস্তুকে বল প্রয়োগ করে গতিশীল করায় তার গতিশক্তি হয়েছে 80 J, বস্তুটির বেগ কত?

উত্তর: গতিশক্তি

$$\frac{1}{2}mv^2 = 80\ \mathrm{J}$$

$$v^2 = \frac{2 \times 80\,\text{J}}{\text{m}} = \frac{160\,\text{m}^2}{10\,\text{s}^2}$$

$$v = 4\,\text{m/s}$$

4.3.2 বিভব শক্তি (Potential Energy)

কাজ সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমরা বলেছিলাম যখন কোনো বল কোনো কিছুর ওপর পজিটিভ কাজ করে তখন সেখানে শক্তির সৃষ্টি হয়। গতিশক্তি সম্পর্কে বলার সময় আমরা তার একটা উদাহরণও দিয়েছিলাম, দেখিয়েছিলাম একটা বস্তুর ওপর বল প্রয়োগ করে সেটাকে খানিকটা দূরত্বে নিয়ে গেলে গতিশক্তি $\frac{1}{2}mv^2$ বেড়ে যায়।

এবারে এমন একটা উদাহরণ দেওয়া হবে, যেখানে বল প্রয়োগ করে খানিকটা দূরত্ব অতিক্রম করার পরও কোনো গতিশক্তি তৈরি হবে না। মনে করো টেবিলে একটা স্প্রিং 4.02 চিত্রে দেখানো উপায়ে রাখা আছে, তুমি স্প্রিংয়ের খোলা মাথার আঙুল দিয়ে F বল প্রয়োগ করে স্প্রিংটাকে x দূরত্বে সংকুচিত করে দিয়েছ। এ রকম অবস্থায় তোমার হাত বা স্প্রিং কোনোটাই গতিশীল না, তাই কোথাও কোনো গতিশক্তি নেই! যেহেতু যেদিকে F বল প্রয়োগ করা হয়েছে অতিক্রান্ত দূরত্বও x সেই দিকে, তাই কাজটি পজিটিভ, আমাদের কাজের সংজ্ঞা অনুযায়ী এখানে শক্তি সৃষ্টি হওয়ার কথা। কিন্তু সেই শক্তিটি কোথায়? কোনো কিছু গতিশীল নয়, তাই এখানে নিশ্চিতভাবে কোনো গতিশক্তি নেই।

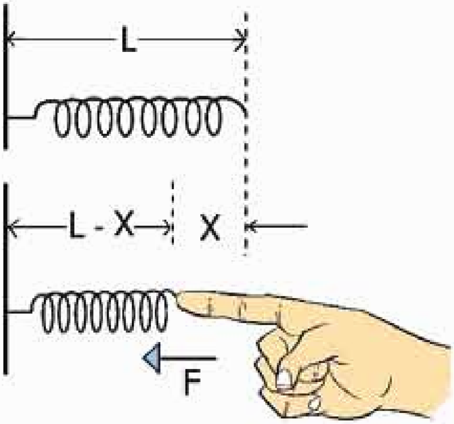

চিত্র 4.02: স্প্রিংয়ের স্থিরাবস্থা এবং বল প্রয়োগ করে সংকুচিত করা।

আমরা যারা স্প্রিং ব্যবহার করেছি তারা অনুমান করতে পারছি যে সংকুচিত স্প্রিংয়ের ভেতর নিশ্চয়ই শক্তিটুকু লুকিয়ে রয়েছে। কারণ আমরা জানি সংকুচিত স্প্রিংটার সামনে একটা m ভরের বস্তু রেখে স্প্রিংটা ছেড়ে দিলে স্প্রিংটা ভরটার ওপর বল প্রয়োগ করে একটা দূরত্ব অতিক্রম করাতে পারত, যার অর্থ কাজ করাতে পারত। অর্থাৎ এটি একটি শক্তি, গতিশক্তি না হলেও এটি অন্য এক ধরনের শক্তি। এই ধরনের সঞ্চিত শক্তিকে বলে বিভব শক্তি (Potential Energy)। এই শক্তিটি কোনো বস্তুর অবস্থা বা অবস্থানের জন্য তৈরি হয়।

একটি স্প্রিংয়ের ধ্রুবক যদি k হয় এবং স্প্রিংটিকে যদি তার স্থির অবস্থার সাপেক্ষে x দূরত্ব সংকুচিত করা হয় তাহলে তার ভেতরে শক্তি সঞ্চিত হয়

$$V = \frac{1}{2}kx^2$$

নিজে করো

নিজে করো: স্প্রিংকে x দূরত্ব সংকুচিত কিংবা প্রসারিত করলে সেটি $F = -kx$ বল প্রয়োগ করে, এটি ব্যবহার করে $V = \frac{1}{2}kx^2$ বের করা সম্ভব। তুমি কি বের করতে পারবে? (যেহেতু বলটি স্প্রিংয়ের দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে তাই গড় বল বের করে মোট দূরত্ব দিয়ে গুণ দাও।)

উদাহরণ

প্রশ্ন: 10 kg ভরের একটা বস্তু 10 m/s বেগে একটা স্প্রিংয়ের ওপর পড়ল। স্প্রিং ধ্রুবক $k = 100{,}000\ \mathrm{J/m^2}$ সেটি কতটুকু সংকুচিত হবে?

উত্তর: বস্তুটির গতিশক্তি

$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \times 10 \times 10^2\ \mathrm{J} = 500\ \mathrm{J}$$

এই শক্তিটুকু স্প্রিংটাকে সংকুচিত করবে অর্থাৎ

$$\frac{1}{2}kx^2 = 500\ \mathrm{J}$$

কাজেই

$$x^2 = \frac{2 \times 500}{100{,}000}\ \mathrm{m^2} = \frac{1}{100}\ \mathrm{m^2}$$

$$x = 0.1\ \mathrm{m}$$

আমরা যখন কোনো কিছুকে উপরে তুলি তখনো সেটা বিভব শক্তি অর্জন করে। এক টুকরো পাথর ওপর থেকে ছেড়ে দিলে সেটা নিচে নামার সময় তার গতি বাড়তে থাকে তাই সেটার মাঝে গতিশক্তির জন্ম হয়। এটি সম্ভব হয় কারণ পাথরটা যখন উপরে ছিল তখন এই "উপরে" অবস্থানের জন্য তার

মাঝে এক ধরনের বিভব শক্তি জমা হয়েছিল। একটা পাথরকে উপরে তোলা হলে তার ভেতরে কী পরিমাণ বিভব শক্তি জমা হয়, এখন সেটাও আমরা বের করতে পারি। বুঝতেই পারছ একটা বস্তুকে উপরে তুলতে হলে যে পরিমাণ কাজ করতে হয় সেটাই বিভব শক্তি হিসেবে পাথরের মাঝে জমা হয়ে যাবে। কাজের পরিমাণ W হলে

$$W = Fh$$

এখানে F হচ্ছে প্রযুক্ত বল এবং h হচ্ছে উচ্চতা। F বলটি আমাদের প্রয়োগ করতে হয় উপরের দিকে এবং অতিক্রান্ত দূরত্বও উপরের দিকে, কাজেই F পজিটিভ। উপরে তোলার জন্য যে বল প্রয়োগ করতে হয় তার মান স্প্রিংয়ের বলের মতো পরিবর্তন হয় না এবং এই বলটি পাথরটির ওজনের সমান। পাথরটির ওজন mg হলে

$$F = mg$$

এবং

$$W = mgh$$

মনে রাখতে হবে, পাথরটির ওজন একটি বল এবং সেটি নিচের দিকে কাজ করে। পাথরটাকে উপরে তুলতে হলে এই ওজনের সমান একটা বল আমাদের উপরের দিকে প্রয়োগ করতে হয়।

m ভরের একটা পাথরকে h উচ্চতায় তুলে তার ভেতরে বিভব শক্তি সৃষ্টি করে যদি পাথরটাকে ছেড়ে দিই তাহলে সেটা যখন নিচের দিকে h দূরত্ব নেমে আসবে, তখন তার ভেতরে কী পরিমাণ গতিশক্তি জন্ম নেবে?

শক্তির নিত্যতার কারণে তার বিভব শক্তির পুরোটুকুই গতিশক্তিতে পরিণত হবে। আমরা জানি গতিশক্তি হচ্ছে $\frac{1}{2}mv^2$ তাই আমরা লিখতে পারি:

$$\frac{1}{2}mv^2 = mgh$$

$$v^2 = 2gh$$

সত্যি কথা বলতে কি আমরা পড়ন্ত বস্তুর সমীকরণ বের করার সময় হুবহু এই সূত্রটি ইতিমধ্যে একবার বের করেছিলাম। শক্তির ধারণা দিয়ে সম্পূর্ণ অন্যভাবে আমরা আবার একই সূত্র বের করেছি!

উদাহরণ

প্রশ্ন: 10 kg ভরের একটা বস্তুকে 100 m/s বেগে উপরের দিকে ছুড়ে দিলে এটা কত উপরে উঠবে?

২০২৩

উত্তর: এটি আগে গতি সূত্র দিয়ে বের করা হয়েছে। এখন শক্তির রূপান্তর দিয়ে বের করা যেতে পারে।

গতিশক্তি:

$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \times 10 \times 100^2 \text{ J} = 50{,}000 \text{ J}$$

বস্তুটি যখন h উচ্চতায় পৌঁছাবে তখন যদি পুরো গতিশক্তিটি বিভব শক্তিতে রূপান্তরিত হয় তাহলে,

$$mgh = 50{,}000 \text{ J}$$

$$h = \frac{50{,}000 \text{ J}}{mg} = \frac{50{,}000}{10 \times 9.8} \text{m} = 510 \text{ m}$$

তোমাদের বোঝানোর জন্য এখানে 10 kg ভর কথাটি বলা হয়েছে। এটা কিন্তু ভরের উপর নির্ভর করে না। যেকোনো ভরকে 100 m/s বেগে উপরে ছুড়ে দিলে আমরা এই উত্তর পাব। কাজেই আমরা ইচ্ছে করলে $v^2 = 2gh$ সূত্রটি ব্যাবহার করে সরাসরি করে ফেলতে পারতাম!

প্রশ্ন: $5kg$ ভরের একটা বস্তুকে 50 m/s বেগে উপরের দিকে ছুড়ে দিলে কোন উচ্চতায় এর বিভব শক্তি এবং গতিশক্তি সমান হবে?

উত্তর: বস্তুটির প্রাথমিক গতিশক্তি

$$T_0 = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \times 5 \times 50^2 \text{ J} = 6{,}250 \text{ J}$$

যখন গতিশক্তি বিভব শক্তির সমান হবে তখন সেই h উচ্চতায় আমরা বলতে পারি

গতিশক্তি = বিভব শক্তি
গতিশক্তি + বিভব শক্তি = প্রাথমিক গতিশক্তি
বিভব শক্তি = গতিশক্তি = প্রাথমিক গতিশক্তি/2

$$mgh = \frac{6250 \text{ J}}{2}$$

$$h = \frac{6250 \text{ J}}{2 \times mg} = \frac{6250}{2 \times 5 \times 9.8} \text{ m} = 63.78 \text{ m}$$

তোমরা নিশ্চয়ই অনুমান করছ এই সমস্যাটিও আসলে ভরের মানের উপর নির্ভর করে না।

২০২৩

4.4 শক্তির বিভিন্ন উৎস (Sources of Energy)

পৃথিবীর সভ্যতার ইতিহাসকে সহজভাবে বলা যায় শক্তি ব্যবহারের ইতিহাস। মোটামুটিভাবে বলা যায়, কোন দেশ কতটা উন্নত, সেটা বোঝার একটা সহজ উপায় হচ্ছে মাথাপ্রতি তারা কতটুকু বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহার করে তার একটা হিসাব নেওয়া। পৃথিবীর বিভিন্ন ধরনের শক্তির রূপ 4.03 চিত্রে দেখানো হয়েছে।

4.4.1 অনবায়নযোগ্য শক্তি (Non-Renewable Energy)

পৃথিবীর সভ্যতার ইতিহাসটা যেহেতু শক্তি ব্যবহারের ইতিহাস, তাই আমরা দেখতে পাই সারা পৃথিবীতেই সব দেশ সব জাতির ভেতরেই শক্তির জন্য এক ধরনের ক্ষুধা কাজ করছে। যে যেভাবে পারছে, সেভাবে শক্তির অনুসন্ধান করছে, শক্তিকে ব্যবহার করছে।

চিত্র 4.03: শক্তির বিভিন্ন উৎস।

জ্বালানি শক্তি (তেল, গ্যাস এবং কয়লা): এই মুহূর্তে পৃথিবীর শক্তির সবচেয়ে বড় উৎস হচ্ছে তেল, গ্যাস বা কয়লা। তেল গ্যাস বা কয়লা তিনটিই হচ্ছে ফসিল জ্বালানি, অর্থাৎ লক্ষ-কোটি বছর আগে গাছপালা মাটির নিচে চাপা পড়ে দীর্ঘদিনের তাপ আর চাপে এই রূপ নিয়েছে। মাটির নিচ থেকে কয়লা, তেল আর গ্যাসকে তুলতে হয়। মাটির নিচ থেকে যে তেল তোলা হয় (Crude Oil) প্রাথমিক অবস্থায় সেগুলো অনেক ঘন থাকে, রিফাইনারিতে সেগুলো পরিশোধন করে পেট্রল, ডিজেল বা কেরোসিনে রূপান্তর করা হয় এবং সাথে সাথে আরো ব্যবহারযোগ্য পদার্থ বের হয়ে আসে। মাটির নিচ থেকে যে গ্যাস বের হয় সেটি মূলত মিথেন CH_4, এর সাথে জলীয়বাষ্প এবং অন্যান্য গ্যাস মেশানো থাকতে পারে এবং সেগুলো আলাদা করে নিতে হয়। আমাদের বাংলাদেশের গ্যাস তুলনামূলকভাবে অনেক পরিষ্কার এবং সরাসরি ব্যবহার করার উপযোগী।

২০২৬

নিউক্লিয়ার শক্তি: অনেক দেশ নিউক্লিয়ার শক্তিকে ব্যবহার করছে, সেখানেও এক ধরনের জ্বালানির দরকার হয়, সেই জ্বালানি হচ্ছে ইউরেনিয়াম। তেল, গ্যাস, কয়লা বা ইউরেনিয়াম, এই শক্তিগুলোর মাঝে একটা মিল রয়েছে, এগুলো ব্যবহার করলে খরচ হয়ে যায়। মাটির নিচে কতটুকু তেল, গ্যাস, কয়লা আছে কিংবা পৃথিবীতে কী পরিমাণ ইউরেনিয়াম আছে মানুষ এর মাঝে সেটা অনুমান করে বের করে ফেলেছে। দেখা গেছে পৃথিবীর মানুষ যে হারে শক্তি ব্যবহার করছে যদি সেই হারে শক্তি ব্যবহার করতে থাকে তাহলে পৃথিবীর শক্তির উৎস তেল, গ্যাস, কয়লা বা ইউরেনিয়াম দিয়ে টেনেটুনে বড়জোর দুই শত বছর চলবে। তারপর আমাদের পরিচিত উৎস যাবে ফুরিয়ে। তখন কী হবে পৃথিবীর মানুষ সেটা নিয়ে খুব বেশি দুর্ভাবনায় নেই, তার কারণ মানুষ মোটামুটি নিশ্চিতভাবেই জানে বিজ্ঞান আর প্রযুক্তি ব্যবহার করে এর মাঝে অন্য কিছু বের করে ফেলা হবে। যেমন নিউক্লিয়ার ফিউসান, যেটা ব্যবহার করে সূর্য কিংবা নক্ষত্রেরা তাদের শক্তি তৈরি করে। ফিউসানের জন্য জ্বালানি আসে হাইড্রোজেনের একটা আইসোটোপ থেকে, আর পানির প্রত্যেকটা অণুতে দুটো করে হাইড্রোজেন, কাজেই সেটা ফুরিয়ে যাবার কোনো আশঙ্কা নেই।

4.4.2 নবায়নযোগ্য শক্তি (Renewable Energy)

শুধু যে ভবিষ্যতে নতুন ধরনের শক্তির ওপর মানুষ ভরসা করে আছে তা নয়, এই মুহূর্তেও তারা এমন শক্তির ওপর ভরসা করে আছে, যেগুলো ফুরিয়ে যাবে না। সেই শক্তি আসে সূর্যের আলো থেকে, সমুদ্রের জোয়ার-ভাটা কিংবা ঢেউ থেকে, উন্মুক্ত প্রান্তরের বাতাস থেকে, পৃথিবীর গভীরের উত্তপ্ত ম্যাগমা থেকে কিংবা নদীর বহমান পানি থেকে। আমাদের বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না যে এই শক্তিগুলো বলতে গেলে অফুরন্ত। এগুলোকে বলা হয় নবায়নযোগ্য (Renewable Energy) শক্তি—অর্থাৎ যে শক্তিকে নবায়ন করা যায়, যে কারণে এটার ফুরিয়ে যাবার কোনো আশঙ্কা নেই।

এই মুহূর্তে পৃথিবীর সব মানুষ যে পরিমাণ শক্তি ব্যবহার করে তার পাঁচ ভাগের এক ভাগ হচ্ছে এই নবায়নযোগ্য শক্তি। যত দিন যাচ্ছে মানুষ ততই পরিবেশ সচেতন হচ্ছে। তাই এ রকম শক্তির ব্যবহার আরো বেড়ে যাচ্ছে।

জলবিদ্যুৎ: পৃথিবীর পুরো শক্তির পাঁচ ভাগের এক ভাগ হচ্ছে নবায়নযোগ্য শক্তি। সেই এক ভাগের বেশির ভাগ হচ্ছে জলবিদ্যুৎ, নদীতে বাঁধ দিয়ে বিদ্যুৎ তৈরি করা। নদীর পানি যেহেতু ফুরিয়ে যায় না তাই এ রকম বিদ্যুৎকেন্দ্রের শক্তির উৎসও ফুরিয়ে যায় না। এটা হচ্ছে প্রচলিত ধারণা। কিন্তু নদীতে বাঁধ দেওয়া হলে পরিবেশের অনেক বড় ক্ষতি হয়, সে কারণে পৃথিবীর মানুষ অনেক সতর্ক হয়ে গেছে। যাদের একটু দূরদৃষ্টি আছে তারা এ রকম জলবিদ্যুৎকেন্দ্র আর তৈরি করে না।

বায়োমাস: জলবিদ্যুতের পর সবচেয়ে বড় নবায়নযোগ্য শক্তি আসে বায়োমাস (Biomass) থেকে, বায়োমাস বলতে বোঝানো হয় লাকড়ি, খড়কুটো এসবকে। পৃথিবীর একটা বড় অংশের মানুষের

কাছে তেল, গ্যাস, বিদ্যুৎ নেই, তাদের দৈনন্দিন জীবন কাটে লাকড়ি, খড়কুটো জ্বালিয়ে। এই দরিদ্র মানুষগুলোর ব্যবহারিক শক্তি পৃথিবীর পুরো শক্তির একটা বড় অংশ। যদিও শুকনো গাছ খড়কুটো পুড়িয়ে ফেললে সেটা শেষ হয়ে যায়। তারপরও বায়োমাসকে নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস বলার কারণ নতুন করে আবার গাছপালা জন্মানো যায়। তেল, গ্যাস বা কয়লার মতো পৃথিবী থেকে এটা চিরদিনের জন্য অদৃশ্য হয়ে যায় না।

নবায়নযোগ্য শক্তির এই দুটি রূপ, জলবিদ্যুৎ আর বায়োমাসের পর গুরুত্বপূর্ণ শক্তির উৎসগুলো হচ্ছে সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি, বায়ো ফুয়েল আর জিওথার্মাল।

সৌরশক্তি: শুনে অনেকেই অবাক হয়ে যাবে, মাত্র এক বর্গকিলোমিটার এলাকায় সূর্য থেকে আলো তাপ হিসেবে প্রায় হাজার মেগাওয়াট শক্তি পাওয়া যায়, যেটা একটা নিউক্লিয়ার শক্তি কেন্দ্রের কাছাকাছি। সূর্য থেকে আসা আলো আর তাপের একটা অংশ বায়ুমণ্ডলে শোষিত হয়ে যায়, রাতের বেলা সেটা থাকে না, মেঘ বৃষ্টির কারণে সেটা অনিয়ন্ত্রিত। তা ছাড়াও শক্তিটা আসে তাপ কিংবা আলো হিসেবে, বিদ্যুতে রূপান্তর করার একটা ধাপ অতিক্রম করতে হয়। তারপরও বলা যায় এটা আমাদের খুব নির্ভরশীল একটা শক্তির উৎস। সূর্যের তাপকে ব্যবহার করে সেটা দিয়ে বিদ্যুৎ তৈরি করা যায়। তার চেয়ে বেশি জনপ্রিয় পদ্ধতি হচ্ছে সেটাকে সরাসরি বিদ্যুতে রূপান্তর করা। আজকাল পৃথিবীর একটা পরিচিত দৃশ্য হচ্ছে সোলার প্যানেল, বাসার ছাদে লাগিয়ে মানুষ তার নিজের প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ নিজের বাসায় তৈরি করে নেয়।

বায়ুশক্তি: সৌরশক্তির পরই যেটি খুব দ্রুত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে ফেলছে সেটা হচ্ছে বায়ুশক্তি। আমাদের দেশে আমরা এখনো বায়ু বিদ্যুতের বিশাল টারবাইন দেখে অভ্যস্ত নই কিন্তু ইউরোপের অনেক দেশেই সেটা খুব পরিচিত একটা দৃশ্য। যেখানে বায়ু বিদ্যুতের বিশাল টারবাইন বসানো হয়, সেখান থেকে শুধু একটা খাম্বা উপরে উঠে যায়, তাই মোটেও জায়গা নষ্ট হয় না, সেজন্য পরিবেশবাদীরা এটা খুব পছন্দ করেন। একটা বায়ু টারবাইন থেকে কয়েক মেগাওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎ পাওয়া সম্ভব! বাতাস ব্যবহার করে যে শক্তি তৈরি করা হয় প্রতিবছর তার ব্যবহার বাড়ছে প্রায় ত্রিশ শতাংশ, এই সংখ্যাটি কিন্তু কোনো ছোট সংখ্যা নয়।

বায়োফুয়েল: পৃথিবীর মানুষ বহুদিন থেকে পান করার জন্য অ্যালকোহল তৈরি করে আসছে—সেটা এক ধরনের জ্বালানি। ভুট্টা, আখ এ ধরনের খাবার থেকে জ্বালানির জন্য অ্যালকোহল তৈরি করা মোটামুটি একটা গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি। রান্না করার জন্য আমরা যে তেল ব্যবহার করি সেটা ডিজেলের পরিবর্তে ব্যবহার করা যায়। পৃথিবীতে অনেক ধরনের গাছপালা আছে যেখান থেকে সরাসরি জ্বালানি তেল পাওয়া যায়। পৃথিবীর অনেক দেশেই এটা নিয়ে গবেষণা হচ্ছে, অনেক দেশই (যেমন ব্রাজিল) এ ধরনের বায়োফুয়েল বেশ বড় আকারে ব্যবহার করতে শুরু করেছে।

ভূতাপীয়: নবায়নযোগ্য শক্তির গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি হচ্ছে ভূতাপীয় বা জিওথার্মাল (Geothermal) শক্তি। আমাদের পৃথিবীর ভেতরের অংশ উত্তপ্ত অগ্নেয়গিরি দিয়ে যখন সেটা বের হয়ে আসে তখন আমরা সেটা টের পাই। তাই কেউ যদি কয়েক কিলোমিটার গর্ত করে যেতে পারে তাহলেই তাপশক্তির একটা বিশাল উৎস পেয়ে যায়। প্রক্রিয়াটা এখনো সহজ নয়, তাই ব্যাপকভাবে ব্যবহার শুরু হয়নি। কোনো কোনো জায়গায় তার ভূ-প্রকৃতির কারণে যেখানে এ ধরনের শক্তি সহজেই পাওয়া যায় সেখানে সেগুলো ব্যবহার শুরু হয়েছে।

4.4.3 শক্তির রূপান্তর এবং পরিবেশের উপর প্রভাব

সারা পৃথিবীতেই এখন মানুষেরা পরিবেশ নিয়ে সচেতন হয়ে উঠছে। উন্নতির জন্য দরকার শক্তি, কিন্তু শক্তির জন্য যদি পরিবেশকে ধ্বংস করে দেওয়া হয় আধুনিক পৃথিবীর মানুষ কিন্তু সেটা মেনে নেয় না। পৃথিবীর মানুষ এখন যেকোনো শক্তি যেকোনোভাবে ব্যবহার করতে প্রস্তুত নয়। পৃথিবীর সর্বনাশ না করে, প্রকৃতির সাথে বিরোধ না করে তারা পৃথিবীর মাঝে লুকানো শক্তিটুকু ব্যবহার করতে চায়।

শক্তির রূপান্তরে পরিবেশের উপর প্রভাবের সবচেয়ে বড় উদাহরণ হচ্ছে ফসিল জ্বালানি বা তেল, গ্যাস এবং কয়লা। এই তিনটিতেই কার্বনের পরিমাণ অনেক বেশি এবং এগুলো পুড়িয়ে যখন তাপশক্তি তৈরি হয় তখন কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস তৈরি হয়, যেটি একটি গ্রিনহাউস গ্যাস। অর্থাৎ এই গ্যাস পৃথিবীতে তাপকে ধরে রাখতে পারে এবং এ কারণে পৃথিবীর তাপমাত্রা ধীরে ধীরে বেড়ে যাচ্ছে, যেটি বৈশ্বিক উষ্ণতা নামে পরিচিত। বৈশ্বিক উষ্ণতার কারণে মেরু অঞ্চলের বরফ গলে গিয়ে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাচ্ছে। সেকারণে পৃথিবীর যেসব দেশের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হবে এবং কৃষিজমি লবণাক্ত হয়ে পরিবেশের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে, তার মাঝে বাংলাদেশ একটি। এই মুহূর্তে পৃথিবীর সব দেশ মিলে কার্বন ডাই-অক্সাইড নিঃসরণের পরিমাণ কমানোর চেষ্টা করছে।

নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎকেন্দ্রে কার্বন ডাই-অক্সাইডের নিঃসরণ হয় না, কিন্তু নিউক্লিয়ার বর্জ্য অত্যন্ত তেজস্ক্রিয় এবং এদের তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা নিরাপদ মাত্রায় পৌঁছানোর জন্য লক্ষ লক্ষ বছর সংরক্ষণ করতে হয় যেটি পরিবেশের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। আধুনিক প্রযুক্তির কারণে নিউক্লিয়ার শক্তিকেন্দ্র অনেক নিরাপদ হলেও মাঝে মাঝে মানুষের ভুল কিংবা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে এখানে বড় দুর্ঘটনা ঘটে মারাত্মক পরিবেশ বিপর্যয় ঘটতে পারে। তার দুটি উদাহরণ হচ্ছে প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের চেরনোবিল এবং জাপানের ফুকুশিমার দুর্ঘটনা।

তুলনামূলকভাবে পরিবেশের উপর নবায়নযোগ্য শক্তির প্রভাব কম, তবে জলবিদ্যুতের জন্য যখন নদীতে বাঁধ দেওয়া হয় তখন একদিকে বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্লাবিত হয়ে পরিবেশের ক্ষতি হয়, অন্যদিকে পানির প্রবাহ কমে যাবার কারণে বাঁধের পরবর্তী এলাকায় তীব্র খরার সৃষ্টি হতে পারে।

4.5 শক্তির নিত্যতা এবং রূপান্তর (Conservation and Transformation of Energy)

4.5.1 শক্তির নিত্যতা

আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে চারপাশে যে শক্তি দেখি সেটি অবিনশ্বর। এর কোনো ক্ষয় নেই, এটি শুধু একটি রূপ থেকে অন্য রূপে পরিবর্তন হয়। একটা পাথর উপরে তুললে তার মাঝে স্থিতিশক্তি বা বিভব শক্তির জন্ম হয়। পাথরটা ছেড়ে দিলে বিভব বা স্থিতিশক্তি কমতে থাকে এবং গতিশক্তি বাড়তে থাকে। মাটি স্পর্শ করার পূর্ব মুহূর্তে পুরো শক্তিটাই গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু মাটিকে স্পর্শ করার পর পাথরটি যখন থেমে যায় তখন তার ভেতরে গতিশক্তিও থাকে না বিভব শক্তি থাকে না, তাহলে শক্তিটা কোথায় যায়?

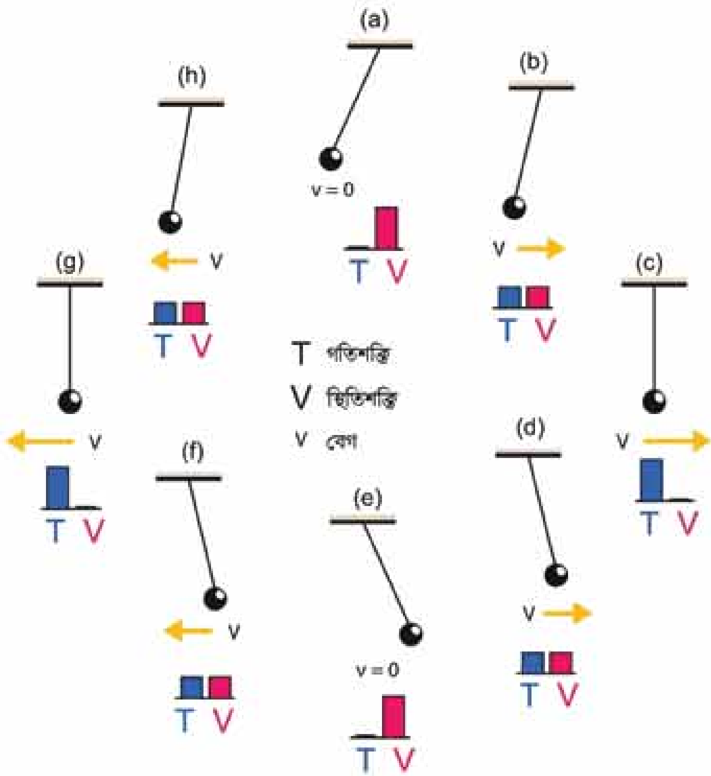

চিত্র 4.04: একটি পেন্ডুলাম দুলছে, মোট শক্তিটুকু গতিশক্তি এবং বিভব শক্তির মাঝে স্থান বদল করছে।

তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ পাথরটা যখন মেঝেতে আঘাত করে তখন সেটি শব্দ করে যেখানে আঘাত করেছে সেখানে তাপের সৃষ্টি করে অর্থাৎ গতিশক্তিটুকু শব্দ কিংবা তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

বিভব এবং গতিশক্তির ভেতরে রূপান্তরের উদাহরণটি চমৎকার (চিত্র 4.04)। একটি ছোট পাথরকে সুতা দিয়ে বেঁধে ঝুলিয়ে দিয়ে যদি আমরা একপাশে একটু টেনে নিই তাহলে সেটি তার স্থির অবস্থা থেকে একটু উপরে উঠে যায় বলে তার ভেতর এক ধরনের স্থিতিশক্তির জন্ম হয়। এখন পাথরটা ছেড়ে দিলে তার ভেতরকার অসাম্য বলের জন্য সেটি তার স্থির অবস্থার দিকে যেতে থাকে এবং তার মাঝে গতির সঞ্চার হয়। ঠিক মাঝখানে যখন পৌঁছায় তখন তার বেগ থাকে সবচেয়ে বেশি তাই সেটি থেমে না গিয়ে অন্যদিকে যেতে থাকে এবং বেগ নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত উপরে উঠতে থাকে অর্থাৎ তার ভেতরে আবার স্থিতিশক্তির জন্ম হয়। যখন এটি সবচেয়ে উঁচুতে পৌঁছে গিয়ে থেমে যায় তখন তার স্থিতিশক্তির জন্য সেটি আবার স্থির অবস্থার দিকে যেতে থাকে। এভাবে পাথরটি দুলতে থাকে এবং স্থিতিশক্তি থেকে গতিশক্তি এবং গতিশক্তি থেকে স্থিতিশক্তির মাঝে রূপান্তর হতেই থাকে। ঘর্ষণ এবং অন্যান্য কারণে শক্তি ক্ষয় না হলে এই প্রক্রিয়াটি অনন্তকাল ধরে চলতে থাকত!

কাজেই শক্তির রূপান্তর খুবই স্বাভাবিক একটা প্রক্রিয়া। শুধু বিভব শক্তি এবং গতিশক্তির মাঝে যে রূপান্তর হতে পারে তা নয়। আমাদের পরিচিত সব শক্তিই এক রূপ থেকে অন্য রূপে যেতে পারে। আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে চারপাশে যে শক্তি দেখি সেটি সৃষ্টিও হয় না ধ্বংসও হয় না, শুধু তার রূপ পরিবর্তন করে। এটাই হচ্ছে শক্তির নিত্যতার সূত্র।

4.5.2 শক্তির রূপান্তর

আমরা আমাদের চারপাশে শক্তির রূপান্তরের অনেক উদাহরণ দেখি, যেমন:

(a) বিদ্যুৎ বা তড়িৎ শক্তি

শক্তির রূপান্তরের উদাহরণ দিতে হলে আমরা সবার আগে বিদ্যুৎ বা তড়িৎ শক্তির উদাহরণ দিই, তার কারণ এই শক্তিকে সবচেয়ে সহজে অন্যান্য শক্তিতে রূপান্তর করা যায়। শুধু তা-ই নয়, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বিদ্যুৎ শক্তি সরবরাহ করা সবচেয়ে সহজ। তাই আমাদের চারপাশে নানা ধরনের শক্তি থাকার পরও আমরা আমাদের বাসায় অন্য কোনো শক্তি সরবরাহ না করে সবার প্রথমে তড়িৎ শক্তি বা ইলেকট্রিসিটি সরবরাহ করে থাকি। আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বৈদ্যুতিক পাখা বা অন্যান্য মোটরে তড়িৎ বা বৈদ্যুতিক শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত হতে দেখি। (যদিও চৌম্বক শক্তি আসলে বিদ্যুৎ বা তড়িৎ শক্তি থেকে ভিন্ন কিছু নয়, তার পরেও আমরা মোটর বা বৈদ্যুতিক পাখার ভেতরে বিদ্যুৎ শক্তিকে প্রথমে চৌম্বক শক্তিতে রূপান্তর করে সেখান থেকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তর হতে দেখি।) বৈদ্যুতিক ইস্ত্রি বা হিটারে এটা তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। বাল্ব, টিউবলাইট

বা এলইডিতে তড়িৎ শক্তি আলোতে রূপান্তরিত হয়। শব্দশক্তি তৈরি করার জন্য সাধারণত কোনো কিছুকে কাঁপাতে হয়। সেটি এক ধরনের যান্ত্রিক শক্তি। তারপরও আমরা বলতে পারি স্পিকারে বিদ্যুৎ শক্তি শব্দশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। আমরা সবাই আমাদের মোবাইলে টেলিফোনের ব্যাটারিকে বিদ্যুৎ দিয়ে চার্জ করি, যেখানে আসলে তড়িৎ শক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

(b) রাসায়নিক শক্তি

শক্তি রূপান্তরের উদাহরণ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ শক্তি নিশ্চয়ই রাসায়নিক শক্তি। আমরা আমাদের বাসায় রান্না করার জন্য যে গ্যাস ব্যবহার করি সেটা রাসায়নিক শক্তির তাপ শক্তিতে রূপান্তরের উদাহরণ। সে কারণে আমাদের বাসায় বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ করার সাথে সাথে গ্যাসও সরবরাহ করা হয়। রাসায়নিক শক্তিকে তাপে রূপান্তর করার কারণে আমরা আলোও পেয়ে থাকি। মোমবাতির আলো তার একটা উদাহরণ। গ্যাস, পেট্রল, ডিজেল বা এ ধরনের জ্বালানি ব্যবহার করে আমরা নানারকম ইঞ্জিনে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত হতে দেখি। যদিও ভালো করে দেখলে আমরা দেখব রাসায়নিক শক্তি প্রথমে তাপশক্তি এবং সেই তাপশক্তি যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। তবে আধুনিক প্রযুক্তির যুগে রাসায়নিক শক্তির রূপান্তরের সবচেয়ে বড় উদাহরণটি হচ্ছে ব্যাটারি, যেখানে এই শক্তি বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। মোবাইল টেলিফোন থেকে শুরু করে গাড়ি কিংবা ঘড়ি থেকে মহাকাশযান এমন কোনো জায়গা খুঁজে পাওয়া যাবে না যেখানে ব্যাটারি ব্যবহার করে রাসায়নিক শক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়নি। রাসায়নিক শক্তির সবচেয়ে চমকপ্রদ উদাহরণ অবশ্য আমাদের বা জীবন্ত প্রাণীর শরীর, যেখানে খাদ্য থেকে রাসায়নিক শক্তি যান্ত্রিক কিংবা বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

(c) তাপশক্তি

পরিমাণের দিক থেকে বিবেচনা করলে নিঃসন্দেহে পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি শক্তির রূপান্তর হয় তাপশক্তি থেকে। যাবতীয় যন্ত্রের যাবতীয় ইঞ্জিনে তাপশক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তর করা হয়। থার্মোকাপলে (Thermocouple) দুটি ভিন্ন ধাতব পদার্থের সংযোগস্থলে তাপ প্রদান করে সরাসরি তাপ থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের উদাহরণ থাকলেও প্রকৃত পক্ষে প্রায় সবক্ষেত্রেই তাপশক্তি থেকে যান্ত্রিক শক্তি এবং যান্ত্রিক শক্তি দিয়ে বিদ্যুৎ শক্তি তৈরি করা হয়। (পরিবেশ রক্ষা করার জন্য আমরা আজকাল শক্তির অপচয় করতে চাই না। তাই তাপ দিয়ে আলো তৈরি হয় সে রকম লাইট বাল্ব ব্যবহার না করে আজকাল বেশি বিদ্যুৎসাশ্রয়ী বাল্ব ব্যবহার করা হয়।) আমরা মোমবাতির শিখায় রাসায়নিক শক্তিতে সৃষ্ট তাপের কারণে উত্তপ্ত গ্যাসের কণা বা বাল্বের ফিলামেন্টে তাপকে আলোক শক্তিতে রূপান্তরিত হতে দেখি।

(d) যান্ত্রিক শক্তি

জেনারেটরে যখন বিদ্যুৎ তৈরি হয় তখন আসলে যান্ত্রিক শক্তি ব্যবহার করে তারের কুণ্ডলীকে চৌম্বক ক্ষেত্রে ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তর করা হয়। ঘর্ষণের কারণে সব সময়ই তাপশক্তি তৈরি হচ্ছে, সেখানে আসলে যান্ত্রিক শক্তি তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে।

(e) আলোক শক্তি

আলো হচ্ছে বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গ এবং এই তরঙ্গের একটা নির্দিষ্ট মাত্রার তরঙ্গদৈর্ঘ্য আমরা চোখে দেখতে পাই, সেটাকে আমরা আলো বলি। এর চেয়ে বেশি এবং কম তরঙ্গদৈর্ঘ্যও প্রকৃতিতে রয়েছে এবং আমরা নানাভাবে তৈরিও করছি। যেমন মাইক্রোওয়েভ ওভেনে আমরা এই বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গকে তাপশক্তিতে রূপান্তর করি। আজকাল সোলার সেল ব্যবহার করে সরাসরি আলো থেকে বিদ্যুৎ তৈরি করা হয়। এখন যদিও ফটোগ্রাফিক কাগজ ধীরে ধীরে উঠে যাচ্ছে কিন্তু আমরা সবাই জানি আলোক সংবেদী ফটোগ্রাফির ফিল্মে আলোর উপস্থিতি রাসায়নিক শক্তির জন্ম দেয়।

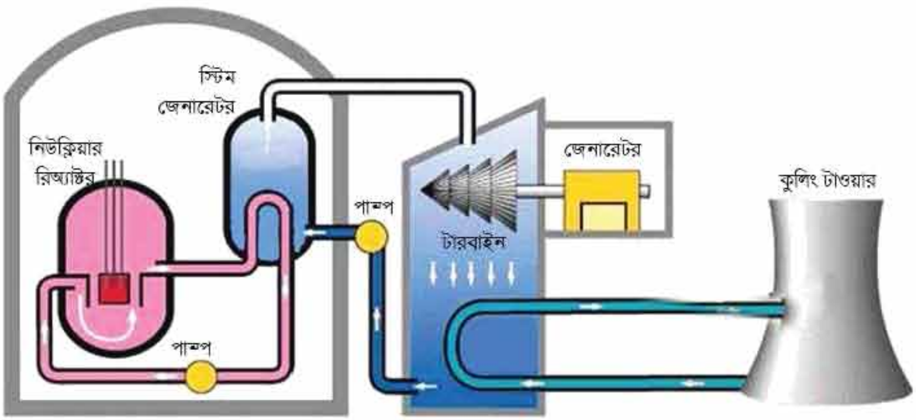

চিত্র 4.05: নিউক্লিয়ার শক্তি কেন্দ্রের গঠন।

(f) ভর

তোমরা নিশ্চয়ই বিভিন্ন ধরনের শক্তির রূপান্তরের মাঝে হঠাৎ করে ভর শব্দটি দেখে চমকে উঠেছ। আমরা যখন শক্তিকে বোঝাই তখন কখনো সরাসরি ভরকে শক্তি হিসেবে কল্পনা করি না। কিন্তু আইনস্টাইন তাঁর আপেক্ষিক সূত্র দিয়ে দেখিয়েছেন $E = mc^2$ এবং এই সূত্রটি দিয়ে ভরকে শক্তিতে রূপান্তরের সম্ভাবনার কথা জানিয়েছেন। নিউক্লিয়ার বোমাতে ভর থেকে শক্তি রূপান্তর করা হয়েছিল, সেখানে প্রচণ্ড তাপ, আলো এবং শব্দ শক্তি হিরোশিমা ও নাগাসাকি শহর ধ্বংস করে দিয়েছিল। শক্তির রূপান্তরের এই পদ্ধতিটি শুধু বোমাতে নয়, নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎকেন্দ্রেও ব্যবহার করা হয়। সরাসরি

তাপশক্তি তৈরি হলেও সেই তাপকে ব্যবহার করে বাষ্প এবং বাষ্পকে ব্যবহার করে টারবাইন ঘুরিয়ে সেই টারবাইন দিয়ে জেনারেটরে বিদ্যুৎ তৈরি করা হয় (চিত্র 4.05)।

শক্তির এই ধরনের রূপান্তর আমাদের চারপাশে ঘটতে থাকলেও আমাদের একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানা দরকার। শক্তি থাকলেই কিন্তু সব সময় সেই শক্তি ব্যবহার করা যায় না। পৃথিবীর সমুদ্রে বিশাল পরিমাণ তাপশক্তি রয়েছে, সেই শক্তি আমরা ব্যবহার করতে পারি না। (ঘূর্ণিঝড় মাঝে মাঝে সেই শক্তি নগর লোকালয় ধ্বংস করে দেয়!) আবার যখনই শক্তিকে একটি রূপ থেকে অন্য রূপে পরিবর্তন করা হয় তখন খানিকটা হলেও শক্তির অপচয় হয়। মূলত এই অপচয়টা হয় তাপশক্তিতে এবং সেটা আমরা ব্যবহার করার জন্য ফিরে পাই না। শক্তির এই অপচয়টি আসলে প্রযুক্তির সীমাবদ্ধতা নয়। এটি পদার্থবিজ্ঞানের বেঁধে দেওয়া নিয়ম।

বিজ্ঞান শেখার প্রাথমিক পর্যায়ে অনেকেই এটা জানে না এবং তারা এক শক্তিকে অন্য শক্তিতে রূপান্তর করে অনন্তকাল চলার উপযোগী একটা মেশিন তৈরি করার চেষ্টা করে (একটি মোটর জেনারেটরকে ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ তৈরি করছে সেই বিদ্যুৎ দিয়েই আবার মোটরটিকে ঘোরানো হচ্ছে। এটি অনন্তকাল চলার একটি মেশিনের উদাহরণ। যেটি কখনোই কাজ করবে না।)

4.6 ভর ও শক্তির সম্পর্ক (Relation between mass and energy)

তোমরা জানো বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের থিওরি অব রিলেটিভিটিতে বলা হয়েছে যে বস্তুর ভর আর শক্তি একই ব্যাপার, এবং ভর m কে যদি শক্তিতে রূপান্তর করা যায় তাহলে সেই শক্তি E এবং এর পরিমাণ হচ্ছে $E = mc^2$, যেখানে c হচ্ছে আলোর বেগ। আলোর বেগ (3×10^8 m/s) বিশাল, সেটাকে বর্গ করা হলে আরো বিশাল হয়ে যায়, যার অর্থ অল্প একটু ভরকে শক্তিতে রূপান্তর করতে পারলে আমরা বিশাল শক্তি পেয়ে যাব, নিউক্লিয়ার শক্তিকেন্দ্রে ঠিক এই ব্যাপারটিই করা হয়।

নিউক্লিয়ার শক্তিকেন্দ্রে যেসব জ্বালানি ব্যবহার করা হয় তার একটি হচ্ছে ইউরেনিয়াম 235 এখানে 92টি প্রোটন এবং 143টি নিউট্রন রয়েছে। প্রকৃতিতে এর পরিমাণ খুব কম, মাত্র 0.7%, এর অর্ধায়ু 703,800,000 (704 মিলিয়ন) বছর। এই ইউরেনিয়াম 235 নিউক্লিয়াস খুব সহজেই আরেকটা নিউট্রনকে গ্রহণ করতে পারে (যদি সে নিউট্রনের গতি কম হয়) তখন ইউরেনিয়াম 235 পুরোপুরি অস্থিতিশীল হয়ে যায়, এটা তখন Kr^{92}এবং Ba^{141}এই দুটো ছোট নিউক্লিয়াসে ভাগ হয়ে যায়। তার সাথে সাথে আরো তিনটা নিউট্রন বের হয়ে আসে (চিত্র 4.06) যেটা নিচের সমীকরণে দেখানো হয়েছে।

$$ {}^{1}_{0}n + {}^{235}_{92}U \rightarrow {}^{92}_{36}Kr + {}^{141}_{56}Ba + 3{}^{1}_{0}n $$

কেউ যদি সমীকরণের বাম পাশে যা আছে তার ভর বের করে এবং সেটাকে ডান পাশে যা আছে তার ভরের সাথে তুলনা করে তাহলে দেখবে ডান পাশে ভর কম, যেটুকু ভর কম সেটুকু আসলে $E = mc^2$এর শক্তি হিসেবে বের হয়ে এসেছে।

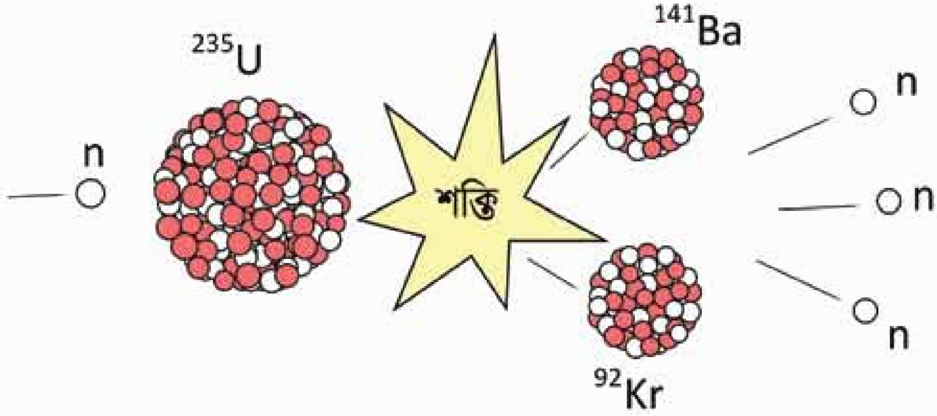

চিত্র 4.06: নিউক্লিয়ার বিক্রিয়ায় শক্তি উৎপাদন।

এই বিক্রিয়ায় যে তিনটি নিউট্রন বের হয়ে এসেছে, তারা আসলে প্রচণ্ড গতিতে বের হয়ে আসে, তাই খুব সহজে অন্য ইউরেনিয়াম ($^{235}_{92}U$) সেগুলো ধরে রাখতে পারে না। কোনোভাবে যদি এগুলোর গতিশক্তি কমানো যায় তাহলে সেগুলো অন্য ইউরেনিয়াম ($^{235}_{92}U$) নিউক্লিয়াসে আটকা পড়ে সেটাকেও ভেঙে দিয়ে আরো কিছু শক্তি এবং আরো তিনটি নতুন নিউট্রন বের করবে। নিউক্লিয়ার শক্তিকেন্দ্রে এই কাজটি করা হয় তাই বের হয়ে আসা নিউট্রনগুলোর গতি কমে আসার পর সেগুলো আবার অন্য নিউক্লিয়াসকে ভেঙে দেয় এবং এভাবে চলতেই থাকে। এই প্রক্রিয়াকে বলে চেইন রি-অ্যাকশন (Chain Reaction)।

এই পদ্ধতিতে প্রচণ্ড তাপশক্তি বের হয়ে আসে, সেই তাপশক্তি ব্যবহার করে পানিকে বাষ্পীভূত করে সেই বাষ্প দিয়ে টারবাইন ঘুরিয়ে জেনারেটর থেকে বিদ্যুৎ তৈরি করা হয় এবং এ রকম বিদ্যুৎকেন্দ্রকে আমরা বলি নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎকেন্দ্র। এরকম একটা বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে খুব সহজেই হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়া সম্ভব। তবে এই নিউক্লিয়ার বিক্রিয়ার পর যে বর্জ্য পদার্থ তৈরি হয় সেগুলো ভয়ংকর রকম তেজস্ক্রিয়, তাই সেগুলো প্রক্রিয়া করার সময় অনেক রকম সাবধানতা নিতে হয়। নিউক্লিয়ার বিক্রিয়ার পর যে বাড়তি নিউট্রন বের হয় কোনোভাবে সেগুলোকে অন্য কোথাও শোষণ করিয়ে নিতে পারলেই নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। নিউট্রনকে শোষণ করার জন্য বিশেষ ধরনের রড নিউক্লিয়ার রি-অ্যাক্টরে থাকে যেগুলোকে বলে কন্ট্রোল রড। সেগুলো দিয়ে নিউক্লিয়ার রি-অ্যাক্টরকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

4.7 ক্ষমতা (Power)

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ক্ষমতা শব্দটা অনেক ব্যবহার হয় এবং সব সময়ই যে শব্দটা ভালো কিছু বোঝানোর জন্য ব্যবহার হয় তা নয়! কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানে ক্ষমতা শব্দটার সুনির্দিষ্ট অর্থ আছে, ক্ষমতা হচ্ছে কাজ করার হার। অর্থাৎ t সময়ে W কাজ করা হয়ে থাকলে ক্ষমতা P হচ্ছে:

$$P = \frac{W}{t}$$

আমরা আগেই দেখেছি কাজ করার অর্থ হচ্ছে শক্তির রূপান্তর। শক্তির যেহেতু ধ্বংস নেই তাই কাজ করার মাঝে দিয়ে শক্তির রূপান্তর করা হয় মাত্র। তাই ইচ্ছে করলে আমরা বলতে পারি ক্ষমতা হচ্ছে শক্তির রূপান্তরের হার। কাজ বা শক্তি যেহেতু স্কেলার তাই ক্ষমতাও স্কেলার।

পদার্থবিজ্ঞান শিখতে গিয়ে আমরা নানা ধরনের রাশি সম্পর্কে জেনেছি, তাদের এককের নাম জেনেছি এবং চেষ্টা করেছি প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রে সেই রাশিটির মাত্রা সম্পর্কে জানতে। ক্ষমতা রাশিটির একক এবং মাত্রা হচ্ছে

ক্ষমতার একক: W (ওয়াট)
ক্ষমতার মাত্রা: $[P] = \mathrm{ML^2T^{-3}}$

এখানে এটি আমরা প্রথম জানলেও এর এককটি আমাদের খুব পরিচিত। যদি প্রতি সেকেন্ডে 1 জুল কাজ করা হয় তাহলে আমরা বলি 1 ওয়াট (W) কাজ করা হয়েছে বা শক্তির রূপান্তর হয়েছে। আমরা যদি 100 W এর একটা বাতি জ্বালাই তার অর্থ এই বাতিতে প্রতি সেকেন্ডে 100 J শক্তি ব্যয় হচ্ছে। যখন আমরা খবরের কাগজ পড়ি, দেশে 1000 MW নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরি হবে তার অর্থ সেই নিউক্লিয়ার শক্তিকেন্দ্রে প্রতি সেকেন্ডে 1000×10^6 J বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন হবে।

4.8 কর্মদক্ষতা (Efficiency)

আমরা একটু আগে বলেছিলাম যে শক্তিকে তার একটি রূপ থেকে অন্য রূপে রূপান্তরিত করার বেলায় সব সময়ই খানিকটা শক্তির অপচয় হয়। কাজেই সব সময়ই আমরা যে পরিমাণ কাজ করতে চাই তার সমপরিমাণ শক্তি দিলে হয় না, একটু বেশি শক্তি দিতে হয়। আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে নানা ধরনের যন্ত্র ব্যবহার করি। নানা ধরনের ইঞ্জিন ব্যবহার করি। তার সব সময়েই দেখা যায় সেগুলোতে ঘর্ষণ বা অন্যান্য কারণে শক্তির অপচয় হয়। সেজন্য প্রায় সময়ই একটি যন্ত্র বা ইঞ্জিন কতটুকু দক্ষতার সাথে শক্তি ব্যবহার করছে আমাদেরকে তার পরিমাপ করতে হয়। সেজন্য আমরা

কর্মদক্ষতা বলে একটি নতুন রাশি ব্যবহার করে থাকি। কর্মদক্ষতাকে শতকরা হিসাবে এভাবে লেখা যায়:

কর্মদক্ষতা হচ্ছে:

$$= \frac{\text{কাজের পরিমাণ}}{\text{প্রদত্ত শক্তি}} \times 100$$

$$= \frac{\text{প্রদত্ত শক্তি} - \text{শক্তির অপচয়}}{\text{প্রদত্ত শক্তি}} \times 100$$

উদাহরণ

প্রশ্ন: 1000 W এর একটি মোটর ব্যবহার করে 15 s এ একটি 10 kg ভরের বস্তুকে 10 m উপরে তোলা হলো শক্তির অপচয় কত? কর্মদক্ষতা কত?

উত্তর: কাজের পরিমাণ: $10 \times 9.8 \times 10\ J = 9{,}800\ J$

প্রদত্ত শক্তি: $1000 \times 15\ J = 15{,}000\ J$

শক্তির অপচয়: $15{,}000\ J - 9{,}800\ J = 5{,}200\ J$

কর্মদক্ষতা = $\frac{9{,}800\ J}{15{,}000\ J} \times 100\% = 65.3\%$

তোমরা শুনে অবাক হবে একটা বিদ্যুৎকেন্দ্রে বিদ্যুৎ উৎপাদন করার সময় প্রতিটি ধাপেই শক্তির অপচয় হয় এবং সবগুলো অপচয় হিসেবে নেওয়ার পর বিদ্যুৎকেন্দ্রের কর্মদক্ষতা 30% এ নেমে আসতে পারে।

প্রশ্ন: প্রত্যেকটি ধাপে 10% অপচয় হলে চার ধাপে কত কর্মদক্ষতা?

উত্তর: $0.9 \times 0.9 \times 0.9 \times 0.9 = 0.6561$

কিংবা 65.6%

অনুসন্ধান 4.01

শারীরিক ক্ষমতা

উদ্দেশ্য: শিক্ষার্থীর শারীরিক ক্ষমতা বের করা

যন্ত্রপাতি: একটি ঘড়ি এবং রুলার

কাজের ধারা:

1. একটি দালান যার সিঁড়ি দিয়ে দোতলা কিংবা তিন তলায় ওঠা সম্ভব।
2. দালানের সিঁড়ির সংখ্যা এবং সিঁড়ির উচ্চতা মেপে দুটি গুণ দিয়ে নিচ থেকে দোতলা কিংবা তিন তলার উচ্চতা বের করো।
3. একটি ওজন মাপার যন্ত্রে তোমার ভর মাপো।
4. তুমি যত দ্রুত সম্ভব সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠ, ঘড়ি ব্যবহার করে কতটুকু সময় লেগেছে মেপে নাও।
5. একইভাবে শ্রেণির অন্য শিক্ষার্থীদের ভর মেপে সিঁড়ি দিয়ে উপরে ওঠার সময়ের তথ্য সংগ্রহ করে নিচের ছকে বসাও।
6. তোমার এবং তোমার বন্ধুদের শারীরিক ক্ষমতা বের করো।

ছাদের উচ্চতা: h = ...

অভিকর্ষজ ত্বরণ: $g = 9.8\ m/s^2$

শিক্ষার্থীর নাম	ভর (m) kg	ছাদে ওঠার সময় (t) s	ক্ষমতা = $\frac{mgh}{t}$ W	গড় ক্ষমতা

সকল শিক্ষার্থীর গড় ক্ষমতা বের করে দেখো তোমার শারীরিক ক্ষমতা শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীদের গড় শারীরিক ক্ষমতা থেকে বেশি না কম।

4.9 উন্নয়ন কার্যক্রমে শক্তির ব্যবহার (Role of Energy in Development)

একটি দেশের উন্নয়নের সাথে শক্তির ব্যবহারের খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। সত্যি কথা বলতে কি একটি দেশ কতটুকু উন্নত সেটি বোঝার প্রথম মাপকাঠি হিসেবে শক্তির ব্যবহারকে বিবেচনা করা যেতে পারে।

আমাদের দেশের উন্নয়নের জন্য আমাদের সবার প্রথম শিক্ষার দিকে নজর দেওয়া উচিত। এই দেশে বিপুল সংখ্যক ছেলেমেয়ে স্কুল-কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে। তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ভালোভাবে চালানোর জন্য সেখানে প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হয়। তাদের পড়াশোনা করার জন্য রাতে আলোর দরকার হয় এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা না হলে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উচ্চশিক্ষার বেলায় ল্যাবরেটরি ব্যবহার করতে হয়, কম্পিউটার এবং নেটওয়ার্ককে সচল রাখতে হয় যার জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহের কোনো বিকল্প নেই।

আমাদের দেশের অর্থনীতিতে কৃষি খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেশটি ছোট বলে কৃষি উপযোগী ভূমির পরিমাণ কম এবং সেটি আরো কমে আসছে। এই কৃষিভূমিতে দুই বা ততোধিক ফসল ফলিয়ে আমাদের দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। এ কারণে শুধু প্রাকৃতিক কৃষির উপর অপেক্ষা না করে কৃষি জমিতে পানি সেচের ব্যবস্থা করতে হয় এবং শক্তির সরবরাহ ছাড়া সেটি কোনোভাবে সম্ভব না। পানি সেচের জন্য পাম্প চালাতে বিদ্যুৎ কিংবা জ্বালানির প্রয়োজন হয়। চাষাবাদের জন্য সারের প্রয়োজন হয় এবং সার কারখানায় বিদ্যুৎ এবং গ্যাস সরবরাহ ছাড়া প্রয়োজনীয় উৎপাদন সম্ভব নয়। জমি চাষ করার জন্য এবং ফসলকে প্রক্রিয়া করার জন্য ট্রাক্টর ব্যবহার করা হয় এবং ট্রাক্টরের জন্য প্রয়োজনীয় জ্বালানির সরবরাহ থাকতে হবে।

কৃষির পর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য শক্তির সরবরাহ প্রয়োজন। সুস্থ দেহে থাকার জন্য একটি স্বাস্থ্যকর পরিবেশ দরকার হয়। বাংলাদেশের মতো ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ তৈরি এবং বর্জ্য প্রক্রিয়াজাত করার জন্য শক্তির দরকার হয়। বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করার জন্য শক্তির দরকার হয়। চিকিৎসাসেবার জন্য হাসপাতালে এক মুহূর্তের জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকতে পারে না।

শিক্ষা, কৃষি এবং স্বাস্থ্য ছাড়াও দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিল্প, কলকারখানা এবং অবকাঠামো গড়ে তোলার জন্য শক্তির দরকার হয়। সে কারণে সঠিক পরিকল্পনা করে দেশে বিদ্যুৎকেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে যেন ভবিষ্যতে শক্তির ঘাটতি না হয়। শক্তির অপচয় বন্ধ করতে হবে এবং নতুন কূপ খনন করে গ্যাস অনুসন্ধান চালিয়ে যেতে হবে। দেশে বিদ্যুৎ প্রয়োজন অনেক বেড়ে যাওয়ার কারণে নিউক্লিয়ার শক্তি কেন্দ্র স্থাপন করা সম্ভাব্য সমাধান হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন

1. ঘর্ষণজনিত বল দিয়ে করা কাজ সব সময়ই নেগেটিভ হয় কেন?
2. একটা স্প্রিংকে কেটে দু'টুকরো করলে টুকরোগুলোর স্প্রিং ধ্রুবক k কি বাড়বে না কমবে?
3. পৃথিবী সচল রাখতে কি শক্তির প্রয়োজন নাকি ক্ষমতার প্রয়োজন?
4. ভরকে কি শক্তি হিসেবে বিবেচনা করা যায়?
5. বেগ 1 শতাংশ বাড়লে গতিশক্তি কত শতাংশ বাড়বে?
6. একটি দেয়াশলাইয়ের কাঠি দেয়াশলাই বাক্সে 5 N বলে ঘষা হলো। কাঠিটিকে 5 cm টানা হলো।
   (ক) কাঠি ঘষাতে কত শক্তি ব্যয় হলো?
   (খ) কাঠি টানতে যদি 0.5 s সময় লাগে তাহলে কত ক্ষমতা লাগল?
7. একটি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের রিজার্ভার সমুদ্র সমতল থেকে 800 m উঁচুতে এবং পাওয়ার স্টেশনটি 250 m উঁচুতে অবস্থিত। রিজার্ভারের পানি পাইপের মাধ্যমে এসে পাওয়ার স্টেশনের টার্বাইন ঘুরায়। রিজার্ভারে 2×10^9 লিটার পানি আছে। যদি 1 লিটার পানির ভর 1 kg হয়, তবে রির্জাভারের পানিতে কত বিভব শক্তি সঞ্চিত আছে।
8. 40 kg ভরের এক বালক সিঁড়ি দিয়ে 12 s ছাদে ওঠে। সিঁড়িতে ধাপের সংখ্যা 20টি এবং প্রতিটি ধাপের উচ্চতা 20 cm ।
   (ক) ঐ বালকের ওজন কত?
   (খ) বালকটি মোট কত উচ্চতায় আরোহণ করেছিল?
   (গ) ছাদে উঠতে সে কত কাজ করল?
   (ঘ) সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে উঠতে সে কত ক্ষমতা কাজে লাগাল?
9. যে সকল পাওয়ার স্টেশন জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার করে তাদের চেয়ে নিউক্লিয় শক্তি উৎপাদনের একটি মস্ত বড় সুবিধা হচ্ছে যে, এতে গ্রিনহাউস গ্যাস উৎপন্ন হয় না।
   (ক) নিউক্লিয় শক্তি ব্যবহারে অন্যান্য সুবিধাগুলো কী কী?
   (খ) নিউক্লিয় শক্তি ব্যবহারের অসুবিধাগুলো কী কী?

গাণিতিক প্রশ্ন

1. একটা বস্তুর ওপর বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বল প্রয়োগ করার কারণে তার বেগের পরিবর্তন হয় এবং সেটি 4.07 চিত্রে দেখানো হয়েছে। OA, AB, BC এবং CD এর মধ্যে কখন পজিটিভ কাজ কখন নেগেটিভ কাজ বা কখন শূন্য কাজ করা হয়েছে?

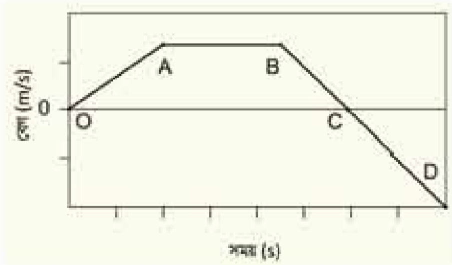

চিত্র 4.07: বেগ সময় লেখচিত্র।

2. 50 kg ভরের একটি মেয়ে 10 s এ সিঁড়ি বেয়ে 5 m উপরে উঠেছে। সে কতটুকু কাজ করেছে? তার ক্ষমতা কত?

3. 5 kg ভরের একটা স্থির বস্তুর ওপর 10 s একটি বল প্রয়োগ করার পর তার গতিশক্তি হলো 500 J. কী পরিমাণ বল প্রয়োগ করা হয়েছিল?

4. একটি কপিকলের (চিত্র 4.08) এক পাশে 10 kg এবং অন্য পাশে 5 kg ভরের দুটি বস্তুকে ঠিক 5 m উপরে স্থির অবস্থায় ধরে রাখা হয়েছে। তুমি বস্তু দুটিকে ছেড়ে দিলে, তখন 10 kg ভরটি নিচের দিকে এবং 5 kg ভরটি উপরের দিকে উঠতে শুরু করবে। যখন 10 kg ভরটি 1 m নিচে এবং 5 kg ভরটি 1 m উপরে উঠেছে তখন ভর দুটির বেগ কত?

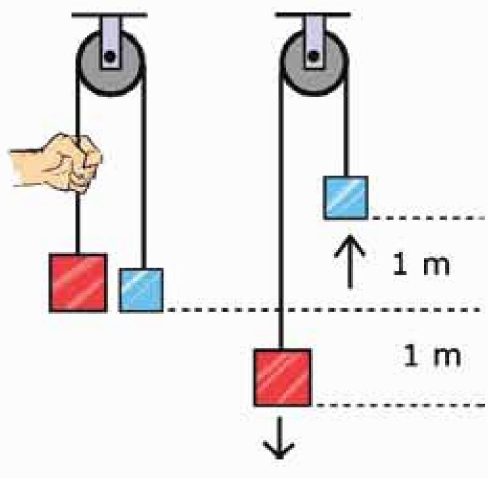

চিত্র 4.08: দুটি ভিন্ন ভর কপিকল দিয়ে ঝোলানো।

5. 100 m ওপর থেকে 5 kg ভরের একটি বস্তু ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, কোন উচ্চতায় বস্তুটির গতিশক্তি তার বিভব শক্তির দ্বিগুণ হবে?

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটির পাশে ঠিক (√) চিহ্ন দাও

1. কাজের একক কোনটি?

(ক) জুল (খ) নিউটন
(গ) কেলভিন (ঘ) ওয়াট

2. 5 kg ভরের একটি বস্তুকে 20 cm, 30 cm, 40 cm ও 50 cm উপরে রাখা হলো। কোন অবস্থানে তার বিভব শক্তি সবচেয়ে বেশি?

(ক) 20 cm (খ) 30 cm
(গ) 40 cm (ঘ) 50 cm

নিচের লেখচিত্র (চিত্র 4.09) অনুসারে 3 ও 4 নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

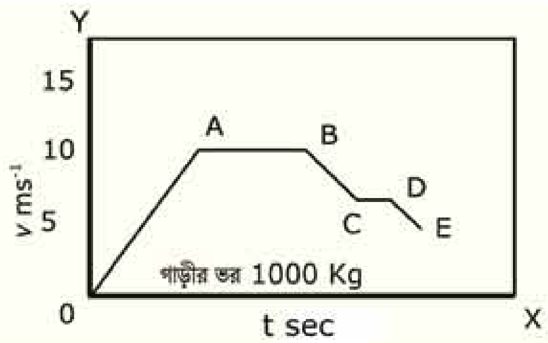

চিত্র 4.09: বেগ-সময় লেখচিত্র

3. চিত্র 4.10 লেখচিত্রের কোন অংশে বেগ-সময়ের সমানুপাতে বৃদ্ধি পায়?

(ক) OA অংশে (খ) AB অংশে
(গ) CD অংশে (ঘ) DE অংশে

4. সর্বোচ্চ গতিশক্তি কত?

(ক) 1.25×10^5 J (খ) 5.0×10^4 J
(গ) 1.25×10^4 J (ঘ) 6.2×10^3 J

5. শক্তির সংরক্ষণশীলতা নীতি থেকে পাওয়া যায়?

   (i) শক্তির সৃষ্টি ও বিনাশ নাই, মহাবিশ্বের মোট শক্তি নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয়

   (ii) অনবায়নযোগ্য শক্তি দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যাবে, তাই নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহার করতে হবে

   (iii) শক্তিকে রক্ষা করতে এর কার্যকর ব্যবহার এবং সিস্টেম লস কমানো জরুরি

নিচের কোনটি সঠিক

(ক) i (খ) ii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

6. একটি কম্বুকে টান টান করলে এর মধ্যে কোন শক্তি জমা থাকে?

(ক) গতিশক্তি (খ) বিভব শক্তি

(গ) তাপশক্তি (ঘ) রাসায়নিক শক্তি

সৃজনশীল প্রশ্ন

1. 40 kg ভরের একটি বালক এবং 60 kg ভরের একজন যুবক একটি ভবনের নিচতলা থেকে এক সাথে দৌড় শুরু করে দৌড়ে একই সময়ে ছাদের একই জায়গায় পৌঁছাল। দৌড়ের সময় উভয়ের বেগ ছিল 30 m/min ।

   (ক) ক্ষমতা কী?

   (খ) 50 J কাজ বলতে কী বোঝায়?

   (গ) যুবকদের গতিশক্তি নির্ণয় করো।

   (ঘ) ছাদে উঠার ক্ষেত্রে দুজনের ক্ষমতা সমান ছিল কিনা গাণিতিক যুক্তিসহ যাচাই করো।

2. জেনি একটি বাড়ির 5 তলায় থাকে। প্রতিটি সিঁড়ির উচ্চতা 20 সেমি এবং প্রতি তলায় 22টি সিঁড়ি থাকলে 5 তলায় উঠতে জেনির 4 মিনিট সময় লাগে। ঐ 5 তলায় উঠতে সুস্মিতার 4.5 মিনিট সময় লাগে। এখানে উল্লেখ্য যে, জেনির ভর 64 কেজি এবং সুস্মিতার ভর 75 কেজি।

   (ক) শক্তির প্রধান উৎস কী?

   (খ) কাজ ও শক্তি এর মধ্যে দুটি মিল লিখ।

   (গ) জেনি কী পরিমাণ কাজ সম্পাদন করেছিল হিসাব করো।

   (ঘ) জেনি ও সুস্মিতার মধ্যে কার ক্ষমতা বেশি? উত্তরের স্বপেক্ষে যুক্তি দাও ।

পঞ্চম অধ্যায়

পদার্থের অবস্থা ও চাপ

(State of Matter and Pressure)

এভারেস্ট বিজয়ী নিশাত মজুমদার এভারেস্টে অক্সিজেন সিলিন্ডার ব্যবহার করে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছেন।

কঠিন, তরল এবং বায়বীয় পদার্থের এই তিনটি অবস্থার সাথে আমরা পরিচিত। এর মাঝে তরল এবং বায়বীয় পদার্থ "প্রবাহিত" হতে পারে তাই এই দুটোকে প্রবাহীও বলা হয়ে থাকে। এই অধ্যায়ে আমরা পদার্থ তার তিন অবস্থাতে কীভাবে চাপ প্রয়োগ করে সেটি বিশ্লেষণ করে দেখব। শুধু তাই নয়, পদার্থের একটি বিশেষ ধর্ম হচ্ছে স্থিতিস্থাপকতা। কঠিন, তরল এবং বায়বীয় অবস্থায় স্থিতিস্থাপকতার ধর্ম কীভাবে কাজ করে সেটি নিয়েও আলোচনা করা হবে।

কঠিন, তরল এবং বায়বীয় ছাড়াও "প্লাজমা" নামে পদার্থের আরো একটি অবস্থা আছে, কেন এটিকে পদার্থের চতুর্থ অবস্থা বলা হয়, আমরা সেটিও বোঝার চেষ্টা করব।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- বল ও ক্ষেত্রফলের পরিবর্তনের সাথে চাপের পরিবর্তন ব্যাখ্যা করতে পারব।
- স্থির তরলের মধ্যে কোনো বিন্দুতে চাপের রাশিমালা পরিমাপ করতে পারব।
- তরলে নিমজ্জিত বস্তুর ঊর্ধ্বমুখী চাপের অনুভূতি ব্যাখ্যা করতে পারব।
- প্যাসকেলের সূত্র ব্যাখ্যা করতে পারব।
- প্যাসকেলের সূত্রের ব্যবহারিক ক্রিয়া প্রদর্শন করতে পারব।
- আর্কিমিডিসের সূত্র ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ঘনত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- দৈনন্দিন জীবনে ঘনত্বের ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বস্তু কেন পানিতে ভাসে তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বাংলাদেশে নৌপথে দুর্ঘটনার কারণ বিশ্লেষণ করতে পারব।
- বায়ুমণ্ডলের চাপ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- তরল স্তম্ভের উচ্চতা ব্যবহার করে বায়ুমণ্ডলীয় চাপ পরিমাপ করতে পারব।
- উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে বায়ুমণ্ডলের চাপের পরিবর্তন বিশ্লেষণ করতে পারব।
- আবহাওয়ার উপর বায়ুমণ্ডলের চাপের পরিবর্তন বিশ্লেষণ করতে পারব।
- পীড়ন ও বিকৃতি ব্যাখ্যা করতে পারব।
- হুকের সূত্র ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পদার্থের আণবিক গতিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পদার্থের প্লাজমা অবস্থা ব্যাখ্যা করতে পারব।

5.1 চাপ (Pressure)

আমরা আমাদের দৈনন্দিন কথাবার্তায় চাপ শব্দটা নানাভাবে ব্যবহার করলেও পদার্থবিজ্ঞানে চাপ শব্দটার একটা সুনির্দিষ্ট অর্থ রয়েছে। আমরা আগের অধ্যায়গুলোতে নানা সময় নানা ধরনের বল প্রয়োগ করার কথা বলেছি, তবে বলটি ঠিক কীভাবে প্রয়োগ করা হবে, সেটি বলা হয়নি। যেমন তুমি একটা পাথরকে এক হাতে ঠেলতে পার, দুই হাতে ঠেলতে পার কিংবা তোমার সারা শরীর দিয়ে ঠেলতে পার (চিত্র 5.01)। প্রত্যেকবার তুমি সমান পরিমাণ বল প্রয়োগ করলেও চাপ কিন্তু হবে ভিন্ন। প্রথম ক্ষেত্রে তুমি তোমার হাতের তালুর ক্ষেত্রফলের ভেতর দিয়ে বল প্রয়োগ করেছ, যদি তোমার প্রয়োগ করা বল হয় F এবং হাতের তালুর ক্ষেত্রফল হয় A তাহলে চাপ P হচ্ছে

$$P = \frac{F}{A}$$

চাপের একক $\frac{N}{m^2}$ অথবা Pa (প্যাসকেল)

চাপের মাত্রা $[P] = ML^{-1}T^{-2}$

কাজেই দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দুই হাত ব্যবহার করায় বল প্রয়োগকারী ক্ষেত্রফল দ্বিগুণ বেড়ে যাবে বলে চাপ অর্ধেক হয়ে যাবে, তৃতীয় ক্ষেত্রে সারা শরীর ব্যবহার করে বল প্রয়োগ করায় বল প্রয়োগকারী ক্ষেত্রফল আরো বেড়ে যাবে তাই চাপ আরো কমে যাবে।

বল একটি ভেক্টর, তাই তোমাদের ধারণা হতে পারে চাপ P বুঝি ভেক্টর। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে চাপ P কিন্তু একটা স্কেলার রাশি এবং আমরা যদি সঠিকভাবে লিখতে চাই তাহলে এটি লেখা উচিত এভাবে:

চিত্র 5.01: কতটুকু জায়গায় বল প্রয়োগ করা হচ্ছে তার উপরে চাপ নির্ভর করে।

$$F = PA$$

অর্থাৎ ক্ষেত্রফলকেই ভেক্টর হিসেবে ধরা হয়! ভেক্টরের পরিমাপ আর দিক থাকতে হয়, ক্ষেত্রফলের পরিমাপটুকু হচ্ছে ভেক্টরের পরিমাপ, ক্ষেত্রফলের উপর লম্ব হচ্ছে ভেক্টরের দিক।

চাপ স্কেলার হওয়ার কারণে এর কোনো দিক নেই। এটি খুবই প্রয়োজনীয়, কারণ চাপ ধারণাটি কঠিন পদার্থ থেকে অনেক বেশি প্রয়োজনীয় তরল কিংবা বায়বীয় পদার্থে। তরল বা বায়বীয় পদার্থ যখন চাপ প্রয়োগ করে তখন আসলে সেটি দিকের উপর নির্ভর করে না। এই বিষয়টি আমরা একটু পরেই দেখব।

উদাহরণ

প্রশ্ন: ধরা যাক তোমার ভর 50 kg, তোমার শরীরের এক পাশের ক্ষেত্রফল $0.5\ \mathrm{m}^2$ এবং দুই পায়ের তলার ক্ষেত্রফল $0.03\ \mathrm{m}^2$। তুমি চিত হয়ে শুয়ে থাকলে মেঝেতে কত চাপ প্রয়োগ করবে এবং দাঁড়িয়ে থাকলে মেঝেতে কত চাপ প্রয়োগ করবে?

উত্তর: ভর 50 kg কাজেই ওজন $50 \times 9.8\ \mathrm{N} = 490\ \mathrm{N}$

যখন শুয়ে থাকো তখন চাপ

$$P = \frac{490\ \mathrm{N}}{0.5\ \mathrm{m}^2} = 980\ \frac{\mathrm{N}}{\mathrm{m}^2}$$

যখন দাঁড়িয়ে থাকো তখন চাপ

$$P = \frac{490\ \mathrm{N}}{0.03\ \mathrm{m}^2} = 16{,}333\ \frac{\mathrm{N}}{\mathrm{m}^2}$$

দেখতেই পাচ্ছ শুয়ে পড়লে অনেক কম চাপ দেওয়া হয়। এজন্য মানুষ যখন চোরাবালিতে পড়ে তখন নিজেকে বাঁচানোর জন্য সব সময় শুয়ে পড়তে হয় যেন সে অনেক কম চাপ দেয় এবং চোরাবালিতে সহজে ডুবে না যায়।

আবার এর উল্টোটাও সত্যি, বল প্রয়োগ করার অংশটুকুর ক্ষেত্রফল যদি কম হয় তাহলে চাপ বেড়ে যায়। একটি পেরেকের সুচালো মুখের ক্ষেত্রফল খুবই কম তাই এটি যখন কাঠ বা দেয়ালে স্পর্শ করে পেছনের চওড়া মাথায় হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করা হয় তখন বলটি সুচালো মাথা দিয়ে কাঠ বা দেয়ালে চাপ দেয়। সুচালো মাথার ক্ষেত্রফল যেহেতু খুবই কম তাই চাপটি খুবই বেশি এবং অনায়াসে কাঠ বা দেয়ালে ঢুকে যেতে পারে। ছুরির বেলাতেও এই কথাটি সত্যি। তার ধারালো মাথা খুব সরু বলে সেই মাথা দিয়ে কোনো কিছুতে অনেক চাপ দিতে পারে এবং সহজেই সেটি ব্যবহার করে কাটা সম্ভব।

চাপের এককের আরেকটি নাম প্যাসকেল (Pa), 1 N বল 1 m^2 ক্ষেত্রফলের উপর প্রয়োগ করলে 1 Pa (1 প্যাসকেল) চাপ প্রয়োগ করা হয়।

5.2 ঘনত্ব (Density)

তরল এবং বায়বীয় পদার্থের চাপ বোঝার আগে আমাদের ঘনত্ব সম্পর্কে ধারণাটি অনেক স্পষ্ট থাকা দরকার। ঘনত্ব হচ্ছে একক আয়তনে ভরের পরিমাণ অর্থাৎ কোনো বস্তুর ভর যদি m এবং আয়তন V হয় তাহলে তার ঘনত্ব

$$\rho = \frac{m}{V}$$

> ঘনত্বের একক kg/m^3 অথবা gm/cc
> ঘনত্বের মাত্রা $[P] = ML^{-3}$

টেবিল 5.01 এ তোমাদের পরিচিত কয়েকটি পদার্থের ঘনত্ব দেওয়া হলো। এখানে একটা বিষয় মনে রাখা ভালো, তাপমাত্রা বাড়লে কিংবা কমলে পদার্থের আয়তন বাড়বে কিংবা কমতে পারে। যেহেতু ভরের কোনো পরিবর্তন হয় না তাই পদার্থের ঘনত্ব তাপমাত্রার সাথে পরিবর্তন হতে পারে। সেজন্য পদার্থের ঘনত্বের কথা বলতে হলে সাধারণত সেটি কোন তাপমাত্রায় মাপা হয়েছে সেটিও বলে দিতে হয়।

টেবিল 5.01: বিভিন্ন পদার্থের ঘনত্ব

পদার্থ	ঘনত্ব (gm/cc)
বাতাস	0.00127
কর্ক	0.25
কাঠ	0.4 - 0.5
মানবদেহ	0.995
পানি	1.00
কাচ	2.60
লোহা	7.80
পারদ	13.6
সোনা	19.30

উদাহরণ

প্রশ্ন: 1 kg পানিতে 0.25 kg লবণ গুলে নেওয়ার পর তার আয়তন হলো 1200 cc এই পানির ঘনত্ব কত?

উত্তর: 1 cc হচ্ছে 1 cm^3 কাজেই

$$1\ cc = (10^{-2}\ m)^3 = 10^{-6}\ m^3$$

২০২৫

কাজেই লবণ গোলা পানির ঘনত্ব

$$\rho = \frac{1\ \text{kg} + 0.25\ \text{kg}}{1200 \times 10^{-6}\ \text{m}^3} = 1.04 \times 10^3\ \text{kg/m}^3$$

প্রশ্ন: জর্ডানের ডেড সি (Dead sea) এর ঘনত্ব 1.24 kg/liter এই সমুদ্রের 1 kg পানির আয়তন কত?

উত্তর: 1 litre হচ্ছে 1000 cc বা 10^{-3} m^3 কাজেই জর্ডানের ডেড সি এর পানির ঘনত্ব

$$\rho = 1.24\ \frac{\text{kg}}{\text{liter}} = \frac{1.24\ \text{kg}}{10^{-3}\ \text{m}^3} = 1.24 \times 10^3\ \text{kg m}^{-3}$$

কাজেই 1 kg পানির আয়তন:

$$V = \frac{m}{\rho} = \frac{1\ \text{kg}}{1.24 \times 10^3\ \text{kg m}^{-3}} = 0.81 \times 10^{-3}\ \text{m}^3$$

কিংবা 0.81 liter

প্রশ্ন: নিউক্লিয়াসের ঘনত্ব কত? 1 চা চামচ নিউক্লিয়াসের ভর কত?

উত্তর: নিউক্লিয়াস তৈরি হয় নিউট্রন আর প্রোটন দিয়ে। তাদের একটার ভর 1.67×10^{-27} kg, তাদের ব্যাসার্ধ আনুমানিক $1.25\ \text{fm} = 1.25 \times 10^{-15}\ \text{m}$ কাজেই নিউট্রন কিংবা প্রোটনের ঘনত্ব বের করতে পারলে সেটাকেই নিউক্লিয়াসের ঘনত্ব হিসেবে ধরতে পারি!

নিউক্লিয়াসের ঘনত্ব

$$\rho = \frac{m}{\frac{4\pi}{3} r^3} = \frac{1.67 \times 10^{-27}\ \text{kg}}{\frac{4\pi}{3}(1.25 \times 10^{-15}\ \text{m})^3} = 0.204 \times 10^{18}\ \text{kg/m}^3$$

এই সংখ্যাটি যে কত বিশাল সেটা তোমাদের অনুমান করা দরকার। এক চা চামচে মোটামুটি 1 cc জিনিস ধরে, কাজেই এক চা-চামচ নিউক্লিয়াসের ভর:

$$m = 0.204 \times 10^{18}\ \text{kg/m}^3 \times 10^{-6}\ \text{m}^3 = 2 \times 10^{11}\ \text{kg}$$

এটা মোটামুটিভাবে পৃথিবীর সব মানুষের সম্মিলিত ভর।

আবার অন্যভাবেও এটা দেখতে পারি। একটা পরমাণুতে নিউক্লিয়াসে নিউটন-প্রোটন থাকে, বাইরে থাকে ইলেকট্রন। ইলেকট্রনের ভর নিউট্রন-প্রোটনের ভর থেকে প্রায় 1800 গুণ কম, কাজেই যেকোনো জিনিসের ভরটা আসলে নিউক্লিয়াসের ভর। ইলেকট্রনগুলোকে না ধরলে খুব একটা ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না। কিন্তু আমরা চারপাশে যেসব দেখি তার আকার কিন্তু নিউক্লিয়াসের আয়তন নয়। তার আয়তন এসেছে পরমাণুর আয়তন থেকে। খুব ছোট একটা নিউক্লিয়াসকে ঘিরে তুলনামূলকভাবে অনেক বড় একটা কক্ষপথে ইলেকট্রন ঘুরতে থাকে। নিউক্লিয়াসের ব্যাসার্ধ থেকে পরমাণুর ব্যাসার্ধ প্রায় এক লক্ষ গুণ বড়।

কাজেই আমরা অন্যভাবে বলতে পারি, পৃথিবীর সব মানুষকে একত্র করে যদি কোনোভাবে চাপ দিয়ে তাদের শরীরের যে কয়টি পরমাণু আছে সেগুলো ভেঙে সমস্ত নিউক্লিয়াস একত্র করে ফেলা যায় তাহলে সেটা একটা চা চামচে এঁটে যাবে!

5.2.1 দৈনন্দিন জীবনে ঘনত্বের ব্যবহার

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ঘনত্ব একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সেটা অনেক সময় আমরা আলাদা করে লক্ষ করি না। যেমন ধরা যাক চুলোতে একটা পাত্রে আমরা যখন পানি গরম করতে দিই, কিছুক্ষণের মাঝেই পানি টগবগ করে ফুটতে থাকে। তার কারণ পাত্রের নিচের অংশে যে পানি থাকে সেটি যখন চুলোর আগুনে উত্তপ্ত হয়ে প্রসারিত হয় তখন তার ঘনত্ব কমে যায়। ঘনত্ব কম বলে সেই পানিটা উপরে উঠে যায় এবং আশেপাশের শীতল পানি নিচে এসে জমা হয়। একটু পর উত্তপ্ত হয়ে সেটাও উপরে উঠে যায় এবং এভাবে চলতেই থাকে এবং কিছুক্ষণেই পানিটা ফুটতে থাকে (এই পদ্ধতিতে পানি কিংবা গ্যাসকে গরম করার পদ্ধতির নাম কনভেকশন বা পরিচলন)। যদি উত্তপ্ত করার পর পানির ঘনত্ব কমে না যেত তাহলে সেটি উপরে উঠে যেত না এবং চুলোর আগুনে শুধু পাত্রের নিচের পানি গরম করতে পারতাম এবং পুরো পাত্রের পানি উত্তপ্ত করা সম্ভব হতো না।

গ্রীষ্মকালের প্রচণ্ড রোদের মাঝে যারা পুকুরের পানিতে ঝাঁপ দিয়েছ তারা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ পুকুরের উপরের পানিটা উষ্ণ হলেও নিচের পানি শীতল। এখানে তাপটুকু এসেছে উপর থেকে এবং পানি গরম হওয়ার পর ঘনত্ব কমে গিয়ে উপরেই রয়ে গেছে, পুকুরের পুরো পানি সমানভাবে উত্তপ্ত হতে পারেনি।

বিভিন্ন অনুষ্ঠানের উদ্বোধনীতে আমরা বেলুন ওড়াতে দেখেছি। এই বেলুনকে ওড়ানোর জন্য তার ভেতর বাতাস থেকে হালকা কোনো গ্যাস ঢোকাতে হয়। নিরাপত্তার দিক থেকে বিবেচনা করা হলে সেটি নিষ্ক্রিয় হিলিয়াম গ্যাস দিয়ে ভরার কথা কিন্তু হিলিয়াম গ্যাস তুলনামূলকভাবে অনেক ব্যয়বহুল বলে প্রায় সময়েই হাইড্রোজেন গ্যাস দিয়ে কাজ সারা হয়, যেটি যথেষ্ট বিপজ্জনক। শুধু তাই নয়,

জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত মিথেন গ্যাস বাতাস থেকে হালকা বলে অনেক সময় এই গ্যাস দিয়েও গ্যাস বেলুন তৈরি করে ব্যবহার করা হয়, যেটি সমান বিপজ্জনক।

আমরা অনেক সময় ফানুস ওড়াতে দেখেছি। এই ফানুসের নিচেও একটা আগুন জ্বালানো হয়, সেটি ফানুসকে আলোকোজ্জ্বল করার সাথে সাথে ভেতরের বাতাসকে উত্তপ্ত করে হালকা করে উপরে নিয়ে যায়।

একটি ডিম ভালো না পচা সেটা ইচ্ছে করলে পানিতে ডুবিয়ে বের করা যায়। যথেষ্ট পচা হলে তার ঘনত্ব পানি থেকে কম হবে এবং সেটি পানিতে ভেসে উঠবে।

5.3 তরলের ভেতর চাপ (Pressure in Liquids)

যারা পানিতে ঝাঁপাঝাঁপি করেছে তারা সবাই জানে পানির গভীরে গেলে এক ধরনের চাপ অনুভব করা যায় (যদিও বায়ুমণ্ডল আমাদের ওপর একটা চাপ দেয় কিন্তু আমরা সেটা অনুভব করি না। কারণ আমাদের শরীরও সমান পরিমাণ চাপ দেয়।) পানি কিংবা অন্য কোনো তরলের গভীরে গেলে ঠিক কতটুকু চাপ অনুভব করা যাবে সেটি ইতিমধ্যে তোমাদের বলা হয়েছে। তোমার উপরে তরলের যে স্তম্ভটুকু থাকবে তার ওজন থেকেই তোমার উপরের চাপ নির্ণয় করতে হবে। ধরা যাক তুমি তরলের h গভীরতায় চাপ নির্ণয় করতে চাইছ। সেখানে A ক্ষেত্রফলের একটি পৃষ্ঠ কল্পনা করে নাও (চিত্র 5.02)। তার উপরে তরলের যে স্তম্ভটুকু হবে সেখানকার তরলটুকুর ওজন A পৃষ্ঠে বল প্রয়োগ করবে।

A পৃষ্ঠের উপরের তরলটুকুর আয়তন Ah তরলের ঘনত্ব যদি ρ হয় তাহলে এই তরলের ওজন বা বল

$$F = mg = (Ah\rho)g$$

কাজেই চাপ:

$$P = \frac{F}{A} = \frac{Ah\rho g}{A} = h\rho g$$

অর্থাৎ নির্দিষ্ট ঘনত্বের তরলে গভীরতার সাথে সাথে চাপ বাড়তে থাকে। পানির বেলায় আনুমানিক প্রতি দশ মিটার গভীরতায় বাতাসের চাপের সমপরিমাণ চাপ বেড়ে যায়।

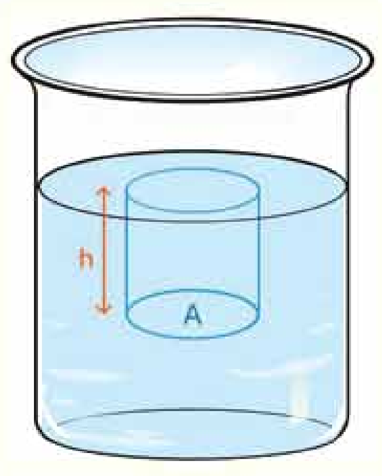

চিত্র 5.02: তরলের উচ্চতার জন্য নিচের পৃষ্ঠে চাপ সৃষ্টি হয়।

২০২৫

বাতাস বা গ্যাসকে যে রকম চাপ দিয়ে সংকুচিত করে তার ঘনত্ব বাড়িয়ে ফেলা যায় তরলের বেলায় কিন্তু সেটি সত্যি নয় (কঠিনের বেলায় তো নয়ই!) তরলকে চাপ দিয়ে সে রকম সংকুচিত করা যায় না তাই তার ঘনত্ব বাড়ানো কিংবা কমানো যায় না। 5.03 চিত্রে সমুদ্রের পৃষ্ঠদেশ থেকে সমুদ্রের গভীরতায় গেলে কীভাবে পানির চাপ বাড়তে থাকে সেটা দেখানো হয়েছে। যেহেতু পানির ঘনত্ব প্রায় সমান তাই চাপটা সমান হারে বাড়ছে। সমুদ্রপৃষ্ঠে শূন্য থেকে শুরু করে সমুদ্রের তলদেশে সেটি অনেক বেড়ে গেছে।

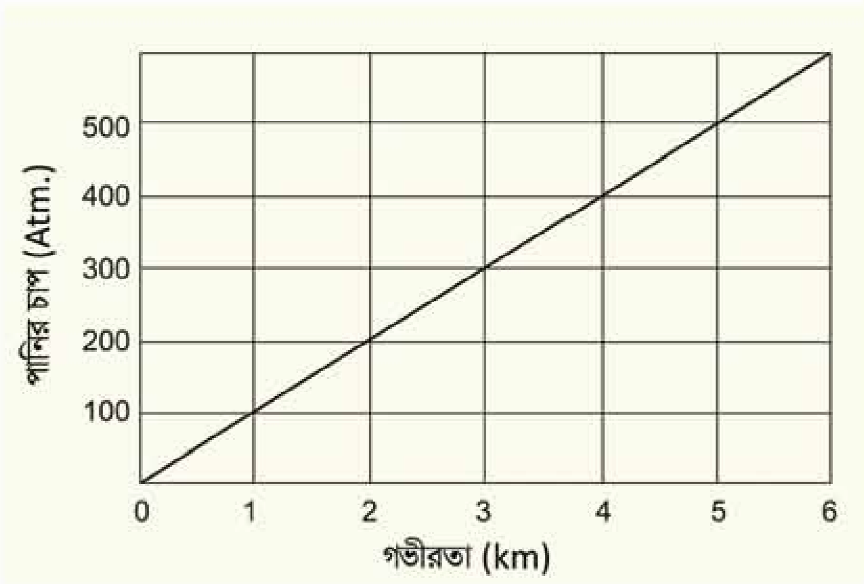

চিত্র 5.03: পানির গভীরতার সাথে সাথে পানির চাপ বেড়ে যায়।

উদাহরণ

প্রশ্ন: তিমি মাছ সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 2,100 m গভীরতায় যেতে পারে, সেটি কত চাপ সহ্য করতে পারে?

উত্তর: তিমি মাছ

$$P = \frac{2,100\ \text{m}}{10\ \text{m/atm}} = 210\ \text{atm}$$

চাপ সহ্য করতে পারে।

প্রশ্ন: পানির নিচে প্রতি 33 ft (10 m) গভীরতায় 1 atm চাপ বেড়ে যায়। ডাইভাররা সর্বোচ্চ 1,000 ft (330 m) গভীর পর্যন্ত গিয়েছে, সেখানে তাদের কতটুকু চাপ সহ্য করতে হয়েছে?

উত্তর: প্রতি 10 m এ 1 atm বা 1 bar চাপ বেড়ে গেলে 330 m গভীরতায়

$$\frac{330\ \text{m}}{10\ \text{m/atm}} = 33\ \text{atm}$$

ডাইভারদের 33 atm চাপ সহ্য করতে হবে।

প্রশ্ন: কেরোসিন (ঘনত্ব 800 kg m^{-3}), পানি (ঘনত্ব 1000 kg m^{-3}) এবং পারদ (ঘনত্ব 13,600 kg m^{-3}) এই তিনটি তরলের জন্য 50 cm নিচে চাপ বের করো

উত্তর: চাপ $P = h\rho g$

কেরোসিনের জন্য

$$P = 0.50\ \text{m} \times 800\ \text{kg m}^{-3} \times 9.8\ \text{N kg}^{-1} = 3{,}920\ \text{N m}^{-2}$$

পানির জন্য

$$P = 0.50\ \text{m} \times 1000\ \text{kg m}^{-3} \times 9.8\ \text{N kg}^{-1} = 4{,}900\ \text{N m}^{-2}$$

পারদের জন্য

$$P = 0.50\ \text{m} \times 13{,}600\ \text{kg m}^{-3} \times 9.8\ \text{N kg}^{-1} = 666{,}400\ \text{N m}^{-2}$$

প্রশ্ন: কেরোসিন, পানি এবং পারদ এই তিনটি তরলের কত গভীরতায় 1 atm এর সমান চাপ হবে?

উত্তর: আমরা জানি পারদের জন্য 76 cm গভীরতায় 1 atm চাপ হয়। পানির ঘনত্ব পারদ থেকে 13.6 গুণ কম কাজেই পানির গভীরতা 13.6 গুণ বেশি হবে। অর্থাৎ পানির গভীরতা:

$$76\ \text{cm} \times 13.6 = 1034\ \text{cm} = 10.34\ \text{m}$$

কেরোসিনের ঘনত্ব পানির ঘনত্ব থেকে 0.8 গুণ কম কাজেই কেরোসিনের জন্য গভীরতা পানির গভীরতা থেকে 1/0.8 = 1.25 গুণ বেশি হবে

$$10.34\ \text{m} \times 1.25 = 12.92\ \text{m}$$

২০২৫

5.3.1 আর্কিমিডিসের সূত্র এবং প্লবতা

তোমরা সবাই নিশ্চয়ই আর্কিমিডিসের সূত্র এবং সেই সূত্রের পেছনের গল্পটি জানো। সূত্রটি সহজ, কোনো বস্তু তরলে নিমজ্জিত করলে সেটি যে পরিমাণ তরল অপসারণ করে সেইটুকু তরলের সমান ওজন বস্তুটির ওজন থেকে কমে যায়। আমরা এখন এই সূত্রটি বের করব। 5.04 চিত্রে দেখানো হয়েছে খানিকটা তরল পদার্থে একটা সিলিন্ডার ডোবানো রয়েছে। (এটি সিলিন্ডার না হয়ে অন্য যেকোনো আকৃতির বস্তু হতে পারত, আমরা হিসাবের সুবিধার জন্য সিলিন্ডার নিয়েছি।) ধরা যাক সিলিন্ডারের উচ্চতা h এবং উপরের ও নিচের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল A। আমরা কল্পনা করে নিই সিলিন্ডারটি এমনভাবে তরলে ডুবিয়ে রাখা হয়েছে যেন তার উপরের পৃষ্ঠটির গভীরতা h_1 এবং নিচের পৃষ্ঠের গভীরতা h_2.

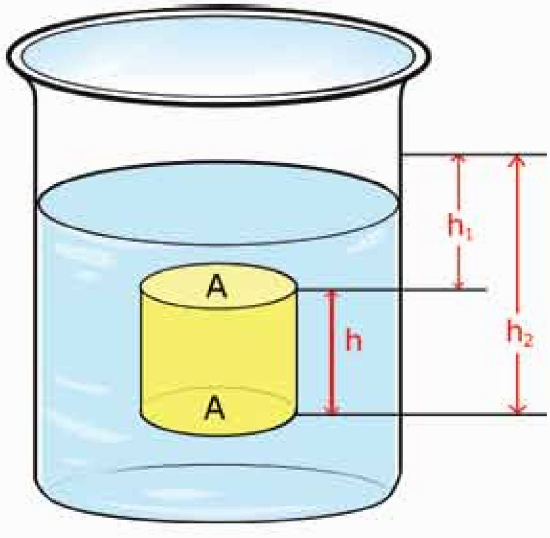

চিত্র 5.04: একটি বস্তু যতটুকু তরল অপসারিত করে তার সমপরিমাণ ওজন হারায়।

আমরা অনেকবার তোমাদের বলেছি যে তরল (কিংবা বায়বীয়) পদার্থে চাপ কোনো নির্দিষ্ট দিকে কাজ করে না। এটি সব দিকে কাজ করে। কাজেই সিলিন্ডারের উপরের পৃষ্ঠে নিচের দিকে যে চাপ কাজ করে তার পরিমাণ

$$P_1 = h_1\rho g$$

এবং নিচের পৃষ্ঠে উপরের দিকে যে চাপ কাজ করে তার পরিমাণ

$$P_2 = h_2\rho g$$

কাজেই সিলিন্ডারে উপর পৃষ্ঠে নিচের দিকে এবং নিচের পৃষ্ঠে উপরের দিকে প্রয়োগ করা বল যথাক্রমে:

$$F_1 = AP_1 = Ah_1\rho g$$

$$F_2 = AP_2 = Ah_2\rho g$$

চারপাশের পৃষ্ঠের উপর কতটুকু বল প্রয়োগ হয়েছে সেটা নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাতে হবে না, কারণ সিলিন্ডারটি একদিক থেকে যে বল অনুভব করে অন্যদিক থেকে ঠিক তার বিপরীত পরিমাণ বল

অনুভব করে এবং একে অন্যকে কাটাকাটি করে দেয়। যেহেতু h_2 এর মান h_1 থেকে বেশি তাই দেখতে পাচ্ছি F_2 এর মান F_1 থেকে বেশি। কাজেই মোট বলটি হবে উপরের দিকে এবং তার পরিমাণ:

$$F = F_2 - F_1 = A(h_2 - h_1)\rho g$$

$$F = Ah\rho g$$

যেহেতু Ah হচ্ছে সিলিন্ডারের আয়তন, ρ তরলের ঘনত্ব এবং g মাধ্যাকর্ষণজনিত ত্বরণ, কাজেই উপরের দিকে প্রয়োগ করা বলের পরিমাণ হচ্ছে সিলিন্ডারের আয়তনের সমান তরলের ওজন। ঠিক যেটি আর্কিমিডিসের সূত্র নামে পরিচিত। ঊর্ধ্বমুখী এই বলটিকে প্লবতা (Buoyancy) বলে।

নিজে করো

একটি রাবার ব্যান্ডের এক মাথায় একটা বড় আলু বা অন্য কোনো ফল বেঁধে ঝুলিয়ে দেখো রাবার ব্যান্ডটি কতখানি লম্বা হয়ে আছে। এবারে আলু কিংবা ফলটি পানিতে ডুবিয়ে নাও দেখবে রাবার ব্যান্ডটি বেশ খানিকটা সংকুচিত হয়ে গেছে, কারণ ডুবন্ত অবস্থায় ফলটির ওজন অনেক কম।

5.3.2 বস্তুর ভেসে থাকা বা ডুবে যাওয়া

এখন তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ কেন একটা বস্তু ভেসে থাকে আবার অন্য একটা বস্তু ডুবে যায়। তোমরা জানো একটা বস্তু পানিতে ডোবানো হলে প্লবতার কারণে সেটা যতটুকু পানি সরিয়েছে উপরের দিকে সেই পানির ওজনের সমপরিমাণ বল অনুভব করে। সেই বলটি বস্তুটার ওজনের বেশি হলে বস্তুটা ভেসে থাকবে। ঠিক যে পরিমাণ ডুবে থাকলে বস্তুর সমান ওজনের পানি অপসারণ করবে ততটুকুই ডুববে, বাকি অংশটুকু পানিতে ডুবে যাবে না।

যদি বস্তুটার ওজন অপসারিত পানির ওজন থেকে বেশি হয় তাহলে সেটি পানিতে ডুবে যাবে। তবে পানিতে ডুবে থাকা অবস্থায় তার ওজন কিন্তু সত্যিকার ওজন থেকে কম মনে হবে।

যদি কোনোভাবে বস্তুটার ওজন অপসারিত পানির ওজনের ঠিক সমান করে ফেলা যায় তাহলে বস্তুটাকে পানির ভেতরে যেখানেই রাখা হবে সেটা সেখানেই থাকবে, উপরেও ভেসে উঠবে না, নিচেও ডুবে যাবে না। দৈনন্দিন জীবনে সে রকম কিছু চোখে না পড়লেও পানির নিচে দিয়ে চলাচল করার জন্য সাবমেরিনে এটি করা হয়।

উদাহরণ

প্রশ্ন: এক টুকরো কাঠ পানিতে ভাসিয়ে দিলে তার কত শতাংশ ডুবে থাকবে? (কাঠের ঘনত্ব $\rho = 0.5 \times 10^3\ \mathrm{kg/m^3}$ পানির ঘনত্ব $\rho_W = 10^3\ \mathrm{kg/m^3}$)

উত্তর: কাঠকে ভেসে থাকতে হলে তার ডুবন্ত অংশের সমপরিমাণ পানির ভর কাঠের ভরের সমান হতে হবে। অর্থাৎ যদি কাঠের আয়তন V হয় তার ভর $V\rho$, এবং যদি কাঠের V_1 অংশ পানিতে ডুবে থাকে তাহলে সেই পরিমাণ পানির ভর $V_1\rho_W$, কাজেই

$$V\rho = V_1\rho_W$$

$$\frac{V_1}{V} = \frac{\rho}{\rho_W} = \frac{0.5 \times 10^3\ \mathrm{kg/m^3}}{10^3\ \mathrm{kg/m^3}} \times 100 = 50\%$$

প্রশ্ন: $10kg$ ভরের একটা কাঠ নদীর পানিতে ভেসে ভেসে সমুদ্রে গেল। নদীর পানিতে সেটি অর্ধেক ডুবেছিল, সমুদ্রে কতটুকু ডুববে? (সমুদ্রের পানির ঘনত্ব $\rho_s = 1.03 \times 10^3 kg/m^3$)

উত্তর: নদীর পানির ঘনত্ব $\rho_W = 10^3\ \mathrm{kg/m^3}$

কাঠের আয়তন V এবং ঘনত্ব ρ হলে কাঠের ভর $V\rho$

নদীর পানিতে কাঠের অর্ধেক ডুবে থাকে কাজেই

$$V\rho = \frac{1}{2}V\rho_W$$

কাঠের ঘনত্ব

$$\rho = \frac{1}{2}\rho_W = 0.5 \times 10^3\ \mathrm{kg/m^3}$$

সমুদ্রের পানিতে V_1 পরিমাণ ডুবে থাকলে

$$V\rho = V_1\rho_s$$

$$\frac{V_1}{V} = \frac{\rho}{\rho_s} = \frac{0.5 \times 10^3\ \mathrm{kg/m^3}}{1.03 \times 10^3\ \mathrm{kg/m^3}} \times 100 = 48.5\%$$

প্রশ্ন: ধরা যাক আর্কিমিডিসের সোনার মুকুটের ভর বাতাসে 10 kg এবং পানিতে ডুবিয়ে ভর করলে 9.4 kg হয়েছে। মুকুটের ঘনত্ব কত?

উত্তর: মুকুটের আয়তন V ঘনত্ব ρ হলে

$$V\rho = 10\ \text{kg}$$

এবং

$$V\rho - V\rho_W = 9.4\ \text{kg}$$

$$V\rho_W = V\rho - 9.4\ \text{kg} = 10\ \text{kg} - 9.4\ \text{kg} = 0.6\ \text{kg}$$

$$V = \frac{0.6\ \text{kg}}{\rho_W} = \frac{0.6\ \text{kg}}{10^3\ \text{kg/m}^3} = 0.6 \times 10^{-3}\ \text{m}^3$$

$$\rho = \frac{10\ \text{kg}}{V} = \frac{10\ \text{kg}}{0.6 \times 10^{-3}\ \text{m}^3} = 16{,}666\ \ \text{kg/m}^3$$

সোনার আসল ঘনত্ব 19,300 kg/m^3 কাজেই বোঝাই যাচ্ছে এই মুকুটে খাদ মেশানো আছে।

5.3.3 বাংলাদেশে নৌপথে দুর্ঘটনার কারণ

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ এবং অসংখ্য খাল-বিল, নদ-নদী পুরো দেশটিকে যুক্ত করে রেখেছে। সে কারণে নৌপথ দেশের অন্যতম যোগাযোগের মাধ্যম। অন্য যেকোনো যানবাহনের মতোই নৌকা, ট্রলার, লঞ্চ বা জাহাজ দুর্ঘটনায় পতিত হয় এবং মানুষের প্রাণহানি ঘটে। নৌপথে দুর্ঘটনার অনেক কারণ থাকতে পারে, তার মাঝে প্রধান কারণ হচ্ছে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া, অন্যকিছুর সাথে সংঘর্ষ, চালকের ত্রুটি, যন্ত্রপাতির ত্রুটি, নকশার ত্রুটি, ধারণক্ষমতার চেয়ে বেশি যাত্রী বহন, মালপত্রের অনিয়মিত সংরক্ষণ ইত্যাদি।

আবহাওয়ার সংকেত যথাযথভাবে অনুসরণ করে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার বিপদ থেকে অনেকটুকুই রক্ষা পাওয়া সম্ভব। তবে হঠাৎ করে কালবৈশাখী ঝড়ের মাঝে পড়ে নৌযান বিপদগ্রস্থ হতে পারে। সেরকম অবস্থায় নৌযানের চালকদের অভিজ্ঞতা এবং দায়িত্ববোধ একটি বড় ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশে নৌপথের দুর্ঘটনার আরেকটি বড় কারণ হচ্ছে সংঘর্ষ: একটি নৌযানের সাথে অন্য নৌযানের সংঘর্ষ, জেটির সাথে সংঘর্ষ, নদীর তলদেশ বা ডুবোচরে সংঘর্ষ– সবগুলোই নানা ধরনের দুর্ঘটনার সূত্রপাত করে থাকে।

নৌযানের যন্ত্রপাতি যথাযথ সংরক্ষণ করা না হলে সেগুলো দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে। বেশি যাত্রী বহন করার জন্য নৌযানের নকশার অননুমোদিত পরিবর্তন করে একটি নৌযানকে দুর্ঘটনার দিকে ঠেলে দেওয়া হতে পারে। অধিক মুনাফার লোভে একটি নৌযানে প্রয়োজন থেকে বেশি যাত্রী বহন করে নৌযানের ভরকেন্দ্র পরিবর্তিত হয়েও অনেক বড় দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় বড় বড় ঢেউয়ে নৌযানের দুলুনীতে মালপত্র সরে গিয়েও নৌযানের ভরকেন্দ্র পরিবর্তিত হয়ে নৌযান দুর্ঘটনায় পড়তে পারে।

5.3.4 প্যাসকেলের সূত্র

এই অধ্যায়ে আমরা অনেকবার দেখিয়েছি যে তরল পদার্থে চাপ প্রয়োগ করলে সেটা চারদিকে সঞ্চালিত হয়। তোমরা একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবে এটাই স্বাভাবিক। তার কারণ এই চাপটুকু যদি পুরো তরল পদার্থে সঞ্চালিত না হয় তাহলে তরলের এক অংশে চাপ বেশি এবং অন্য অংশে চাপ কম থাকবে, কাজেই সেখানে একটা প্রস্থচ্ছেদ কল্পনা করে নিলে এক দিক থেকে আরোপিত বল অন্যদিক থেকে আরোপিত বল থেকে বেশি হবে এবং এই বলের কারণে তরলটি প্রবাহিত হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না চাপ সমান হয়ে যায়। প্যাসকেল এই বিষয়টি একটা সূত্র হিসেবে দিয়েছিলেন, সেটি এ রকম:

প্যাসকেলের সূত্র: একটা আবদ্ধ পাত্রে তরল বা বায়বীয় পদার্থে বাইরে থেকে চাপ দেওয়া হলে সেই চাপ সমানভাবে সঞ্চালিত হয়ে পাত্রের সংলগ্ন গায়ে লম্বভাবে কাজ করবে।

প্যাসকেলের সূত্রের ব্যবহার: প্যাসকেলের এই সূত্রটি ব্যবহার করে অত্যন্ত চমকপ্রদ কিছু যন্ত্র তৈরি করা যায়। 5.05 ছবিতে সে রকম একটা যন্ত্র দেখানো হয়েছে, এখানে পাশাপাশি দুটি সিলিন্ডার একটা নল দিয়ে সংযুক্ত। ধরা যাক একটি সিলিন্ডারের প্রস্থচ্ছেদ A_1 অন্যটির A_2 এবং তুমি A_1 প্রস্থচ্ছেদের সিলিন্ডারে F_1 বল প্রয়োগ করেছ তাহলে তোমার প্রয়োগ করা চাপ

$$P = \frac{F_1}{A_1}$$

এখন এই চাপ এই তরলের মাধ্যমে চারদিকে সঞ্চালিত হবে এবং দ্বিতীয় সিলিন্ডারের প্রস্থচ্ছেদেও প্রয়োগ করবে।

কাজেই দ্বিতীয় সিলিন্ডারে প্রয়োগ করা বলের পরিমাণ হবে

$$F_2 = PA_2 = F_1\left(\frac{A_2}{A_1}\right)$$

২০২২

তুমি নিশ্চয়ই চমৎকৃত হয়ে দেখতে পাচ্ছ যদি (A_2/A_1) এর মান 100 হয় তাহলে তুমি প্রথম সিলিন্ডারে যে পরিমাণ বল প্রয়োগ করছ দ্বিতীয় সিলিন্ডারে তার থেকে 100 গুণ বেশি বল পেয়ে যাচ্ছ।

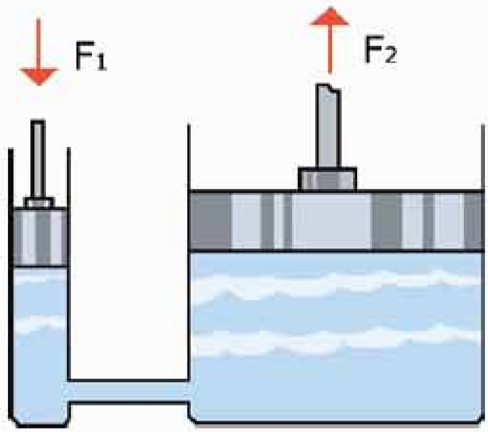

চিত্র 5.05: F_1 বল প্রয়োগ করলে প্রস্থচ্ছেদের উপর নির্ভর করে অন্য দিকে F_2 বল পাওয়া যায়।

এই পদ্ধতিটি খুব কার্যকর, বড় বড় কলকারখানা কিংবা বিমান নিয়ন্ত্রণে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। তবে তোমরা একটা জিনিস জেনে রাখো এটা বলবৃদ্ধিকরণ নীতি। এই পদ্ধতিতে শক্তি কিন্তু মোটেও বাড়ানো যায় না। তুমি প্রথম সিলিন্ডারে যে পরিমাণ শক্তি প্রয়োগ করবে দ্বিতীয় সিলিন্ডারে ঠিক সেই পরিমাণ শক্তি ফিরে পাবে।

উদাহরণ

প্রশ্ন: দেখাও যে বল বৃদ্ধি করা হলেও যে পরিমাণ শক্তি প্রয়োগ করা হচ্ছে ঠিক সেই পরিমাণ শক্তি ফিরে পাচ্ছ।

উত্তর: ধরা যাক ছোট পিস্টনে F_1 বল প্রয়োগ করা হয়েছে এবং পিস্টনটি l_1 দূরত্ব অতিক্রম করেছে, কাজেই কাজের পরিমাণ

$$W_1 = F_1 l_1$$

বড় পিস্টনে বলের পরিমাণ

$$F_2 = F_1\left(\frac{A_2}{A_1}\right)$$

যেহেতু ছোট পিস্টন অপসারিত তরলটুকু বড় পিস্টনটুকুকে l_2 দূরত্ব ঠেলে নিয়ে যায়, কাজেই

$$l_1 A_1 = l_2 A_2$$

বড় পিস্টনে অতিক্রান্ত দূরত্ব:

$$l_2 = l_1\left(\frac{A_1}{A_2}\right)$$

কাজেই কাজের পরিমাণ

$$W_2 = F_2 l_2 = F_1\left(\frac{A_2}{A_1}\right) l_1\left(\frac{A_1}{A_2}\right) = F_1 l_1$$

অর্থাৎ বড় পিস্টনের কাজের পরিমাণ ছোট পিস্টনের কাজের সমান।

5.4 বাতাসের চাপ (Air Pressure)

বাতাসের একটা চাপ আছে (চিত্র 5.06)। আমরা এই চাপ আলাদাভাবে অনুভব করি না কারণ আমাদের শরীরের ভেতর থেকেও বাইরে একটি চাপ দেওয়া হচ্ছে। তাই দুটো চাপ একটা আরেকটিকে কাটাকাটি করে দেয়। মহাকাশে বাতাস নেই, তাই বাতাসের চাপও নেই, তাই সেখানে শরীরের ভেতরের চাপকে কাটাকাটি করার জন্য কিছু নেই এবং এ রকম পরিবেশে মুহূর্তের মাঝে মানুষের শরীর তার ভেতরকার চাপে বিস্ফোরিত হয়ে যেতে পারে। সে জন্য মহাকাশে মহাকাশচারীরা সব সময়ই চাপ নিরোধক স্পেস স্যুট পরে থাকেন। পৃথিবী পৃষ্ঠে বাতাসের এই চাপ $10^5\,N/m^2$ যার অর্থ তুমি যদি পৃথিবী পৃষ্ঠে $1\,m^2$ ক্ষেত্রফলের খানিকটা জায়গা কল্পনা করে নাও তাহলে তার উপরে বাতাসের যে স্তম্ভটি রয়েছে তার ওজন $10^5\,N$, এটা মোটামুটিভাবে একটা হাতির ওজন।

এখানে একটা বিষয় এখনই তোমাদের খুব ভালো করে বুঝতে হবে, এটি সত্যি, ওজন হচ্ছে বল এবং এই বলটি নিচের দিকে কাজ করে। বল হচ্ছে ভেক্টর তাই এর মান এবং দিক দুটোরই প্রয়োজন আছে। চাপ ভেক্টর নয় তার কোনো দিক নেই তাই যেকোনো জায়গায় চারদিকে সমান। তুমি যেখানে এখন দাঁড়িয়ে কিংবা বসে আছো তোমার ওপর বাতাস যে চাপ প্রয়োগ করছে, সেটা তোমার উপরে ডানে বামে সামনে পেছনে বা নিচে চারদিকেই সমান। বাতাস কিংবা তরল পদার্থের জন্য এটা সব সময়ই সত্যি।

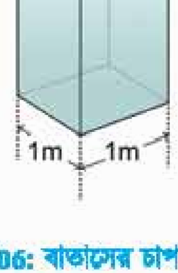

চিত্র 5.06: বাতাসের চাপটি আসে বাতাসের স্তম্ভের ওজন থেকে।

পাতলা টিন বা অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি কোনো নিশ্ছিদ্র টিন বা কৌটা যদি কোনোভাবে বায়ুশূন্য করা যায় তাহলে সেটা দুমড়েমুচড়ে যাবে, তার কারণ স্বাভাবিক অবস্থায় বাইরের বাতাসের চাপকে কৌটার ভেতরের বাতাসের পাল্টা চাপ দিয়ে একটা সমতা বজায় রেখেছিল। ভেতরের বাতাস পাম্প করে সরিয়ে নেবার পর ভেতরে বাইরের বাতাসের চাপ প্রতিহত করার মতো কিছু নেই, তাই বাইরের

বাতাসের চাপ টিন বা কৌটাকে দুমড়েমুচড়ে দেবে (চিত্র 5.07)। তোমরা যে জিনিসটা লক্ষ করবে সেটি হচ্ছে কৌটাটা শুধু উপর দিক থেকে দুমড়েমুচড়ে যাবে না। চারদিক থেকে দুমড়েমুচড়ে যাবে। চাপ যদি শুধু উপর থেকে আসত তাহলে টিনটা শুধু উপর থেকে দুমড়েমুচড়ে যেত। চাপ যেহেতু চারদিকেই সমান তাই টিনটা চারদিক থেকেই আসছে এবং চারদিক থেকে দুমড়েমুচড়ে যাচ্ছে।

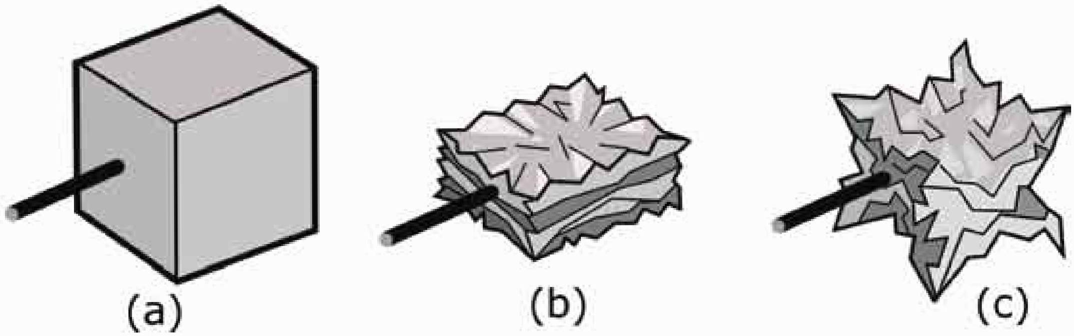

চিত্র 5.07: (a) তে দেখানো কিউবটির ভেতর থেকে পাম্প করে বাতাস সরিয়ে নিলে যদি শুধু উপর থেকে চাপ দিত তাহলে (b) ছবির মতো চ্যাপ্টা হয়ে যেত। কিন্তু যেহেতু চারদিক থেকে চাপ আসে তাই (c) ছবির মতো সংকুচিত হয়।

নিজে করো

একটি এক লিটারের প্লাস্টিকের পানির খালি বোতল নাও। তার ভেতরে সাবধানে খানিকটা ফুটন্ত গরম পানি ঢেলে প্লাস্টিকের বোতলের ভেতর পানিটাকে নাড়াচাড়া করো। ভেতরের পুরো বাতাস উত্তপ্ত হওয়ার পর বোতলের ছিপিটি শক্ত করে লাগিয়ে নাও। এবারে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করো কিংবা প্লাস্টিকের বোতলটি ঠান্ডা পানির ধারায় ধরে রেখে ঠান্ডা করে নাও। ভেতরে খানিকটা শূন্যতা তৈরি হবে বলে বাইরের বাতাসের চাপে বোতলটি দুমড়েমুচড়ে যাবে (চিত্র 5.08)।

চিত্র 5.08: বাতাসের চাপে প্লাস্টিকের বোতল দুমড়ে-মুচড়ে গেছে।

২০২৫

পৃথিবী পৃষ্ঠে বাতাসের চাপটি আসছে এর উপরের স্তম্ভটির ওজন থেকে। তাই আমরা যদি উপরে উঠি তাহলে আমাদের উপরের স্তম্ভের উচ্চতাটুকু কমে যাবে, ওজনটাও কমে যাবে এবং সেজন্য সেখানে বাতাসের চাপও কমে যাবে। বিষয়টি সত্যি এবং 5.09 চিত্রে তোমাদের দেখানো হয়েছে উচ্চতার সাথে সাথে বাতাসের চাপ কেমন করে কমে যায়। যে বিষয়টা তোমাদের আলাদা করে লক্ষ করার কথা সেটি হচ্ছে পাঁচ কিলোমিটার উচ্চতায় পৌঁছানোর পর বাতাসের চাপ অর্ধেক কমে গিয়েছে। সাধারণভাবে মনে হতে পারে তাহলে পরের পাঁচ কিলোমিটারে বাকি অর্ধেক কমে সেখানে বাতাসের চাপ শূন্য হয়ে যাচ্ছে না কেন? এর একটা সুনির্দিষ্ট কারণ আছে। বাতাস বা গ্যাসকে চাপ দিয়ে সংকুচিত করা যায়। তাই পৃথিবীর পৃষ্ঠে, যেখানে বাতাসের চাপ সবচেয়ে বেশি সেখানে বাতাস সবচেয়ে বেশি সংকুচিত হয়ে আছে অর্থাৎ বাতাসের ঘনত্ব সেখানে সবচেয়ে বেশি। আমরা যতই উপরে উঠতে থাকব বাতাসের চাপ যে রকম কমতে থাকবে তার ঘনত্বও সে রকম কমতে থাকবে।

উচ্চতার সাথে সাথে বাতাসের ঘনত্ব কমে যাওয়ার অনেকগুলো বাস্তব দিক আছে। আকাশে যখন প্লেন উড়ে তখন বাতাসের ঘর্ষণ প্লেনের জন্য অনেক বড় সমস্যা। যত উপরে ওঠা যাবে বাতাসের ঘনত্ব তত কমে যাবে এবং ঘর্ষণও কমে যাবে তাই সত্যি সত্যি বড় বড় যাত্রীবাহী প্লেন আকাশে অনেক ওপর দিয়ে উড়ার চেষ্টা করে। সাধারণভাবে মনে হতে পারে তাহলে প্লেনগুলো আরো উপর দিয়ে, একেবারে মহাকাশ দিয়ে উড়ে যায় না কেন, তাহলে তো ঘর্ষণ আরো কমে যাবে। তার কারণ প্লেনকে ওড়ানোর জন্য তার শক্তিশালী ইঞ্জিন দরকার আর সেই ইঞ্জিনে জ্বালানি জ্বালানোর জন্য অক্সিজেন দরকার। উপরে যেখানে বাতাসের ঘনত্ব কম সেখানে অক্সিজেনও কম, তাই বেশি উচ্চতায় অক্সিজেনের অভাব হয়ে যায় বলে প্লেনের ইঞ্জিন মহাকাশে কাজ করবে না!

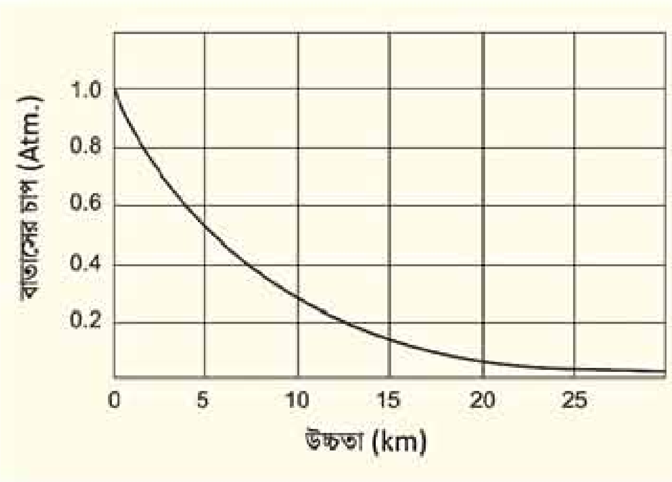

চিত্র 5.09: উচ্চতার সাথে বাতাসের চাপ কমে যায়

যারা পর্বতশৃঙ্গে ওঠে তাদের জন্যও সেই একই সমস্যা। যত উপরে উঠতে থাকে সেখানে বাতাসের চাপ কমে যাওয়ার সমস্যা থেকে অনেক বড় সমস্যা বাতাসের ঘনত্ব কমে যাওয়ার কারণে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যাওয়া। যারা পর্বতারোহণ করে সেজন্য তাদের অত্যন্ত কম অক্সিজেনে

শুধু বেঁচে থাকা নয় পর্বতারোহণের মতো অত্যন্ত কষ্টসাধ্য কাজ করা শিখতে হয়, সেজন্য তাদের শরীরকেও প্রস্তুত করতে হয়।

উদাহরণ

উদাহরণ: এভারেস্টের চূড়ায় (29,029 ft) বাতাসে কতটুকু অক্সিজেন আছে?

উত্তর: 29,029 ft = 8,848 m

ছবির গ্রাফ থেকে দেখছি এই উচ্চতায় বাতাসের চাপ পৃথিবী পৃষ্ঠে বাতাসের চাপের মাত্র 35% কাজেই সেখানে অক্সিজেনের পরিমাণও পৃথিবী পৃষ্ঠের অক্সিজেনের প্রায় 1/3 বা এক-তৃতীয়াংশ।

5.4.1 টরিসেলির পরীক্ষা

তোমরা নিশ্চয়ই স্ট্র দিয়ে কখনো না কখনো কোল্ড ড্রিংকস খেয়েছ। কখনো কি চিন্তা করেছ স্ট্রতে চুমুক দিলে কেন কোল্ড ড্রিংকস তোমার মুখে চলে আসে? আসলে ব্যাপারটি ঘটে বাতাসের চাপের জন্য। ব্যাপারটি বোঝা খুব সহজ হতো যদি তুমি কখনো 10.5 মিটার লম্বা একটা স্ট্র দিয়ে কোল্ড ড্রিংকস খাওয়ার চেষ্টা করতে। (ব্যাপারটি মোটেও বাস্তবসম্মত নয়। কিন্তু যুক্তির খাতিরে মেনে নাও।) তাহলে তুমি আবিষ্কার করতে ড্রিংকসটা 10.3 মিটার পর্যন্ত উঠে হঠাৎ করে থেমে গেছে। আর যতই চুমুক দেওয়ার চেষ্টা করো ড্রিংকসটা উপরে উঠছে না। (আমরা ধরে নিচ্ছি কোল্ড ড্রিংকসের ঘনত্ব পানির ঘনত্বের কাছাকাছি।)

পারদ মুখে নেওয়ার মতো তরল নয় কিন্তু যুক্তির খাতিরে কল্পনা করো তুমি স্ট্র দিয়ে পারদ চুমুক দিয়ে মুখে আনার চেষ্টা করছ। যদি স্ট্রটি 76 cm থেকে বেশি লম্বা হয় তাহলে তুমি আবিষ্কার করবে পারদ ঠিক 76 cm উচ্চতায় এসে থেমে গেছে, তুমি যতই চুমুক দেওয়ার চেষ্টা করো পারদ আর উপর উঠবে না। পানির ঘনত্ব থেকে পারদের ঘনত্ব 13.6 গুণ বেশি, তাই পানি যেটুকু উচ্চতায় উঠেছে পারদ উঠেছে তার থেকে 13.6 গুণ কম।

এমনিতে একটি স্ট্র মুখে নিয়ে কোল্ড ড্রিংকসের বোতলে ধরে রাখলে কোল্ড ড্রিংকসটা উপরে উঠবে না। কারণ তোমার মুখের ভেতরে বাতাসের যে চাপ স্ট্র ডুবিয়ে রাখা তরলেও সেই একই বাতাসের চাপ। দুটো চাপই সমান, কাজেই এর ভেতরে কোনো কার্যকর বল নেই। এখন যদি তুমি চুমুক দাও,

যার অর্থ তুমি মুখের ভেতরে শূন্যতা তৈরি করার চেষ্টা করো তখন সেখানে বাতাসের চাপ কমে যায়। তখন তরলের উপরে বাতাসের চাপের জন্য তরলটা স্ট্র বেয়ে উপরে ওঠে।

পারদ ব্যবহার করে বাতাসের চাপের এই পরীক্ষাটি বিজ্ঞানী টরিসেলি করেছিলেন 1643 সালে। তিনি অবশ্য মুখ দিয়ে পারদকে একটি নল বেয়ে টেনে তোলার চেষ্টা করেননি, তিনি এক মুখ বন্ধ একটা নলের ভেতর পারদ ভরে, নলটি পারদ ভরা একটা পাত্রে উল্টো করে রেখেছিলেন। পারদের উচ্চতা নামতে নামতে ঠিক 76 cm এসে থেমে গেল। তুমি চুমুক দিয়ে খাবার সময় মুখের ভেতরে যে শূন্যতা তৈরি করার চেষ্টা করো কাচের নলের উপরে ঠিক সেই শূন্যতা তৈরি হয়ে গিয়েছিল। বাতাস পারদের উপরে চাপ দিচ্ছে এবং সেই চাপ তরলের সব জায়গায় সঞ্চালিত হয়ে নলের নিচেও এসেছে। নলের উপরে কোনো ফুটো নেই, তাই সেদিক দিয়ে বাতাস চাপ দিতে পারছে না। কাজেই সমতা আনার জন্য নলের নিচে এক মাত্র চাপ হচ্ছে 76 cm উঁচু পারদ স্তম্ভের ওজনের কারণে তৈরি হওয়া চাপ।

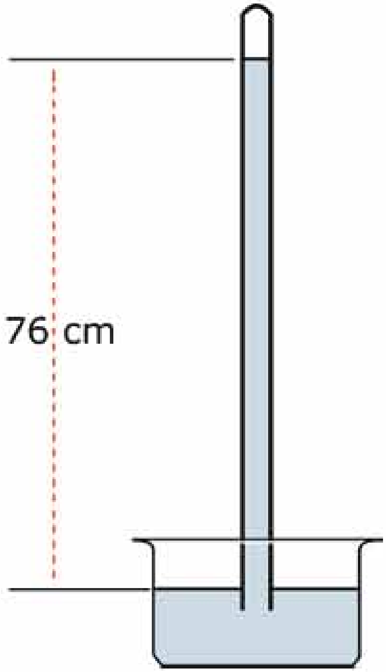

চিত্র 5.10: বাতাসের চাপের কারণে পারদ ঠিক 76 cm উচ্চতায় স্থির হয়ে যায়।

বাতাসের চাপ মাপার যন্ত্রের নাম ব্যারোমিটার (চিত্র 5.10) এবং টরিসেলির এই পদ্ধতি দিয়ে তৈরি ব্যারোমিটারে এখনো বাতাসের চাপ মাপা হয়। বাতাসের চাপ বাড়লে পারদের উচ্চতা 76 cm থেকে বেশি হয়, চাপ কমলে উচ্চতা 76 cm থেকে কমে যায়।

5.4.2 বাতাসের চাপ এবং আবহাওয়া

বাতাসের চাপের সাথে আবহাওয়ার খুব ঘনিষ্ঠ একটা সম্পর্ক আছে। তোমরা নিশ্চয়ই আবহাওয়ার খবরে অনেকবার সমুদ্রে নিম্নচাপ সৃষ্টি হওয়ার কথা শুনেছ, যার অর্থ সেখানে বাতাসের চাপ কমে গেছে। তখন চাপ সমান করার জন্য আশপাশের উচ্চ চাপ এলাকা থেকে বাতাস সেই নিম্নচাপের দিকে আসতে থাকে এবং মাঝে মাঝে একটা ঘূর্ণির সৃষ্টি হয়, সেই ঘূর্ণিটি বিশেষ অবস্থায় ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি করে। আমাদের দেশে ঘূর্ণিঝড়ের ভয়াবহতার খবর তোমরা নিশ্চয়ই জানো।

তোমরা যখন পরের অধ্যায়ে তাপ এবং তাপমাত্রা সম্পর্কে পড়বে তখন তোমরা জানতে পারবে যে বাতাসের তাপমাত্রা বেড়ে গেলে সেটি প্রসারিত হয় বলে তার ঘনত্ব কমে যায় এবং চাপ কমে যায়। বাতাসের চাপ আরো কার্যকরভাবে কমে, যদি তার মাঝে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেড়ে যায়। জলীয়

২০২৫

বাষ্প হচ্ছে পানি, পানির অণুতে একটি অক্সিজেন এবং দুটি হাইড্রোজেন থাকে এবং পানির অণুর আণবিক ভর হচ্ছে (16 + 1 + 1 =) 18। বাতাসের মূল উপাদান হচ্ছে নাইট্রোজেন (পারমাণবিক ভর 14) দুটো পরমাণু দিয়ে তৈরি হয় তাই তাদের আণবিক ভর (14 + 14 =) 28 এবং অক্সিজেন (পারমাণবিক ভর 16), এটিও দুটি পরমাণু দিয়ে তৈরি তাই আণবিক ভর (16 + 16 =) 32 যা পানির আণবিক ভর থেকে অনেক বেশি। তাই যখন বাতাসে জলীয় বাষ্প থাকে তখন বেশি আণবিক ভরের নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেনের বদলে কম আণবিক ভরের পানির অণু স্থান করে নেয় কাজেই বাতাসের ঘনত্ব কমে যায়। বাতাসের ঘনত্ব কম হলে বাতাসের চাপও কমে যায়। কাজেই ব্যারোমিটারে বাতাসের চাপ দেখেই স্থানীয় আবহাওয়া সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব। ব্যারোমিটারে উচ্চ চাপ দেখালে বোঝা যায় বাতাস শুকনো এবং আবহাওয়া ভালো। চাপ কমতে থাকলে বোঝা যায় জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বাড়ছে। চাপ বেশি কম দেখালে বুঝতে হবে আশপাশের এলাকা থেকে বাতাস ছুটে এসে ঝড়-বৃষ্টি শুরু হতে যাচ্ছে।

5.5 স্থিতিস্থাপকতা (Elasticity)

তোমরা সবাই কখনো না কখনো একটা স্প্রিং কিংবা একটা রাবার ব্যান্ড টেনে লম্বা করে আবার ছেড়ে দিয়েছ। তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ স্প্রিং কিংবা রাবার ব্যান্ডকে টেনে ছেড়ে দেওয়া হলে সেটা আবার আগের দৈর্ঘ্যে ফিরে এসেছে। টেনে ধরাকে পদার্থবিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় বল প্রয়োগ করা আর দৈর্ঘ্য পরিবর্তন হওয়াকে বলা হয় বিকৃতি ঘটা। দৈনন্দিন জীবনে বিকৃতি শব্দটি খুবই নেতিবাচক। কিন্তু এখানে এটাকে তোমরা নেতিবাচক হিসেবে দেখো না। এটা হচ্ছে অবস্থার পরিবর্তন মাত্র!

কাজেই তোমরা বুঝতে পারছ যখন কোনো বস্তুকে বল প্রদান করা হয় তখন তার ভেতরে একটা বিকৃতি ঘটে (এবং এই বিকৃতির জন্য একটা পাল্টা বলের তৈরি হয়) বলটি সরিয়ে নিলে বিকৃতির অবসান ঘটে আর বস্তুটি আবার তার আগের অবস্থায় ফিরে যায়। পদার্থের এই ধর্মের নাম স্থিতিস্থাপকতা। তবে মনে রাখতে হবে কতটুকু বল প্রয়োগ করা যাবে তার একটা সীমা আছে। এই সীমা অতিক্রম করে ফেললে পদার্থ তার আগের অবস্থায় ফিরে আসতে পারবে না। তার মাঝে একটা স্থায়ী বিকৃতি ঘটে যেতে পারে। এই সীমাকে স্থিতিস্থাপক সীমা বলে। একটা রডকে অল্প একটু বাঁকা করে ছেড়ে দিলে সেটা সোজা হয়ে যায়। বেশি বাঁকা করলে বাঁকা হয়েই থাকে আর সোজা হয় না। কাজেই আমরা বিষয়টা এভাবে বলতে পারি:

বিকৃতি: বাইরে থেকে বল প্রয়োগ করলে পদার্থের আকার বা দৈর্ঘ্যের যে আপেক্ষিক পরিবর্তন হয় সেটা হচ্ছে বিকৃতি। অর্থাৎ L_0 দৈর্ঘ্যের একটি বস্তুর ওপর বল প্রয়োগ করা হলে তার দৈর্ঘ্য যদি L হয় তাহলে বিকৃতি হচ্ছে

$$\frac{L - L_0}{L_0}$$

দেখাই যাচ্ছে বিকৃতির কোনো একক নেই, এটি একটি সংখ্যা মাত্র

পীড়ন: একক ক্ষেত্রফলে বিকৃতির কারণে পদার্থের ভেতর যে বল তৈরি হয় সেটাই হচ্ছে পীড়ন। অর্থাৎ A প্রস্থচ্ছেদের একটা বস্তুতে বল প্রয়োগ করা হলে যদি তার বিকৃতি ঘটে সেই বিকৃতি যদি F প্রতিরোধ বল তৈরি করে তাহলে পীড়ন হচ্ছে

$$\frac{F}{A}$$

দেখতেই পাচ্ছ এটা চাপের মতো এবং এর একক Pa বা প্যাসকেল।

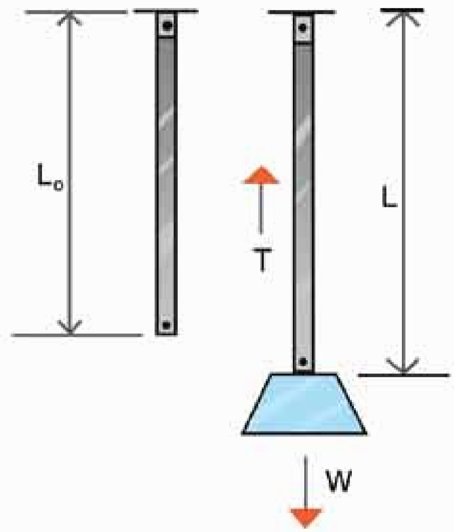

চিত্র 5.11: বল প্রয়োগ প্রয়োগ করে পীড়ন সৃষ্টি করলে দন্ডের বিকৃতি হয়।

হুকের সূত্র: আমরা যদি পীড়ন এবং বিকৃতি বুঝে থাকি তাহলে হুকের সূত্রটি বোঝা খুব সহজ। এই সূত্র অনুসারে স্থিতিস্থাপক সীমার ভেতরে পীড়ন এবং বিকৃতি সমানুপাতিক

$$\text{পীড়ন} \propto \text{বিকৃতি}$$

কাজেই

$$\text{পীড়ন} = \text{ধ্রুবক} \times \text{বিকৃতি}$$

অর্থাৎ প্রত্যেক পদার্থের পীড়ন এবং বিকৃতির সাথে সম্পর্কযুক্ত একটা ধ্রুবক থাকে, সেই ধ্রুবকটার নাম স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক।

দুটি নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা করলে বোঝা আরো সহজ হবে:

(i) ধরা যাক A প্রস্থচ্ছেদের একটা তারের দৈর্ঘ্য L_0, এর সাথে W ওজনের একটা ভর ঝুলিয়ে দেওয়া হলো এই বলটি ঝোলানোর কারণে L_0 দৈর্ঘ্যটি বেড়ে হলো L (চিত্র 5.11) এই বর্ধিত দৈর্ঘ্য তারটির ভেতরে একটা পাল্টা বল তৈরি করেছে T (এখানে T অক্ষরটি ব্যবহার করা হয় টেনশন Tension শব্দটির জন্য। সাধারণত যখন কোনো তারকে টানা হয় তখন তার ভেতরে যে বল কাজ করে তার নাম টেনশন)। কাজেই পীড়ন হচ্ছে T/A এবং বিকৃতি হচ্ছে:

$$\frac{L - L_0}{L_0}$$

কাজেই

$$\frac{T}{A} \propto \frac{L - L_0}{L_0}$$

কিংবা

$$\frac{T}{A} = Y\left(\frac{L - L_0}{L_0}\right)$$

টেবিল 5.02: বিভিন্ন পদার্থের ইয়াংস মডুলাস

পদার্থ	G-Pa
রাবার	0.01-0.1
হাড়	9
কাঠ	10
কাচ	50 - 90
অ্যালুমিনিয়াম	69
তামা	117
লোহা	200
হীরা	1220

এই ধ্রুবকের নাম ইয়াংস মডুলাস (Young's Modulus)। যেহেতু বিকৃতির কোনো একক নেই তাই Y এর একক হচ্ছে Nm^{-2}. টেবিল 5.02 এ কয়েকটি পদার্থের ইয়াংস মডুলাস দেওয়া হলো।

উদাহরণ

প্রশ্ন: ইয়াংস মডুলাসের মান বেশি হলে পদার্থ কীভাবে দৈর্ঘ্য পরিবর্তন করে?

উত্তর: দৈর্ঘ্যের পরিবর্তনের হার

$$\frac{L - L_0}{L_0} = \frac{1}{Y}\left(\frac{T}{A}\right)$$

কাজেই T/A যদি সমান হয় তাহলে Y যত বেশি হবে দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন তত কম হবে।

(ii) ধরা যাক একটি সিলিন্ডারে সাধারণ অবস্থায় V_0 আয়তনের গ্যাস আছে। এই গ্যাসে P চাপ দেওয়ার কারণে সিলিন্ডারেরগ্যাসের আয়তন কমে হয়ে গেল V (চিত্র 5.12), এখানে পীড়ন হচ্ছে P এবং বিকৃতি হচ্ছে:

$$\frac{V - V_0}{V_0}$$

কাজেই আমরা লিখতে পারি

$$P \propto \left(\frac{V - V_0}{V_0}\right)$$

$$P = B\left(\frac{V - V_0}{V_0}\right)$$

এখানে B হচ্ছে ধ্রুবক এবং এই ধ্রুবকের নাম বাল্ক মডুলাস বা আয়তনীয় গুণাঙ্ক (Bulk Modulus)। B এর একক হচ্ছে Nm^{-2} কিংবা প্যাসকেল।

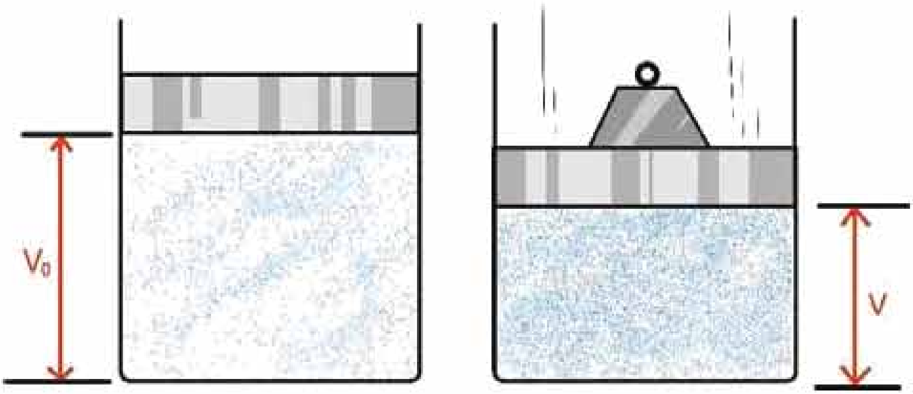

চিত্র 5.12: আবদ্ধ বাতাসে চাপ প্রয়োগ করলে বাতাস সংকুচিত হয়।

5.6 পদার্থের তিন অবস্থা: কঠিন, তরল এবং গ্যাস (The three states of Matter: Solid, Liquid and Gas)

তোমরা নিশ্চয়ই জান বিশ্বের সবকিছু তৈরি হয়েছে অণু দিয়ে। (অবশ্য অণু মৌলিক কণা নয়, অণু তৈরি হয়েছে পরমাণু দিয়ে, পরমাণু তৈরি হয়েছে ইলেকট্রন এবং নিউক্লিয়াস দিয়ে, নিউক্লিয়াস তৈরি হয়েছে প্রোটন এবং নিউট্রন দিয়ে, প্রোটন এবং নিউট্রন তৈরি হয়েছে কোয়ার্ক দিয়ে এবং বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন ইলেকট্রন কিংবা কোয়ার্ক তৈরি হয়েছে স্ট্রিং দিয়ে।) যেহেতু একটা পদার্থের ধর্ম তার অণুতে বজায় থাকে তাই আমরা অণুকেই পদার্থের সবচেয়ে ছোট একক হিসেবে ধরে নিই। যেমন

পানির অণুতে পানির সব ধর্ম আছে কিন্তু পানিকে তার পরমাণুতে ভেঙে নিলে সেটি আর পানি থাকে না। সেটা হয়ে যাবে একটা অক্সিজেন আর দুইটা হাইড্রোজেনের পরমাণুতে, দুটোই গ্যাস।

একটা পদার্থে তার অণুগুলো কীভাবে আছে তার ওপর নির্ভর করে সেটি কি কঠিন, তরল নাকি গ্যাস (চিত্র 5.13)। এর সবচেয়ে পরিচিত উদাহরণ হচ্ছে পানি, এটি কঠিন তরল কিংবা গ্যাস তিন রূপেই থাকতে পারে। তার অণুগুলো কীভাবে আছে তার উপর নির্ভর করছে এটি কি বরফ, পানি নাকি জলীয় বাষ্প।

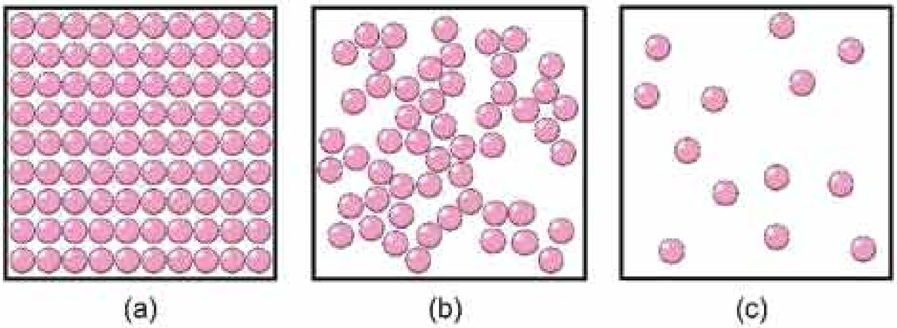

চিত্র 5.13: (a) কঠিন, (b) তরল এবং (c) গ্যাস।

যখন কোনো পদার্থ গ্যাস অবস্থায় থাকে তখন তার অণুগুলো থাকে মুক্ত অবস্থায়, একটি থেকে অন্যটির মাঝে দূরত্ব অনেক বেশি। যখন তরল অবস্থায় থাকে তখন অণুগুলো তুলনামূলকভাবে কাছে হলেও একটার সাপেক্ষে অন্যটি নড়তে পারে। কঠিন অবস্থায় অণুগুলো কাছাকাছি থাকে কিন্তু একটি অণু অন্য অণুর সাপেক্ষে নড়তে পারে না।

একটা গ্যাসের অণুগুলোর মাঝে দূরত্ব অনেক বেশি। সেগুলোর কোনো নিয়মিত আয়তন বা আকার নেই। তরল পদার্থের গ্যাসগুলো কাছাকাছি, তাদের নির্দিষ্ট আয়তন থাকলেও কোনো নিয়মিত আকার নেই। কঠিন পদার্থের অণুগুলো প্রায় গায়ে গায়ে লেগে থাকে, তাই তাদের নির্দিষ্ট আয়তন এবং নিয়মিত আকার আছে।

গ্যাসে অণুগুলো মুক্তভাবে ছোটাছুটি করতে পারে, তরলে অণুগুলো কাঁপে এবং একটার পাশ দিয়ে অন্যটি চলে যেতে পারে, কঠিন পদার্থে অণুগুলো নিজ অবস্থানে থেকে কাঁপলেও স্থান পরিবর্তন করতে পারে না।

এমনিতে আমরা কঠিন, তরল বা গ্যাস কোনোটিরই অণুকে দেখতে পাই না, এটাকে কঠিন, তরল বা গ্যাস হিসেবে দেখি। উপরে অণুগুলোর যে বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে, তাদের কঠিন, তরল বা গ্যাসীয় অবস্থাতেও সেটা প্রকাশ পায়। যেমন:

গ্যাস: আণবিক ধর্ম	গ্যাসে তার প্রতিফলন
অণুগুলো একটা আরেকটার পাশে ছুটতে পারে	যে পাত্রে রাখা হয় তার পুরো আয়তনে ছড়িয়ে পড়ে।
অণুগুলোর মাঝে দূরত্ব বেশি, ফাঁকা জায়গা রয়েছে	গ্যাসকে চাপ দিয়ে সংকুচিত করা যায়।
একটি অণু অন্য অণুর সাপেক্ষে ছুটতে পারে	গ্যাস সহজে প্রবাহিত হয়।

তরল: আণবিক ধর্ম	তরল পদার্থে তার প্রতিফলন
অণুগুলো একটা আরেকটার পাশে দিয়ে যেতে পারে	সহজে প্রবাহিত হয়, যে পাত্রে রাখা হয় তার আকার ধারণ করে।
অণুগুলো কাছাকাছি বলে ফাঁকা জায়গা নেই	তরলকে চাপ দিয়ে সংকুচিত করা যায় না।

কঠিন: আণবিক ধর্ম	কঠিন পদার্থে তার প্রতিফলন
অণুগুলো নিজ অবস্থানে দৃঢ়	নির্দিষ্ট আকার থাকে
অণুগুলোর মাঝে দূরত্ব নেই	চাপ দিয়ে সংকুচিত করা যায় না।
অণুগুলো নিজ অবস্থানে আটকা পড়ে থাকে	ঢেলে প্রবাহিত করা যায় না।

5.6.1 পদার্থের আণবিক গতিতত্ত্ব

একটি কঠিন পদার্থ টেবিলে রাখা হলে কঠিন পদার্থটি টেবিলের যে অংশটুকু স্পর্শ করবে সেখানে এক ধরনের চাপ প্রয়োগ করবে। কঠিন পদার্থ না রেখে আমরা যদি একইভাবে টেবিলে তরল পদার্থ রাখতে চাই সেটি কাজ করবে না, তরলটি সারা টেবিলে গড়িয়ে যাবে। তরলটি রাখতে হবে কোনো একটা পাত্রে এবং তরলটি শুধু নিচে নয় চারদিকে পাত্রটির গায়ে চাপ দেবে। (পাত্রটির গায়ে একটা ফুটো করা হলে তরলের চাপে এই ফুটো দিয়ে তরল বের হতে থাকবে) আমরা যদি গ্যাস রাখতে চাই তাহলে সেটি আর পাত্রে রাখা সম্ভব না, তখন সেটি একটা আবদ্ধ জায়গায় রাখতে হবে এবং গ্যাস এই আবদ্ধ জায়গার চারদিকে চাপ প্রয়োগ করবে। একটা বেলুন ফুলিয়ে সেখানে গ্যাস রাখা হয় এবং বেলুনটা না ফাটিয়ে সেখানে একটা ফুটো করতে পারলে বাতাসের চাপে এই ফুটো দিয়ে বাতাস বের হতে থাকবে।

নিজে করো

একটা বেলুন ফুলিয়ে বেলুনটির পৃষ্ঠে এক টুকরা স্কচটেপ ভালো করে লাগাও। এবারে একটা সুচ দিয়ে স্কচটেপের উপর দিয়ে বেলুনটাতে একটা ফুটো করো। তাহলে বেলুনটা ফাটবে না, দেখবে ফুটো দিয়ে বাতাস বের হয়ে যাচ্ছে।

আমরা গ্যাসের চাপের কথা উল্লেখ করেছি কিন্তু এর কারণটি ব্যাখ্যা করিনি। পদার্থের আণবিক গতিতত্ত্ব দিয়ে আমরা চাপের কারণটি ব্যাখ্যা করতে পারব। আবদ্ধ জায়গায় গ্যাস রাখা হলে এটি পাত্রের গায়ে একধরনের চাপ দেয়, পদার্থের আণবিক গতিতত্ত্ব দিয়ে সেটি ব্যাখ্যা করা যায়। আবদ্ধ জায়গার ভেতর গ্যাসের অণুগুলো ছোটাছুটি করতে থাকে এবং প্রতিনিয়ত সেটি আবদ্ধ জায়গার দেয়ালে এসে আঘাত করে এবং প্রতিফলিত হয়ে ফিরে যায়। অর্থাৎ গ্যাসের অণু একটি ভরবেগে দেয়ালে আঘাত করে অন্য ভরবেগে ফিরে যায়। তোমরা জানো ভরবেগের পরিবর্তন করতে হলে বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করতে হয়। গ্যাসের অণু দেয়ালে আঘাত করে বল প্রয়োগ করে, নিউটনের তৃতীয় সূত্র অনুযায়ী পাত্রের দেয়াল একটি পাল্টা বল গ্যাসের অণুর উপর প্রয়োগ করে অণুটিকে প্রতিফলিত করে দেয়।

এভাবে অসংখ্য অণু আবদ্ধ পাত্রের দেয়ালে আঘাত করে বল প্রয়োগ করতে থাকে এবং এই সম্মিলিত বলটিই গ্যাসের চাপ হিসেবে দেখা যায়। যদি গ্যাসের তাপ বাড়িয়ে দেওয়া হয় তাহলে অণুগুলোর গতিশক্তি বেড়ে যাবে এবং সেটি আরো জোরে দেয়ালে আঘাত করতে পারবে। অর্থাৎ চাপ বেড়ে যাবে। আমরা পরের অধ্যায়ে তাপ দিয়ে তাপমাত্রা বাড়ানোর সাথে চাপ বেড়ে যাওয়ার সম্পর্কটি নতুনভাবে দেখব।

5.6.2 পদার্থের চতুর্থ অবস্থা

কঠিন, তরল এবং গ্যাস এই তিনটি ভিন্ন অবস্থার বাইরেও পদার্থের চতুর্থ আরেকটি অবস্থা হতে পারে, এর নাম প্লাজমা। আমরা জানি অণু কিংবা পরমাণুর নিউক্লিয়াসে যে কয়টি পজিটিভ চার্জের প্রোটন থাকে তার বাইরের ঠিক সেই কয়টি নেগেটিভ চার্জের ইলেকট্রন থাকে। সে কারণে একটা অণু কিংবা পরমাণুর সম্মিলিত চার্জ শূন্য। বিশেষ অবস্থায় অণু কিংবা পরমাণুকে আয়নিত করে ফেলা যায়, কিছু পরমাণুর এক বা একাধিক ইলেকট্রনকে মুক্ত করে ফেলা যায়, তখন আলাদা আলাদাভাবে পরমাণুগুলো আর চার্জ নিরপেক্ষ থাকে না। ইলেকট্রন এবং আয়নের এক ধরনের মিশ্রণ তৈরি হয়। এটি যদিও গ্যাসের মতো থাকে কিন্তু গ্যাসের সব ধর্ম এর জন্য সত্যি নয়। যেমন আমরা জানি গ্যাসের কোনো নির্দিষ্ট আকার নেই কিন্তু চৌম্বক ক্ষেত্র দিয়ে প্লাজমার নির্দিষ্ট আকার তৈরি করে ফেলা যায়।

প্রচণ্ড তাপ দিয়ে গ্যাসকে প্লাজমা করা যায়, শক্তিশালী বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র প্রয়োগ করেও প্লাজমা করা যায়। আমাদের ঘরে টিউবলাইটের ভেতর প্লাজমা তৈরি হয়, নিওন লাইটের যে উজ্জ্বল বিজ্ঞাপন দেখা যায় সেগুলোর ভেতরেও প্লাজমা থাকে। বজ্রপাত হলে যে বিজলির আলো দেখা যায় সেটিও প্লাজমা আবার দূর নক্ষত্রের মাঝে যে পদার্থ সেটিও প্লাজমা অবস্থায় আছে। আমরা বর্তমানে ফিশান পদ্ধতিতে ভারী নিউক্লিয়াসকে ভেঙে নিউক্লিয়ার শক্তি ব্যবহার করি। হালকা নিউক্লিয়াসকে একত্র করে ফিউশান পদ্ধতিতে শক্তি তৈরি করার জন্য প্লাজমা ব্যবহার করার চেষ্টা করা হয় এবং এটি এখন পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র।

নিজে করো

কঠিন বস্তুর ঘনত্ব বের করা

যন্ত্রপাতি: স্প্রিং ব্যালেন্স, পানিতে রাখা হলে পুরোপুরি ডুবে যায় সেরকম কোনো একটি কঠিন বস্তু, পানির পাত্রে পানি।

তত্ত্ব: বস্তুর ভরকে বস্তুর আয়তন দিয়ে ভাগ দেওয়া হলে ঘনত্ব বের হয়। বস্তুর ভর স্প্রিং ব্যালেন্স দিয়ে বের করা যায়। বস্তুর আয়তন আর্কিমিডিসের সূত্র দিয়ে বের করা সম্ভব, পানিতে ডোবালে তার ভর যত গ্রাম কমে যাবে বস্তুর আয়তন তত সিসি (cm^3)।

কাজের ধারা:

1. একটি স্প্রিং ব্যালেন্স দিয়ে কোনো একটি কঠিন বস্তুর ভর বের করো।
2. বস্তুটি একটা সুতা দিয়ে স্প্রিং ব্যালেন্সের সাথে বেঁধে পানিতে ডুবিয়ে আবার তার ভর মেপে নাও।
3. বস্তুর ঘনত্ব বের করো।

বস্তুর ঘনত্ব নির্ণয়ের ছক

পর্যবেক্ষণ সংখ্যা	বস্তুর ভর M_1 gm	পানিতে ডোবানো অবস্থায় বস্তুর ভর M_2 gm	বস্তুর আয়তন M_1-M_2 cm^3	বস্তুর ঘনত্ব $\frac{M_1}{M_1-M_2}\frac{gm}{cm^3}$

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন

1. এক গ্লাস পানিতে এক টুকরো বরফ ভাসছে, বরফটি গলে যাবার পর গ্লাসে পানির উচ্চতা কি বেড়ে যাবে নাকি সমান থাকবে?
2. একটা আস্ত বিশাল জাহাজকে মাত্র কয়েক বালতি পানির মাঝে ভাসিয়ে রাখা সম্ভব। কীভাবে?
3. একটা সুইমিংপুলে একটা ছোট নৌকার মাঝে তুমি একটা বড় পাথর নিয়ে বসে আছ। পাথরটা নৌকার ভেতর থেকে নিয়ে সুইমিংপুলের পানিতে ফেলে দিলে। সুইমিংপুলে পানির উচ্চতা কি বেড়ে যাবে, সমান থাকবে নাকি কমে যাবে?
4. সাধুরা পেরেকের বিছানায় শুয়ে থাকে (চিত্র 5.14)। চাইলে তুমিও পারবে। কেন?

চিত্র 5.14: একজন সাধু পেরেকের বিছানায় বসে আছে।

5. টরিসেলির পারদের তৈরি ব্যারোমিটারের কাচের নলটি যদি সোজা না হয়ে আঁকাবাঁকা হয় তাহলে কি কাজ করবে?
6. বল, চাপ ও ক্ষেত্রফলের সম্পর্ক কী?
7. ঘনত্ব কাকে বলে? এর একক কী?
8. বায়ুমণ্ডলীয় চাপ কাকে বলে?
9. টরিসেলির শূন্যস্থান কি প্রকৃতপক্ষে শূন্য? ব্যাখ্যা করো।
10. তরলের চাপ ও উচ্চতার মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করো।

গাণিতিক প্রশ্ন

1. বাতাসের ঘনত্ব 0.0012 gm/cm^3, সোনার ঘনত্ব 19.30 gm/cm^3, একটা নিক্তিতে 1 kg সোনা মাপা হলে তার প্রকৃত ভর কত?

2. পারদের পরিবর্তে কেরোসিন দিয়ে ব্যারোমিটার তৈরি করলে তার উচ্চতা কত হবে? (কেরোসিনের ঘনত্ব 0.8 gm/cm^3)

3. সোনার মুকুট এবং তার ওজনের সমান খাঁটি সোনা একটি দণ্ডের দুই পাশে ঝুলিয়ে সেটা পানিতে ডোবানো হলে (চিত্র 5.15) যদি দেখা যায় পানির নিচে সোনার মুকুটের ওজন কম তাহলে তুমি মুকুটটি সম্পর্কে কী বলবে? খাঁটি না খাদ মেশানো? কেন?

4. পানিভর্তি দুটি সিলিন্ডার একটি নল দিয়ে লাগানো। সিলিন্ডার দুটির প্রস্থচ্ছেদ 1 cm^2 এবং 1 m^2 এবং নিশ্ছিদ্রভাবে দুটি পিস্টন লাগানো আছে। বড় পিস্টনের উপর 70 kg ওজনের একজন মানুষ বসে আছে, তাকে ওপরে তুলতে ছোট পিস্টনে (চিত্র 5.16) তোমাকে কত বল প্রয়োগ করতে হবে?

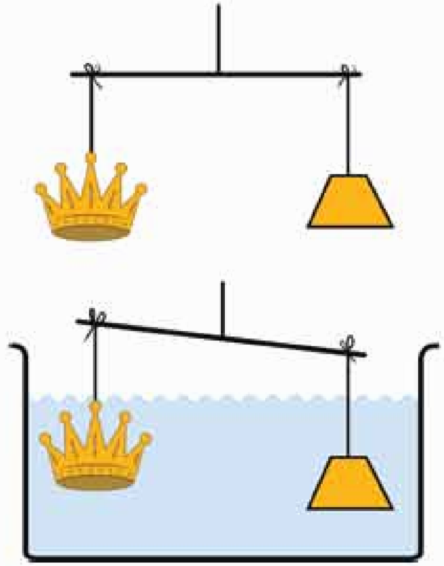

চিত্র 5.15: সোনার মুকুট ও খাঁটি সোনা পানিতে ডুবানো হচ্ছে।

5. উপর থেকে ঝোলানো 0.5 m লম্বা এবং 0.01 m^2 প্রস্থচ্ছেদের একটা ধাতব দণ্ডের নিচে একটি 10 kg ভর ঝোলানোর পর তার দৈর্ঘ্য হয়েছে 0.501 m. এই ধাতব দণ্ডটির ইয়াং এর মডুলাস কত?

চিত্র 5.16: হাইড্রোলিক প্রেসে চাপ দিয়ে একটি মানুষকে উপরে তোলা।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটির পাশে ঠিক (√) চিহ্ন দাও

1. বায়ুচাপ পরিমাপের যন্ত্রের নাম কী?
   (ক) থার্মোমিটার (খ) ব্যারোমিটার
   (গ) ম্যানোমিটার (ঘ) সিসমোমিটার

2. তরলের চাপের পরিমাণ কী হবে?
   (ক) গভীরতার সমানুপাতিক (খ) ক্ষেত্রফলের সমানুপাতিক
   (গ) ঘনত্বের ব্যস্তানুপাতিক (ঘ) অভিকর্ষীয় ত্বরণের সমান

3. পদার্থের চতুর্থ অবস্থার নাম কী?
   (ক) গ্যাস (খ) প্লাজমা
   (গ) কঠিন (ঘ) তরল

চিত্র 5.17

চিত্র থেকে নিচের 4 ও 5 নং প্রশ্নের উত্তর দাও

4. পাত্রের নিম্নতলে কী পরিমাণ চাপ অনুভূত হবে?
   (ক) 98 Pa (খ) 980 Pa
   (গ) 196 Pa (ঘ) 1960 Pa

5. যদি পাত্রের মুখে F বল প্রয়োগ করা হয় তবে বল:
   i. শুধু পাত্রের তলায় চাপ প্রয়োগ করবে
   ii. শুধু পাত্রের বক্র তলে চাপ প্রয়োগ করবে
   iii. পাত্রের সকল দিকে চাপ প্রয়োগ করবে

নিচের কোনটি সঠিক?
   (ক) i (খ) ii
   (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

1. চিত্র দেখে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:
   (ক) ঘনত্ব কাকে বলে?
   (খ) চিত্রে বস্তুটির এভাবে ভেসে থাকার কারণ ব্যাখ্যা করো।
   (গ) বস্তুটির ঘনত্ব নির্ণয় করো।
   (ঘ) তরলের তাপমাত্রা ক্রমাগত বৃদ্ধির ফলাফল ব্যাখ্যা করো।

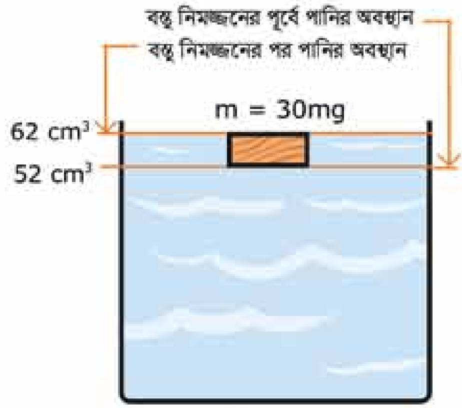

চিত্র 5.18

2. কাহিম L_1 দৈর্ঘ্যের একটি রাবার ব্যান্ডের এক মাথা দেয়ালে গাঁথা পেরেকের সাথে বেঁধে অপর মাথায় M ভর ঝুলিয়ে দিয়ে দেখল রাবার ব্যান্ডটি L_2 টেনে পর্যন্ত লম্বা হয়। ভর সরিয়ে নিলে আবার আগের অবস্থায় ফিরে আসে। সে তার পরীক্ষার ফলাফল কাগজে নিচের টেবিল আকারে লিখে রাখল।

ভর (kg)	0	0.4	1	1.4	2.2	3	4	5
ভর ঝুলানো অবস্থায় দৈর্ঘ্য L_2 (cm)	10	12	15	17	21	25	30	36
ভর সরিয়ে নেওয়ার পর দৈর্ঘ্য L_1 (cm)	10	10	10	10	10	10	10.2	10.6

   (ক) হুকের সূত্রটি লিখ।
   (খ) পীড়ন কীভাবে বিকৃতি ঘটায়?
   (গ) M= 2.7 kg হলে L_2 =? হিসাব করো।
   (ঘ) টেবিলের তথ্য ব্যবহার করে প্রতিদিন কাজে লাগানো যায় এমন একটি যন্ত্রের নকশা আঁকো।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বস্তুর ওপর তাপের প্রভাব

(Effect of Heat on Matter)

তাপ হচ্ছে এক ধরনের শক্তি। শক্তির ধারণা থেকে আমাদের মনে হতে পারে বেশি তাপশক্তি থেকে বুঝি সব সময়েই তাপ কম তাপশক্তির দিকে যায়, কিন্তু সেটি সত্যি নয়। তাপশক্তি কোন দিকে যাবে সেটি নির্ভর করে তাপমাত্রার উপর। এই অধ্যায়ে আমরা তাপ কিংবা তাপমাত্রা কীভাবে পরিমাপ করতে পারি এবং দুইয়ের মাঝে কী সম্পর্ক সেটি দেখব।

তাপশক্তিটুকু আসলে বস্তুর অণু-পরমাণুর গতি বা কম্পন থেকে এসেছে। তাপ দিয়ে কোনো কঠিন বস্তুর অণুগুলোর কম্পন যদি অনেক বাড়িয়ে দেওয়া যায় তাহলে একটি অণু অন্য অণু থেকে সরে যেতে পারে, অর্থাৎ অবস্থার পরিবর্তন হতে পারে। এই অধ্যায়ে আমরা কঠিন, তরল এবং গ্যাসের উপর তাপের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করব।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- তাপ ও তাপমাত্রা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পদার্থের তাপমাত্রিক ধর্ম ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ফারেনহাইট, সেলসিয়াস এবং কেলভিন স্কেলের মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে পারব।
- বস্তুর অভ্যন্তরীণ শক্তি বৃদ্ধির সাপেক্ষে তাপমাত্রা বৃদ্ধি ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পদার্থের তাপীয় প্রসারণ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- কঠিন পদার্থের দৈর্ঘ্য, ক্ষেত্রফল এবং আয়তন প্রসারণ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- তরলের আপাত ও প্রকৃত প্রসারণ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- আপেক্ষিক তাপ ও তাপ ধারণক্ষমতা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- তাপ পরিমাপের মূলনীতি ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পদার্থের অবস্থার পরিবর্তনে তাপের প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- গলন, বাষ্পীভবন ও ঘনীভবন ব্যাখ্যা করতে পারব।
- গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক ব্যাখ্যা করতে পারব।
- গলনাঙ্কের উপর চাপের প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- স্ফুটন ও বাষ্পায়ন ব্যাখ্যা করতে পারব।
- গলনের এবং বাষ্পীভবনের সুপ্ততাপ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বাষ্পায়ন শীতলীকরণের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বাষ্পায়নের উপর নিয়ামকের প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারব।

6.1 তাপ ও তাপমাত্রা (Heat and Temperature)

তাপ এক ধরনের শক্তি। আমরা দেখেছি শক্তি কাজ করতে পারে অর্থাৎ বল প্রয়োগ করে বস্তুকে বলের দিকে সরাতে পারে, যেমন ট্রেন বা গাড়িতে আসলে জ্বালানি তেল জ্বালিয়ে তাপ তৈরি করা হয় যেটা ট্রেন বা গাড়িকে ছুটিয়ে নিয়ে যায়। সেজন্য আলো, বিদ্যুৎ বা গতিশক্তির মতো আমরা নতুন ধরনের এই শক্তির নাম দিয়েছি তাপশক্তি।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, আমরা যদি আণবিক পর্যায়ে দেখতে পেতাম অর্থাৎ যেকোনো পদার্থের দিকে তাকালেই তার অণুগুলোকে দেখতে পেতাম তাহলে সম্ভবত তাপশক্তি নামে একটা নতুন নাম না দিয়ে এটাকে "গতিশক্তি" নামেই রেখে দিতাম। তার কারণ তাপশক্তি বলতে আমরা যেটা বোঝাই সেটা আসলে পদার্থের অণুগুলোর সম্মিলিত গতিশক্তি ছাড়া কিছু নয়। একটা কঠিন পদার্থে অণুগুলো যখন উত্তপ্ত হয় তখন অণুগুলো নিজের নির্দিষ্ট অবস্থানে থেকে কাঁপতে থাকে। যত বেশি উত্তপ্ত হবে অণুগুলোর কাঁপুনি তত বেড়ে যাবে। যদি অনেক বেশি উত্তপ্ত হয় তাহলে অণুগুলোর নিজেদের ভেতরে যে আন্তঃআণবিক বল রয়েছে অণুগুলো সেই বলকে ছাড়িয়ে মুক্ত হয়ে যাবে। তখন আমরা সেটাকে বলি তরল। তখন অণুগুলো এলোমেলোভাবে একে অন্যের ভেতর দিয়ে ছোটাছুটি করতে থাকে। তাদের একটা গতি থাকে, কাজেই এটা গতিশক্তি। যত উত্তপ্ত করা হয় অণুগুলো তত জোরে ছোটাছুটি করে। যদি আরো উত্তপ্ত করা হয় তখন অণুগুলো আণবিক বন্ধন থেকে পুরোপুরি মুক্ত হয়ে যেতে পারে। আমরা তখন সেটাকে বলি গ্যাস। একটা গ্যাসকে যত উত্তপ্ত করা হবে অণুগুলো তত জোরে ছোটাছুটি করবে। গতি যত বেশি হবে গতিশক্তি তত বেশি হবে।

যেহেতু খালি চোখে আমরা অণুগুলোকে দেখি না, তাদের ছোটাছুটি দেখি না, তাই আমরা পরোক্ষভাবে পুরো জিনিসটা বোঝার চেষ্টা করি, আমরা সেটাকে তাপশক্তি নাম দিই এবং তাপমাত্রা বলে পদার্থের অবস্থা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি। কাজেই আমরা বলতে পারি পদার্থের অণুগুলোর কম্পন বা গতির কারণে যে শক্তি পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে তাপ। যেহেতু এটা শক্তি তাই স্বাভাবিকভাবে অন্য শক্তির মতোই তার একক হচ্ছে জুল (J). তাপের আরো একটি একক আছে, তার নাম ক্যালরি (cal)। 1 gm পানির তাপমাত্রা $1\,^{\circ}C$ বাড়াতে হলে যে পরিমাণ তাপের দরকার সেটা হচ্ছে 1 ক্যালরি। 1 ক্যালরি হচ্ছে 4.2 J এর সমান।

তোমরা হয়তো খাবারের জন্য ক্যালরি শব্দটি ব্যবহার করতে শুনেছ। ফুড ক্যালরি বলতে আসলে বোঝানো হয় মানুষ নির্দিষ্ট খাবার থেকে কী পরিমাণ শক্তি পায় এবং এটার জন্য একক আসলে k cal বা 1000 ক্যালরি। তবে সেটা নিয়ে আমরা মাথা ঘামাব না। এখানে আমরা খাবার থেকে পাওয়া শক্তি নয় তাপশক্তি নিয়েই আলোচনা করব।

6.1.1 অভ্যন্তরীণ শক্তি (Internal Energy)

আমরা যদি তাপকে একটা শক্তি হিসেবে মেনে নিই, তাহলে সাথে সাথে এরপরের যে বিষয়টা আমাদের জানতে হবে সেটা হচ্ছে কীভাবে তাপশক্তি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত হয়। সাধারণভাবে আমাদের ধারণা সব সময়ই শক্তির প্রবাহ হয় বুঝি বেশি শক্তি থেকে কম শক্তিতে। ছোট একটা গরম আলপিনে যে পরিমাণ তাপশক্তি রয়েছে তার থেকে অনেক বেশি তাপশক্তি রয়েছে এক গ্লাস পানিতে। কিন্তু গরম আলপিনটা আমরা যদি পানিতে ডুবিয়ে দিই তাহলে কিন্তু আলপিনের অল্প তাপশক্তি থেকেই খানিকটা চলে যাবে গ্লাসের পানিতে। তার কারণ তাপশক্তির প্রবাহটা তাপের পরিমাণের ওপর নির্ভর করে না, এটা নির্ভর করে তাপমাত্রার উপরে। দুটো ভিন্ন তাপমাত্রার জিনিস যদি একে অন্যের সংস্পর্শে আসে তাহলে সব সময়ই বেশি তাপমাত্রা থেকে তাপ কম তাপমাত্রার জিনিসে যেতে থাকবে যতক্ষণ না দুটোর তাপমাত্রা সমান হচ্ছে।

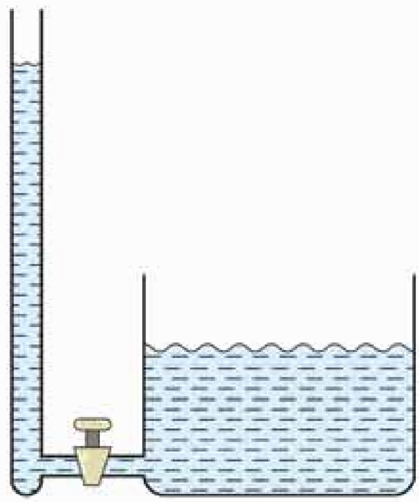

চিত্র 6.01: তাপমাত্রা তরলের উচ্চতার মতো, তাপ তরলের আয়তনের মতো।

আমরা এখনো কিন্তু "তাপমাত্রা" নামের রাশিটি সংজ্ঞায়িত করিনি। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে এটি এত ব্যবহার হয় যে বিষয়টি কী বুঝতে কারোই সমস্যা হয় না। পদার্থবিজ্ঞানের ভাষায় বলতে পারি এটা হচ্ছে পদার্থের ভেতরকার অণুগুলোর গড় গতিশক্তির একটা পরিমাপ। আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা বলতে পারি, তাপমাত্রা হচ্ছে সেই তাপীয় অবস্থা যেটি ঠিক করে একটা বস্তু অন্য বস্তুর সংস্পর্শে এলে সেটি কি তাপ দেবে নাকি তাপ নেবে। বিষয়টা বোঝানোর জন্য আমরা পানির পৃষ্ঠদেশের উচ্চতার সাথে তুলনা করতে পারি (চিত্র 6.01)। যদি পানির দুটি পাত্রে পানির পৃষ্ঠদেশের উচ্চতা ভিন্ন হয় তাহলে পাত্র দুটিকে একটি নল দিয়ে একত্র করার পর কোন পাত্রে পানি বেশি কোন পাত্রে পানি কম সেটি পানির প্রবাহ ঠিক করবে না। কোন পাত্র থেকে কোন পাত্রে পানি যাবে সেটা নির্ভর করবে কোন পাত্রের পানির পৃষ্ঠদেশের উচ্চতা কত তার ওপর। সব সময়ই বেশি উচ্চতা থেকে পানি কম উচ্চতায় প্রবাহিত হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না দুটি উচ্চতা সমান হয়ে যাচ্ছে। এখানে পানির পরিমাণটাকে তাপশক্তির সাথে তুলনা করতে পারি, পানির পৃষ্ঠদেশের উচ্চতাকে তুলনা করতে পারি তাপমাত্রার সাথে। তাপমাত্রার বেলাতেও এটা সত্যি যে যতক্ষণ পর্যন্ত না দুটি বস্তুর তাপমাত্রা সমান হচ্ছে ততক্ষণ তাপ প্রবাহিত হতে থাকবে।

6.2 পদার্থের তাপমাত্রিক ধর্ম (Thermometric Properties of matter)

তাপমাত্রা পরিমাপের জন্য বিশেষ পদার্থের বিশেষ ধর্মকে কাজে লাগাতে হয়। তাপমাত্রা পরিবর্তন হলে পদার্থের যে ধর্মের পরিবর্তন হয় এবং যে পরিবর্তন সূক্ষ্মভাবে পরিমাপ করে তাপমাত্রা মাপা যায় সেটাই হচ্ছে তাপমাত্রিক ধর্ম। তাপমাত্রা মাপার জন্য পদার্থের যে ধর্মটি ব্যবহার করা হয় সেটি হচ্ছে তাপমাত্রিক ধর্ম। তোমরা জ্বর মাপার পারদের থার্মোমিটার দেখে থাকবে, সেটি শরীরের তাপমাত্রা মাপে। এখানে পারদ হচ্ছে তাপমাত্রিক পদার্থ এবং পারদের আয়তনের প্রসারণ হচ্ছে তার তাপমাত্রিক ধর্ম।

পারদ ছাড়াও অ্যালকোহলের থার্মোমিটার আছে, সেখানে অ্যালকোহল হচ্ছে তাপমাত্রিক পদার্থ এবং তরলের প্রসারণ হচ্ছে তাপমাত্রিক ধর্ম।

গ্যাস থার্মোমিটারে গ্যাস হচ্ছে তাপমাত্রিক পদার্থ এবং নির্দিষ্ট আয়তনে রক্ষিত গ্যাসের চাপ হচ্ছে তাপমাত্রিক ধর্ম। তাপমাত্রার সাথে ধাতুর রোধ বা রেজিস্ট্যান্সের পরিবর্তন হয়, তাই রোধকেও তাপমাত্রিক ধর্ম হিসেবে ব্যবহার করা যায়। একেকটি তাপমাত্রিক পদার্থ একেক তাপমাত্রার জন্য কার্যকর, তাই খুব বেশি বা কম তাপমাত্রা মাপার জন্য বিশেষ তাপমাত্রিক পদার্থের বিশেষ তাপমাত্রিক ধর্ম ব্যবহার করতে হয়। তামা এবং কনস্টান্টেন ধাতুকে তাপমাত্রিক পদার্থ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। দুটি ভিন্ন ভিন্ন ধাতুর সংযোগস্থলে তাপমাত্রার পরিবর্তন হলে এটি একটি ইএমএফ (emf: electromotive force) তৈরি করে, সেটি মেপে তাপমাত্রা বের করা যায়। এই থার্মোকাপল $-200°C$ থেকে $1000°C$ পর্যন্ত তাপমাত্রা মাপতে পারে বলে ইন্ডাস্ট্রিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহার হয়।

আমরা যদি তাপমাত্রার ধারণাটুকু ঠিক করে পেয়ে যাই তাহলে এর পরেই আমাদের জানতে হবে এর একক কী কিংবা তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, আমরা কেমন করে তাপমাত্রা মাপব। তাপমাত্রার প্রচলিত একক হচ্ছে সেলসিয়াস (°C)। সাধারণভাবে বলা যায় এই স্কেলে এক এটমস্ফিয়ার বাতাসের চাপের যে তাপমাত্রায় বরফ গলে পানিতে পরিণত হয় সেটাকে $0°C$ এবং যে তাপমাত্রায় পানি ফুটতে থাকে সেটাকে $100°C$ ধরা হয়েছে। তবে মজার ব্যাপার হলো বিজ্ঞানী সেলসিয়াস যখন তাপমাত্রার স্কেল তৈরি করেছিলেন তখন শূন্য ডিগ্রি ধরেছিলেন ফুটন্ত পানির তাপমাত্রা, 100 ডিগ্রি ধরেছিলেন বরফ গলনের তাপমাত্রা। বর্তমান স্কেলের ঠিক উল্টো!

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা সাধারণত সেলসিয়াস স্কেল ব্যবহার করলেও আন্তর্জাতিক একককটির নাম হচ্ছে কেলভিন (K)। সেলসিয়াস স্কেলের সাথে $273.15°C$ যোগ করলেই কেলভিন স্কেল পাওয়া যায়। যদি শুধু তাপমাত্রার পার্থক্য নিয়ে মাথা ঘামাই তাহলে সেলসিয়াস স্কেল আর কেলভিন স্কেলে কোনো পার্থক্য নেই। অর্থাৎ তাপমাত্রা $10°C$ বেড়েছে বলা যে কথা, তাপমাত্রা $10K$

বেড়েছে বলা সেই একই কথা। কিন্তু যদি জিজ্ঞেস করা হয় এই ঘরের তাপমাত্রা কত, তাহলে যদি সেটা হয় 30°C তাহলে কেলভিন স্কেলে সেটা হবে (30 + 273.15 =) 303.15 K। তোমাদের মনে হতে পারে দুটো স্কেল হুবহু একই রকম শুধু 273.15°C পার্থক্য এর পেছনে কারণটি কী?

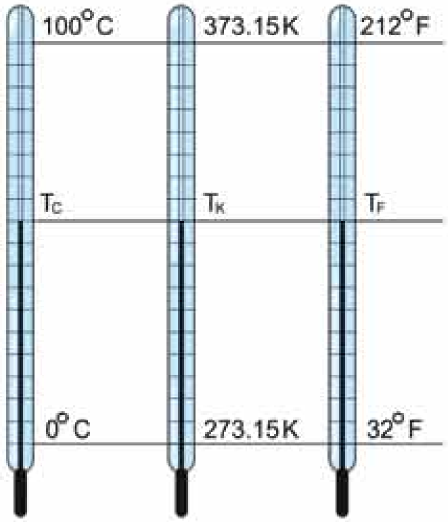

চিত্র 6.02: সেলসিয়াস কেলভিন এবং ফারেনহাইট তাপমাত্রার স্কেল।

এটি করার পেছনের কারণটি খুবই চমকপ্রদ। সাধারণভাবে আমাদের মনে হতে পারে আমরা বুঝি যত বেশি বা যত কম তাপমাত্রা কল্পনা করতে পারব, কিন্তু আসলে সেটি সত্যি নয়। তাপমাত্রা যত ইচ্ছে বেশি কল্পনা করতে সমস্যা নেই কিন্তু যত ইচ্ছে কম কল্পনা করা সম্ভব নয়, সবচেয়ে কম একটা তাপমাত্রা আছে এবং তাপমাত্রা এর থেকে কম হওয়া যায় না। শুধু তাই নয়, আমরা এই তাপমাত্রার কাছাকাছি যেতে পারি কিন্তু কখনোই এই তাপমাত্রায় পৌঁছাতে পারব না। এই তাপমাত্রাকে পরম শূন্য বা Absolute Zero বলা হয়। সেলসিয়াস স্কেলে এই তাপমাত্রার মান −273.15°C কাজেই কেলভিন স্কেলে এর মান হচ্ছে শূন্য ডিগ্রি। অন্যভাবে বলা যায় কেলভিন স্কেলটি তৈরি হয়েছে চরম শূন্য তাপমাত্রাকে শূন্য ডিগ্রি ধরে।

তাপমাত্রার যেকোনো স্কেল তৈরি করতে হলে দুটো নির্দিষ্ট তাপমাত্রা (বা স্থিরাঙ্ক) দরকার। কেলভিন স্কেলে একটি হচ্ছে পরম শূন্য। যেটাকে শূন্য ডিগ্রি ধরা হয়েছে। অন্যটি হচ্ছে পানির ত্রৈধ বিন্দু বা Triple Point এই তাপমাত্রায় একটা নির্দিষ্ট চাপে (0.0060373 atm) বরফ, পানি এবং জলীয় বাষ্প এক সাথে থাকতে পারে বলে তাপমাত্রাকে অনেক বেশি সূক্ষ্মভাবে নির্দিষ্ট করা যায়। সেলসিয়াস স্কেলে এর মান 0.01°C, এবং এই স্কেলের সাথে মিল রাখার জন্য কেলভিন স্কেলে এর মান 273.16°

কেলভিন এবং সেলসিয়াস স্কেলের পাশাপাশি ফারেনহাইট স্কেল বলেও একটা স্কেল আছে যেখানে বরফ গলন এবং পানির বাষ্পীভবনের তাপমাত্রা যথাক্রমে 32°F এবং 212°F, চিত্র 6.02 এ তিনটি স্কেলকে তুলনা করার জন্য দেখানো হলো, কেলভিন স্কেলে 0°C তাপমাত্রা 273.15 K হলেও আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অনেক সময়েই এটাকে 273 K ধরে নিই। দৈনন্দিন হিসাবে সেটা কোনো গুরুতর সমস্যা করে না।

6.2.1 ভিন্ন স্কেলের মাঝে সম্পর্ক

যদি একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রা সেলসিয়াস, কেলভিন এবং ফারেনহাইট স্কেলে যথাক্রমে T_C, T_K আর T_F দেখায় তাহলে আমরা লিখতে পারি:

$$\frac{T_C - 0}{100 - 0} = \frac{T_K - 273.15}{373.15 - 273.15} = \frac{T_F - 32}{212 - 32}$$

কিংবা

$$\frac{T_C}{100} = \frac{T_K - 273.15}{100} = \frac{T_F - 32}{180}$$

T_C এর সাপেক্ষে কেলভিন স্কেল এবং ফারেনহাইট স্কেল যথাক্রমে:

$$T_C = T_K - 273.15°$$

$$T_C = \frac{5}{9}(T_F - 32)$$

উদাহরণ

প্রশ্ন: কোন তাপমাত্রায় সেলসিয়াস এবং ফারেনহাইট স্কেল সমান?

উত্তর: সেলসিয়াস এবং ফারেনহাইট তাপমাত্রার সম্পর্কটি এ রকম:

$$T_C = \frac{5}{9}(T_F - 32°)$$

$$9T_C = 5T_F - 5 \times 32\,°$$

T_C এবং T_F সমান হলে:

$$4T_C = -5 \times 32° = -160°$$

$$T_C = -40°$$

অর্থাৎ যে তাপমাত্রা $-40°$ C দেখায় সেই একই তাপমাত্রা $-40°$ F দেখায়।

প্রশ্ন: কোন তাপমাত্রায় কেলভিন এবং ফারেনহাইট স্কেল সমান?

উত্তর: কেলভিন এবং ফারেনহাইট তাপমাত্রার সম্পর্কটি এ রকম:

$$T_K - 273.15° = \frac{5}{9}(T_F - 32°)$$
$$9T_K - 9 \times 273.15° = 5T_F - 5 \times 32°$$

যদি T_K এবং T_F সমান হয়:

$$4T_K = 9 \times 273.15° - 5 \times 32°$$
$$T_K = 574.59°$$

প্রশ্ন: সুস্থ দেহের তাপমাত্রা 98.4°F, সেলসিয়াসে সেটা কত?

উত্তর: সেলসিয়াস এবং ফারেনহাইট তাপমাত্রার সম্পর্কটি এ রকম:

$$T_C = \frac{5}{9}(T_F - 32°)$$

কাজেই $T_F = 98.4°$ হলে

$$T_C = \frac{5}{9}(98.4° - 32°) = 36.89°$$

(অর্থাৎ 37° C এর কাছাকাছি)

প্রশ্ন: কোন তাপমাত্রায় সেলসিয়াস এবং কেলভিন স্কেল সমান?

উত্তর: কখনোই না!

6.3 পদার্থের তাপীয় প্রসারণ (Thermal Expansion of Matter)

6.3.1 কঠিন পদার্থের প্রসারণ

তাপ দিলে প্রায় সব পদার্থের আয়তনই একটু বেড়ে যায়। তাপ তাপমাত্রা এই বিষয়গুলো যদি আমরা আমাদের আণবিক মডেল দিয়ে ব্যাখ্যা করি তাহলে এর কারণটা বোঝা কঠিন নয়। একটা কঠিন পদার্থকে আমরা অনেকগুলো অণু হিসেবে কল্পনা করতে পারি। তাদের ভেতর যে আণবিক বল সেটাকে আমরা স্প্রিংয়ের সাথে তুলনা করতে পারি। কঠিন পদার্থে অণুগুলো কীভাবে থাকে সেটা

দেখানোর জন্য আমরা অণুগুলোর মাঝে একটা স্প্রিং কল্পনা করেছি এবং 6.03 চিত্রে সেটা দেখানো হয়েছে। কঠিন পদার্থটিকে উত্তপ্ত করলে অণুগুলো কাঁপতে থাকবে। তাপমাত্রা যত বেশি হবে অণুগুলো তত বেশি কাঁপবে। সত্যিকারের কঠিন পদার্থের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে হলে আমাদের এই স্প্রিং মডেলটাকে একটুখানি উন্নত করতে হবে। স্প্রিংয়ের বেলায় আমরা দেখেছি একটা স্প্রিংকে কোনো নির্দিষ্ট দূরত্বে প্রসারিত করলে সেটি যে পরিমাণ বলে টানতে থাকে সেই একই দূরত্বে সংকুচিত করলে এটি ঠিক একই বলে ঠেলতে থাকে। কঠিন পদার্থের অণুগুলোর জন্য এটি পুরোপুরি সত্যি নয়। অণুগুলোকে একটি বেশি দূরত্বে সরিয়ে নিলে এটা যে পরিমাণ বলে টানতে থাকে সেই একই দূরত্বে কাছাকাছি আনলে অনেক বেশি বলে ঠেলতে থাকে। অর্থাৎ স্প্রিংটি যেন একটি বিশেষ ধরনের স্প্রিং। এটা প্রসারিত করতে কম বল প্রয়োগ করতে হয় কিন্তু সংকুচিত করতে বেশি বল প্রয়োগ করতে হয়।

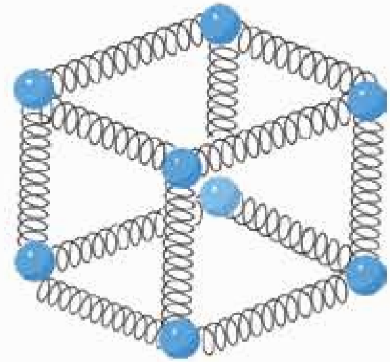

চিত্র 6.03: অণুগুলো একটি অন্যটির সাথে স্প্রিং দিয়ে যুক্ত কল্পনা করে নেওয়া যায়।

এখন তুমি কল্পনা করে নাও একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় থাকার কারণে অণুগুলো কাঁপছে। বিশেষ ধরনের স্প্রিং হওয়ার কারণে কাঁপার সময় অণুগুলো কাছাকাছি যায় কম কিন্তু দূরে সরে যায় বেশি। এবারে কঠিন পদার্থটিকে আরো উত্তপ্ত করা হলো, অণুগুলো আরো বেশি কাঁপতে থাকবে এবং তোমরা বুঝতেই পারছ অণুগুলো এই বিশেষ ধরনের স্প্রিংয়ের জন্য যেহেতু বেশি কাছে যেতে পারে না কিন্তু সহজেই বেশি দূরে যেতে পারে তাই অণুগুলো একে অন্যের থেকে একটু দূরে সরে নতুন একটা সাম্য অবস্থা তৈরি করবে। সব অণু যখন একে অন্য থেকে দূরে সরে যাবে তখন আমাদের কাছে পুরো কঠিন বস্তুটাই একটু প্রসারিত হয়ে গেছে বলে মনে হবে।

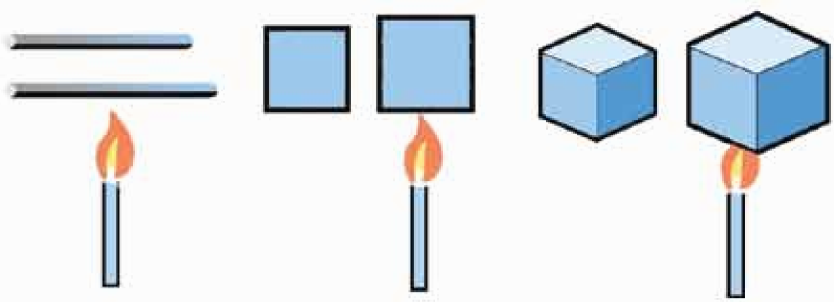

চিত্র 6.04: তাপ প্রয়োগ করলে কঠিন পদার্থের দৈর্ঘ্য, প্রস্থচ্ছেদ এবং আয়তন বেড়ে যায়।

তাপ প্রয়োগ করলে কঠিন বস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা তিন দিকেই সমানভাবে প্রসারিত হয় (চিত্র 6.04)। পদার্থের এই প্রসারণকে বিশ্লেষণ করার জন্য দৈর্ঘ্য, ক্ষেত্রফল আর আয়তন প্রসারণ সহগ নামে তিনটি রাশি তৈরি করা হয়েছে।

T_1 তাপমাত্রার কোনো বস্তুর দৈর্ঘ্য যদি L_1 হয় এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধি করে সেটি T_2 করার পর যদি দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পেয়ে সেটি L_2 হয় তাহলে দৈর্ঘ্য প্রসারণ সহগ α হচ্ছে:

$$\alpha = \frac{(L_2 - L_1)/L_1}{T_2 - T_1}$$

কাজেই

$$L_2 = L_1 + \alpha L_1(T_2 - T_1)$$

একইভাবে T_1 তাপমাত্রায় কোনো বস্তুর ক্ষেত্রফল যদি A_1 হয় এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধি করে T_2 করার পর ক্ষেত্রফলও যদি বেড়ে A_2 হয় তাহলে ক্ষেত্রফল প্রসারণ সহগ β হচ্ছে:

$$\beta = \frac{(A_2 - A_1)/A_1}{T_2 - T_1}$$

কাজেই

$$A_2 = A_1 + \beta A_1(T_2 - T_1)$$

ঠিক একইভাবে T_1 তাপমাত্রায় যদি আয়তন V_1 হয় এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধি করে T_2 করার পর যদি আয়তন বেড়ে V_2 হয় তাহলে আয়তন প্রসারণ সহগ γ হচ্ছে:

$$\gamma = \frac{(V_2 - V_1)/V_1}{T_2 - T_1}$$

কাজেই

$$V_2 = V_1 + \gamma V_1(T_2 - T_1)$$

তোমরা দেখতেই পাচ্ছ α, β এবং γ তিনটি রাশির এককই হচ্ছে K^{-1}

মাত্রা $[\alpha] = [\beta] = [\gamma] = T^{-1}$

উদাহরণ

প্রশ্ন: 20° C তাপমাত্রায় তামার দণ্ডের দৈর্ঘ্য 10 m, 120° C তাপমাত্রায় দণ্ডটির দৈর্ঘ্য 10.0167 m, এর দৈর্ঘ্য প্রসারণ সহগ কত?

উত্তর: দৈর্ঘ্য প্রসারণ সহগ

$$\alpha = \frac{L_2 - L_1}{L_1(T_2 - T_1)}$$

এখানে $L_1 = 10$ m

$$L_2 = 10.0167 \text{ m}$$
$$T_2 = 120° \text{ C}$$
$$T_1 = 20° \text{ C}$$

$$\alpha = \frac{10.0167m - 10m}{10m(120℃ - 20℃)} = 16.7 \times 10^{-6}\ °\text{C}^{-1}$$

তোমরা উপরের উদাহরণগুলো থেকে দেখেছ কঠিন পদার্থের প্রসারণ সহগের মান আসলে খুবই কম। সে কারণে α, β এবং γ এই তিনটি ভিন্ন ভিন্ন সহগের কিন্তু প্রয়োজন ছিল না। আমরা কাজ চালানোর জন্য শুধু দৈর্ঘ্য প্রসারণ সহগটি ব্যাখ্যা করে নিলেই পারতাম। যেমন ধরা যাক ক্ষেত্রফল প্রসারণের ব্যাপারটি। আমরা দেখেছি:

$$A_2 = A_1 + \beta A_1(T_2 - T_1)$$

কিন্তু ক্ষেত্রফল A_1 আসলে দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থের গুণফল যদি এবং আমরা বর্গাকৃতির ক্ষেত্রফল ধরে নিই যার বাহুর দৈর্ঘ্য L_1 তাহলে তাপমাত্রা বাড়ালে তার ক্ষেত্রফল হবে

$$A_2 = L_2^2 = [L_1 + \alpha L_1(T_2 - T_1)]^2$$

কিংবা

$$A_2 = L_1^2 + 2\alpha L_1^2(T_2 - T_1) + \alpha^2 L_1^2(T_2 - T_1)^2$$

কিন্তু

$$A_1 = L_1^2$$

কাজেই

$$A_2 = A_1 + 2\alpha A_1(T_2 - T_1) + \alpha^2 A_1(T_2 - T_1)^2$$

আমরা দেখেছি α এর মান খুবই ছোট, কাজেই α^2 এর মান আরও ছোট, সত্যি কথা বলতে কি এটি এত ছোট যে উপরের সমীকরণে α^2 সহ পুরো অংশটুকু আমরা যদি পুরোপুরি বাদ দিই আমাদের বিশ্লেষণ বা হিসাবে এমন কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি হবে না। তাই আমরা লিখতে পারি:

$$A_2 = A_1 + 2\alpha A_1(T_2 - T_1)$$

কিন্তু আমরা জানি

$$A_2 = A_1 + \beta A_1(T_2 - T_1)$$

কাজেই নিশ্চয়ই:

$$\beta = 2\alpha$$

ঠিক একইভাবে আমরা L_1 দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা নিয়ে একটা কিউব কল্পনা করতে পারি T_1 তাপমাত্রায় যার আয়তন V_1 এবং তাপমাত্রা বাড়িয়ে T_2 করার পর যার আয়তন হয়েছে V_2 , কাজেই

$$V_2 = [L_1 + \alpha L_1(T_2 - T_1)]^3$$

একই যুক্তিতে এখানেও যদি α^2 এবং α^3 সহ অংশগুলোকে বাদ দিই আমাদের বিশ্লেষণ বা হিসাবের এমন কোনো ক্ষতি বৃদ্ধি হবে না। কাজেই শুধু প্রথম দুটি অংশ থাকবে অর্থাৎ

$$V_2 = L_1^3 + 3\alpha L_1^3(T_2 - T_1) \ldots$$

কিন্তু আমরা জানি

$$V_1 = L_1^3$$

অর্থাৎ

$$V_2 = V_1 + 3\alpha V_1(T_2 - T_1)$$

কাজেই

$$V_2 = V_1 + \gamma V_1(T_2 - T_1)$$

কাজেই নিশ্চয়ই:

$$\gamma = 3\alpha$$

বাস্তব জীবনে আমাদের কঠিন পদার্থের প্রসারণের বিষয়টা সব সময়ই মনে রাখতে হয়। তোমরা নিশ্চয়ই রেললাইনের মাঝে ফাঁকাটি দেখেছ। তাপমাত্রার প্রসারণকে মনে রেখে এটা করা হয়েছে। প্রসারণের এই সুযোগটি না দিলে উত্তপ্ত দিনে রেললাইন আঁকাবাঁকা হয়ে যেতে পারত। বেশি মিষ্টি খেয়ে এবং নিয়মিত দাঁত ব্রাশ না করে তোমাদের যাদের দাঁতে কেভিটি হয়েছে তারা যখন ডেন্টিস্টের কাছে গিয়েছ তারা হয়তো লক্ষ করেছ একটা বিশেষ পদার্থ দিয়ে দাঁতের গর্তটি বুজে দেওয়া হয়েছে। এই পদার্থটির প্রসারণ সহগ অনেক যত্ন করে দাঁতের প্রসারণ সহগের সমান করা হয়েছে। যদি প্রসারণ সহগ দাঁত থেকে কম হতো তাহলে গরম কিছু খাওয়ার সময় এটা দাঁতের সমান প্রসারিত না হয়ে খুলে আসত। আবার প্রসারণ সহগ বেশি হলে ঠান্ডা কিছু খাওয়ার সময় বেশি ছোট হয়ে দাঁত থেকে খুলে আসত। পদার্থবিজ্ঞান না পড়েও অনেক সাধারণ মানুষও তাপমাত্রায় প্রসারণের বিষয়টা জানে। তোমরা লক্ষ করে দেখবে কোনো কৌটার মুখ আটকে গেলে সেটাতে গরম পানি ঢালা হয়। যেন এটা প্রসারিত হয়ে সহজে খুলে আসে।

উদাহরণ

প্রশ্ন: কাচের গ্লাসে গরম পানি ঢাললে গ্লাস ফেটে যায় কেন?

উত্তর: কোনো কোনো অংশে হঠাৎ করে তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ায় কোথাও প্রসারণ বেশি হয়, সে কারণে গ্লাস ফেটে যায়।

প্রশ্ন: সোনার ঘনত্ব 19.30 gm/cc, এর দৈর্ঘ্য প্রসারণ সহগ $14 \times 10^{-6}\,°C^{-1}$ এর তাপমাত্রা 100° C বাড়ালে ঘনত্ব কত হবে?

উত্তর: ঘনত্ব

$$\rho = \frac{m}{V}$$

যেখানে V হচ্ছে আয়তন এবং m হচ্ছে ভর। তাপমাত্রা বাড়ালে ভর এক থাকলেও আয়তন বেড়ে যায়। কাজেই 100 °C তাপমাত্রা বাড়ালে তার আয়তন V' হবে:

$$V' = V + \gamma V(T_2 - T_1) = V(1 + 3\alpha \times 100)$$

$$\alpha = 14 \times 10^{-6}\,°C^{-1}$$

$$V' = V(1 + 4.2 \times 10^{-3})$$

$$\rho' = \frac{m}{V'} = \frac{m}{V(1 + 4.2 \times 10^{-3})} = \frac{m}{V} \times 0.9958 = 0.9958\rho$$

$$\rho' = 0.9958 \times 19.30\ \text{gm/cc} = 19.22\ \text{gm/cc}$$

প্রশ্ন: তাপমাত্রা যদি আরো 1000°C বাড়ানো হয় তাহলে ঘনত্ব কত হবে?

উত্তর: সোনার গলনাঙ্ক 1064°C কাজেই এই তাপমাত্রায় সোনা গলে যাবে৷

6.3.2 তরল পদার্থের প্রসারণ

তরল পদার্থের দৈর্ঘ্য বা ক্ষেত্রফল বলে কিছু নেই। তরল পদার্থের শুধু আয়তন আছে। কাজেই তরল পদার্থের প্রসারণ বলতে তার আয়তন প্রসারণকেই বোঝায়। তরল পদার্থের প্রসারণ মাপার সময়

একটু সতর্ক থাকতে হয় কারণ তরল পদার্থকে সব সময়ই কোনো পাত্রে রাখতে হয়, কাজেই প্রসারণ সহগ মাপতে চাইলে যখন তরলটিকে উত্তপ্ত করার চেষ্টা করা হয় তখন স্বাভাবিকভাবে পাত্রটিও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং পাত্রটিরও একটি প্রসারণ হয়। কাজেই পাত্রে তরল যে প্রসারণ দেখা যায় সেটা সত্যিকারের প্রসারণ না, সেটা হচ্ছে আপাত প্রসারণ। কাজেই প্রকৃত প্রসারণ বের করতে হলে পাত্রের প্রসারণের ব্যাপারটা সব সময়ই মনে রাখতে হবে। সাধারণত তরলের প্রসারণ কঠিন পদার্থের প্রসারণ থেকে বেশি হয়। যদি তা না হতো তাহলে আমরা আপাত প্রসারণটি হয়তো দেখতেই পেতাম না। মনে হতো আপাত সংকোচন।

তরল পদার্থের প্রসারণের সবচেয়ে সহজ উদাহরণ হচ্ছে থার্মোমিটার। নানা রকম থার্মোমিটার রয়েছে, তার মধ্যে জ্বর মাপার থার্মোমিটার (চিত্র 6.05) সম্ভবত তোমাদের কাছে সবচেয়ে পরিচিত। থার্মোমিটারের গোড়ায় একটা কাচের টিউবে পারদ থাকে। তাপ দেওয়া হলে পারদের আয়তন বেড়ে যায় এবং একটা খুব সরু নল বেয়ে উঠতে থাকে, কতদূর উঠেছে সেটা হচ্ছে তাপমাত্রার পরিমাপ। জ্বর মাপার সময় যেহেতু থার্মোমিটারকে বগল থেকে কিংবা মুখ থেকে বের করে তাপমাত্রা দেখতে হয় তখন যেন পারদের কলামটুকু কমে না যায় সেজন্য সরু নলটির গোড়ায় নলটিকে একটা খুব সরু বক্রতা রাখা হয়। এ কারণে একবার প্রসারিত হয়ে উপরে উঠে গেলে তাপমাত্রা কমে যাবার পরও নেমে আসতে পারে না। ঝাঁকিয়ে নামাতে হয়।

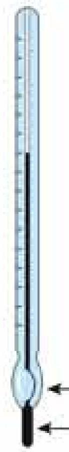

চিত্র 6.05: জ্বর মাপার থার্মোমিটারে পারদ যেন নেমে যেতে না পারে সেজন্য টিউবে সূক্ষ্ম বক্রতা তৈরি করা হয়।

প্রকৃত এবং আপাত প্রসারণ

আগেই বলা হয়েছে তরলকে সব সময় কোনো পাত্রে রেখে উত্তপ্ত করতে হয়। তাপ দেওয়া হলে তরলটির সাথে সাথে পাত্রটিরও প্রসারণ হয়, তাই সত্যি সত্যি তরলের কতটুকু প্রসারণ হয়েছে সেটি বের করতে হলে পাত্রের প্রসারণটুকু বিবেচনায় রাখতে হয়। এটি বিবেচনায় না রেখে তরলের প্রসারণ বের করা হলে আমরা সেটাকে বলি আপাত প্রসারণ। পাত্রের প্রসারণটি বিবেচনায় রেখে তরলের প্রসারণ বের করা হলে সেটি হবে সত্যিকার প্রসারণ বা প্রকৃত প্রসারণ।

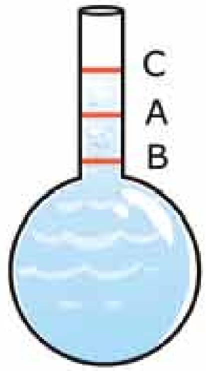

চিত্র 6.06: সত্যিকার এবং আপাত প্রসারণ।

একটা সরু নলবিশিষ্ট কাচের বাল্বে A দাগ পর্যন্ত তরলে ভর্তি করে যদি বাল্বটিকে গরম করা হয় তাহলে আমরা দেখব প্রথমে তরলের

উচ্চতা B তে নেমে এসেছে (চিত্র 6.06)। এটি ঘটবে কারণ তাপ দেওয়ার পর তরলটির তাপমাত্রা বাড়ার আগে বাল্বটির তাপমাত্রা বেড়ে যাবে এবং তার প্রসারণ হবে, অর্থাৎ বাল্বটি একটুখানি বড় হয়ে যাবে।

যদি আমরা তারপরও তাপ দিতে থাকি তাহলে তরলটির উচ্চতা বাড়তে থাকবে। যেহেতু তরলের প্রসারণ বেশি তাই আমরা দেখব তরলটি A থেকে অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত C উচ্চতায় পৌঁছেছে।

নলটির প্রস্থচ্ছেদকে দিয়ে যদি AB উচ্চতাকে গুণ দিই তাহলে আমরা পাত্রটির প্রসারণ (V_B) পাব। যদি BC উচ্চতাকে গুণ দিই তাহলে তরলের প্রকৃত প্রসারণ (V_L) পাব। এখানে আপাত প্রসারণ (V_a) হচ্ছে

$$V_a = V_L - V_B$$

6.3.3 গ্যাসের প্রসারণ

কঠিন পদার্থের আকার আর আয়তন দুটিই আছে তাই তার প্রসারণ বুঝতে কোনো সমস্যা হয়নি। তরলের নির্দিষ্ট আকার না থাকলেও তার আয়তন আছে, তাই তার প্রসারণও আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি কিংবা মাপতে পারি। গ্যাসের বেলায় বিষয়টা বেশ মজার। তার কারণ তার নির্দিষ্ট আকার তো নেই-ই, তার নির্দিষ্ট আয়তনও নেই, গ্যাসকে যে পাত্রে ঢোকানো হবে গ্যাসটি সাথে সাথে সেই পাত্রের আয়তন নিয়ে নেবে৷ একই পরিমাণ গ্যাস ভিন্ন ভিন্ন আয়তনের পাত্রে ঢোকানো হলে তার চাপ হয় ভিন্ন। কাজেই আমরা ঠিক করে নিতে পারি, যদি গ্যাসের আয়তন বৃদ্ধি মাপতে চাই তাহলে লক্ষ রাখতে হবে তার চাপের যেন পরিবর্তন না হয়। 6.07 চিত্রে যে রকম দেখানো হয়েছে। একটা সিলিন্ডারের পিস্টনের ওপর নির্দিষ্ট ওজনের কিছু একটা রাখা হয়েছে, যেন এটা সব সময়ই সিলিন্ডারের আবদ্ধ গ্যাসকে সমান চাপ দেয়।

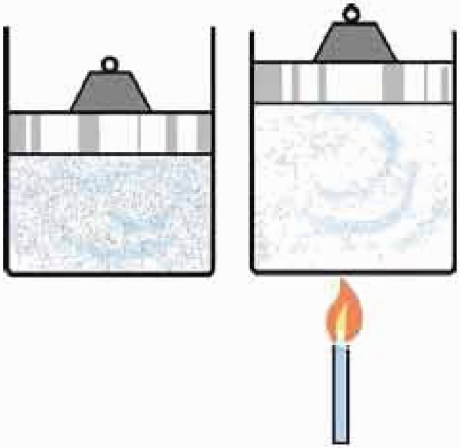

চিত্র 6.07: তাপ প্রয়োগ করলে বাতাসের আয়তন বেড়ে যায়।

তরল কিংবা কঠিন পদার্থকে চাপ দিয়ে খুব বেশি সংকুচিত করা যায় না। কিন্তু গ্যাসকে খুব সহজে সংকুচিত করা যায়। তাই প্রথমেই আমাদের গ্যাসের চাপ আর আয়তনের মাঝে সম্পর্কটা জানা দরকার। এটাকে বলে আদর্শ গ্যাসের সূত্র এবং এটা হচ্ছে

$$PV = nRT$$

এখানে P হচ্ছে চাপ, V হচ্ছে আয়তন, n হচ্ছে গ্যাসের পরিমাণ (মোলে মাপা) R একটি ধ্রুবক ($8.314\ \mathrm{J\,K^{-1}mol^{-1}}$) এবং T হচ্ছে কেলভিন স্কেলে তাপমাত্রা।

এখন আমরা গ্যাসের জন্য প্রসারণ সহগ বের করতে পারি। একটা নির্দিষ্ট চাপে যদি T_1 তাপমাত্রায় গ্যাসের আয়তন হয় V_1 এবং T_2 তাপমাত্রায় গ্যাসের আয়তন হয় V_2 তাহলে গ্যাসের আয়তন প্রসারণ সহগ β_P হচ্ছে:

$$\beta_P = \frac{(V_2 - V_1)/V_1}{T_2 - T_1}$$

আমরা জানি

$$PV_1 = nRT_1$$

$$PV_2 = nRT_2$$

কাজেই

$$P(V_2 - V_1) = nR(T_2 - T_1)$$

বাম পাশে PV_1 এবং ডান পাশে nRT_1 দিয়ে ভাগ দিয়ে:

$$\frac{V_2 - V_1}{V_1} = \frac{T_2 - T_1}{T_1}$$

কাজেই

$$\frac{(V_2 - V_1)/V_1}{T_2 - T_1} = \frac{1}{T_1}$$

অর্থাৎ

$$\beta_P = \frac{1}{T_1}$$

কাজেই দেখতেই পাচ্ছ গ্যাসের প্রসারণের সহগ মোটেই কোনো ধ্রুব সংখ্যা নয়। এটা তাপমাত্রার বিপরীত (${T_1}^{-1}$) অর্থাৎ তাপমাত্রা যত কম হবে গ্যাসের প্রসারণ হবে তত বেশি। অন্যভাবে বলা যায় একটি নির্দিষ্ট চাপে একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় গ্যাসের তাপমাত্রা এক ডিগ্রি বাড়ালে তার যেটুকু প্রসারণ হবে একই চাপে কিন্তু কম তাপমাত্রায় গ্যাসের তাপমাত্রা এক ডিগ্রি বাড়ালে প্রসারণ হবে তার থেকে বেশি।

নিজে করো

দুটি বেলুন নাও, একটিতে খানিকটা পানি ভরো, অন্যটিতে সমান আয়তনের বাতাস। এবারে দুটোই গরম পানিতে কিছুক্ষণ ডুবিয়ে রাখো, দেখবে পানি ভরা বেলুনটির আকার আগের মতোই আছে, কারণ তাপে তরলের সেরকম প্রসারণ হয় না কিন্তু বাতাস ভরা বেলুনটি অনেকখানি ফুলে উঠেছে, কারণ তাপে গ্যাসের প্রসারণ তরল থেকে অনেক বেশি।

6.4 পদার্থের অবস্থার পরিবর্তনে তাপের প্রভাব (Effect of Temperature on Change of State)

তোমরা ইতিমধ্যে জেনে গেছ সব পদার্থ অণু দিয়ে তৈরি এবং কঠিন পদার্থে অণুগুলো নির্দিষ্ট অবস্থানে থেকে একে অন্যকে আটকে রাখে। তাপ দেওয়া হলে এগুলোর কম্পন বেড়ে যায় এবং আণবিক বন্ধন শিথিল হয়ে একে অন্যের ওপর গড়াগড়ি খেয়ে নড়তে শুরু করে এবং এটাকে আমরা বলি তরল। তাপমাত্রা যদি আরো বেড়ে যায় তখন অণুগুলো মুক্ত হয়ে ছোটাছুটি শুরু করে, তাকে আমরা বলি গ্যাস। এই ব্যাপারটি আমরা এখন আরেকটু গভীরভাবে দেখব এবং পদার্থের অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সম্পর্ক আছে এ রকম বিভিন্ন রাশির সাথে পরিচিত হব।

একটা কঠিন পদার্থকে যখন তাপ দেওয়া হয় তখন তার তাপমাত্রা বাড়তে থাকে। (কী হারে তাপমাত্রা বাড়বে এবং সেটা কিসের ওপর নির্ভর করে সেটা আমরা একটু পরেই জেনে যাব।) তাপমাত্রা (একটা নির্দিষ্ট চাপে) একটা নির্দিষ্ট মানে পৌঁছালে কঠিন পদার্থটি গলতে শুরু করে। এই প্রক্রিয়াটার নাম গলন এবং যে তাপমাত্রায় গলন শুরু হয় সেটাকে বলে গলনাঙ্ক। আমরা যদি কঠিন পদার্থের তাপমাত্রা মাপতে থাকি তাহলে একটু অবাক হয়ে লক্ষ করব যখন গলন শুরু হয়েছে তখন তাপ দেওয়া সত্ত্বেও খানিকটা কঠিন খানিকটা তরলের এই মিশ্রণের তাপমাত্রা আর বাড়ছে না, (6.08 চিত্রে যে রকম দেখানো হয়েছে) এই সময়টিতে তাপ কঠিন পদার্থের অণুগুলোর ভেতরকার আন্তঃআণবিক বন্ধনকে শিথিল করতে ব্যয় হয়। তাই অণুগুলোকে আরো গতিশীল করতে পারে না বলে তাপমাত্রা বাড়তে পারে না। গলন চলাকালীন নির্দিষ্ট গলনাঙ্কে যে পরিমাণ তাপ দিয়ে পুরো কঠিন পদার্থকে তরলে রূপান্তর করতে হয় সেই তাপকে বলা হয় গলনের সুপ্ততাপ।

একবার পুরো কঠিন পদার্থটি তরলে রূপান্তরিত হওয়ার পর তাপমাত্রা আবার বাড়তে শুরু করে (6.08 চিত্রে যে রকম দেখানো হয়েছে) তাপমাত্রা বাড়তে বাড়তে এক সময় তরল পদার্থটি গ্যাসে পরিবর্তন

হতে শুরু করে। এই প্রক্রিয়াটির নাম বাষ্পীভবন এবং যে তাপমাত্রায় বাষ্পীভবন ঘটে সেটাকে বলে স্ফুটনাঙ্ক। আবার সবাইকে মনে করিয়ে দেওয়া হচ্ছে এই স্ফুটনাঙ্ক চাপের ওপর নির্ভর করে।

যখন বাষ্পীভবন প্রক্রিয়া শুরু হয় তখন তরলের অণুগুলো তাপশক্তি নিয়ে পরস্পরের সাথে যে আণবিক বন্ধন আছে সেটা থেকে মুক্ত হতে শুরু করে। গলনের মতো এখানেও যদিও তাপ দেওয়া হয়, তাতে তরলের তাপমাত্রা কিন্তু বাড়ে না। তরলকে বাষ্পীভূত করার সময় যে পরিমাণ তাপ দিয়ে পুরো তরল পদার্থকে গ্যাসে পরিণত করা হয় সেই তাপকে বলা হয় বাষ্পীভবনের সুপ্ততাপ। পুরো তরলটা গ্যাসে রূপান্তর করার পর তাপ দিতে থাকলে গ্যাসের তাপমাত্রা আবার বাড়তে থাকে। তাপমাত্রা মোটামুটি অচিন্তনীয় পর্যায়ে নিতে পারলে অণুগুলো আয়নিত হতে শুরু করবে এবং প্লাজমা নামে পদার্থের চতুর্থ অবস্থা শুরু হবে, কিন্তু সেটি অন্য ব্যাপার।

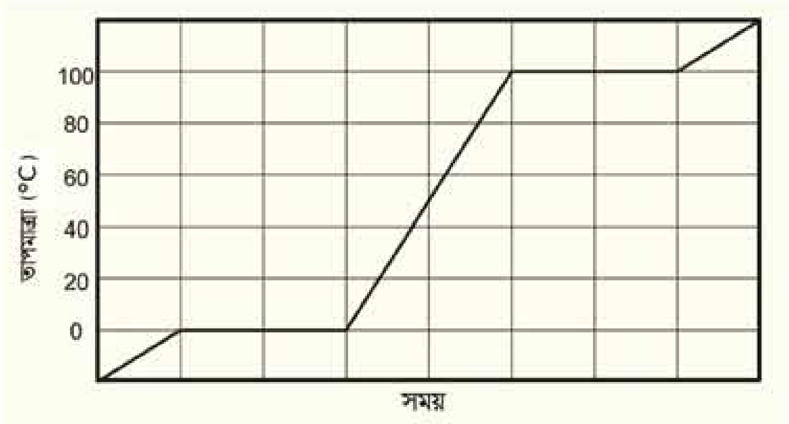

চিত্র 6.04: তাপ প্রয়োগ করার সময় গলনাঙ্ক এবং স্ফুটনাঙ্কের তাপমাত্রার পরিবর্তন হয় না।

তাপ দিয়ে কঠিন থেকে তরল এবং তরল থেকে গ্যাসে রূপান্তরের এই প্রক্রিয়ার অন্তত একটি উদাহরণ আমরা সবাই দেখেছি, সেটি হচ্ছে বরফ, পানি এবং বাষ্প। আমরা যদিও সরাসরি গলনের সুপ্ততাপ কিংবা বাষ্পীভবনের সুপ্ততাপ দেখি না। কিন্তু তার একটা প্রভাব অনেক সময় অনুভব করেছি। অনেক ভিড়ে কিংবা আবদ্ধ জায়গায় গরমে ছটফট করে আমরা যদি হঠাৎ খোলা জায়গায় কিংবা বাতাসে আসি তখন শরীর শীতল হয়ে জুড়িয়ে যায়। তার কারণ খোলা জায়গায় আসার পর শরীর থেকে ঘাম বাষ্পীভূত হওয়ার সময় বাষ্পীভবনের সুপ্ততাপটুকু শরীর থেকে নিয়ে নেয়। এবং শরীরটাকে শীতল করে দেয়।

তাপ দিয়ে কঠিন থেকে তরল, তরল থেকে গ্যাসে যে রকম রূপান্তর করা হয় তার উল্টো প্রক্রিয়াটিও কিন্তু ঘটে। তাপ সরিয়ে নিলে একটা গ্যাস প্রথমে তরল, তারপর কঠিন হতে পারে। বায়বীয় অবস্থা

থেকে তরল অবস্থায় রূপান্তরিত হওয়াকে ঘনীভবন (Liquification) বলে। তরল অবস্থা থেকে কঠিন অবস্থায় রূপান্তরিত হওয়াকে কঠিনীভবন (Solidification) বলে।

আমরা পদার্থের অবস্থানের পরিবর্তনের সময় বলেছি কঠিন থেকে তরল কিংবা তরল থেকে গ্যাসে রূপান্তরের জন্য একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় পৌঁছাতে হয়। কিন্তু সেই তাপমাত্রায় না পৌঁছেও কিন্তু কঠিন থেকে তরল, তরল থেকে গ্যাস কিংবা সরাসরি কঠিন থেকে গ্যাসে রূপান্তর হতে পারে। আমরা যদি পদার্থের আণবিক মডেলে ফিরে যাই তাহলে বিষয়টা বোঝা মোটেও কঠিন নয়। একটা অণু যদি কোনোভাবে যথেষ্ট শক্তি পেয়ে যায় এবং তার কারণে যদি তার গতিশক্তি যথেষ্ট বেড়ে যায় যে সেটি কঠিন পদার্থ কিংবা তরল পদার্থের পৃষ্ঠদেশ থেকে বের হয়ে আসতে পারে। কঠিন কিংবা তরলের পৃষ্ঠদেশে যেহেতু বাইরের বাতাস থেকে অসংখ্য অণু ক্রমাগত আঘাত করছে তাই তাদের আঘাতে কখনো কখনো কঠিন কিংবা তরলের কোনো কোনো অণু মুক্ত হয়ে যাবার মতো শক্তি পেয়ে যেতে পারে। তাই পৃষ্ঠদেশ যত বিস্তৃত হবে এই প্রক্রিয়াটি তত বেশি কাজ করবে। আমরা সবাই এই প্রক্রিয়াটি দেখেছি একটা ভেজা জিনিস এমনিতেই শুকিয়ে যায় এর জন্য এটাকে স্ফুটনাঙ্কের তাপমাত্রায় নিতে হয় না। শুকিয়ে যাওয়া মানেই তরল পদার্থের অণুর বাষ্পায়িত হয়ে যাওয়া। যেকোনো তাপমাত্রায় এই প্রক্রিয়া ঘটতে পারে এবং এই প্রক্রিয়াটার নাম বাষ্পায়ন (Evaporation)।

পানির বাষ্পায়নের সময় পানি যে রকম তার বাষ্পীভবনের সুপ্ততাপটুকু নিয়ে নেয়, এর উল্টোটাও সত্যি। যদি কোনো প্রক্রিয়ায় বাষ্প পানিতে রূপান্তরিত হয় তখন সেটি তাপ সরবরাহ করে। ঘূর্ণিঝড়ের সময় সমুদ্রের জলীয় বাষ্পে ভরা বাতাস উপরে উঠে যখন জলকণায় রূপান্তরিত হয় তখন বাষ্পীভবনের সুপ্ততাপটা শক্তি হিসেবে বের হয়ে আসে। এই শক্তিটা ঘূর্ণিঝড়ের প্রচণ্ড শক্তি হিসেবে কাজ করে।

বাষ্পায়নের নির্ভরশীলতা

তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ বর্ষাকালের বৃষ্টিভেজা দিনগুলোতে ভেজা কাপড় কিছুতেই শুকাতে চায় না। আবার শীতকালে ঘরের ভেতর ছায়াতেও একটা কাপড় ধুয়ে শুকাতে দিলে সেটি শুকিয়ে যায়। কাপড় ধুয়ে শুকাতে দিলে সব সময় কাপড়টি ভালো করে মেলে দিতে হয়, ভেজা কাপড় ভাঁজ হয়ে থাকলে সেই জায়গাটুকু ভেজা থেকে যায়। ভেজা কাপড় শুকানোর বিষয়টি পানির বাষ্পায়ন ছাড়া আর কিছু না, কাজেই তোমরা দেখতেই পাচ্ছ পানির বাষ্পায়ন বেশ কিছু বিষয়ের উপর নির্ভর করে। সত্যি কথা বলতে কি পানির জন্য যেটা সত্যি অন্যান্য তরলের বেলাতেও সেটা সত্যি, তাই আমরা সাধারণভাবেই একটা তরলের বাষ্পায়ন কোন কোন বিষয়ের উপর নির্ভর করে তার একটা তালিকা করতে পারি:

বাতাসের প্রবাহ: বাতাসের প্রবাহ বেশি হলে বাষ্পায়ন বেশি হয়।

তরলের উপরিভাগের ক্ষেত্রফল: তরলের উপরিভাগের ক্ষেত্রফল যত বেশি হবে বাষ্পায়ন তত বেশি হবে। এক গ্লাস পানি বাষ্পীভূত হতে অনেক সময় নেবে কিন্তু সেই পানিটা বড় থালায় ঢেলে দিলে অনেক তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যাবে।

তরলের প্রকৃতি: তরলের স্ফুটনাঙ্ক কম হলে বাষ্পায়ন বেশি। উদ্বায়ী তরলের বাষ্পায়ন সবচেয়ে বেশি।

বাতাসের চাপ: বাতাসের চাপ যত কম হবে বাষ্পায়নের হার তত বেশি। শূন্যস্থানে বাষ্পায়ন সবচেয়ে বেশি, তাই খাদ্য সংরক্ষণের জন্য খাবারকে শুকাতে পাম্প দিয়ে বাতাস বের করে নেওয়া হয়।

উষ্ণতা: তরল এবং তরলের কাছাকাছি বাতাসের উষ্ণতা বেশি হলে বাষ্পায়ন বেশি হয়।

বায়ুর শুষ্কতা: বাতাস যত শুষ্ক হবে তরল তত তাড়াতাড়ি বাষ্পায়ন হবে।

6.5 আপেক্ষিক তাপ (Specific Heat)

তাপ, তাপমাত্রা এবং এর সাথে সম্পর্ক রয়েছে এ রকম অনেকগুলো বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হলেও, একটা বস্তুর তাপমাত্রা কতটুকু বাড়াতে হলে সেখানে কতটুকু তাপ দিতে হবে সেটি এখানো আলোচনা করা হয়নি। তোমরা হয়তো লক্ষ করে থাকবে খানিকটা পানিকে উত্তপ্ত করতে বেশ অনেকক্ষণ চুলার ওপর রেখে সেটাতে তাপ দিতে হয়। প্রায় সমপরিমাণ ধাতব কোনো বস্তুকে সেই একই তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করতে কিন্তু মোটেও বেশি সময় উত্তপ্ত করতে হয় না। এর কারণ পানির আপেক্ষিক তাপ বেশি সেই তুলনায় ধাতব পদার্থের আপেক্ষিক তাপ অনেক কম। 1 kg পদার্থের তাপমাত্রা 1 K বাড়াতে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন সেটি হচ্ছে ঐ পদার্থের আপেক্ষিক তাপ। অর্থাৎ যদি m ভরের কোনো পদার্থকে T_1 থেকে T_2 তাপমাত্রায় নিতে Q তাপের প্রয়োজন হয় তাহলে আপেক্ষিক তাপ s হচ্ছে:

$$s = \frac{Q}{m(T_2 - T_1)}$$

আপেক্ষিক তাপের একক $\mathrm{J\,kg^{-1}K^{-1}}$

তাপ ধারণক্ষমতা C বলতে বোঝানো হয় একটা বস্তুর তাপমাত্রা 1 K বাড়াতে কত তাপের প্রয়োজন। আপেক্ষিক তাপ হচ্ছে 1 kg ভরের তাপমাত্রা 1 K বাড়াতে কত তাপের প্রয়োজন। তাই বস্তুর আপেক্ষিক তাপ জেনে নিলে আমরা খুব সহজেই যেকোনো বস্তুর তাপ ধারণক্ষমতা C বের করতে পারব। কারণ বস্তুর ভর যদি m হয়, আপেক্ষিক তাপ s হয় তাহলে

$$C = ms$$

10 kg সোনার তাপ ধারণক্ষমতা হচ্ছে

$$C = 10 \times 230 \text{ JK}^{-1} = 2300 \text{ JK}^{-1}$$

সে তুলনায় 10 kg পানির তাপ ধারণক্ষমতা

$$C = 10 \times 4200 \text{ JK}^{-1} = 42{,}000 \text{ JK}^{-1}$$ প্রায় 20 গুণ বেশি।

তার অর্থ সোনা কিংবা অন্য কোনো ধাতুকে চট করে উত্তপ্ত করা যায় কিন্তু পানিকে এত সহজে উত্তপ্ত করা যায় না।

6.6 ক্যালোরিমিতির মূলনীতি (Fundamental Principles of Calorimetry)

শীতকালে গোসল করার সময় অনেক সময়ই আমরা বালতির ঠান্ডা পানিতে খানিকটা প্রায় ফুটন্ত গরম পানি ঢেলে দিই। ফুটন্ত গরম পানি বালতির শীতল পানিকে তাপ দিতে দিতে ঠান্ডা হতে থাকে। বালতির শীতল পানিও গরম ফুটন্ত পানি থেকে তাপ নিতে নিতে উত্তপ্ত হতে থাকে। কিছুক্ষণের মাঝে দেখা যায় উত্তপ্ত পানির তাপমাত্রা কমে এবং শীতল পানির তাপমাত্রা বেড়ে পুরো পানিটুকুই একটা আরামদায়ক উষ্ণতায় চলে এসেছে।

আমরা ইচ্ছে করলেই কোন পদার্থের কোন তাপমাত্রার বস্তুর সাথে অন্য কোন তাপমাত্রার কোন বস্তু মেশালে কে কতটুকু তাপ দেবে বা নেবে এবং শেষ পর্যন্ত কত তাপমাত্রায় পৌঁছাবে এই বিষয়গুলো বের করে ফেলতে পারব। তা করতে হলে আমাদের শুধু কয়েকটা নিয়ম মনে রাখতে হবে:

(i) বেশি তাপমাত্রার বস্তু কম তাপমাত্রার বস্তুর কাছে তাপ দিতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না দুটো তাপমাত্রাই সমান হয়।

(ii) উত্তপ্ত বস্তু যতটুকু তাপ পরিত্যাগ করবে, শীতল বস্তু ঠিক ততটুকু তাপ গ্রহণ করবে। (আমরা ধরে নিয়েছি এই প্রক্রিয়াতে অন্য কোনোভাবে কোনো তাপ নষ্ট হচ্ছে না।)

উদাহরণ

প্রশ্ন: 30° C তাপমাত্রায় 1 liter পানিতে 100 gm ওজনের এক টুকরো বরফ ছেড়ে দেওয়া হলো। পুরো বরফটি গলে যাবার পর মোট পানির তাপমাত্রা কত হবে? (বরফ গলনের সুপ্ততাপ $L = 334$ kJ/kg)

উত্তর: বরফের তাপমাত্রা 0° C ধরে নিই।

বরফের ভর $m_1 = 100 \text{ gm} = 0.1 \text{ kg}$
1 liter পানির ভর $m_2 = 1 \text{ kg}$
পানির আপেক্ষিক তাপ $s = 4.2 \times 10^3 \text{ Jkg}^{-1}\text{K}^{-1}$

বরফটুকু গলতে এবং বরফ গলা পানির চূড়ান্ত তাপমাত্রায় পৌঁছাতে যে তাপের প্রয়োজন হবে সেই তাপটুকু 1 kg পানিকে সরবরাহ করতে হবে। ধরা যাক পানির চূড়ান্ত তাপমাত্রা T, তাহলে বরফ যে পরিমাণ তাপ গ্রহণ করবে সেগুলো হলো:

গলার জন্য প্রয়োজনীয় তাপ: $m_1 L$
গলার পর 0° C থেকে T পর্যন্ত তাপমাত্রা বাড়ার জন্য তাপ: $m_1 s(T - 0)$

এই তাপগুলো সরবরাহ করবে বাকি m_2 পরিমাণ পানি, কাজেই তার তাপমাত্রা কমে যাবে। অর্থাৎ:

তাপ সরবরাহ করা হবে: $m_2 s(30° \text{ C} - T)$

দুটো তাপ সমান হতে হবে। কাজেই:

$$m_1 L + m_1 sT = m_2 s(30 \,℃ - T)$$

$$T = \frac{30° \text{ C} \times m_2 s - m_1 L}{(m_1 + m_2)s}$$

$$T = \frac{30 \times 1 \times 4.2 \times 10^3 - 0.1 \times 334 \times 10^3}{(1 + 0.1)4.2 \times 10^3} = 20° \text{ C}$$

প্রশ্ন: 75° C তাপমাত্রার 2 liter পানিতে 20° C তাপমাত্রার 1 liter পানি যোগ করা হলে চূড়ান্ত তাপমাত্রা কত?

উত্তর: ধরা যাক চূড়ান্ত তাপমাত্রা T তাহলে 2 liter পানির তাপমাত্রা 75°C থেকে কমে সেটি T তে পৌঁছাবে। এই তাপটুকু গ্রহণ করে 1 liter পানির তাপমাত্রা 20°C থেকে বেড়ে T তে পৌঁছাবে। কাজেই

1 liter পানির ভর $m_1 = 1 \text{ kg}$
2 liter পানির ভর $m_2 = 2 \text{ kg}$

পানির আপেক্ষিক তাপ $s = 4.2 \times 10^3 \text{ Jkg}^{-1}\text{K}^{-1}$

$$m_1 s(75°\ C - T) = m_2 s(T - 20°\ C)$$

$$T = \frac{(75m_1 + 20m_2)s}{(m_1 + m_2)s}°C = \frac{75 \times 2 + 20}{2 + 1}°C = 56.6°\ C$$

প্রশ্ন: 120° C তাপমাত্রায় উত্তপ্ত 10 gm ভরের এক টুকরো লোহা একটা পাত্রে রাখা 30° C তাপমাত্রার 1 kg পানিতে ছেড়ে দেওয়া হলো। পানির তাপমাত্রা কত হবে?

উত্তর: লোহার ভর $m_1 = 0.01$ kg
পানির ভর $m_2 = 1$ kg
লোহার আপেক্ষিক তাপ $s_1 = 0.45 \times 10^3$ $Jkg^{-1}K^{-1}$
পানির আপেক্ষিক তাপ $s_2 = 4.2 \times 10^3$ $Jkg^{-1}K^{-1}$

লোহার টুকরো যতটুকু তাপ হারাবে পানি ঠিক ততটুকু তাপ গ্রহণ করবে। কাজেই লোহার চূড়ান্ত তাপমাত্রা T হলো

$$m_1 s_1(120°\ C - T) = m_2 s_2(T - 30°\ C)$$

$$T = \frac{120m_1 s_1 + 30m_2 s_2}{m_1 s_1 + m_2 s_2} = \frac{120 \times 0.01 \times 0.45 \times 10^3 + 30 \times 1 \times 4.2 \times 10^3}{0.01 \times 0.45 \times 10^3 + 1 \times 4.2 \times 10^3}°C$$

$$T = 30.1°\ C$$

6.7 গলনাঙ্ক এবং স্ফুটনাঙ্কের ওপর চাপের প্রভাব (Effect of Pressure on Melting Point and Boiling Point)

চাপ দেওয়া হলে পদার্থের গলনাঙ্ক কমে যায়, তাই দুই টুকরা বরফকে চাপ দিয়ে এক টুকরো বরফে পরিণত করে ফেলা যায়। বরফের যেখানে চাপ পড়েছে সেখানে গলনাঙ্ক কমে যায় বলে বরফের তাপমাত্রাতেই সেখানকার বরফ গলে যায়, চাপ সরিয়ে নিলে গলনাঙ্ক আগের মান ফিরে পায় তখন গলে যাওয়া পানি আবার বরফে পাল্টে গিয়ে একটা বরফ খণ্ড হয়ে যায়। একটা বরফের ওপর একটা তার এবং তারের দুই পাশে দুটি ওজন ঝুলিয়ে দিলে মনে হবে তারটি বরফকে কেটে দুই

টুকরো করে ফেলেছে, কিন্তু বরফটি পরীক্ষা করলে দেখা যাবে সেটি অখণ্ড এক টুকরো বরফই আছে (চিত্র 6.09)।

চাপের কারণে স্ফুটনাঙ্কের পরিবর্তন হয়। চাপ কম হলে স্ফুটনাঙ্ক কমে যায়, চাপ বেশি হলে স্ফুটনাঙ্ক বেড়ে যায়। এজন্য যারা পর্বতারোহণ করে অনেক উচ্চতায় যায় তাদের রান্না করতে সময় বেশি নেয়। বাতাসের চাপ কম বলে সেখানে পানি তুলনামূলকভাবে কম তাপমাত্রায় ফুটতে থাকে। তাই তাপমাত্রা বাড়ানো যায় না, সেজন্য রান্না করতে সময় বেশি লাগে। একই কারণে প্রেশার কুকার তৈরি হয়েছে, এটি আসলে একটি নিশ্ছিদ্র পাত্র, তাই রান্না করার সময় বাষ্প আবদ্ধ হয়ে চাপ বাড়িয়ে দেয় এবং সে কারণে পানির স্ফুটনাঙ্ক বেড়ে যায় বলে বেশি তাপমাত্রায় পানি ফুটতে থাকে। তাপমাত্রা বেশি বলে রান্নাও করা যায় তাড়াতাড়ি।

চিত্র 6.09: একটি বরফ খণ্ডকে সূক্ষ্ম তারের চাপ দিয়ে কাটা সম্ভব।

গ্যাসকে চাপ দিলে তার গলনাঙ্ক বেড়ে যায় তাই খুব বেশি শীতল না করেই চাপ বাড়িয়ে গ্যাসকে তরল করা যায়। তখন অবশ্য অনেক তাপের সৃষ্টি হয়, সেই তাপকে সরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হয়।

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন

1. একটি কাচের পাত্রে পারদ রেখে উত্তপ্ত করা হলে প্রথমে পারদের উচ্চতা কমে তারপর বাড়তে থাকবে। কেন?
2. মহাশূন্যে যেখানে কোনো অণু-পরমাণু নেই সেখানে কি তাপমাত্রার অস্তিত্ব আছে?
3. অনেক ভিড়ের ভেতরে ভ্যাপসা গরম থেকে খোলা জায়গায় এলে শীতল অনুভব করি কেন?
4. কাচের গ্লাসে পানিতে বরফ দিলে গ্লাসের গায়ে বিন্দু বিন্দু পানি জমে কেন?
5. প্রেশার কুকারে তাড়াতাড়ি রান্না করা যায় কেন?

গাণিতিক প্রশ্ন

1. বিজ্ঞানী সেলসিয়াস যে থার্মোমিটার প্রবর্তন করেছিলেন সেই থার্মোমিটারে বরফের গলনাঙ্ক ছিল 100° C, পানির বাষ্পীভবন ছিল 0° C। সেই থার্মোমিটারের কোন তাপমাত্রায় সেলসিয়াস এবং ফারেনহাইট তাপমাত্রার সমান?

2. কোন তাপমাত্রায় সোনার ঘনত্ব 0.001% কমে যাবে?

3. একটা উত্তপ্ত 1 gm ওজনের লোহার টুকরা 30° C তাপমাত্রায় 1 liter পানিতে ছেড়ে দেওয়ার পর পানির তাপমাত্রা 15° C বেড়ে গেল। লোহার টুকরোটির তাপমাত্রা কত ছিল?

4. 0° C তাপমাত্রার 1 gm বরফে প্রতি সেকেন্ডে 10 J করে তাপ প্রদান করা হলে কতক্ষণ পর পুরোটি বাষ্পীভূত হবে?

5. একটি নিশ্ছিদ্র সিলিন্ডারে আবদ্ধ গ্যাসের তাপমাত্রা 30° C থেকে বাড়িয়ে 100° C করা হলে গ্যাসের চাপ কত শতাংশ বেড়ে যাবে?

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও

1. রেললাইন নির্মাণের সময় দুটি রেল যেখানে মিলিত হয় সেখানে একটু ফাঁকা রাখা হয় কেন?
   - (ক) লোহা সাশ্রয় করার জন্য
   - (খ) গ্রীষ্মকালে রেললাইনের তাপমাত্রা বৃদ্ধি হ্রাস করার জন্য
   - (গ) রেলগাড়ি চলার সময় খটখট শব্দ করার জন্য
   - (ঘ) তাপীয় প্রসারণের জন্য রেললাইনের বিকৃতি পরিহার করার জন্য

2. ঘর্মাক্ত দেহে পাখার বাতাস আরাম দেয় কেন?
   - (ক) পাখার বাতাস গায়ের ঘাম বের হতে দেয় না তাই
   - (খ) বাষ্পায়ন শীতলতার সৃষ্টি করে তাই
   - (গ) পাখার বাতাস শীতল জলীয় বাষ্প ধারণ করে তাই
   - (ঘ) পাখার বাতাস সরাসরি লোমকূপ দিয়ে শরীরে ঢুকে যায় তাই

3. সুপ্ততাপের মাধ্যমে:

i. বস্তুর তাপমাত্রা বৃদ্ধি হয়

ii. বস্তুর অবস্থার পরিবর্তন হয়

iii. বস্তুর অভ্যন্তরীণ শক্তি বৃদ্ধি পায়

নিচের কোনটি সঠিক

(ক) i (খ) ii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

চিত্রের সাহায্যে 4 ও 5 নং প্রশ্নের উত্তর দাও

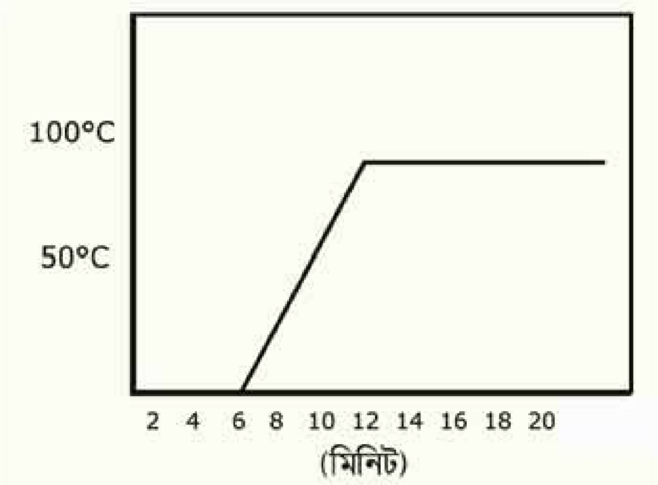

চিত্র 6.10: বরফ গলনের লেখচিত্র

4. সম্পূর্ণ বরফ গলতে কত সময় লেগেছিল?

(ক) 2 মিনিট (খ) 4 মিনিট

(গ) 6 মিনিট (ঘ) 8 মিনিট

5. গলিত পানির তাপমাত্রা স্ফুটনাঙ্কে পৌঁছাতে প্রয়োজনীয় সময় কত মিনিট?

(ক) 6 (খ) 8

(গ) 12 (ঘ) 18

সৃজনশীল প্রশ্ন

1. দুটি বৈদ্যুতিক খুঁটির মধ্যবর্তী দূরত্ব 30 m। খুঁটি দুটির সাথে 30.001 m দৈর্ঘ্যের তামার তার যেদিন সংযোগ দেওয়া হয় ঐ দিন বায়ুর তাপমাত্রা ছিল 30° C। তামার দৈর্ঘ্য প্রসারণ সহগ $16.7 \times 10^{-6}\ K^{-1}$। শীতকালে যেদিন বায়ুর তাপমাত্রা 4° C হলো সেদিন তারটি ছিঁড়ে গেল।
   (ক) পানির ত্রৈধ বিন্দুর সংজ্ঞা দাও।
   (খ) দুটি বস্তুর তাপ সমান হলেও এদের তাপমাত্রা ভিন্ন হতে পারে কি? ব্যাখ্যা করো।
   (গ) বায়ুর তাপমাত্রাকে ফারেনহাইট স্কেলে প্রকাশ করো।
   (ঘ) তারটি ছিঁড়ে যাবার কারণ গাণিতিক যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করো।

2. দুটি ধাতব দণ্ডের দৈর্ঘ্য 6 m। একটির তাপমাত্রা 30^o C থেকে বাড়িয়ে 80^o C তাপমাত্রা পর্যন্ত উত্তপ্ত করা হলে এর দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পেয়ে 6.0051 m হয়। অপর ধাতব দণ্ডের তাপমাত্রা 20^o C থেকে বাড়িয়ে 60^o C পর্যন্ত উত্তপ্ত করা হলে এর দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পেয়ে 6.0041 m হয়। দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুনাঙ্ক α, ক্ষেত্র প্রসারণ গুনাঙ্ক β ও আয়তন প্রসারণ গুনাঙ্ক γ.
   (ক) দুটি বস্তুর মধ্যে তাপের আদান-প্রদান কিসের উপর নির্ভর করে?
   (খ) তাপমাত্রা ও তাপ কেন ভিন্ন লিখ।
   (গ) একটি ধাতব দণ্ডের তাপমাত্রা 80^oC হলে সেটি কেলভিন স্কেলে কত?
   (ঘ) গাণিতিক ব্যাখ্যাসহ দন্ড দুটির উপাদান সম্পর্কে মন্তব্য করো।

সপ্তম অধ্যায়

তরঙ্গ ও শব্দ

(Waves and Sound)

পদার্থবিজ্ঞান ঠিকভাবে বোঝার জন্য যে কয়েকটি বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হয় তার একটি হচ্ছে তরঙ্গ। এই অধ্যায়ে আমরা আমাদের পরিচিত যান্ত্রিক কয়েক ধরনের তরঙ্গের মাঝেই আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব।

শব্দ এক ধরনের তরঙ্গ। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে শব্দের খুব বড় একটা ভূমিকা রয়েছে, তাই আমরা এই অধ্যায়ে শব্দ, শব্দের বেগ, শব্দের প্রতিধ্বনি এবং তার দূষণ নিয়েও আলোচনা করব।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- তরঙ্গের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- তরঙ্গ সংশ্লিষ্ট রাশিসমূহের মধ্যে সরল গাণিতিক সম্পর্ক স্থাপন এবং পরিমাপ করতে পারব।
- শব্দ তরঙ্গের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- প্রতিধ্বনি সৃষ্টি ব্যাখ্যা করতে পারব।
- দৈনন্দিন জীবনে প্রতিধ্বনি ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে পারব।
- শব্দের বেগ, কম্পাঙ্ক এবং তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের গাণিতিক সম্পর্ক স্থাপন এবং তা থেকে রাশিসমূহ পরিমাপ করতে পারব।
- শব্দের বেগের পরিবর্তন ব্যাখ্যা করতে পারব।
- শ্রাব্যতার সীমা ও এদের ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে পারব।
- শব্দের পিচ ও তীক্ষ্ণতা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- শব্দদূষণের কারণ ও ফলাফল এবং প্রতিরোধের কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারব।

7.1 সরল স্পন্দন গতি (Simple Harmonic Motion)

একটা স্প্রিংয়ের নিচে একটা ভর লাগিয়ে সেটা টেনে ছেড়ে দিলে এটা উপরে-নিচে করতে থাকে। (তৃতীয় এবং চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা এই গতিটি ব্যাখ্যা করেছি।) আমরা দেখেছি ঘর্ষণের জন্য বা অন্যান্যভাবে শক্তি ক্ষয় হয় বলে এটা একসময় থেমে যায়। তা না হলে এটা অনন্তকাল উপর-নিচ করতে থাকত। আমরা এটাও দেখেছি সরল স্পন্দন গতিতে স্প্রিংয়ের সাথে লাগানো ভরটির শক্তি গতিশক্তি এবং বিভব শক্তির মাঝে বিনিময় করে এবং এসব ঘটে কারণ স্প্রিংয়ের বলটি হুক এর সূত্র মেনে চলে। হুকের সূত্রটি আবার মনে করিয়ে দেওয়া যায়, স্প্রিংয়ের ধ্রুব যদি হয় k, ভর যদি হয় m এবং অবস্থান যদি হয় x তাহলে তার ওপর আরোপিত বল F হচ্ছে

$$F = -kx$$

হুকের সূত্রের কারণে যে ছন্দিত বা স্পন্দন গতি হয় সেটাকে বলে সরল স্পন্দন গতি। পদার্থবিজ্ঞানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গতিগুলোর একটি হচ্ছে এই গতি।

তোমাদের এই বইয়ে এটা বের করে দেখানোর সুযোগ নেই কিন্তু জানিয়ে রাখতে ক্ষতি কী? যদি একটা স্প্রিংয়ের ধ্রুব হয় k এবং ভর হয় m তাহলে ভরটির দোলনকাল হবে

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

যদি এটা স্প্রিং না হয়ে একটা সুতায় ঝোলানো পেন্ডুলাম হতো এবং সুতার দৈর্ঘ্য হতো l আর মাধ্যাকর্ষণজনিত ত্বরণ হতো g তাহলে দোলনকাল হতো:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$$

(না, কোনো ভুল হয়নি, তুমি একটা হালকা ভরই ঝোলাও আর ভারী ভরই ঝোলাও দোলনকাল একই থাকবে, এটা ভরের ওপর নির্ভর করে না।)

উদাহরণ

২০২৫

প্রশ্ন: 1 m লম্বা একটা সুতা দিয়ে 10 gm ভরের একটা পাথর ঝুলিয়ে দাও। তার দোলনকাল কত?

উত্তর:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}} = 2\pi\sqrt{\frac{1}{9.8}}\ s = 2.0\ s$$

পাথরটার ওজন 10 gm না হয়ে অন্য কিছু হলেও দোলনকাল একই থাকত। ইচ্ছে করলে তুমি এখনই দোলনকাল মেপে তুমি সেখান থেকে g এর মান বের করতে পারবে। চেষ্টা করে দেখো।

একটা স্প্রিংয়ের নিচে একটা ভর লাগিয়ে রেখে দিলে ভরটা স্প্রিংটাকে টেনে একটু লম্বা করে সেই অবস্থানে স্থির হয়ে থাকে। স্প্রিংয়ের এই দৈর্ঘ্যটাকে বলা যায় সাম্য অবস্থা (চিত্র 7.01-0)।

এখন যদি ভরটাকে টেনে একটু নিচে a দূরত্ব নামিয়ে এনে ছেড়ে দিই (চিত্র 7.01-1) তাহলে ভরটা উপরের দিকে উঠতে থাকবে, সাম্য অবস্থা পার হয়ে এটা উপরে a দূরত্বে উঠে যাবে, তারপর আবার নিচে নামতে থাকবে, সাম্য অবস্থা পার হয়ে নিচে নেমে যাবে এবং এটা চলতেই থাকবে।

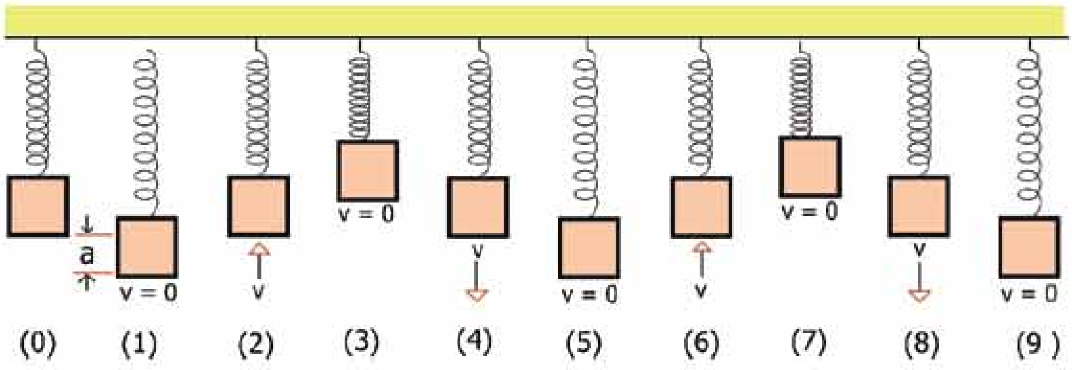

চিত্র 7.01: (0) হচ্ছে সাম্য অবস্থা। টেনে (1) অবস্থানে নিয়ে ছেড়ে দেবার পর স্প্রিংটি সরল স্পন্দিত বেগে দুলছে।

ভরটা যখন 2 → 3 → 4 → 5 অবস্থান শেষ করে যে অবস্থানে শুরু করেছিল ঠিক একই অবস্থানে (6) একইভাবে ফিরে আসে (উপরের দিকে v বেগে গতিশীল) তখন আমরা বলি একটা পূর্ণ স্পন্দন হয়েছে। মনে রাখতে হবে 2 → 3 শেষ করে 4 এলেও কিন্তু যে অবস্থান থেকে শুরু করেছে সেই অবস্থানে ফিরে আসবে কিন্তু এটা পূর্ণ স্পন্দন নয় কারণ প্রথম 2 অবস্থানটিতে উপরের দিকে যাচ্ছে এবং পরের 4 অবস্থানটিতে নিচের দিকে যাচ্ছে, কাজেই এক অবস্থানে একইভাবে ফিরে আসা হলো না।

সরল স্পন্দন গতি বিশ্লেষণ করতে হলে আমাদের কয়েকটা রাশি ব্যাখ্যা করে নেওয়া ভালো। প্রথমটি হতে পারে পর্যায় কাল (Time Period) বা দোলনকাল T। একটা পূর্ণ স্পন্দন হতে যে সময় নেয় সেটা হচ্ছে পর্যায়কাল বা দোলনকাল। কম্পাঙ্ক f হচ্ছে প্রতি সেকেন্ড পূর্ণ স্পন্দনের সংখ্যা অর্থাৎ $f = \frac{1}{T}$ পর্যায়কাল T যদি সেকেন্ডে প্রকাশ করি তাহলে f এর একক হচ্ছে হার্টজ (Hz)।

সরল স্পন্দিত গতিতে বিস্তার হচ্ছে সাম্যাবস্থা থেকে সবচেয়ে বেশি উপরে ওঠা (কিংবা নিচে নামা) দূরত্ব। 7.01 চিত্রে যেভাবে দেখানো হয়েছে সেখানে বিস্তার হচ্ছে a।

এর পরের রাশিটি হচ্ছে দশা (Phase), স্প্রিংয়ে লাগানো ভরটি যখন ওঠানামা করছে, তখন কোনো এক মুহূর্তে যদি ভরটির দিকে তাকাই তাহলে আমরা দেখব সেটি সাম্যাবস্থা থেকে কোনো একটি দূরত্বে থাকবে, সেই অবস্থানটি হচ্ছে তার দশা। সরল স্পন্দন গতিতে ভর এবং স্প্রিংয়ের এই নির্দিষ্ট অবস্থাটি হুবহু একইভাবে ফিরে আসবে আবার ঠিক এক পর্যায়কাল পরে। পদার্থবিজ্ঞানের ভাষায় বলা যায় সরল স্পন্দন গতিতে কোনো এক মুহূর্তে যে দশা হয় এক দোলনকাল পর আবার সেই দশা ফিরে আসে।

7.2 তরঙ্গ (Waves)

আমরা সবাই তরঙ্গ দেখেছি, একটা পানিতে ঢিল ছুড়ে দিলে সেই বিন্দু থেকে পানির তরঙ্গ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ঘরে বাতি জ্বালালে যে আলো ঘরে ছড়িয়ে পড়ে সেটাও তরঙ্গ। আমরা যখন কথা বলি আর শব্দটা যখন এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পৌঁছে যায় সেটাও তরঙ্গ। একটা স্প্রিংকে সংকুচিত করে ছেড়ে দিলে তার ভেতর দিয়ে যে বিচ্যুতিটি ছুটে যায় সেটাও তরঙ্গ, একটা টান করে রাখা দড়ির মাঝে ঝাঁকুনি দিলে যে বিচ্যুতিটি দড়ি দিয়ে ছুটে যায় সেটাও তরঙ্গ। এক কথায় বলা যায় তরঙ্গটি কী আমরা সেটা অনুভব করতে পারি, কিন্তু যদি তার জন্য পদার্থবিজ্ঞানের ভাষায় একটা সুন্দর সংজ্ঞা দিতে চাই তাহলে কী বলব?

> সহজ ভাষায় বলা যায়, তরঙ্গ হচ্ছে একটা মাধ্যমের ভেতর দিয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় শক্তি পাঠানোর একটা প্রক্রিয়া, যেখানে মাধ্যমের কণাগুলো তার নিজের অবস্থানে স্পন্দিত হতে পারে কিন্তু সেখান থেকে সম্পূর্ণ সরে যাবে না।

আমরা এবারে যাচাই করে দেখতে পারি আমাদের এই সংজ্ঞাটি আমাদের অভিজ্ঞতার সাথে মেলে কি না। নদীর মাঝখান দিয়ে একটা লঞ্চ যাবার সময় যে ঢেউ তৈরি করে সেই ঢেউ নদীর কূলে এসে আঘাত করে, কাজেই নিশ্চিতভাবে বলা যায় এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় শক্তি পাঠানো হয়েছে।

সেই সময়ে নদীর পানিতে ভাসমান কোনো কচুরিপানার দিকে তাকালে আমরা দেখব যখন ঢেউটি যাচ্ছে সেই মুহূর্তে কচুরিপানাটি উপরে উঠেছে এবং নিচে নেমেছে এবং ঢেউ চলে যাবার পর আবার আগের মতো স্থির হয়ে গেছে এবং মোটেও ঢেউয়ের সাথে সাথে তীরে এসে আছড়ে পড়েনি।

সরল স্পন্দন গতির সাথে তরঙ্গের সম্পর্কটা এখন নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পারছ। একটা মাধ্যমের কোনো একটা নির্দিষ্ট বিন্দুর দিকে যদি আমরা তাকিয়ে থাকি তাহলে যখন তার ভেতর দিয়ে একটা তরঙ্গ যেতে থাকে তখন সেই বিন্দুটির সরল স্পন্দন গতি হয়। কচুরিপানার বেলায় যেটা ঘটেছিল, যতক্ষণ তার ভেতর দিয়ে পানির তরঙ্গটা গিয়েছে ততক্ষণ সেখানে সরল স্পন্দন গতি হয়েছে। সরল স্পন্দন গতির মাঝে তরঙ্গ নেই, কিন্তু তরঙ্গের প্রত্যেকটা বিন্দু একেকটা সরল স্পন্দন গতি।

কাজেই তরঙ্গের জন্য আমাদের দেওয়া সংজ্ঞাটি সঠিক। তবে মনে রাখতে হবে আরো অনেক ধরনের তরঙ্গ আছে যার জন্য এই সংজ্ঞাটি পুরোপুরি সঠিক নাও হতে পারে। আমরা তরঙ্গে যাবার জন্য একটা মাধ্যমের কথা বলেছি কিন্তু সূর্য থেকে আলো যখন পৃথিবীতে পৌঁছায় তখন তার জন্য কোনো মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না। আলো হচ্ছে বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গ। সেটা নিয়ে নবম অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করব। গ্র্যাভিটি ওয়েভ নামে এক ধরনের তরঙ্গের কথা বিজ্ঞানীরা বলছেন, যেটি মাত্র কিছুদিন হলো বিজ্ঞানীরা প্রথমবার দেখতে পেয়েছেন। তার জন্যও কোনো মাধ্যমের প্রয়োজন নেই। পদার্থবিজ্ঞানের চমকপ্রদ শাখা কোয়ান্টাম মেকানিক্সে ওয়েভ ফাংশন বলে অন্য এক ধরনের তরঙ্গের কথা বলা হয় সেটি আরো বিচিত্র, সেখানে সরাসরি তরঙ্গটি দেখা যায় না শুধু তার প্রতিক্রিয়া অনুভব করা যায়।

কাজেই আমরা আপাতত আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব শুধু সেই সব তরঙ্গের মাঝে যার জন্য কঠিন, তরল বা গ্যাসের মতো মাধ্যমের দরকার হয়। এই ধরনের তরঙ্গের নাম যান্ত্রিক তরঙ্গ।

7.2.1 তরঙ্গের বৈশিষ্ট্য

তরঙ্গ নিয়ে আলোচনা করার সময় তার কয়েক ধরনের বৈশিষ্ট্যের কথা উঠে এসেছে, এখানে আমরা তরঙ্গের, বিশেষ করে যান্ত্রিক তরঙ্গের সব বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করব।

(i) যান্ত্রিক তরঙ্গের জন্য মাধ্যমের দরকার হয়। পানিতে ঢেউ হয়, একটা স্প্রিংয়ে তরঙ্গ পাঠানো যায়, একটা দড়িতে তরঙ্গ সৃষ্টি করা যায়। আমরা যে শব্দ শুনি সেটাও একটা তরঙ্গ এবং তার মাধ্যম হচ্ছে বাতাস।

(ii) একটা মাধ্যমের ভেতর দিয়ে যখন তরঙ্গ যেতে থাকে তখন কণাগুলো নিজ অবস্থানে থেকে স্পন্দিত হয় (কাঁপে কিংবা ওপর-নিচে যায়) কিন্তু কণাগুলো নিজে তরঙ্গের সাথে সাথে সরে যায় না।

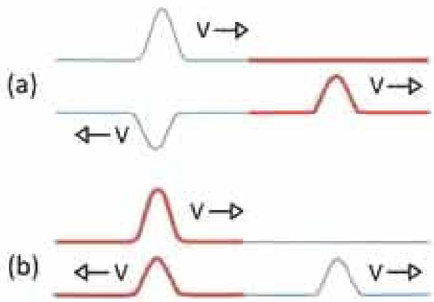

চিত্র 7.02: ভিন্ন প্রস্থচ্ছেদের তারের ভেতর একটি তরঙ্গ প্রতিফলিত এবং প্রতিসরিত হচ্ছে। (a) সরু তার থেকে মোটা তারে গেলে এক ধরনের প্রতিফলন হয় আবার (b) মোটা তার থেকে সরু তারে গেলে অন্য ধরনের প্রতিফলন হয়।

(iii) তরঙ্গের ভেতর দিয়ে শক্তি এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে পারে। শক্তি যত বেশি হয় তরঙ্গের বিস্তার তত বেশি হয়। শক্তি তরঙ্গের বিস্তারের বর্গের সমানুপাতিক। অর্থাৎ বিস্তার যদি দ্বিগুণ হয় শক্তি হয় চার গুণ।

(iv) সব তরঙ্গেরই একটা বেগ থাকে সেই বেগ তার মাধ্যমের প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে। বাতাসে শব্দের বেগ 330 m/s পানিতে এই বেগ 1493 m/s! ঢিলে একটা দড়িতে একটা তরঙ্গের যত বেগ হবে টান টান করে রাখা দড়িতে হবে তার থেকে বেশি।

(v) তরঙ্গের প্রতিফলন কিংবা প্রতিসরণ হয়, পরের অধ্যায়ে আলোর জন্য এটি অনেক বড় করে আলোচনা করা হয়েছে। আপাতত জেনে রাখ এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে যাবার সময় তরঙ্গের খানিকটা যদি প্রথম মাধ্যমে ফিরে আসে সেটা হচ্ছে প্রতিফলন। (চিত্র 7.02) তরঙ্গ যখন প্রথম মাধ্যম থেকে দ্বিতীয় মাধ্যমে যায় সেটা হচ্ছে প্রতিসরণ। আমরা যখন শব্দের প্রতিধ্বনি শুনি সেটা হচ্ছে শব্দের প্রতিফলন। পানিতে ডুবে থাকা অবস্থায় যদি বাইরের শব্দ শুনি সেটা হচ্ছে প্রতিসরণ।

(vi) তরঙ্গের যতগুলো বৈশিষ্ট্য আছে, তার মাঝে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে উপরিপাতন, যদিও আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সেটা আমাদের খুব বেশি চোখে পড়ে না। ধরা যাক দুটি ভিন্ন ভিন্ন জায়গা থেকে এক জায়গায় দুটি তরঙ্গ এসে হাজির হয়েছে। একটি তরঙ্গ যখন মাধ্যমটিকে উপরে তুলতে চেষ্টা করছে অন্যটি তখন তাকে নামানোর চেষ্টা করছে, তখন কী হবে? এগুলো হচ্ছে উপরিপাতনের বিষয়, যখন তরঙ্গের আরো গভীরে যাবে তখন বিষয়গুলো

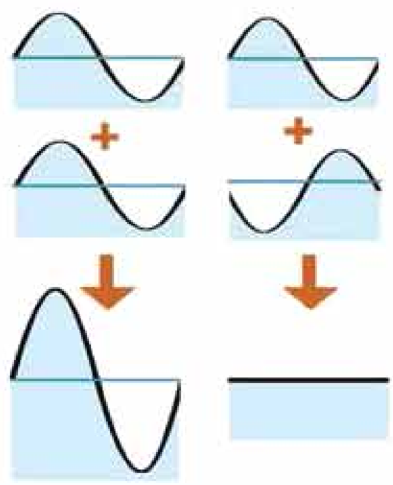

চিত্র 7.03: দুটি তরঙ্গ যোগ হয়ে আরো বড় তরঙ্গ হতে পারে, আবার একটি অন্যটিকে নিঃশেষও করে দিতে পারে।

আরো ভালোভাবে জেনে যাবে, আপাতত শুধু সহজ দুটি বিষয় 7.03 চিত্রে দেখানো হয়েছে। দুটো তরঙ্গ একটি আরেকটিকে বড় করে দিতে পারে আবার একটি আরেকটিকে ধ্বংসও করে দিতে পারে।

নিজে করো

একটি আলোকোজ্জ্বল জায়গায় বড় থালাতে খানিকটা পানি ঢেলে নাও। থালায় যেন অন্য কোনো কম্পন না থাকে সেটি নিশ্চিত করো। পানির যেকোনো বিন্দু স্পর্শ করলে সেই বিন্দু থেকে তরঙ্গ চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে এবং থালার তলায় তুমি তার প্রতিচ্ছবি দেখতে পাবে। থালার পানির ঠিক কেন্দ্রে স্পর্শ করলে দেখবে একটি তরঙ্গ সেখান থেকে শুরু হয়ে থালার কিনারায় গিয়ে সেখান থেকে প্রতিফলিত হয়ে কেন্দ্রে মিলিত হবে। তরঙ্গটি ঠিক করে তৈরি করতে পারলে সেটি কেন্দ্রে মিলিত হবার পর আবার পাশে ছড়িয়ে পড়বে। তুমি একটুখানি চেষ্টা করলেই এই তরঙ্গের বেগ মাপতে পারবে। চেষ্টা করে দেখো।

ঠিক কেন্দ্রে স্পর্শ না করে একটু পাশে স্পর্শ করলে কী হবে? চেষ্টা করে দেখো।

7.2.2 তরঙ্গের প্রকারভেদ

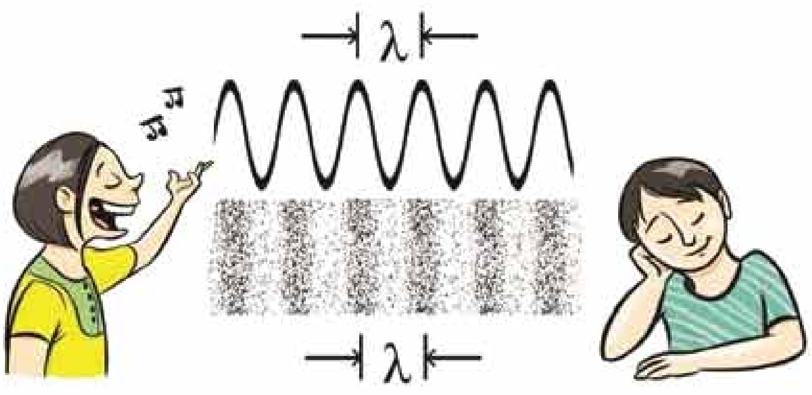

চিত্র 7.04: শব্দ হচ্ছে বাতাসের চাপের কারণে সংকোচন এবং প্রসারণের একটি অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ। এখানে λ হচ্ছে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য।

২০২৫

একটা স্প্রিংয়ের ভেতর দিয়ে একটা তরঙ্গ যাবার সময় তরঙ্গটি স্প্রিংকে সংকুচিত এবং প্রসারিত করে এগিয়ে যায়। আবার একটা দড়ির এক প্রান্তে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে একটা তরঙ্গ তৈরি করে দড়ির মাঝে দিয়ে পাঠানো যায়। দুটি তরঙ্গের মাঝে কিন্তু একটা মৌলিক পার্থক্য আছে।

স্প্রিংয়ে তরঙ্গটি ছিল সংকোচন এবং প্রসারণের, স্প্রিংটির সংকোচন এবং প্রসারণের দিক এবং তরঙ্গের বেগ একই দিকে। এই ধরনের তরঙ্গের নাম অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ। শব্দ (চিত্র 7.04) হচ্ছে এ রকম অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ (Longitudinal Wave)।

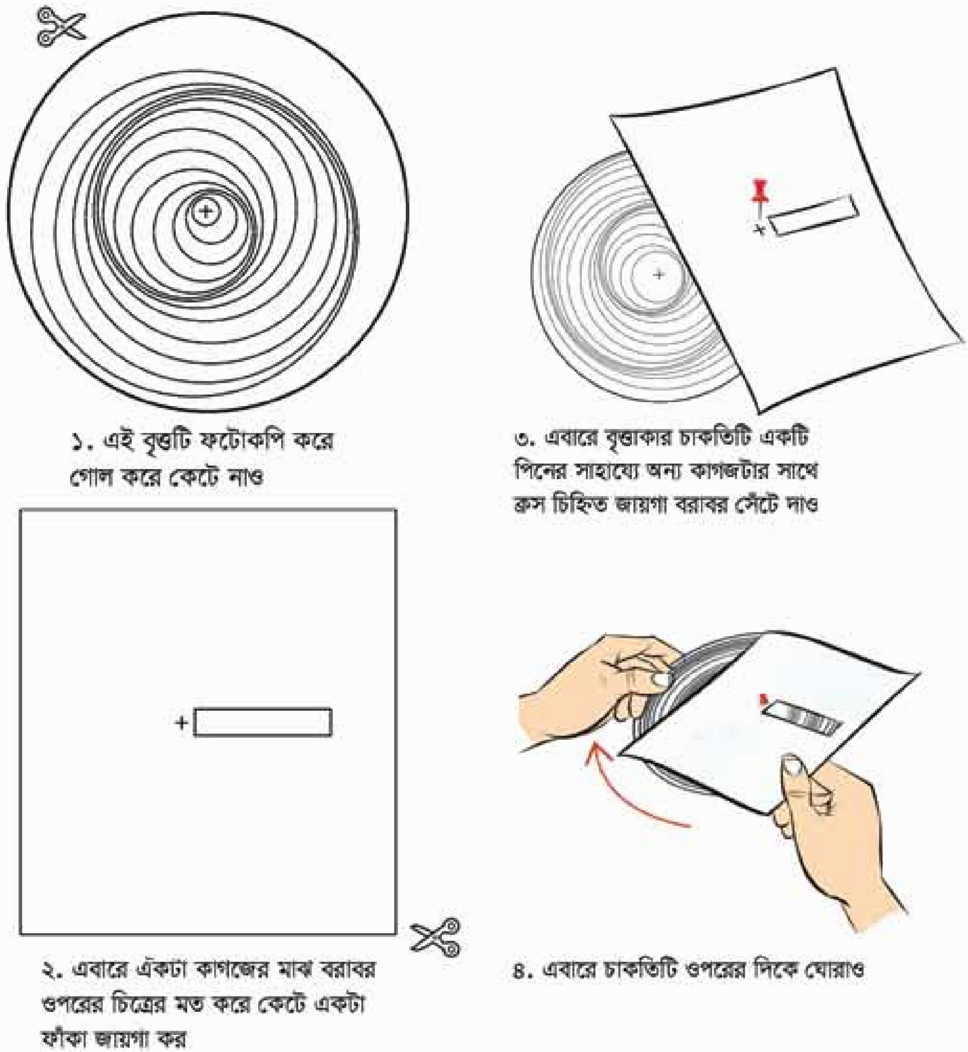

চিত্র 7.05: অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ কীভাবে অগ্রসর হয় তার মডেল।

দড়ির বেলায় আমরা যখন দড়িটিতে ঝাঁকুনি দিয়ে তরঙ্গ তৈরি করেছি সেখানে দড়ির কম্পনটি কিন্তু তরঙ্গের বেগের দিকে ঘটে না। কম্পনের দিক অর্থাৎ দড়ির ওঠা এবং নামা, তরঙ্গের বেগের সাথে লম্ব। এরকম তরঙ্গের নাম অনুপ্রস্থ তরঙ্গ (Transverse Wave)। পানির ঢেউ হচ্ছে এর একটি উদাহরণ।

নিজে করো

7.05 চিত্রটি ফটোকপি করে নাও। এবারে ছবিতে দেখানো উপায়ে কেটে নাও, লক্ষ করো নিচের আয়তাকার কাগজটিতে ছোট একটা জানালা তৈরি করা হয়েছে। এখন উপরের বৃত্তাকার কাগজটির উপর আয়তাকার কাগজটি রাখো। একটা ছোট তার ক্রস চিহ্নিত জায়গা দিয়ে ঢুকিয়ে চাপ দিয়ে তারটি ভাঁজ করে নাও। এখন নিচের বৃত্তাকার কাগজটি ঘুরিয়ে কাটা অংশটিতে দেখো, অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ বা Longitudinal Wave কীভাবে অগ্রসর হয় পরিষ্কার দেখতে পাবে।

7.2.3 তরঙ্গ সংশ্লিষ্ট রাশি

সরল স্পন্দন গতিতে আমরা যে সকল রাশির কথা বলেছি তার সবগুলোই আসলে তরঙ্গের বেলায় ব্যবহার করতে পারব। একটা তরঙ্গেরও পূর্ণ স্পন্দন হয়, তার পর্যায়কাল আছে, কম্পাঙ্ক আছে এবং বিস্তার আছে। আমরা দেখেছি কোনো একটা তরঙ্গ যাবার সময় আমরা যদি মাধ্যমের কোনো একটা কণার দিকে তাকিয়ে থাকি তাহলে দেখব সেই কণাটির সরল স্পন্দিত কম্পন হচ্ছে। তরঙ্গের বেলায় আমরা নতুন দুটি রাশির কথা বলতে পারি যার একটা হচ্ছে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য। তরঙ্গের যেকোনো একটি দশা থেকে তার পরবর্তী একই দশার মাঝে দূরত্ব হচ্ছে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য। (চিত্র 7.04) অর্থাৎ এক পর্যায়কালে একটা তরঙ্গ যেটুকু দূরত্ব অতিক্রম করে সেটাই হচ্ছে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য।

তরঙ্গের মাঝে দ্বিতীয় আরো একটি রাশি রয়েছে যেটা সরল স্পন্দিত কম্পনে নেই, সেটি হচ্ছে তরঙ্গের বেগ। প্রতি সেকেন্ডে একটা তরঙ্গ যেটুকু দূরত্ব অতিক্রম করে সেটাই হচ্ছে তরঙ্গের বেগ। প্রতি সেকেন্ডে যে কয়টি পর্যায়কাল থাকে সেটি হচ্ছে কম্পাঙ্ক, কম্পাঙ্ক যদি f এবং তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যদি λ হয় তাহলে বেগ v হচ্ছে

$$v = f\lambda$$

একটা তরঙ্গ যখন একটা মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে যায় তখন তার বেগের পরিবর্তন হয়, যেহেতু কম্পাঙ্ক সব সময় সমান থাকে তাই তরঙ্গ যখন এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে যায় তখন তার

তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন হয়। অর্থাৎ তরঙ্গ বিভিন্ন মাধ্যমের ভেতর দিয়ে যাবার সময় তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কিংবা বেগের পরিবর্তন হয় কিন্তু কম্পাঙ্কের বা পর্যায়কালের কখনো পরিবর্তন হয় না।

উদাহরণ

প্রশ্ন: 7.06 চিত্রে একটি তরঙ্গ দেখানো হয়েছে। এই চিত্র থেকে তরঙ্গের বিস্তার, তরঙ্গ দৈর্ঘ্য, দোলনকাল, কম্পাঙ্ক এবং বেগের ভেতর কোন কোনটির মান বের করা সম্ভব? সেগুলো বের করে দেখাও।

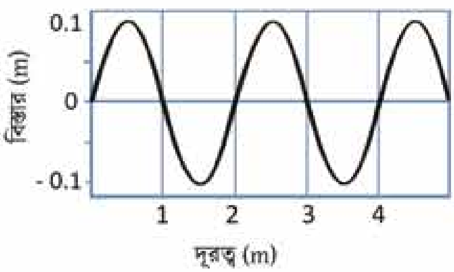

চিত্র 7.06: অবস্থানের সাপেক্ষে একটি তরঙ্গ।

উত্তর: ছবিতে যে তথ্য দেওয়া আছে সেখান থেকে শুধু তরঙ্গটির বিস্তার ($0.1\ m$) এবং তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ($2\ m$) বের করা সম্ভব। এই ছবিতে যে তথ্য দেওয়া আছে সেখান থেকে পর্যায়কাল, কম্পাঙ্ক বা বেগ বের করা সম্ভব নয়। উপরের তরঙ্গটি একটি নির্দিষ্ট সময়ে তরঙ্গের অবস্থা। সময়ের সাথে অবস্থানের কীভাবে পরিবর্তন হয়েছে এখানে সে সম্পর্কে কোনো তথ্য নেই।

প্রশ্ন: 7.07 চিত্রে আরেকটি তরঙ্গ দেখানো হয়েছে। এই চিত্র থেকে তরঙ্গের বিস্তার, তরঙ্গ দৈর্ঘ্য, দোলনকাল, কম্পাঙ্ক এবং বেগের ভেতর কোন কোনটি বের করা সম্ভব? সেগুলো বের করে দেখাও।

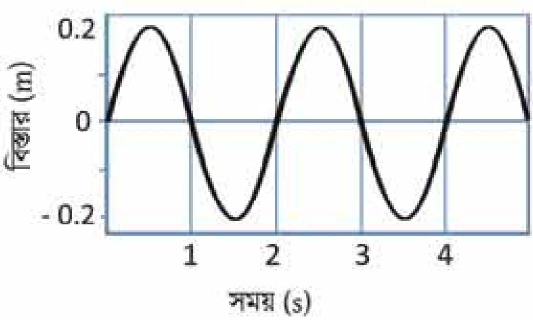

চিত্র 7.07: সময়ের সাপেক্ষে একটি তরঙ্গ।

উত্তর: এই তরঙ্গের বিস্তার (0.2 m) এবং পর্যায়কাল (2 s), এই ছবি থেকে অন্য কোনো তথ্য বের করা সম্ভব না। এই ছবিটিতে একটা নির্দিষ্ট স্থানে সময়ের সাথে সাথে তরঙ্গটি কীভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে সেটি দেখানো হয়েছে কাজেই এখান থেকে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত বলা সম্ভব নয়।

প্রশ্ন: 7.08 চিত্রে একটি নির্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন অবস্থানে এবং একটি নির্দিষ্ট অবস্থানে বিভিন্ন সময়ে একটি তরঙ্গের অবস্থা দেখানো হয়েছে। এর বিস্তার, তরঙ্গ দৈর্ঘ্য, দোলনকাল, কম্পাঙ্ক এবং বেগ বের করো।

উত্তর: প্রথম চিত্র থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি তরঙ্গটির

বিস্তার $a = 0.1\ \text{m}$
তরঙ্গ দৈর্ঘ্য $\lambda = 1\ \text{m}$

দ্বিতীয় চিত্র থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি তরঙ্গটির

বিস্তার $a = 0.1\ \text{m}$ (এটি আমরা প্রথম ছবি থেকেও জানি)
দোলনকাল $T = 0.2\ \text{s}$
দোলনকাল থেকে কম্পাঙ্ক f বের করতে পারি

$$f = \frac{1}{T} = 5\ \text{s}^{-1} = 5\ \text{Hz}$$

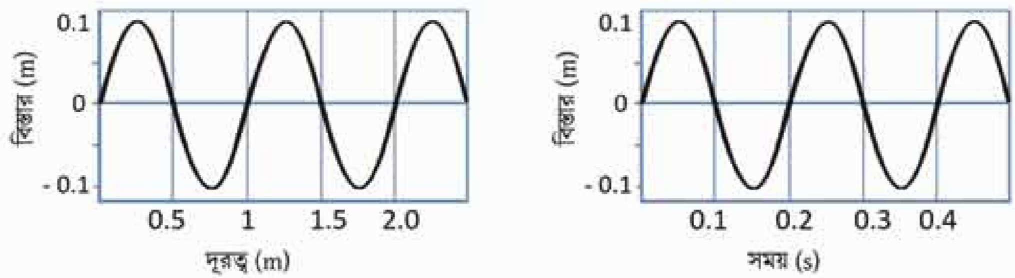

চিত্র 7.08: একই সাথে অবস্থান এবং সময়ের সাপেক্ষে একটি তরঙ্গ।

কাজেই দুটি চিত্রের তথ্য ব্যবহার করে আমরা বলতে পারি

তরঙ্গটির বেগ $v = \lambda f = 1\ \text{m} \times 5\ \text{Hz} = 5\ \text{ms}^{-1}$

প্রশ্ন: 7.09 চিত্রে একটি তরঙ্গের বিভিন্ন অবস্থা দেখানো হয়েছে, কোন কোন অবস্থানে দশা এক?

উত্তর: A এবং C তে দশা এক
A এবং B তে তরঙ্গের মান সমান হলেও দশা বিপরীত
D এবং E তে মান সমান হলেও দশা এক নয়।

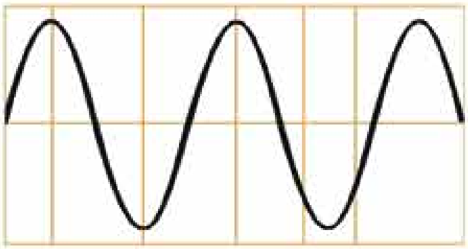

চিত্র 7.09: ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানে একটি তরঙ্গের দশা

7.3 শব্দ তরঙ্গ (Sound Wave)

শব্দ তরঙ্গ তৈরি করতে তার একটা উৎসের দরকার, সেটাকে পাঠানোর জন্য একটা মাধ্যমের দরকার এবং সেই শব্দ গ্রহণ করার জন্য কোনো এক ধরনের রিসিভার দরকার। আমাদের চারপাশে অসংখ্য শব্দের উৎস রয়েছে। অবশ্যই সবচেয়ে পরিচিত উৎস আমাদের কণ্ঠ, সেখানে যে ভোকাল কর্ড আছে আমরা তার ভেতর দিয়ে বাতাস বের করার সময় সেখানে যে কম্পন হয় সেটা দিয়ে শব্দ তৈরি হয়। কথা বলার সময় আমরা যদি গলায় স্পর্শ করি তাহলে আমরা সেই কম্পনটা অনুভব করতে পারব।

তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ পুরুষের গলার স্বর মোটা এবং নারী ও শিশুদের গলার স্বর তীক্ষ্ণ। আমরা যখন কোনো একটা শব্দ করি তখন আমাদের ফুসফুস থেকে বাতাস গলা দিয়ে দিয়ে বের হয়ে আসে। আমাদের গলায় ফুসফুসে বাতাস ঢোকার জন্য এবং বের হওয়ার জন্য রয়েছে wind pipe এর উপরে শব্দ সৃষ্টি করার জন্য রয়েছে স্বরযন্ত্র (larynx)। সেখানে দুটো পর্দা ভালভের মতো কাজ করে, এই পর্দা দুটির নাম ভোকাল কর্ড (Vocal cord)। বাতাস বের করার সময় এগুলো কাঁপতে পারে এবং শব্দ তৈরি করে। বয়সের সাথে সাথে পুরুষের ভোকাল কর্ড শক্ত হয়ে যায়, মেয়েদেরটি কোমল থাকে। সে জন্য পুরুষেরা কম কম্পাঙ্কের শব্দ তৈরি করে মেয়েরা বেশি কম্পাঙ্ক তৈরি করে। যে কারণে পুরুষের গলার স্বর মোটা মেয়েদেরটি তীক্ষ্ণ।

নিজে করো

7.10 চিত্রে দেখানো উপায়ে একটি কাগজ কেটে নিয়ে দুই আঙুলের মাঝে রেখে মুখে লাগিয়ে ফুঁ দাও। কাগজের কাটা টুকরো দুটো স্বরযন্ত্র ভোকাল কর্ডের মতো কেঁপে শব্দ তৈরি করবে। বিভিন্নভাবে কাগজ কেটে বিভিন্ন রকম শব্দ তৈরি করতে পার কিনা দেখো।

আমাদের কণ্ঠ ছাড়াও স্পিকার শব্দের উৎস হিসেবে কাজ করে, সেখানে যে পাতলা ডায়াফ্রাম রয়েছে সেটিকে সুনির্দিষ্টভাবে কাঁপিয়ে শব্দ তৈরি করা হয়। স্কুলের ঘণ্টার মাঝে আঘাত করলে সেটি কাঁপতে শুরু করে শব্দ তৈরি করে এবং তখন হাত দিয়ে সেটাকে চেপে ধরে কম্পন বন্ধ করে ফেলা যায়, সাথে সাথে শব্দও বন্ধ হয়ে যাবে। গিটারের তারে টোকা দিলে সেটি কাঁপতে থাকে এবং শব্দ তৈরি করে। ল্যাবরেটরিতে সুর শলাকা দিয়ে নির্দিষ্ট কম্পনে শব্দ তৈরি করা যায়।

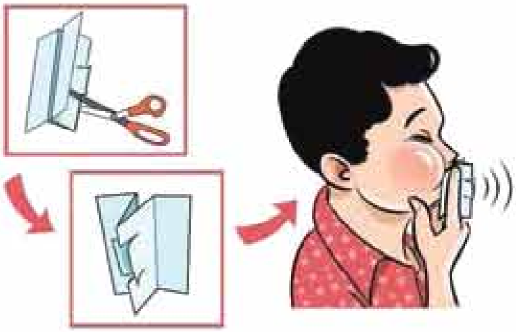

চিত্র 7.10: কাগজ দিয়ে ভোকাল কর্ড তৈরি করে সেটাকে ফুঁ দিয়ে কাঁপিয়ে শব্দ তৈরি করা যায়।

কম্পন দিয়ে শব্দ তৈরি করার পর সেটিকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পাঠানোর জন্য একটা মাধ্যমের দরকার হয়। শব্দ তরল কিংবা কঠিন পদার্থের ভেতর দিয়েও পাঠানো যায় কিন্তু আমরা বাতাসকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেই শব্দ শুনে অভ্যস্ত। মাধ্যম ছাড়া যে শব্দ যেতে পারে না সেটি দেখানোর জন্য ল্যাবরেটরিতে 7.11 চিত্রে দেখানো উপায়ে একটা কলিং বেল রেখে সেটাকে বাইরে থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে বাজানো যেতে পারে। তারপর একটা পাম্প দিয়ে ধীরে ধীরে বায়ুশূন্য করা শুরু করলে কলিং বেলের শব্দ মৃদু হতে শুরু করবে। বেলজারটি পুরোপুরি বায়ুশূন্য করা হলে ভেতরে কলিং বেলটি বাজতে থাকলেও বাইরে থেকে মনে হবে সেটি কোনো শব্দ তৈরি করছে না।

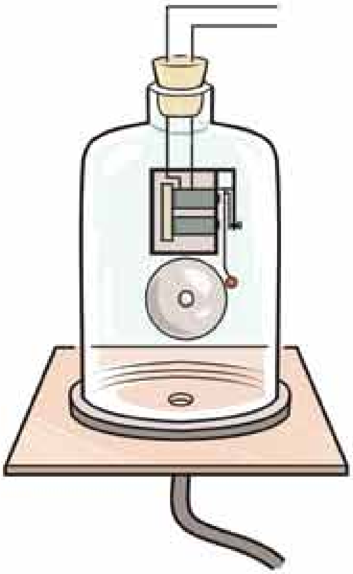

চিত্র 7.11: বেলজার থেকে বাতাস পাম্প করে সরিয়ে নিলে কলিং বেলে শব্দটি আর শোনা যাবে না।

আমরা আমাদের কান দিয়ে শব্দ শুনতে পাই। শব্দের কম্পাঙ্ক যদি 20 Hz থেকে 20,000 Hz বা 20 kHz এর মাঝখানে থাকে তাহলে সেই শব্দ শোনা যায়। (তবে কানে হেডফোন লাগিয়ে অবিরত গান শুনে কিংবা প্রচণ্ড শব্দদূষণে থাকলে অনেক সময় শোনার ক্ষমতা কমে যায়।) শব্দের কম্পাঙ্ক 20 Hz থেকে কম হলে সেটাকে শব্দেতর বা ইনফ্রাসাউন্ড এবং 20 kHz থেকে বেশি হলে সেটাকে শব্দোত্তর বা আলট্রাসাউন্ড বলে। 20 Hz থেকে কম কিংবা 20 kHz থেকে বেশি কম্পাঙ্ক তৈরি করা হলে সেটি

বাতাসে যে আলোড়ন সৃষ্টি করবে আমরা সেটি শুনতে পারব না। এ ধরনের শব্দের অস্তিত্ব বুঝতে হলে আমরা বিশেষ ধরনের মাইক্রোফোন বা রিসিভার ব্যবহার করতে পারি। অনেক পশুপাখি কম কম্পাঙ্কের শব্দ শুনতে পায়। ভূমিকম্পের আগে আগে এ ধরনের কম কম্পাঙ্কের শব্দ তৈরি হয় এবং অনেক সময় পশুপাখি সেই শব্দ শুনে আতঙ্কে ছোটাছুটি করেছে সে ধরনের ঘটনা ঘটেছে বলে জানা গেছে।

চিত্র 7.12: প্লাস্টিকের গ্লাসের পেছনে সুতা বেঁধে "ফোন" তৈরি করা যায়।

শব্দ তরঙ্গের বৈশিষ্ট্য

শব্দ একটি যান্ত্রিক তরঙ্গ কারণ বস্তুর কম্পনের ফলে শব্দ তরঙ্গ সৃষ্টি হয় এবং সেটি সঞ্চালনের জন্য স্থিতিস্থাপক মাধ্যমের দরকার হয়। এটি একটি অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ কারণ এই তরঙ্গের প্রবাহের দিক এবং কম্পনের দিক এক। শব্দ তরঙ্গের বেগ মাধ্যমে প্রকৃতির উপর নির্ভর করে, বায়বীয় মাধ্যমে এর বেগ কম, তরলে তার চেয়ে বেশি, কঠিন পদার্থে আরো বেশি। শব্দের বেগ মাধ্যমের তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতার উপরও নির্ভর করে। শব্দের তীব্রতা অন্যান্য তরঙ্গের মতো তার বিস্তারের বর্গের সমানুপাতিক। অর্থাৎ তরঙ্গের বিস্তার বেশি হলে শব্দের তীব্রতা বেশি হবে এবং তরঙ্গের বিস্তার কম হলে শব্দের তীব্রতা কম হবে। যেকোনো তরঙ্গের মতোই শব্দ তরঙ্গের প্রতিফলন, প্রতিসরণ এবং উপরিপাতন হতে পারে।

নিজে করো

দুটো প্লাস্টিকের গ্লাস নিয়ে গ্লাসগুলোর নিচে দুটি ছোট ফুটো করো। (সেফটি পিন চুলোয় গরম করে স্পর্শ করো।) সেই ফুটো দিয়ে সুতা ঢুকিয়ে সুতাটা বেঁধে নাও (চিত্র 7.12)। এভাবে দুটি প্লাস্টিকের গ্লাসকে একটা লম্বা সুতা দিয়ে বেঁধে নিয়ে দুইজন দুই জায়গায় দাঁড়িয়ে একজন কথা বলো অন্যজন শোনো। (সুতাটা যেন টান টান থাকে, তা না হলে কিন্তু কথা শোনা যাবে না) আমরা বাতাসে কথা শুনতে শুনতে এত অভ্যস্ত হয়ে গেছি যে ধরেই নিয়েছি শব্দ বুঝি শুধু বাতাসেই যায়। শব্দ যে তরল কিংবা কঠিন পদার্থের মতো অন্য মাধ্যম দিয়েও যেতে পারে এই পরীক্ষাটি তার একটা প্রমাণ।

উদাহরণ

প্রশ্ন: 1 kHz কম্পনের একটি সুর শলাকা বা টিউনিং ফর্ক দিয়ে শব্দ তৈরি করে সেটি বাতাসে, পানিতে এবং লোহার ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হতে দিয়ে তার বেগ নির্ণয় করে দেখা গেছে শব্দের বেগ বাতাসে 334 m/s, পানিতে 1493 m/s এবং লোহার ভেতরে 5130 m/s কোন মাধ্যমে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত?

উত্তর: তরঙ্গের বেগ $= \lambda f$ যেখানে λ তরঙ্গের দৈর্ঘ্য এবং f কম্পাঙ্ক। এখানে কম্পাঙ্ক 1 kHz বা 1000 Hz কাজেই

$$\lambda = \frac{v}{f}$$

বাতাসে

$$\lambda = \frac{334\ \text{ms}^{-1}}{10^3\ \text{s}^{-1}} = 0.334\ \text{m}$$

পানিতে

$$\lambda = \frac{1493\ \text{ms}^{-1}}{10^3\ \text{s}^{-1}} = 1.49\ \text{m}$$

লোহায়

$$\lambda = \frac{5130\ \text{ms}^{-1}}{10^3\ \text{s}^{-1}} = 5.13\ \text{m}$$

7.3.1 প্রতিধ্বনি

শব্দ যেহেতু এক ধরনের তরঙ্গ তাই তার প্রতিফলন হতে পারে। সাধারণত বড় ফাঁকা দালানের ভেতর কথা বললে এক ধরনের গমগম আওয়াজ হয়, সেটি প্রতিফলন ছাড়া আর কিছু নয়। দালানের ভেতর দূরত্ব বেশি নয় বলে শব্দটা আলাদাভাবে শুনতে পাই না। আমরা যখন কিছু শুনি তার অনুভূতিটা 0.1 s পর্যন্ত থেকে যায় তাই দুটি শব্দ আলাদাভাবে শুনতে হলে দুটি শব্দের মাঝে কমপক্ষে 0.1 s এর একটা ব্যবধান থাকা দরকার। শব্দের বেগ 330 m/s কাজেই 0.1 s এর ব্যবধান তৈরি করতে শব্দকে কমপক্ষে 33 m দূরত্ব অতিক্রম করতে হয়। একটি বড় দেয়াল, দালান কিংবা খাড়া পাহাড়ের সামনে কমপক্ষে এই দূরত্বের অর্ধেক দূরত্বে (16.5 m) দাঁড়ালে শব্দটি গিয়ে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসতে 0.1 s সময় লাগবে এবং আমরা শব্দের প্রতিধ্বনি শুনতে পাব।

বাদুড়ের চোখ আছে এবং সেই চোখে বেশ ভালো দেখতে পায়, তারপরও তারা ওড়ার সময় শব্দের প্রতিধ্বনি ব্যবহার করে। বাদুড় ওড়ার সময় তার কণ্ঠ থেকে শব্দ তৈরি করে, সামনে কোনো কিছু

থাকলে শব্দটি সেখানে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে, কতক্ষণ পর শব্দটি ফিরে এসেছে সেখান থেকে বাদুড় দূরত্বটা অনুমান করতে পারে। এ জন্য অন্ধকারেও বাদুড় কোথাও ধাক্কা না খেয়ে উড়ে যেতে পারে। বাদুড়ের তৈরি এই শব্দ আমরা শুনতে পাই না, কারণ শব্দটি আলট্রাসাউন্ড অর্থাৎ আমাদের শোনার বাইরের কম্পাঙ্কের শব্দ। বাদুড় প্রায় 100 kHz কম্পনের শব্দ তৈরি করতে পারে।

টেবিল 7.01: বিভিন্ন মাধ্যমে শব্দের বেগ

মাধ্যম	m/s
বাতাস	330
হাইড্রোজেন	1,284
পারদ	1,450
পানি	1,493
লোহা	5,130
হীরা	12,000

7.3.2 শব্দের বেগের পার্থক্য

বাতাসে শব্দের বেগ তাপমাত্রার বর্গমূলের সমানুপাতিক। অর্থাৎ

$$v \propto \sqrt{T}$$

এখানে তাপমাত্রা কিন্তু সেলসিয়াস তাপমাত্রা নয়। কেলভিন স্কেলে তাপমাত্রা।

শব্দের বেগ বাতাসের চাপের ওপর নির্ভর করে না। তবে বাতাসের ঘনত্বের বর্গমূলের ওপর ব্যস্তানুপাতিকভাবে নির্ভর করে। তাই বাতাসে জলীয়বাষ্প থাকলে বাতাসের ঘনত্ব কমে যায়, সে জন্য শব্দের বেগ বেড়ে যায়।

শব্দ একটি যান্ত্রিক তরঙ্গ। এটি মাধ্যমের স্থিতিস্থাপকতার ওপর নির্ভর করে। তরল এবং কঠিন পদার্থের প্রকৃতি বাতাস থেকে ভিন্ন এবং স্বাভাবিক কারণেই শব্দের বেগ সেখানে ভিন্ন। তরলে শব্দের বেগ বাতাস থেকে বেশি এবং কঠিন পদার্থে শব্দের বেগ তরল থেকেও বেশি। 7.01 টেবিলে বিভিন্ন মাধ্যমে শব্দের বেগ দেখানো হয়েছে।

নিজে করো

একটা টেবিলের এক মাথায় একজন কান লাগিয়ে রাখো, আরেকজনকে বলো টেবিলের অন্য মাথায় হালকা টোকা দিতে। টোকার শব্দটি তুমি স্পষ্ট শুনতে পাবে, কারণ কঠিন পদার্থ বাতাস থেকে অনেক ভালো শব্দের মাধ্যম।

উদাহরণ

প্রশ্ন: কোনো জায়গায় শীতকালে তাপমাত্রা 10° C এবং শব্দের বেগ 332 m/s, গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা বেড়ে 30° C হলে শব্দের বেগ কত?

উত্তর:

$$v \propto \sqrt{T}$$

$$\frac{v_1}{v_2} = \sqrt{\frac{T_1}{T_2}}$$

$$v_1 = v_2\sqrt{\frac{T_1}{T_2}} = 332\sqrt{\frac{273+30}{273+10}}\,\text{m/s} = 343.5\ \text{m/s}$$

7.3.3 শব্দের ব্যবহার

শব্দের প্রচলিত ব্যবহারের কথা নিশ্চয়ই আর কাউকে আলাদা করে বলতে হবে না, আমরা কথা বলি, গান শুনি, ডাক্তাররা হৃৎস্পন্দন শোনেন, ইঞ্জিনিয়াররা যন্ত্রপাতির শব্দ শোনেন ইত্যাদি ইত্যাদি। শব্দের আরো কিছু ব্যবহার আছে, যার কথা তোমরা হয়তো শোনোনি। সন্তানসম্ভবা মায়ের গর্ভে যে নবজাতকটি বড় হয় বাইরে থেকে তাকে দেখার কোনো উপায় ছিল না, এখন আলট্রাসনোগ্রাফি নামে একটি প্রক্রিয়ায় সেটি দেখা সম্ভব হয়। শেষ অধ্যায়ে সেটি আলোচনা করা হয়েছে।

ত্রিমাত্রিক সিসমিক সার্ভে

মাটির নিচে গ্যাস বা তেল আছে কি না দেখার জন্য সিসমিক সার্ভে করা হয়। এটি করার জন্য মাটির খানিকটা নিচে ছোট বিস্ফোরণ করা হয়, বিস্ফোরণের শব্দ মাটির নিচের বিভিন্ন স্তরে আঘাত করে প্রতিফলিত হয়ে উপরে ফিরে আসে। জিওফোন (Geophone) নামে বিশেষ এক ধরনের রিসিভারে সেই প্রতিফলিত তরঙ্গকে ধারণ (Detect) করা হয় (চিত্র 7.13)। সমস্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে মাটির নিচের নিখুঁত ত্রিমাত্রিক ছবি বের করে কোথায় গ্যাস বা কোথায় তেল আছে তা বের করে নেওয়া হয়। শব্দের উৎসটি কোথায় আছে এবং জিওফোন কোথায় আছে দুটিই জানা থাকার কারণে উৎস থেকে জিওফোনে শব্দ আসতে কতটুকু সময় লেগেছে জানতে পারলেই বিভিন্ন স্তরের দূরত্ব নিখুঁতভাবে বের করা যায়।

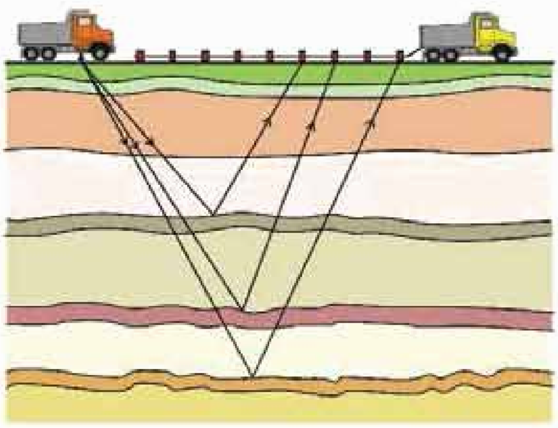

চিত্র 7.13: শব্দ তরঙ্গে প্রতিফলন থেকে ভূপৃষ্ঠের ভিন্ন ভিন্ন স্তর সম্পর্কে তথ্য জানা যায়।

আলট্রাসাউন্ড ক্লিনার

ল্যাবরেটরিতে যখন ছোটখাটো যন্ত্রপাতি নিখুঁতভাবে পরিষ্কার করতে হয় তখন আলট্রাসাউন্ড ক্লিনার ব্যবহার করা হয়। এখানে কোনো একটি তরলে ছোটখাটো যন্ত্রপাতি ডুবিয়ে রেখে তার ভেতর আলট্রাসাউন্ড পাঠানো হয়, তার কম্পনে যন্ত্রপাতির সব ময়লা বের হয়ে আসে।

7.3.4 সুরযুক্ত শব্দ

আমাদের চারপাশে নানা ধরনের শব্দ রয়েছে তার মাঝে কিছু কিছু শব্দ শুনতে আমাদের ভালো লাগে আবার কিছু কিছু শুনতে আমাদের বিরক্তি হয়। যে সকল শব্দ শুনতে আমাদের ভালো লাগে তার মাঝে সবচেয়ে প্রধান হচ্ছে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের শব্দ। 7.14 চিত্রে বেশ কয়েকটি বাদ্যযন্ত্রের শব্দের তরঙ্গ দেখানো হয়েছে। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এর সবগুলোই পর্যাবৃত্ত কম্পন। সুরশলাকা বা টিউনিফের্ক থেকে নিখুঁত একটি কম্পনের শব্দ বের হয়। কিন্তু সুরযুক্ত শব্দে শুধু একটি তরঙ্গ থাকে না, একাধিক তরঙ্গ পরস্পরের ওপর উপস্থাপন করে শব্দটাকে সুরেলা করে তোলে।

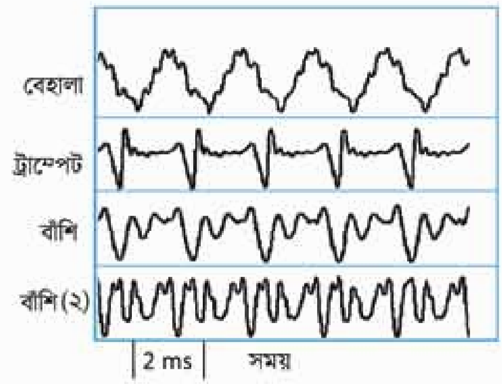

চিত্র 7.14: ভিন্ন ভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের শব্দ তরঙ্গ।

সুরেলা শব্দকে ব্যাখ্যা করার জন্য অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে তার মাঝে গুরুত্বপূর্ণ তিনটি হচ্ছে:

তীব্রতা (Intensity): একটি সুরেলা শব্দ কত জোরে শোনা যাচ্ছে তার পরিমাণ হচ্ছে তীব্রতা। অর্থাৎ একক ক্ষেত্রফল দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে যে পরিমাণ শব্দ শক্তি যায় তাকে শব্দের তীব্রতা বলে। শব্দের তীব্রতার একক হচ্ছে Wm^{-2}

তীক্ষ্ণতা (Pitch): সুরযুক্ত শব্দের যে বৈশিষ্ট্য দিয়ে একই তীব্রাকার শব্দকে কখনো মোটা কখনো তীক্ষ্ণ শোনা যায় তাকে তীক্ষ্ণতা বা পিচ বলে। তীক্ষ্ণতার একক হচ্ছে Hz।

টিম্বার (Timbre): ভিন্ন ভিন্ন বাদ্যযন্ত্র থেকে আসা শব্দের পার্থক্য যে বৈশিষ্ট্য দিয়ে বোঝা যায় সেটা হচ্ছে টিম্বার বা সুরের গুণ।

সুরেলা শব্দ তৈরি করার জন্য নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার করা হয়, সেগুলোকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়:

তার দিয়ে তৈরি বাদ্যযন্ত্র: একতারা, বেহালা, সেতার
বাতাসের প্রবাহ দিয়ে তৈরি বাদ্যযন্ত্র: বাঁশি, হারমোনিয়াম
আঘাত (Percussion) দিয়ে শব্দ তৈরি করার বাদ্যযন্ত্র: ঢোল, তবলা

আজকাল ইলেকট্রনিকস ব্যবহার করে সম্পূর্ণ ভিন্ন উপায়ে সুরেলা শব্দ তৈরি করা হয়।

7.3.5 শব্দের দূষণ

শব্দ আমাদের জীবনের খুব প্রয়োজনীয় একটি বিষয়, কিন্তু এর বাড়াবাড়ি আমাদের জীবনকে অসহনীয় করে তুলতে পারে। আমরা যারা শহরে থাকি, বিশেষ করে যারা বড় একটি রাস্তার পাশে থাকি তারা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছি রাস্তায় বাস, গাড়ি, ট্রাকের ইঞ্জিনের শব্দ এবং অনবরত হর্নের শব্দ প্রায় সময়ই সহনশীল সহ্যসীমার বাইরে চলে যায়। দীর্ঘদিন এই শব্দদূষণে থাকতে থাকতে আমরা অনেক সময় তাতে অভ্যস্ত হয়ে যাই। তখন যদি শব্দদূষণ নেই সে রকম কোনো নিরিবিলি জায়গায় যাওয়ার সৌভাগ্য হয় তখন হঠাৎ করে শব্দদূষণ ছাড়া জীবনের অনেকটুকুর গুরুত্বটুকু ধরতে পারি। বিভিন্ন ধরনের শব্দের পরিমাণ 7.02 টেবিলে দেখানো হয়েছে।

টেবিল 7.02: বিভিন্ন ধরনের শব্দের পরিমাণ

জেট ইঞ্জিন	110-140 dB
ট্রাফিক	80-90 dB
গাড়ি	60-80 dB
টেলিভিশন	50-60 dB
কথাবার্তা	40-60 dB
নিঃশ্বাস	10 dB
মশার পাখার শব্দ	0 dB

এটি বলার অপেক্ষা রাখে না শব্দদূষণের কারণে আমাদের শোনার ক্ষমতার অনেক ক্ষতি হয়। সমস্যাটি বাড়িয়ে তোলার জন্য আমাদের অনেকে অপ্রয়োজনেও কানে হেডফোন লাগিয়ে গান শোনে।

শব্দদূষণ কমানোর জন্য প্রথম প্রয়োজন দেশে এর বিরুদ্ধে আইন তৈরি করা যেন কেউ শব্দদূষণ করতে না পারে এবং করা হলে তার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া যায়। এরপর প্রয়োজন জনসচেতনতা। সবাইকে বিষয়টি বোঝাতে হবে, যথাসম্ভব কম হর্ন ব্যবহার করে চলাচল, কলকারখানায় শব্দ শোষণের যন্ত্র চালু, মাইকের ব্যবহার কমিয়ে কিংবা বন্ধ করে দেওয়া, কম শব্দের যানবাহন ব্যবহার ইত্যাদি। একই সাথে শহরের ফাঁকা জায়গায় প্রচুর গাছ লাগিয়ে শব্দকে শোষণ করার মতো ব্যবস্থাও নেওয়া উচিত।

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন

1. দেখাও যে একটি তরঙ্গ শক্তিকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিতে পারে।

2. শিস দিলে শব্দ হয় কেন?

3. "তরঙ্গ প্রবাহিত হওয়ার সময় মাধ্যম প্রবাহিত হয় না, নিজ অবস্থানে তার সরল ছন্দিত স্পন্দন হয়" সত্য না মিথ্যা?

4. বজ্রপাত হলে শব্দ হয় কেন?

5. ওড়ার সময় আলট্রাসাউন্ড শব্দ তৈরি না করে ইনফ্রা-সাউন্ড শব্দ তৈরি করলে বাদুড়ের কী সমস্যা হতো?

গাণিতিক প্রশ্ন

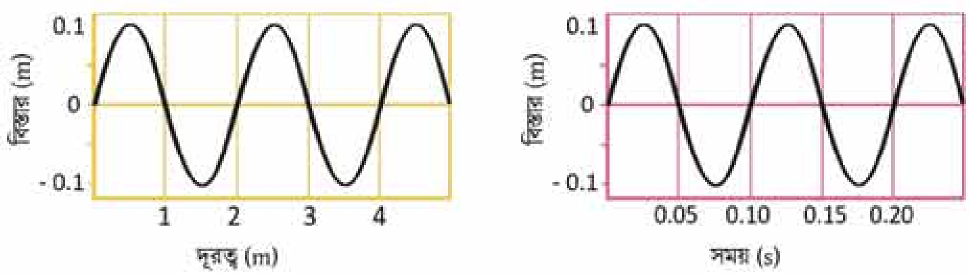

চিত্র 7.15: অবস্থান এবং সময়ের সাপেক্ষে একটি তরঙ্গ।

1. 7.15 চিত্রে অবস্থান এবং সময়ের সাপেক্ষে একটি তরঙ্গ দেখানো হয়েছে। তরঙ্গটির বেগ কত?

2. বেগ এবং শব্দের বেগ-এর অনুপাতকে *MACH* বলে। *MACH* 9 যুদ্ধবিমানের গতিবেগ কত?

3. কোনো একটি শহরে গ্রীষ্মকালে শব্দের বেগ 0.05% বেড়ে গেছে। শীতকালে তাপমাত্রা 10° C হলে গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা কত?

4. আমরা 20 Hz থেকে 20 kHz পর্যন্ত শব্দ শুনতে পারি। 20 Hz এবং 20 kHz শব্দের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত?

5. $dB = 10\log\left(\frac{P_2}{P_1}\right)$, P_2 জেট ইঞ্জিনের শব্দ এবং P_1 মশার পাখার শব্দ হলে, জেট ইঞ্জিনের শব্দ মশার পাখার শব্দ থেকে কত গুণ বেশি?

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটির পাশে ঠিক (√) চিহ্ন দাও

1. শব্দ কোন ধরনের তরঙ্গ?
   (ক) তির্যক তরঙ্গ (খ) তাড়িতচৌম্বক তরঙ্গ
   (গ) অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ (ঘ) বেতার তরঙ্গ

2. শব্দের বেগ কোন মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি।
   (ক) কঠিন (খ) তরল
   (গ) গ্যাসীয় (ঘ) প্লাজমা

3. বৈদ্যুতিক লাইনে মৃত বাদুড় ঝুলে থাকতে দেখা যায় কেন?
   i. বৈদ্যুতিক তারগুলোর অবস্থান এবং মধ্যবর্তী দূরত্ব সম্পর্কে তাৎক্ষণিকভাবে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকায়।
   ii. সামনের দিকের শব্দোত্তর তরঙ্গের প্রতিধ্বনি শুনতে না পাওয়ায়।
   iii. বাদুড় একটি তারে ঝুলে অপর তারটি স্পর্শ করায়।

নিচের কোন উত্তরটি সঠিক
   (ক) i ও ii (খ) i ও iii
   (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

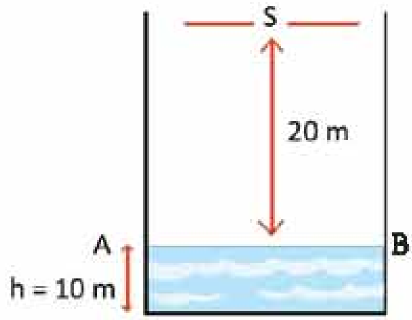

চিত্র 7.16

7.16 চিত্রে S একটি শব্দ উৎস এবং AB পানির পৃষ্ঠতল। শব্দের বেগ 332 m/s ধরে নিয়ে এবং পাশের তথ্য ও চিত্রের ভিত্তিতে 4 ও 5 নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

২০২৫

4. পানির উচ্চতা h এর মান সর্বোচ্চ কত পর্যন্ত প্রতিধ্বনি শোনা যাবে?

(ক) 13.40 cm　(খ) 13.40 m

(গ) 3.40 m　(ঘ) 3.40 cm

5. প্রদত্ত চিত্রের ক্ষেত্রের প্রতিধ্বনি শুনতে কত সময় প্রয়োজন হবে?

(ক) 0.10 s　(খ) 0.12 s

(গ) 0.14 s　(ঘ) 0.18 s

সৃজনশীল প্রশ্ন

1. রাকসান দশম শ্রেণির নির্বাচনী পরীক্ষা দিচ্ছে। পরের দিন তার পদার্থবিজ্ঞান পরীক্ষা। পাশের বাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠান। সেখানে রাত দুইটা পর্যন্ত জোরে জোরে গান বাজল। উচ্চ শব্দের জন্য তার পড়াশোনার দারুণ ব্যাঘাত ঘটল। তার বাবা উচ্চরক্তচাপের রোগী। তাঁরও অসুবিধা হলো।

(ক) শব্দদূষণ কী?

(খ) শব্দদূষণের কারণ ব্যাখ্যা করো।

(গ) রাকসানের বাবার কী অসুবিধা হতে পারে এবং এ প্রসঙ্গে জনস্বাস্থ্যে শব্দদূষণের প্রভাব লিখ।

(ঘ) রাকসানের এলাকায় শব্দদূষণ প্রতিরোধে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে?

2. নিচের তথ্য ও 7.17 চিত্রের ভিত্তিতে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

(ক) পর্যায়বৃত্ত গতি কাকে বলে?

(খ) পানির ঢেউ অনুপ্রস্থ তরঙ্গ কেন? ব্যাখ্যা করো।

(গ) শব্দের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো।

(ঘ) S অবস্থান থেকে প্রতিধ্বনি শোনা সম্ভব কি? গাণিতিক যুক্তিসহ যাচাই করো।

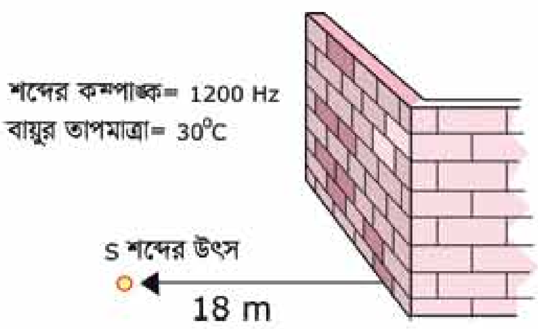

চিত্র 7.17

3. গ্রীষ্মকালীন ছুটিতে নুসরাত ছোট বোন ও পরিবারসহ সাজেক বেড়াতে গেল। সেখানে নুসরাত তার ছোট বোনকে প্রতিধ্বনির বাস্তবিক প্রদর্শন করার জন্য পাহাড়ের পাশে দাঁড়িয়ে চিৎকার করল কিন্তু কোন প্রতিধ্বনি শুনতে না পেয়ে মন খারাপ করল। তখন তার বাবা নুসরাতকে আরও 3 মিটার সরে গিয়ে আবার শব্দ করতে বললেন এবং এইবার নুসরাত প্রতিধ্বনি শুনতে পেল। ঐ দিন ঐ স্থানে শব্দের বেগ ও কম্পাঙ্ক যথাক্রমে 332 m/s ও 1328 Hz.

(ক) প্রতিধ্বনি কী?

(খ) প্রতিধ্বনি শোনার জন্য একটা ন্যূনতম দূরত্বের প্রয়োজন কেন?

(গ) নুসরাতের উচ্চারিত শব্দের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত?

(ঘ) নুসরাত চিৎকার করার 0.3 সেকেন্ড পর প্রতিধ্বনি শুনতে চাইলে নুসরাতকে আরও কতটা পেছনে যেতে হবে?

অষ্টম অধ্যায়

আলোর প্রতিফলন

(Reflection of Light)

আমরা চারপাশের যা কিছু আছে সেগুলো থেকে যখন আলো প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে এসে পড়ে আমরা তখন সেগুলো দেখতে পাই। আগের অধ্যায়ে শব্দকে তরঙ্গ হিসেবে জেনেছি, এই অধ্যায়ে আমরা আলোকে তরঙ্গ হিসেবে জানব, তবে সেটি হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক ধরনের তরঙ্গ যার নাম বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গ।

আলো যখন সমতল আয়নায় প্রতিফলিত হয় তখন সেটি প্রতিবিম্ব তৈরি করে, আমরা সবাই সেই প্রতিবিম্বের সাথে পরিচিত। সমতল আয়না না হয়ে গোলাকৃতির আয়নাও ব্যবহার করা যায় তখন সেটি যে প্রতিবিম্ব তৈরি করবে সেটি হবে অন্যরকম। এই অধ্যায়ে আমরা নানা ধরনের আয়নার নানা ধরনের প্রতিবিম্বের বিষয়গুলোও আলোচনা করব।

২০২৩

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- আলোর প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে পারব।
- আলোর প্রতিফলনের সূত্র ব্যাখ্যা করতে পারব।
- দর্পণ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- প্রতিবিম্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- আলোক রশ্মির ক্রিয়ারেখা অঙ্কন করে দর্পণে সৃষ্ট প্রতিবিম্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- দর্পণে প্রতিবিম্ব সৃষ্টির কিছু সাধারণ ঘটনা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- দর্পণের ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বিবর্ধন ব্যাখ্যা করতে পারব।
- প্রতিবিম্ব সৃষ্টি প্রদর্শন করতে পারব।
- আমাদের জীবনে বিভিন্ন আলোকীয় ঘটনার প্রভাব এবং এদের অবদান উপলব্ধি করতে পারব এবং প্রশংসা করতে পারব।

8.1 আলোর প্রকৃতি (Nature of Light)

আমরা চোখে যেটা দেখতে পাই, সেটা হচ্ছে আলো। আমরা চোখে গাছপালা দেখি, আকাশ দেখি, চেয়ার-টেবিল দেখি, মানুষ দেখি, তার মানে এই নয় যে গাছপালা, আকাশ, চেয়ার-টেবিল কিংবা মানুষ হচ্ছে আলো। এগুলো থেকে আলো প্রতিফলিত হয়ে সেই আলোটা আমাদের চোখে পড়ে, চোখের

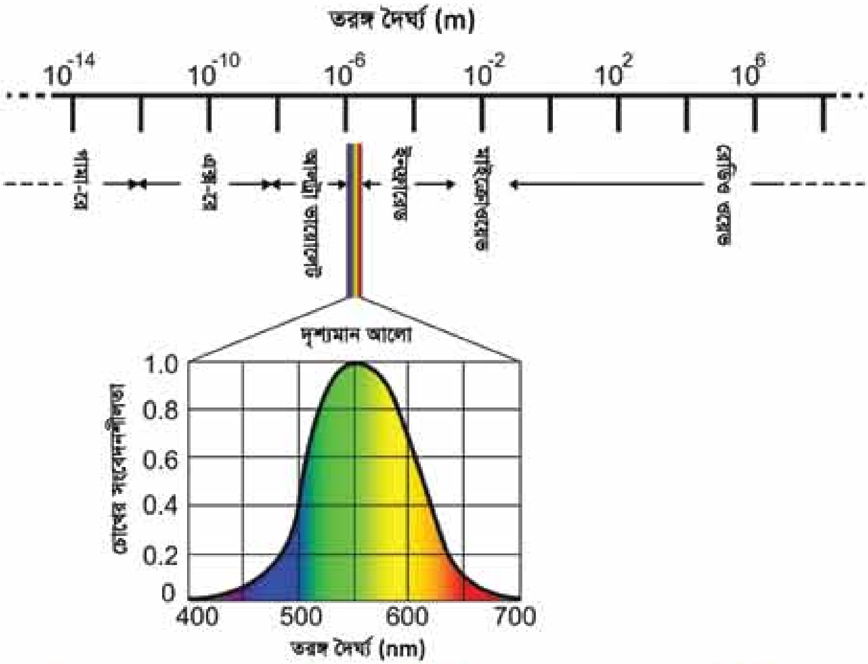

চিত্র 8.01: আলোর স্পেকট্রাম এবং ভিন্ন ভিন্ন রংয়ে চোখের সংবেদনশীলতা।

রেটিনা থেকে সেই আলো দিয়ে তৈরি সংকেত আমাদের মস্তিষ্কে পৌঁছায় আর আমাদের মস্তিষ্ক বুঝতে পারে কোনটা গাছপালা কিংবা কোনটা মানুষ। পুরো ব্যাপারটা শুরু হয় চোখের মাঝে আলো ঢোকা থেকে।

আলো হচ্ছে বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গ। তরঙ্গ হলেই তার একটা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য থাকে, তার মানে আলোরও নিশ্চয়ই তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আছে। আমরা যারা পুকুরে ঢিল ছুড়ে কিংবা একটা দড়িতে ঝাঁকুনি দিয়ে তরঙ্গ তৈরি করেছি, তারা জানি যে ইচ্ছে করলেই ছোট-বড় তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ তৈরি করা যায়, তাই আলোরও নিশ্চয়ই নানা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য থাকতে পারে। কথাটা সঠিক, বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গের দৈর্ঘ্য যা কিছু হতে পারে। সেটা কয়েক কিলোমিটার থেকেও বেশি হতে পারে আবার এক

২০২৩

মিটারের ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ভাগের এক ভাগও হতে পারে। যে বিষয়টা আমাদের ভালো করে জানা দরকার, সেটি হচ্ছে এই সম্ভাব্য বিশাল তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ছোট একটা অংশ আমরা দেখতে পাই, তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এর থেকে বেশি হলেও আমরা দেখতে পাই না আবার এর থেকে ছোট হলেও আমরা দেখতে পাই না। তরঙ্গ দৈর্ঘ্য 400 nm থেকে 700 nm এর ভেতরে হলে আমরা বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গ দেখতে পাই এবং সেটাকে আমরা বলি আলো। আমরা যে চোখে নানা রং দেখতে পাই সেগুলোও আসলে বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো। তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যখন ছোট হয় সেটা হয় বেগুনি। যখন তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বাড়তে থাকে তখন সেটা নীল সবুজ হলুদ কমলা লাল হয়ে চোখের কাছে অদৃশ্য হয়ে যায়। মানুষের চোখ এই ব্যাপ্তির বাইরে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য দেখতে পার না—কিন্তু পোকামাকড় বা অন্য অনেক প্রাণী এর বাইরেও দেখতে পায়। বিভিন্ন আলোতে মানুষের চোখের সংবেদনশীলতা ৪.01 চিত্রতে দেখানো হয়েছে।

নিজে করো

তোমরা নিশ্চয়ই কম্পিউটারে কিংবা সিডি প্লেয়ারে ব্যবহার করার সিডি দেখেছ। এরকম একটি সিডি সূর্যের আলোতে ধরে আলোটিকে কাছাকাছি দেয়ালে প্রতিফলিত করো। তুমি সেখানে সূর্যের আলোর পুরো স্পেকট্রামটি দেখতে পারবে। সিডিতে আসলে খুবই সূক্ষ্ম খাঁজ কাটা থাকে, এই খাঁজগুলো গ্রেটিং হিসেবে কাজ করে, যেটি রংগুলোকে বিভক্ত করে দেয়।

৪.01 চিত্রে আলোর বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের নাম দেখানো হয়েছে। তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যদি দৃশ্যমান আলোর সবচেয়ে ছোট তরঙ্গ দৈর্ঘ্য থেকেও ছোট হয়, সেটাকে আমরা বলি আলট্রা ভায়োলেট আলো, আরো ছোট হলে এক্স-রে আরো ছোট হলে গামা রে—যেটা তেজস্ক্রিয় নিউক্লিয়াস থেকে বের হয়। আবার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যদি দৃশ্যমান আলোর সবচেয়ে বড় তরঙ্গ দৈর্ঘ্য থেকেও বড় হয়, সেটাকে আমরা বলি ইনফ্রারেড, আরো বড় হলে মাইক্রোওয়েভ, আরো বড় হলে রেডিও ওয়েভ। পদার্থবিজ্ঞান শিখতে হলে যে বিষয়গুলো জানতে হয়, বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গের এই বিভাজনটি হচ্ছে তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়।

নিজে করো

ইনফ্রারেড আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বেশি বলে আমরা খালি চোখে দেখতে পাই না। টেলিভিশনের রিমোট কন্ট্রোল করার ইউনিট থেকে ইনফ্রারেড আলো বের হয় বলে আমরা সেখান থেকে আলো বের হতে দেখি না। এটিকে মোবাইলের ক্যামেরা দিয়ে দেখতে পারো কারণ মোবাইলের ক্যামেরায় ছবি তোলার জন্য সিসিডি নামে যে আলোক সংবেদনশীল আইসি ব্যবহার করা হয় সেগুলো দৃশ্যমান আলোর সাথে সাথে খানিকটা ইনফ্রারেড আলো দেখতে পায়।

তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আমরা আমাদের চোখে যে আলো দেখতে পাই তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য খুবই ছোট কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানের অনেক চমকপ্রদ পরীক্ষা আছে, যেগুলো দিয়ে আমরা এই তরঙ্গের নানা চমকপ্রদ এক্সপেরিমেন্ট করতে পারি।

আলো সম্পর্কে আমরা যদি জানতে চাই তাহলে শুরু করতে পারি প্রতিফলন দিয়ে।

8.2 প্রতিফলন (Reflection)

প্রতিফলন কথাটা বলতেই আমাদের প্রায় সবার চোখেই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে থাকার চিত্রটা ভেসে ওঠে কিন্তু মনে রাখতে হবে প্রতিফলন বিষয়টা আরো অনেক ব্যাপক। যখনই এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে আলোকে পাঠানো হয়, তখনই আসলে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ঘটনা ঘটে, তার একটি হচ্ছে প্রতিফলন। অন্য দুটি হচ্ছে প্রতিসরণ আর শোষণ। (চিত্র 8.02)

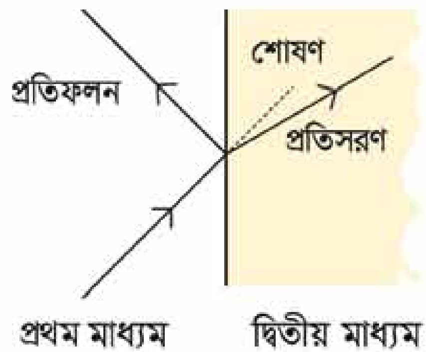

চিত্র 8.02: এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে আলোর প্রতিফলন, প্রতিসরণ ও শোষণ।

প্রথম মাধ্যম থেকে দ্বিতীয় মাধ্যমে যাবার সময় খানিকটা আলো আবার প্রথম মাধ্যমেই ফিরে আসে সেটার নাম হচ্ছে প্রতিফলন। খানিকটা আলো দ্বিতীয় মাধ্যমে ঢুকে যেতে পারে সেটা হচ্ছে প্রতিসরণ। আবার খানিকটা আলো শোষিত হয়ে যায় সেটার নাম হচ্ছে শোষণ। এই অধ্যায়ে আমরা প্রতিফলন এবং পরের অধ্যায়ে প্রতিসরণ নিয়ে আলোচনা করব।

আগেই বলা হয়েছে আলো এক ধরনের তরঙ্গ, সাধারণভাবে তরঙ্গের যাওয়ার জন্য মাধ্যমের প্রয়োজন হয়, (পানি না থাকলে পানির ঢেউটা হবে কোথায়?) কিন্তু আলোর বিষয়টা সম্পূর্ণ ভিন্ন, এটা যেহেতু বিদ্যুৎ এবং চৌম্বক ক্ষেত্রের তরঙ্গ, তাই এটার জন্য কোনো মাধ্যমের দরকার নেই, আলো তার বিদ্যুৎ আর চৌম্বক ক্ষেত্র দুটির তরঙ্গ তৈরি করে নিজেরাই চলে যেতে পারে। কাজেই প্রতিফলন বা প্রতিসরণ ব্যাখ্যা করার জন্য যখন প্রথম এবং দ্বিতীয় মাধ্যমের কথা বলা হয়েছে, তখন একটি মাধ্যম আসলে শূন্য মাধ্যমও হতে পারত। সত্যি কথা বলতে কি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা কাচ বা পানিতে আলোর প্রতিফলন এবং প্রতিসরণের যে উদাহরণগুলো দেখি সেখানে একটা মাধ্যম বাতাস অন্যটি কাচ (কিংবা পানি)। বাতাস এত হালকা মাধ্যম যে সেটাকে শূন্য মাধ্যম ধরে নিলে এমন কিছু বড় ভুল হয় না।

৪.2.1 প্রতিফলনের সূত্র

প্রতিফলনের সূত্র বোঝার আগে আমাদের কয়েকটা বিষয়কে সংজ্ঞায়িত করে নেওয়া দরকার। যখন এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে আলো এসে পড়ে আমরা আপাতত ধরে নিই সেটি হচ্ছে একটা সমতল। বিষয়টি বোঝার জন্য আমরা ধরে নিই যে আলোটা প্রতিফলিত হবে, সেটা একটা আলোক রেখা বা আলোক রশ্মি। যখন একটা আলোক রশ্মি এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমের ওপর একটা বিন্দুতে এসে পড়ে প্রথমেই সেই বিন্দু থেকে একটা লম্ব কল্পনা করে নিতে হবে। যে আলোক রশ্মিটি এসে সেই বিন্দুটিতে পড়েছে এবং যে লম্বটি কল্পনা করেছ সেই দুটি রেখাকে নিয়ে একটি সমতল কল্পনা করে নাও। (চিত্র ৪.03)

যে রশ্মিটি প্রথম মাধ্যম থেকে দ্বিতীয় মাধ্যমে ঢোকার জন্য একটা বিন্দুতে আপতিত হয়েছে আমরা সেটাকে বলব, আপাতন রশ্মি (XO)। যে রশ্মিটি প্রতিফলিত হয়েছে (OX') সেটা হচ্ছে প্রতিফলিত রশ্মি (বোঝাই যাচ্ছে যেটা দ্বিতীয় মাধ্যমে ঢুকে যাবে সেটা প্রতিসরিত রশ্মি—এই অধ্যায়ে সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব না।) আপতিত রশ্মি লম্বের সাথে যে কোণ করবে, সেটাকে বলব আপাতন কোণ (θ_i), প্রতিফলিত রশ্মি লম্বের সাথে যে কোণ (θ_r) করবে, সেটাকে বলব প্রতিফলন কোণ। এখন আমরা প্রতিফলনের সূত্র দুটি বলতে পারি:

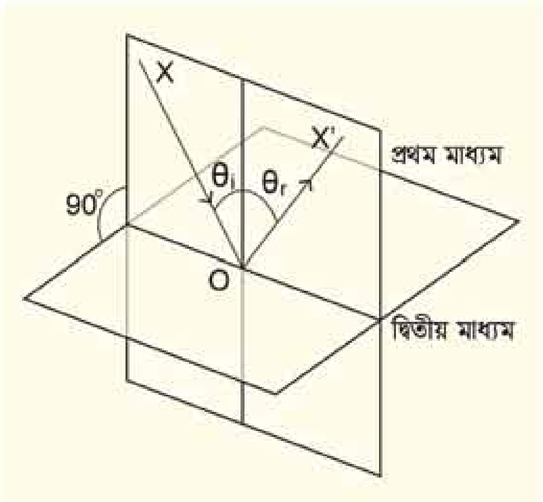

চিত্র ৪.03: প্রথম মাধ্যম থেকে দ্বিতীয় মাধ্যমে আলোর প্রতিফলন।

প্রথম সূত্র: আপাতন রশ্মি এবং লম্ব নিয়ে আমরা যে সমতলটি কল্পনা করে নিয়েছিলাম প্রতিফলিত রশ্মিটি সেই সমতলেই থাকবে।

দ্বিতীয় সূত্র: প্রতিফলন কোণটি হবে আপাতন কোণের সমান।

উদাহরণ

প্রশ্ন: ৪.04 চিত্রে দেখানো অবস্থায় দুটি আয়না রাখা আছে। মাঝখানে x বিন্দুতে একটি মোমবাতি রাখা হয়েছে। মোমবাতির প্রতিবিম্ব কোথায় হবে?

উত্তর: আয়নায় প্রতিবিম্ব দেখা যাবে। সেই প্রতিবিম্বের প্রতিবিম্বটিও আয়না দুটিতে দেখা যাবে, এভাবে চলতেই থাকবে। কাজেই ৪.04 চিত্রে যেভাবে দেখানো হয়েছে, সেভাবে অসংখ্য প্রতিবিম্ব দেখা যাবে।

চিত্র ৪.04: দুটি সমান্তরাল আয়নার মাঝখানে একটি মোমবাতি x রাখা হলে তার প্রতিবিম্ব x' এবং x' প্রতিবিম্বের প্রতিবিম্ব x'', x''' ... তৈরি হতে থাকে।

প্রতিফলনের দুটি সূত্র বলা হলেই প্রতিফলন নিয়ে সবকিছু বলা হয়ে যায় না, সত্যি কথা বলতে কি প্রতিফলনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টাই বলা হয়নি, কতটুকু প্রতিফলন হবে? প্রতিফলনের জন্য যদি আয়না ব্যবহার করা হয় তাহলে প্রায় পুরোটাই প্রতিফলিত হয়, কিন্তু প্রতিফলন কথাটি তো শুধু আয়নার জন্য তৈরি করা হয়নি—এটা তো যেকোনো দুটো মাধ্যমের মাঝে হতে পারে। কতটুকু প্রতিফলন হবে সেটার জন্য সূত্রটির নাম ফ্রেনেলের (Fresnel) সূত্র। সূত্রটা তোমরা আরেকটু বড় হয়ে শিখবে, এখন এটার মূল বিষয়টা জেনে শুধু রাখো—আপাতন কোণ যত বেশি হবে প্রতিফলনও হবে তত বেশি (চিত্র ৪.05)। তোমরা দেখেছ সাধারণ এক টুকরো কাচে প্রতিফলন হয় কম, মাত্র 4% থেকে 5%, বাকিটা ভেতরে দিয়ে প্রতিসরিত হয়ে যায়। কিন্তু প্রতিফলন কোণ যদি বেশি হয় ৪0° কিংবা 90° এর কাছাকাছি, তাহলে প্রতিফলিত আলো অনেক বেশি বেড়ে যায়। জানালার কাচের পাশে দাঁড়িয়ে তোমরা এখনই সেটা পরীক্ষা করে দেখতে পারো।

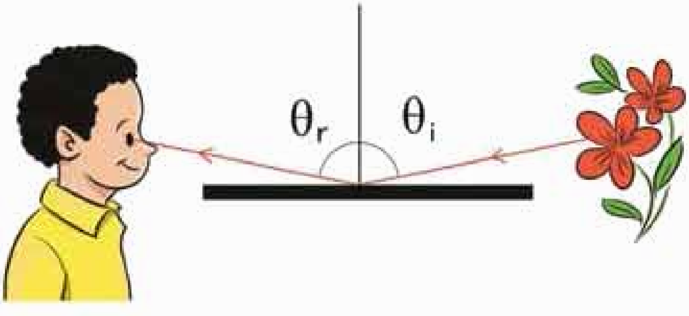

চিত্র ৪.05: আপাতন কোণ বেশি হলে প্রতিফলন অনেক বেশি হয়।

শোষণ

আমাদের চারপাশের জগতের সৌন্দর্যের বড় একটা অংশ আসে বিভিন্ন রং থেকে। কিন্তু রংটি আসে কেমন করে? আমরা যখন সবুজ পাতার মাঝে একটা লাল গোলাপ ফুল দেখি, সেটি কেন লাল কিংবা তার পাতাটি কেন সবুজ? বিষয়টা আরো বিস্ময়কর মনে হতে পারে যখন তোমরা দেখবে সবুজ আলোতে লাল ফুলটাকেই দেখাবে কুচকুচে কালো কিংবা লাল আলোতে সবুজ পাতাকে দেখাবে কুচকুচে কালো।

বিষয়টা আসলে সহজ, সাধারণ আলোতে (অনেক সময় বলে সাদা আলো), আসলে সবগুলো তরঙ্গ দৈর্ঘ্যই থাকে, রং যেহেতু তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ওপর নির্ভর করে, তাই বলা যেতে পারে সেখানে সব রঙের আলো রয়েছে। যখন সবগুলো রং থাকে তখন সেখানে আলাদাভাবে কোনো রং দেখা যায় না—তখন আলোটাকে আমরা বলি বর্ণহীন কিংবা সাদা আলো। এই আলোটা যখন একটা লাল গোলাপ ফুলে পড়ে তখন গোলাপ ফুলটা লাল রং ছাড়া অন্য সবগুলো রং শোষণ করে নেয়—তাই যে আলোটা প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে পড়ে, সেখানে লাল ছাড়া আর কোনো রং থাকে না এবং গোলাপ ফুলটাকে মনে হয় লাল। ঠিক সে রকম সবুজ পাতাটাতে সব রং এসে পড়ে এবং পাতাটা সবুজ ছাড়া অন্য সব রং শোষণ করে নেয়, তখন যে রংটা প্রতিফলিত হয় সেটাতে সবুজ ছাড়া অন্য কোনো রঙের আলো থাকে না বলে পাতাটাকে দেখায় সবুজ। (চিত্র ৪.০৬)

চিত্র ৪.০৬: একটা বস্তু সব রং শোষণ করে যেটা প্রতিফলিত করে সেটাকেই তার রং বলে মনে হয়।

যদি সম্পূর্ণ লাল আলোতে এই গোলাপ ফুল এবং পাতাটাকে দেখা হতো তাহলে ফুলটাকে ঠিকই লাল দেখা যেত কারণ এটা লাল রং শোষণ করে না কিন্তু পাতাটাকে তার সঠিক রঙে না দেখিয়ে দেখাবে কালো। কারণ পাতাটা লাল রংকে শোষণ করে ফেলবে এবং কোনো রং প্রতিফলিত করবে না। ঠিক একই কারণে সবুজ আলোতে পাতাটা সবুজ দেখালেও সেই রংটা গোলাপ ফুল পুরোপুরি শোষণ করে নেবে বলে গোলাপ ফুল থেকে প্রতিফলিত হবার মতো কোনো রং থাকবে না বলে সেটাকে দেখাবে কালো।

8.2.2 মসৃণ এবং অমসৃণ পৃষ্ঠে প্রতিফলন

আয়না কিংবা আয়নার মতো মসৃণ পৃষ্ঠে আলোর সমান্তরাল রশ্মিগুলো প্রতিফলনের পরেও সমান্তরাল থাকে, কারণ প্রত্যেকটা রশ্মিই প্রতিফলনের সূত্র মেনে আপাতন কোণের সমান প্রতিফলন কোণে প্রতিফলিত হয়। পৃষ্ঠটি যদি মসৃণ না হয় তাহলেও প্রত্যেকটা রশ্মিই প্রতিফলনের সূত্র মেনে চলে কিন্তু একেক অংশের পৃষ্ঠ একেক কোণে থাকে বলে প্রতিফলনের পর আলোক রশ্মিগুলো ভিন্ন ভিন্ন কোণে প্রতিফলিত হয়। তখন প্রতিফলনের পর আর আলোক রশ্মিগুলো সমান্তরাল না থেকে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। (চিত্র 8.07) এ ধরনের প্রতিফলনকে অনেক সময় ব্যাপ্ত প্রতিফলন বলা হয়।

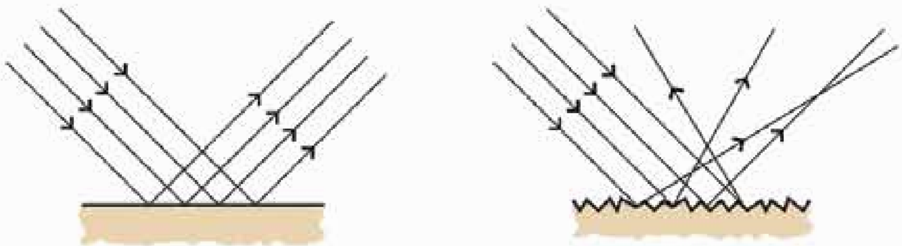

চিত্র 8.07: মসৃণ পৃষ্ঠে আলো প্রতিফলিত হয় কিন্তু অমসৃণ পৃষ্ঠে আলো বিচ্ছুরিত হয়।

8.3 আয়না অথবা দর্পণ (Mirror)

আমরা সবাই আয়না (দর্পণ) দেখেছি। আয়নায় নিয়মিত প্রতিফলনের কারণে স্পষ্ট প্রতিবিম্বের তৈরি হয়। আয়না তৈরি করার জন্য কাচের পেছনে প্রতিফলনের উপযোগী রুপার প্রলেপ দেওয়া হয়। কাচের সামনের পৃষ্ঠ থেকে 4% আলো প্রতিফলিত হলেও পেছনের পৃষ্ঠ থেকে পুরো আলো প্রতিফলিত হয় বলে সেটি মূল প্রতিবিম্বটি তৈরি করে। টেলিস্কোপ বা অন্য অপটিক্যাল (Optical) যন্ত্রে যখন মূল প্রতিবিম্বটি খুব গুরুত্বপূর্ণ হয় তখন কাচের উপরেই রুপা বা অ্যালুমিনিয়ামের প্রলেপ দেওয়া হয় যেন একটি 4% হালকা আরেকটি 96% স্পষ্ট, এ রকম দুটি প্রতিবিম্ব তৈরি না হয়ে একটা 100% স্পষ্ট প্রতিবিম্ব তৈরি হয়।

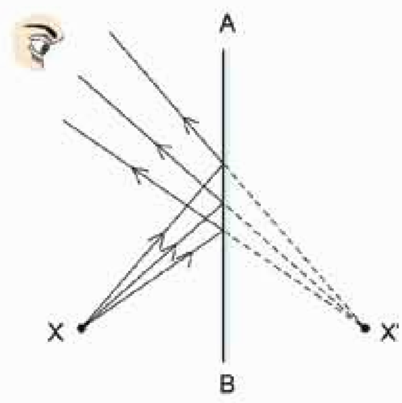

চিত্র 8.08: X বস্তুটির প্রতিবিম্ব X' অবস্থানে দেখা যাবে।

4.3.1 প্রতিবিম্ব

তুমি যখন আয়নার সামনে দাঁড়াও তখন তুমি নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে পাও, তুমি আয়নার যতটুকু সামনে আছ, তোমার মনে হবে প্রতিবিম্বটি বুঝি ঠিক ততটুকু পেছনে আছে। ৪.০৪ চিত্রে দেখানো হয়েছে X হচ্ছে একটি বস্তু সেখান থেকে তিনটি রশ্মি AB আয়নায় প্রতিফলিত হয়েছে (অর্থাৎ আপাতন কোণ = প্রতিফলিত কোণ)। প্রতিফলিত রশ্মিগুলোকে আমরা যদি আয়নার পেছনে বাড়িয়ে দিই তাহলে মনে হবে সবগুলো X' এক বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। এই বিন্দুটিই হচ্ছে X বস্তুটির প্রতিবিম্ব। সত্যিকার বস্তুতে একটা বিন্দু না থেকে অনেকগুলো বিন্দু থাকে এবং প্রতিটা বিন্দুর একটা করে প্রতিবিম্ব হয়ে পুরো বস্তুটির প্রতিবিম্ব তৈরি হয়।

আমরা যদি জ্যামিতি ব্যবহার করে প্রতিবিম্বটির অবস্থান দেখাতে চাই তাহলে কমপক্ষে দুটি রশ্মি আঁকতে হবে। চিত্রটা আঁকা অনেক সহজ হয় যদি আমরা সোজা লম্বভাবে যাওয়া রশ্মিটিকে (XP) একটি রশ্মি হিসেবে নিই এবং চিত্রে যেভাবে দেখানো হয়েছে সেভাবে তার সাথে অন্য যেকোনো একটা রশ্মিকে (XO) নিই। OPX এবং OPX' ত্রিভুজ দুটি সর্বসম। অর্থাৎ XP = X'P তার মানে X বিন্দুর X' প্রতিবিম্বটি আয়না থেকে বস্তুটির সমান দূরত্বে তৈরি হয়েছে।

উদাহরণ

প্রশ্ন: ৪.০৭ দেখাও OPX এবং OPX' ত্রিভুজ দুটি সর্বসম।

উত্তর: এখানে ∠XPO = ∠X'PO কারণ দুটিই এক সমকোণ যেহেতু XP হচ্ছে আয়নার পৃষ্ঠে আঁকা লম্ব। প্রতিফলনের নিয়ম অনুযায়ী আপাতন কোণ প্রতিফলন কোণের সমান কাজেই ∠XOP = ∠ROA আবার ∠ROA = ∠X'OP কাজেই ত্রিভুজ OPX এবং OPX' এর মাঝে OP সাধারণ বাহু এবং এই বাহুর দুই দিকের কোণ দুটি সমান। OPX এবং OPX' ত্রিভুজ দুটি সর্বসম, তাই XP = X'P

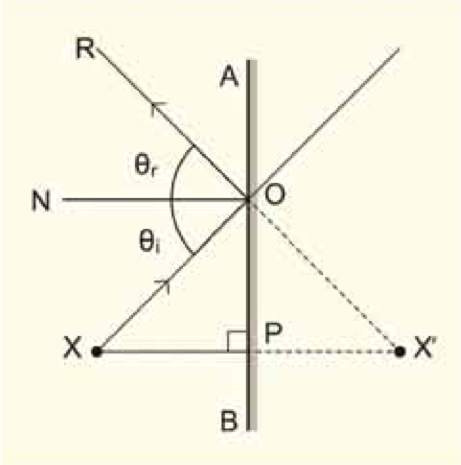

চিত্র ৪.০৭: X অবস্থানের বস্তুটির প্রতিবিম্ব দেখার জন্য XP এবং XO এই দুটি আলোক রশ্মি ব্যবহার করাই যথেষ্ট।

কোনো আয়নায় আমরা যদি একটি বস্তুর প্রতিবিম্ব দেখি সেটিকে যথেষ্ট বাস্তব মনে হলেও আসলে সেটি বাস্তব নয়। কারণ যেখান থেকে আলো আসছে বলে মনে হয় সেখান থেকে কোনো আলো

আসছে না। আমরা পরে দেখব অনেক সময় কিন্তু সত্যি সত্যি এমনভাবে একটা প্রতিবিম্ব তৈরি হয়, যেখানে সত্যি সত্যি আলো কেন্দ্রীভূত হয় এবং সেখান থেকে আলোক রশ্মি বের হয়ে আসে। এ রকম প্রতিবিম্বকে বলে বাস্তব প্রতিবিম্ব এবং এই ধরনের প্রতিবিম্ব দিয়ে অনেক কাজ করা সম্ভব। আয়নায় যে প্রতিবিম্ব তৈরি হয়, সেখানে সত্যিকারের আলো কেন্দ্রীভূত হয় না, তাই এর নাম অবাস্তব প্রতিবিম্ব।

8.10 চিত্রে একটি মাত্র বিন্দু না হয়ে একটা বিস্তৃত বস্তুর প্রতিবিম্ব কীভাবে তৈরি হয় দেখানো হয়েছে। X এবং Y বিন্দু থেকে আলো আয়নায় প্রতিফলিত হয়ে যথাক্রমে X' এবং Y' এ অবাস্তব প্রতিবিম্ব তৈরি করেছে অর্থাৎ মনে হচ্ছে চোখে আলোক রশ্মি আসছে X' এবং Y' থেকে। দেখাই যাচ্ছে XY এর যে দৈর্ঘ্য X'Y' এর সেই একই দৈর্ঘ্য। XY তে তীরের মাথাটি যদি উপরের দিকে হয় তাহলে X'Y' তেও তীরের মাথাটি উপরের দিকে হবে। অর্থাৎ সাধারণ আয়নায় কিংবা দর্পণে প্রতিবিম্ব:

(a) আয়না থেকে সমদূরত্বে
(b) অবাস্তব
(c) সোজা এবং
(d) সমান দৈর্ঘ্যের

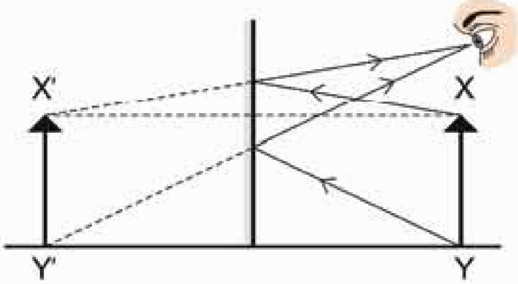

চিত্র 8.10: XY বস্তুটির প্রতিবিম্ব X'Y'

আমরা আলাদা আলাদাভাবে এই বিষয়গুলো মনে করিয়ে দিচ্ছি কারণ একটু পরেই দেখব সাধারণ আয়নার বদলে অন্য ধরনের আয়না ব্যবহার করলে প্রতিবিম্ব ভিন্ন দূরত্বে হতে পারে, বাস্তব হতে পারে, উল্টো হতে পারে এমনকি ছোট কিংবা বড়ও হতে পারে।

নিজে করো

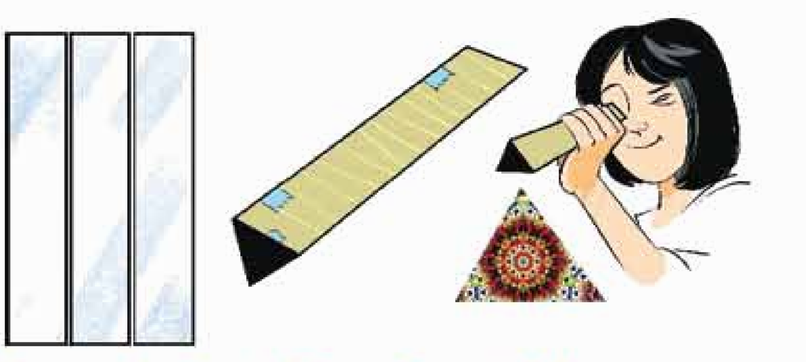
চিত্র 8.11: তিন টুকরা কাচ দিয়ে ক্যালাইডোস্কোপ তৈরি করা যায়।

এক মাপের তিনটি কাচের টুকরো নাও (ছবি ফ্রেমের দোকানে এরকম কাচের টুকরো সহজেই পাওয়া যায়) তিনটি কাচের টুকরো ত্রিভুজাকৃতিভাবে রেখে (চিত্র ৪.11) কাগজ দিয়ে কয়েকবার পেঁচিয়ে নাও এবং আঠা দিয়ে জুড়ে দিয়ে কাচের টুকরোকে ত্রিভুজাকৃতি ভাবে আটকে রাখো। এক পাশে পাতলা কাগজ দিয়ে ঢেকে দাও। এবারে ভেতরে একটা দুটো রঙিন পাথর, পুঁতি, ভাঙা কাচের চুড়ি ইত্যাদি রেখে অন্য পাশ দিয়ে দেখো। তুমি অপূর্ব নকশা দেখতে পাবে। এটাকে ক্যালাইডোস্কোপ (kaleidoscope) বলে। চোখে লাগিয়ে রেখে এটা ঘোরাও তাহলে নকশাটিকে নড়তে দেখবে। কাচ থেকে প্রতিফলনের প্রতিফলন এবং তার প্রতিফলনের কারণে এটা ঘটে। তোমাদের মনে হতে পারে সাধারণ স্বচ্ছ কাচে প্রতিফলন বুঝি হয় খুব কম, কিন্তু ক্যালাইডোস্কোপ কাচ ঘেঁষে দেখা হয় যেখানে আপাতন কোণ অনেক বেশি তাই প্রতিফলনটুকু অনেক বেশি।

উদাহরণ

প্রশ্ন: পূর্ণদৈর্ঘ্য প্রতিবিম্ব দেখার জন্য আয়না কত বড় হতে হয়?

উত্তর: ৪.12 চিত্রের জ্যামিতি থেকে বলা যায় আয়নার দৈর্ঘ্য 0.75 মিটার। মজার ব্যাপার হচ্ছে, তুমি আয়না থেকে 1 মিটার দূরেই থাকো কিংবা 10 মিটার দূরে থাকো তোমার আয়নার দৈর্ঘ্য কিন্তু সব সময়ই হবে তোমার দৈর্ঘ্যের অর্ধেক। তোমার মা-বাবা কিংবা অন্য কেউ যদি সাজগোজ করার পর তাদের কেমন দেখাচ্ছে দেখার জন্য পূর্ণদৈর্ঘ্য আয়না (ফুল লেংথ মিরর) কিনতে যায় তাদের বলো অর্ধদৈর্ঘ্য আয়না কিনলেই কাজ চলে যাবে।

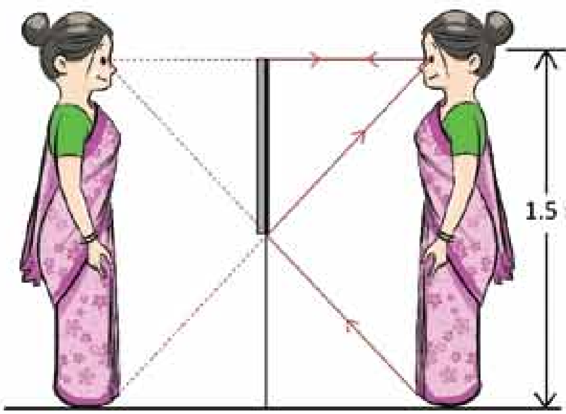

চিত্র ৪.12: পূর্ণদৈর্ঘ্য প্রতিবিম্ব দেখার জন্য পূর্ণদৈর্ঘ্য আয়নার প্রয়োজন হয় না।

প্রশ্ন: দুটি আয়না পরস্পরের সাথে 60° কোণে রাখা আছে (চিত্র ৪.13)। প্রথম আয়নার 60° তে আলো ফেলা হলে আলোক রশ্মি কোন দিকে যাবে?

উত্তর: জ্যামিতি থেকে বলা যায় রশ্মিটি B বিন্দুতে আপতিত হবে এবং ঠিক বিপরীত দিকে প্রতিফলিত হবে।

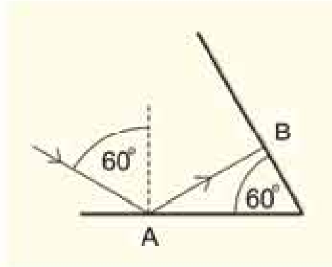

চিত্র ৪.13: 60° কোণে রাখা দুটি আয়নার একটিতে 60° কোণে আপতিত আলো।

একক কাজ

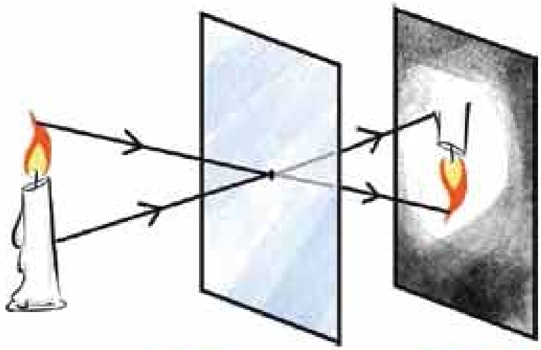

চিত্র ৪.14: সূক্ষ্ম ফুটো দিয়ে কোনো বস্তুর প্রতিবিম্ব তৈরি করা সম্ভব।

একটা অন্ধকার ঘরে একটা বোর্ডের মাঝে খুব ছোট একটা ফুটো করে একটা জ্বলন্ত মোমবাতির সামনে রাখো। ৪.14 চিত্রে দেখানো উপায়ে বোর্ডটার অন্য পাশে একটা সাদা কাগজ রাখো। সাদা কাগজে যদি অন্য কোথাও থেকে আলো পড়তে না দাও তাহলে সেখানে মোমবাতির শিখার একটা প্রতিবিম্ব দেখবে। পেছনের সাদা কাগজটি সামনে-পেছনে সরিয়ে প্রতিবিম্বটি ছোট-বড় করতে পারবে। প্রতিবিম্বটি কি বাস্তব নাকি অবাস্তব? সোজা না উল্টো? সমদূরত্বে না ভিন্ন দূরত্বে? বড় না ছোট?

বুঝতেই পারছ, প্রতিবিম্বটি বাস্তব, উল্টো, সকল দূরত্বে স্পষ্ট এবং যত দূরে তৈরি হয় তত বড়। এই পদ্ধতিতে পিন হোল ক্যামেরা তৈরি হয়।

উদাহরণ

প্রশ্ন: ৪.15 চিত্রে যেভাবে দেখানো হয়েছে, সেভাবে দুটি আয়না AO এবং BO পরস্পরের সাথে লম্বভাবে রাখা আছে। তার সামনে তুমি তোমার বাম হাতটি রেখেছ। হাতটির প্রতিবিম্বগুলো আঁকো।

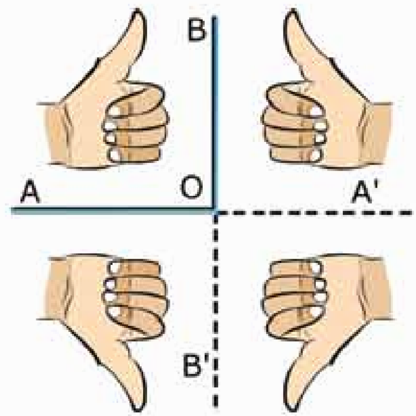

চিত্র ৪.15: সমকোণে রাখা দুটি আয়নার বাম হাতের মুঠির ভিন্ন ভিন্ন প্রতিফলন।

উত্তর: AOB তে তোমার প্রকৃত হাত। A'OB তে তোমার হাতের সামনা-সামনি প্রতিবিম্ব। ঠিক সেরকম AOB' তে তোমার হাতের উপর-নিচ প্রতিবিম্ব। লক্ষ করো, দুই ক্ষেত্রেই বাম হাতের প্রতিবিম্ব ডান হাত হিসেবে এসেছে। A'OB' ক্ষেত্রে প্রতিবিম্বের প্রতিবিম্ব দেখা যাবে। এটি A'OB এর প্রতিবিম্বের উপর-নিচ প্রতিবিম্ব হতে পারে, আবার AOB' এর প্রতিবিম্বের সামনা-সামনি প্রতিবিম্ব হতে পারে। লক্ষ করো একবার প্রতিফলনে বাম হাত ডান হাত হয়ে গিয়েছিল কিন্তু দুইবার প্রতিফলনে (প্রতিফলনের প্রতিফলনে) বাম হাত আবার বাম হাত হিসেবেই এসেছে।

৪.4 গোলীয় আয়না (Spherical Mirror)

সাধারণ সমতল আয়না আমরা সবাই দেখেছি কিন্তু সত্যিকারের গোলীয় আয়না আমরা সবাই নাও দেখতে পারি—তবে গোলীয় আয়নার মূল বিষয়টি কিন্তু চকচকে নতুন চামচে অনেকটা দেখা যায়। গোলীয় আয়না দুই রকমের হয়ে থাকে—অবতল এবং উত্তল। একটা ফাঁপা গোলকের খানিকটা কেটে তার পৃষ্ঠে রুপা বা অ্যালুমিনিয়ামের প্রলেপ লাগিয়ে অবতল কিংবা উত্তল গোলীয় আয়না তৈরি করা যায়। কোন পৃষ্ঠে রুপা বা অ্যালুমিনিয়ামের প্রলেপ দেওয়া হবে তার ওপর নির্ভর করবে এই গোলীয় আয়নাটি অবতল না উত্তল গোলীয় আয়না হবে।

চিত্র ৪.16: একটি চামচের উল্টো পৃষ্ঠ উত্তল গোলীয় আয়নার মতো।

8.5 উত্তল আয়না (Convex Mirror)

তোমরা যদি কখনো একটা চকচকে চামচের নিচের বা পেছনের অংশে নিজের চেহারা দেখার চেষ্টা করে থাকো (চিত্র 8.16) তাহলে নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ যে সেখানে তুমি তোমার চেহারাটা সোজা দেখালেও সেটি হবে তুলনামূলকভাবে ছোট। চামচের এই অংশটা উত্তল আয়নার মতো কাজ করে। সত্যিকারের উত্তল আয়না একটা প্রকৃত গোলকের অংশ হয়। ধরা যাক, গোলকটির ব্যাসার্ধ r (চিত্র 8.17) এবং তার একটা অংশ কেটে তার উত্তল অংশটির দিক থেকে আলোর প্রতিফলনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই আয়নায় একটা সমান্তরাল আলো ফেলা হলে আলোটি চারদিকে ছড়িয়ে যাবে, ছড়িয়ে যাওয়া আলোক রশ্মিগুলো যদি আয়নার কেন্দ্রের দিকে বর্ধিত করি তাহলে মনে হবে সেটা বুঝি একটা বিন্দু থেকে ছড়িয়ে গেছে। ঐ বিন্দুটিকে বলে ফোকাস বিন্দু। উত্তল আয়নার যে পৃষ্ঠ থেকে প্রতিফলন হয় তার কেন্দ্রবিন্দুটিকে বলে মেরু বিন্দু এবং এই বিন্দু থেকে ফোকাস বিন্দুর দূরত্বটিকে বলে ফোকাস দূরত্ব (f)।

একটা গোলীয় আয়নাকে আমরা সব সময়ই একটা গোলকের অংশ হিসেবে কল্পনা করতে পারি। ঐ গোলকটির ব্যাসার্ধ যদি r হয় তাহলে ফোকাস দূরত্ব হবে r/2.

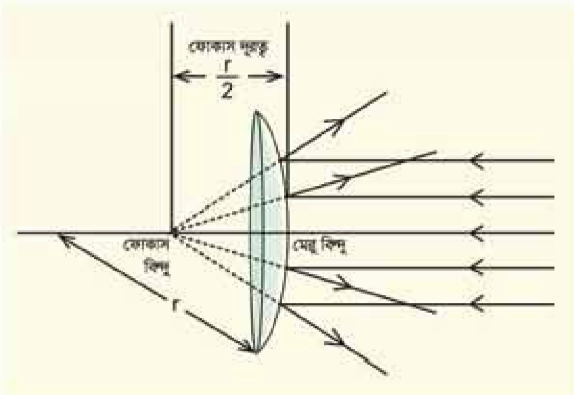

চিত্র 8.17: উত্তল আয়নার ফোকাস দূরত্ব গোলকের ব্যাসার্ধের অর্ধেক।

উদাহরণ

প্রশ্ন: প্রমাণ করো $f = r/2$

উত্তর: মজার ব্যাপার হচ্ছে, তুমি কিন্তু এটা পুরোপুরি প্রমাণ করতে পারবে না, শুধু এর কাছাকাছি প্রমাণ করতে পারবে। ধরা যাক গোলীয় আয়নার মূল অক্ষের সাথে সমান্তরাল দুটি রশ্মি A এবং B

থেকে X (মেরু বিন্দু) বিন্দুতে এবং অন্য একটি Y বিন্দুতে এসেছে (চিত্র ৪.18)। যে রশ্মিটি X বিন্দুতে এসেছে সেটি প্রতিফলিত হয়ে যেদিকে এসেছে ঠিক সেদিকেই ফিরে যাবে। আমরা এই রেখাটিকে গোলকের কেন্দ্র O বিন্দু পর্যন্ত বর্ধিত করি, দেখাই যাচ্ছে OX = r (গোলকের ব্যাসার্ধ)। B থেকে যে রশ্মিটি Y বিন্দুতে এসেছে সেটি সেই বিন্দুতে লম্ব ON এর সাথে θ_i আপাতন কোণ করেছে। BY রশ্মিটির প্রতিফলন কোণ θ_r এবং সেটি প্রতিফলিত হয়ে YP দিকে যাবে। আমরা FY কে বর্ধিত করলে সেটি OX রেখাকে F বিন্দুতে ছেদ করবে।

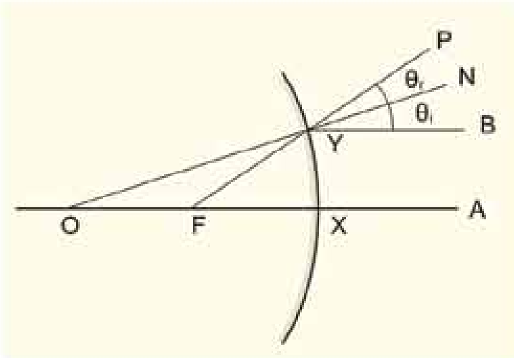

চিত্র ৪.18: একটি গোলীয় উত্তল আয়না আসলে একটা গোলকের অংশ।

FO = FY কারণ OFY ত্রিভুজের ∠FOY = ∠OYF যেহেতু ∠FOY = θ_i এবং ∠FYO = θ_r

FY ≅ FX যখন XY ব্যাসার্ধ r থেকে অনেক ছোট হয় তখন এটি সত্য। বেশির ভাগ উত্তল আয়নায় এটা সত্যি।

কাজেই FO = FY = FX = r/2 অর্থাত ফোকাস দূরত্ব f = r/2

প্রশ্ন: সমতল আয়নাকে যদি আমরা গোলীয় উত্তল আয়না হিসেবে কল্পনা করি তাহলে তার ফোকাস দূরত্ব কত?

উত্তর: অসীম।

আমরা এখন গোলীয় আয়নার জন্য প্রতিবিম্ব কেমন হতে পারে সেটি দেখব। তোমরা দেখবে গোলীয় উত্তল আয়নায় প্রতিবিম্ব সব সময় অবাস্তব কিন্তু গোলীয় অবতল আয়নায় সেটি বাস্তব কিংবা অবাস্তব দুটিই হতে পারে, তবে সেটি নির্ভর করে বস্তুটি কোথায় আছে তার উপর।

৪.5.1 গোলীয় উত্তল আয়নায় প্রতিবিম্ব

আমরা আগেই বলেছি চামচের বাইরের অংশটা গোলীয় উত্তল আয়নার মতো কাজ করে এবং সেখানে তুমি নিজেকে দেখতে চাইলে ছোট এবং সোজা একটা প্রতিবিম্ব দেখতে পাও। যার অর্থ আমরা গোলীয় উত্তল আয়নার প্রতিবিম্বটি সব সময়ই ছোট দেখার কথা।

গোলীয় উত্তল আয়নায় কীভাবে প্রতিবিম্ব তৈরি হয় সেটি বোঝার জন্য আলোক রশ্মি গোলীয় উত্তল আয়নায় কীভাবে প্রতিফলিত হয় সেটি জানতে হবে। সেটি নির্ভর করে আলোক রশ্মি কী কোণে গোলীয় উত্তল আয়নায় এসে পড়ছে তার উপর। আমরা তিনটি বিশেষ আলোক রশ্মির প্রতিফলনের নিয়ম জানলেই কীভাবে প্রতিবিম্ব তৈরি হয় সেটি ব্যাখ্যা করতে পারব:

(i) আলোক রশ্মি কেন্দ্রমুখী হলে (চিত্র 8.19, XN কিংবা YR রশ্মি) সেটি লম্বভাবে প্রতিফলিত হয়ে যেদিক থেকে এসেছে ঠিক সেদিকেই ফিরে যায়।

(ii) প্রধান অক্ষের সমান্তরাল (চিত্র 8.19, XP) রশ্মিটি প্রতিফলনের পর মনে হবে যেন রশ্মিটি (PQ) ফোকাস বিন্দু (F) থেকে ছড়িয়ে যাচ্ছে।

(iii) আলোক রশ্মির দিক পরিবর্তন করা হলে এটি যেদিক থেকে এসেছে ঠিক সেদিক দিয়ে ফিরে যায়। কাজেই কোনো আলোক রশ্মি (চিত্র 8.19, QP) ফোকাস অভিমুখী হলে সেটি প্রধান অক্ষের সাথে সমান্তরাল হয়ে (PX) প্রতিফলিত হবে।

আমরা এখন এই তিনটি নিয়ম ব্যবহার করে প্রতিবিম্ব তৈরি করতে পারব। 8.19 চিত্রে একটা উত্তল আয়নার সামনে XY একটি বস্তু রাখা আছে Y বিন্দু থেকে আলো R বিন্দুতে এলে সেটি লম্বভাবে প্রতিফলিত হয়ে আবার Y বিন্দুর দিকেই ফিরে যায়, যার অর্থ XY বস্তুর Y বিন্দুর প্রতিবিম্বটি এই YO রেখার কোথাও হবে। সেটি ঠিক কোথায় জানতে হলে X বিন্দু থেকে অন্যদিকে আরেকটি রশ্মি আঁকতে হবে, আমাদের সেটি করার প্রয়োজন নেই কারণ X বিন্দুটির প্রতিবিম্বটি বের করে সেখান থেকে আমরা এটি জেনে নেব।

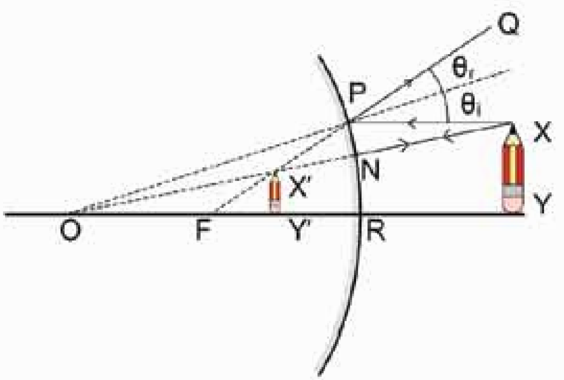

চিত্র 8.19: উত্তল আয়নায় একটি বস্তু XY ফোকাস দূরত্বের ভেতরে রাখা হলে প্রতিবিম্ব X'Y' ছোট দেখায়।

X বিন্দুর প্রতিবিম্ব বের করার জন্য দুটি রশ্মি আঁকতে হবে, একটি আগের মতো সরাসরি O বিন্দুর সাথে যুক্ত করি। YR রশ্মিটি যে রকম লম্বভাবে প্রতিফলিত হয়ে Y এর দিকে ফিরে গিয়েছিল এই রশ্মিটিও ঠিক একইভাবে N বিন্দুতে প্রতিফলিত হয়ে X এর দিকে ফিরে যাবে। দ্বিতীয় রশ্মিটি YR এর সাথে সমান্তরালভাবে আঁকা যেতে পারে, সেটা উত্তল আয়নার P বিন্দুতে স্পর্শ করলে মনে হবে যেন F বিন্দু থেকে ছড়িয়ে যাচ্ছে কাজেই আমরা FP কে যুক্ত করে Q এর দিকে বাড়িয়ে দিতে পারি।

FP রেখাটা OX রেখাকে X' বিন্দুতে ছেদ করেছে, যার অর্থ X বিন্দুর প্রতিবিম্বটি হবে X' বিন্দুতে। X' থেকে OY রেখার ওপর লম্ব টানলে সেটা Y' বিন্দুতে ছেদ করবে। যেহেতু আমাদের মনে হবে X বিন্দুর প্রতিফলনটি আসছে X' বিন্দু থেকে সে কারণে আমাদের মনে হবে Y বিন্দুর প্রতিফলনটি আসছে Y' বিন্দু থেকে। কাজেই X'Y' হবে XY এর প্রতিবিম্ব।

দেখাই যাচ্ছে X'Y' সব সময় XY থেকে ছোট এবং XY উত্তল আয়না থেকে যত দূরে থাকবে X'Y' হবে তত ছোট। প্রতিফলনের নিয়ম ব্যবহার করে উত্তল কিংবা অবতল আয়নায় প্রতিবিম্ব আঁকার এই পদ্ধতিটি ভালো করে জেনে রাখা দরকার, এটি পদার্থবিজ্ঞানের খুব প্রয়োজনীয় একটা পদ্ধতি।

বোঝাই যাচ্ছে X'Y' থেকে আসলে সত্যিকারের আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে না, আমাদের শুধু মনে হচ্ছে বুঝি প্রতিবিম্বটি এখানে আছে। কাজেই এটা অবাস্তব প্রতিবিম্ব। সাধারণ আয়নার প্রতিবিম্বের সাথে তুলনা করে আমরা বলতে পারি

(a) এই প্রতিবিম্বটির অবস্থান হবে ফোকাস বিন্দু এবং মেরু বিন্দুর মাঝখানে। বস্তুটি যত দূরে থাকবে প্রতিবিম্বটি ফোকাস বিন্দুর তত কাছে তৈরি হবে।
(b) এই প্রতিবিম্বটি অবাস্তব
(c) এটি সোজা
(d) এটা ছোট, বস্তুটি আয়না থেকে যত দূরে যাবে প্রতিবিম্বটি তত ছোট হতে থাকবে।

8.6 অবতল গোলীয় আয়না (Concave Mirror)

একটা চকচকে চামচের ভেতরের অংশটা অবতল গোলীয় আয়নার উদাহরণ হতে পারে। তোমরা যারা চামচের ভেতরের দিকে তাকিয়েছ তারা নিশ্চয়ই লক্ষ (চিত্র 8.20) করেছ সেখানে তোমার প্রতিবিম্বটি ছোট এবং সবচেয়ে চমকপ্রদ হচ্ছে যে প্রতিবিম্বটি উল্টো। তোমরা চাইলে তোমার আঙুল চামচটার খুব কাছে এনে দেখতে পারো, তখন দেখবে আঙুলটা সোজাই দেখাচ্ছে। এবারে আস্তে আস্তে দূরে সরাতে থাক, দেখবে তোমার আঙুলটা বড় দেখাতে শুরু করেছে (আমরা সমতল আয়না কিংবা উত্তল আয়নায় এর আগে প্রতিবিম্ব তৈরি করতে পেরেছি কিন্তু কখনোই বস্তুর প্রকৃত আকার থেকে বড় প্রতিবিম্ব তৈরি করতে পারিনি—এই প্রথম বড় প্রতিবিম্ব দেখতে

চিত্র 8.20: একটি চামচের ভেতরের অংশ অবতল গোলীয় আয়নার মতো কাজ করে।

পাচ্ছি। আঙুলটা যদি আস্তে আস্তে সরাতে থাকো একসময় অবাক হয়ে দেখবে আঙুলের প্রতিবিম্বটা উল্টো হয়ে গেছে। এটাকে এখন যতই সরিয়ে নাও, এটা এখন সব সময় উল্টোই থেকে যাবে। (সমতল আয়না কিংবা উত্তল আয়না দিয়ে আমরা এর আগে কখনোই উল্টো প্রতিবিম্ব তৈরি করতে পারিনি—এই প্রথম আমরা উল্টো প্রতিবিম্ব দেখছি।)

কাজেই দেখতে পাচ্ছ চামচের বাইরের অংশটা উত্তল আয়নার মতো এবং ভেতরের অংশটা অবতল আয়নার মতো কাজ করে। সত্যিকারের অবতল আয়না আসলে একটা গোলকের অংশ। উত্তল আয়নার বেলায় বাইরের উত্তল অংশ থেকে আলো প্রতিফলিত হতো, অবতল আয়নার বেলায় আলো ভেতরের অবতল অংশ থেকে প্রতিফলিত হবে।

একটি অবতল আয়নায় সমান্তরাল আলো ফেলা হলে আলোর রশ্মিগুলো প্রতিফলনের পর এক বিন্দুতে মিলিত হবে (চিত্র ৪.21)। বুঝতেই পারছ এই বিন্দুটি অবতল আয়নার ফোকাস বিন্দু এবং মেরু বিন্দু থেকে এই বিন্দু পর্যন্ত দূরত্বটা হচ্ছে ফোকাস দূরত্ব। আলোর রশ্মির তো আর থেমে থাকার উপায় নেই কাজেই এক বিন্দুতে মিলিত হবার পরও সেটা সোজা সামনের দিকে এগোতে থাকবে এবং দেখা যাবে সেই বিন্দু থেকে আলোগুলো ছড়িয়ে পড়ছে। অর্থাৎ ফোকাস বিন্দুতে পৌঁছানোর আগে আলো একত্র হতে থাকে (অভিসারী) ফোকাস বিন্দুতে পৌঁছানোর পর আলো ছড়িয়ে যেতে থাকে (অপসারী)।

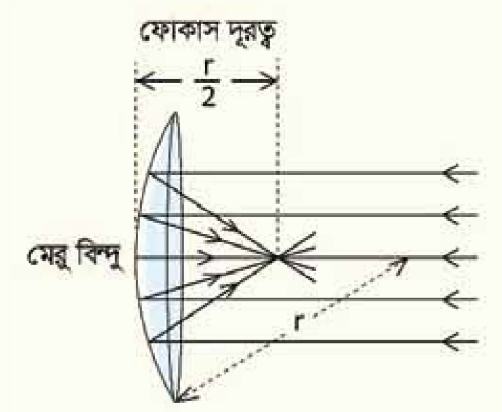

চিত্র ৪.21: অবতল আয়নার ফোকাস দূরত্ব গোলকের ব্যাসার্ধের অর্ধেক।

উদাহরণ

প্রশ্ন: সমতল আয়নাকে আমরা যদি গোলীয় অবতল আয়না হিসেবে কল্পনা করি তাহলে তার ফোকাস দূরত্ব কত?

উত্তর: অসীম।

উত্তল আয়নার বেলাতেও আমরা একই উত্তর পেয়েছিলাম, যার অর্থ ফোকাস দূরত্ব বাড়তে বাড়তে অসীম হয়ে গেলে উত্তল এবং অবতল আয়না দুটিই সমতল আয়না হয়ে যায়। উত্তল আয়নার মতো

অবতল আয়নাতেও ফোকাস দূরত্ব হচ্ছে ব্যাসার্ধের অর্ধেক। এটি হুবহু প্রমাণ করা যায় না, কাছাকাছি প্রমাণটি এবারে আমরা তোমাদের হাতে ছেড়ে দিলাম।

8.6.1 অবতল আয়নায় প্রতিবিম্ব

এবারে এসেছি আমরা সবচেয়ে মজার অংশটুকুতে। সমতল আয়না এবং উত্তল আয়নায় শুধু একধরনের প্রতিবিম্ব তৈরি হতো। অবতল আয়নায় দুই ধরনের প্রতিবিম্ব হতে পারে। একটা বস্তু ফোকাস দূরত্ব থেকে কম দূরত্বে রাখলে একধরনের প্রতিবিম্ব তৈরি হয়, ফোকাস দূরত্ব থেকে বেশি দূরত্বে রাখলে অন্য রকম প্রতিবিম্ব তৈরি হয়।

সেটি শুরু করার আগে আমরা আলোক রশ্মি গোলীয় অবতল আয়নায় কীভাবে প্রতিফলিত হয় সেটি জেনে নেই। গোলীয় অবতল আয়নায় তিনটি বিশেষ আলোক রশ্মির প্রতিফলনের নিয়ম জানলেই কীভাবে প্রতিবিম্ব তৈরি হয় সেটি ব্যাখ্যা করতে পারব:

(i) আলোক রশ্মি ব্যাসার্ধ বরাবর বা কেন্দ্র থেকে শুরু হলে (চিত্র 8.22, OP কিংবা ON রশ্মি) সেটি লম্বভাবে প্রতিফলিত হয়ে যেদিক থেকে এসেছে ঠিক সেদিকেই ফিরে যায়।

(ii) প্রধান অক্ষের সমান্তরাল (চিত্র 8.22, XQ) রশ্মিটি প্রতিফলনের পর ফোকাস বিন্দু (F) দিয়ে যাবে (QF)।

(iii) আলোক রশ্মির দিক পরিবর্তন করা হলে এটি যেদিক থেকে এসেছে ঠিক সেদিক দিয়ে ফিরে যায়। কাজেই কোনো আলোক রশ্মি (চিত্র 8.22, FQ) ফোকাস দিয়ে গেলে সেটি প্রধান অক্ষের সাথে সমান্তরাল হয়ে (QX) প্রতিফলিত হবে।

এবারে আমরা অবতল আয়নার জন্য প্রতিবিম্ব তৈরি করতে পারব।

ফোকাস দূরত্ব থেকে কম দূরত্বে

8.22 চিত্রে একটা অবতল আয়না দেখানো হয়েছে, অবতল আয়নাটি যে গোলকের অংশ সেই গোলকের কেন্দ্র হচ্ছে O, অবতল আয়নার ফোকাস বিন্দু F এবং ধরা যাক XY বস্তুটির প্রতিবিম্বটি আমরা বের করতে চাই। Y বিন্দুটি থেকে আলো অবতল আয়নার P বিন্দুতে প্রতিফলিত হয়ে আবার Y হয়ে O বিন্দুর দিকে ফিরে যাবে। কাজেই বোঝা যাচ্ছে এটি OP রেখায় কিংবা তার বর্ধিত অংশের কোনো একটা বিন্দুতে থাকবে, ঠিক কোথায় সেই বিন্দুটি হবে সেটি বের করতে হলে Y বিন্দু থেকে অন্যদিকে আরো একটি রশ্মিকে অবতল আয়নার দিকে আঁকতে হবে, আমরা আর সেটি করছি না, আগের মতো X বিন্দুটির প্রতিবিম্ব বের করতে পারলেই সেখান থেকে Y বিন্দুটির প্রতিবিম্বের সঠিক জায়গাটি বের করা যাবে। X বিন্দুর প্রতিবিম্ব বের করতে হলে এই বিন্দু থেকে দুটি রেখা আঁকতে হবে, বোঝাই যাচ্ছে প্রথম রেখাটি হবে OX রেখার বর্ধিত অংশ, এটা অবতল আয়নাকে লম্বভাবে স্পর্শ করে ঠিক সেই পথেই প্রতিফলিত হয়ে ফিরে যাবে। চিত্রে যেভাবে দেখানো হয়েছে X বিন্দু থেকে

২০২৫

আরেকটা রশ্মি হতে পারে অক্ষের সাথে সমান্তরাল একটা রশ্মি, কারণ আমরা এর মধ্যে জেনে গেছি সমান্তরাল রশ্মি প্রতিফলনের পর ফোকাস বিন্দু দিয়ে যায়। কাজেই এটা Q বিন্দুতে আপতিত হয়ে প্রতিফলিত হয়ে F বিন্দু দিয়ে চলে যাবে।

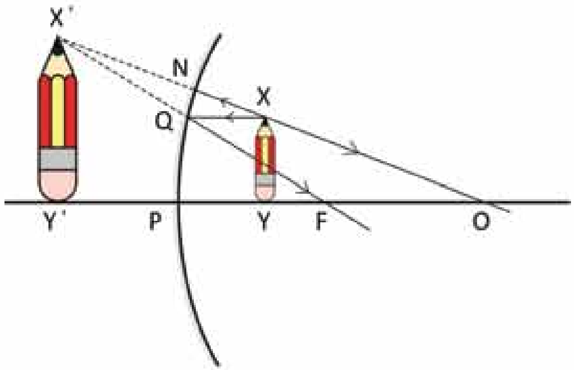

চিত্র ৪.২২: অবতল আয়নায় একটি বস্তু ফোকাস দূরত্বের ভেতরে রাখা হলে প্রতিবিম্বটি বড় দেখায়।

X বিন্দু থেকে বের হওয়া দুটি রশ্মি প্রতিফলনের পর NO এবং QF এর দিকে যাবে এবং দেখাই যাচ্ছে এই রশ্মি দুটো মিলিত হবার কোনো সুযোগ নেই। কাজেই ডান পাশে কোনো প্রতিবিম্ব তৈরি হতে পারবে না। কিন্তু যদি ডান পাশ থেকে বাম পাশে তাকানো যায় তাহলে মনে হবে ON রেখা এবং FQ রেখা দুটি বুঝি X' বিন্দুতে মিলিত হয়েছে—কাজেই X' হবে X এর প্রতিবিম্ব। এই বিন্দু থেকে OP অক্ষের ওপর একটি লম্ব আঁকলেই আমরা XY এর পুরো প্রতিবিম্ব X'Y' পেয়ে যাব। X'Y' থেকে সত্যিকারভাবে কোনো আলো যাচ্ছে না, শুধু আমাদের মনে হচ্ছে এখানে বুঝি প্রতিবিম্বটি তৈরি হয়েছে। কাজেই এই প্রতিবিম্বটি অবাস্তব প্রতিবিম্ব। চিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে প্রতিবিম্বটি মূল বস্তু থেকে বড়। শুধু তা-ই নয় আমরা বস্তুটিকে যতই ফোকাস বিন্দুর কাছে আনব, প্রতিবিম্বটি ততই বড় হবে। (যদি এটাকে ঠিক ফোকাস বিন্দুতে বসানো হয় তাহলে প্রতিফলিত আলোক রশ্মি আসলে সমান্তরাল হয়ে যাবে অর্থাৎ প্রতিবিম্ব তৈরি করার জন্য আলোক রশ্মি আর মিলিত হতে পারবে না।)

এবারে অবতল আয়নায় ফোকাস দূরত্বের ভেতরে কোনো কিছু রাখা হলে তার প্রতিবিম্বটি কেমন হবে সেটি দেখে নেওয়া যাক:

(a) প্রতিবিম্বটির অবস্থান কোথায় হবে সেটি নির্ভর করবে আসল বস্তুটির অবস্থানের ওপর। বস্তুটি যতই ফোকাসের কাছে রাখা হবে প্রতিবিম্বের অবস্থানটি হবে তত দূরে।
(b) এটি অবাস্তব
(c) সোজা
(d) প্রতিবিম্বটির দৈর্ঘ্যও নির্ভর করবে তার অবস্থানের ওপর, যত ফোকাস বিন্দুর কাছে যাবে তার দৈর্ঘ্যও তত বেড়ে যাবে।

ফোকাস দূরত্ব থেকে বেশি দূরত্বে

আমরা এখন পর্যন্ত যত প্রতিবিম্ব দেখেছি তার মাঝে এই প্রতিবিম্বটি সবচেয়ে চমকপ্রদ, কারণ এই প্রথমবার আমরা একটি বাস্তব প্রতিবিম্ব দেখব, অর্থাৎ যেখানে প্রতিবিম্বটি তৈরি হবে, সেখানে সত্যি সত্যি আলো কেন্দ্রীভূত হবে (চিত্র 8.23)।

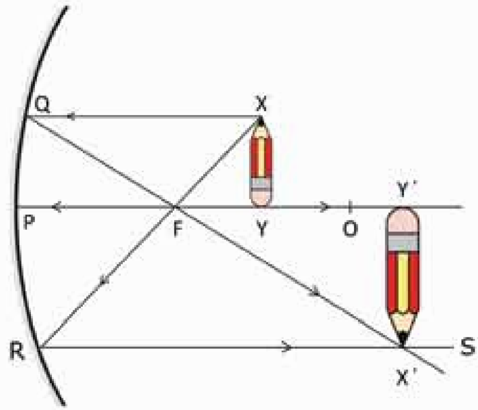

চিত্র 8.23: অবতল আয়নায় একটি বস্তু ফোকাস দূরত্বের বাইরে রাখলে প্রতিবিম্বটি হয় উল্টো।

সত্যিকারের বস্তুটি হচ্ছে XY এবং Y বিন্দুর প্রতিবিম্বটি অন্যবারের মতো নিশ্চয়ই YP রেখার উপরে থাকবে। X বিন্দুটির প্রতিবিম্ব বের করার জন্য আমাদের দুটি রশ্মি আঁকতে হবে। একটি হবে অক্ষের সাথে সমান্তরাল XQ এবং প্রতিফলিত হয়ে এটি নিশ্চয়ই ফোকাস বিন্দু F এর ভেতর দিয়ে QF হিসেবে যাবে। দ্বিতীয় রশ্মিটি আমরা F বিন্দুর ভেতর দিয়ে আঁকতে পারি। এটি অবতল আয়নায় প্রতিফলিত হয়ে RS হিসেবে সমান্তরাল হয়ে যাবে, কারণ সমান্তরাল রেখার আলো অবতল আয়নাতে প্রতিফলিত হয়ে যে রকম ফোকাস বিন্দুর ভেতর দিয়ে যায় ঠিক সে রকম তার উল্টোটাও সত্যি, আলো সব সময়ই তার গতিপথ উল্টো পথে পুরোপুরি অনুসরণ করে। QF এবং RS রেখা দুটি X' বিন্দুতে ছেদ করেছে এবং X' বিন্দুটি হচ্ছে X বিন্দুর প্রতিবিম্ব। কাজেই X' বিন্দু থেকে PO রেখার ওপর লম্বটি Y' বিন্দুতে ছেদ করেছে এবং X'Y' হচ্ছে XY এর প্রতিবিম্ব। দেখতেই পাচ্ছ এই প্রতিবিম্বটি এখন পর্যন্ত দেখা অন্যান্য প্রতিবিম্ব থেকে ভিন্ন।

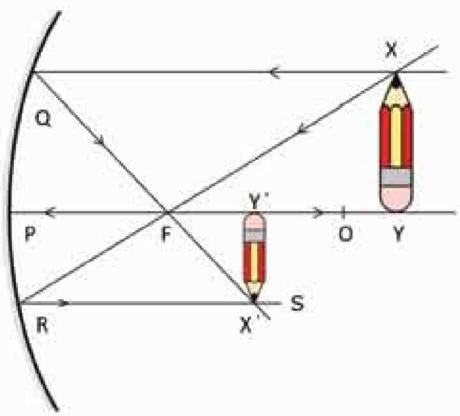

চিত্র 8.24: অবতল আয়নায় একটি বস্তু ফোকাস দূরত্বের দ্বিগুণ দূরত্বের বাইরে রাখলে প্রতিবিম্বটি উল্টো এবং ছোট হয়।

8.24 চিত্রে হুবহু একই বিষয় দেখানো হয়েছে। শুধু XY বস্তুটি ফোকাস দূরত্বের দ্বিগুণ থেকে বেশি দূরত্বে রাখা হয়েছে। এবারে বস্তুটির প্রতিবিম্বটি হয়েছে ছোট। বস্তুটি যদি ঠিক ফোকাস দূরত্বের দ্বিগুণ দূরত্বে রাখা হতো তাহলে তার প্রতিবিম্বটিও হতো এই একই বিন্দুতে, 8.25 চিত্রে যেমন

দেখানো হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, প্রতিবিম্বটির আকার হতো ঠিক বস্তুটির সমান। ফোকাস দূরত্বের বাইরে রাখা এই তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ব্যাপার এবারে গুছিয়ে লেখা যেতে পারে। ফোকাস দূরত্বের বাইরে কোনো বস্তুকে রাখা হলে তার প্রতিবিম্ব হবে এ রকম:

(a) প্রতিবিম্বের অবস্থানটা নির্ভর করবে বস্তুটি কোথায় আছে তার ওপর। যতক্ষণ পর্যন্ত বস্তুটি ফোকাস বিন্দু এবং অবতল আয়নার কেন্দ্রের মাঝখানে আছে প্রতিবিম্বের অবস্থানটা হবে কেন্দ্রের বাইরে। বস্তুটি যদি অবতল আয়নার বক্রতার কেন্দ্র থেকে বাইরে থাকে তাহলে তার প্রতিবিম্ব হবে কেন্দ্রের ভেতরে। যদি বস্তুটি ঠিক কেন্দ্রের ওপর থাকে তাহলে প্রতিবিম্বের অবস্থানটাও হবে কেন্দ্রে।

(b) প্রতিবিম্বটি বাস্তব। তাই বস্তুটাকে দিয়ে তার প্রতিবিম্ব যে রকম বের করতে পারি ঠিক সে রকম প্রতিবিম্বটাকে বস্তু ধরা হলে বস্তুটাই হবে তার প্রতিবিম্ব।

(c) প্রতিবিম্বটি উল্টো।

(d) প্রতিবিম্বটির দৈর্ঘ্য নির্ভর করবে এটি কোথায় আছে তার ওপর। যদি এটা ফোকাস বিন্দু এবং বক্রতার কেন্দ্রের মাঝখানে থাকে তাহলে প্রতিবিম্বটির প্রতিবিম্ব হবে বস্তুটি থেকে বড়। যত ফোকাস বিন্দুর কাছাকাছি তত বড়। যদি বস্তুটি বক্রতার কেন্দ্র থেকে বাইরে হয় তাহলে এর আকার হবে আসল বস্তুটি থেকে ছোট। যদি এটা ঠিক বক্রতার কেন্দ্রে থাকে তাহলে প্রতিবিম্বের আকার হবে ঠিক বস্তুটির আকারের সমান।

আমরা জ্যামিতি ব্যবহার করে উত্তল এবং অবতল আয়নার জন্য প্রতিবিম্বের অবস্থান আকার ইত্যাদি বের করেছি। আমরা চাইলে একটিমাত্র সূত্র ব্যবহার করে এই কাজগুলো করতে পারতাম, সূত্রটি হচ্ছে:

$$\frac{1}{u}+\frac{1}{v}=\frac{1}{f}$$

এখানে u হচ্ছে আয়নার পৃষ্ঠ থেকে বস্তুর দূরত্ব, v হচ্ছে প্রতিবিম্বের দূরত্ব এবং f হচ্ছে ফোকাস দূরত্ব।

বাস্তব প্রতিবিম্ব খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ধারণা। আমরা পরের অধ্যায়ে দেখব কেমন করে লেন্স দিয়েও এ রকম বাস্তব প্রতিবিম্ব তৈরি করা যায়। তোমরা দেখতেই পেয়েছ বাস্তব প্রতিবিম্বে সত্যিকারের আলোক রশ্মি থাকে, তাই এটাকে যদি কোনো পর্দায় ফেলা যায়, সেখানে প্রতিবিম্বটি দেখাও সম্ভব হয়। সাধারণ আয়নায় তুমি তোমার চেহারা দেখতে পারবে কিন্তু শুধু সাধারণ আয়না দিয়ে কখনো তোমার চেহারা কোনো পর্দায় ফেলতে পারবে না।

উদাহরণ

প্রশ্ন: 8.24 চিত্রে দেখানো হয়েছে XY বস্তুটির প্রতিবিম্ব তৈরি হয়েছে X'Y' এ। যদি X'Y' টি বস্তুটি হতো তাহলে তার প্রতিবিম্ব কোথায় হতো?

উত্তর: এটি বাস্তব প্রতিবিম্ব। কাজেই X'Y' যদি প্রকৃত বস্তু হয় তাহলে তার প্রতিবিম্ব হবে XY।

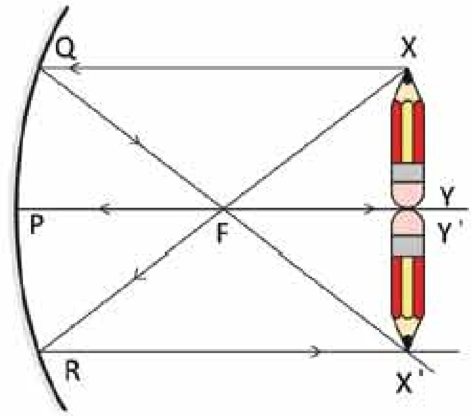

চিত্র 8.25: অবতল আয়নার ফোকাস দূরত্ব এর দ্বিগুণ দূরত্বে একটি বস্তু রাখলে প্রতিবিম্বটি ঠিক একই জায়গায় উল্টো অবস্থায় দেখা যায়।

প্রশ্ন: অবতল আয়নার ফোকাস দূরত্ব এর ঠিক দ্বিগুণ দূরত্বে একটি বস্তু রাখলে প্রতিবিম্বটি কোথায় দেখা যাবে?

উত্তর: (চিত্র 8.25) ঠিক একই জায়গায় একই আকারের কিন্তু উল্টো অবস্থায় দেখা যাবে।

আমরা এতক্ষণ গোলীয় অবতল আয়নার ভেতরকার বিজ্ঞানটুকু শিখেছি, এবারে দেখা যাক কীভাবে সেটা আমরা ব্যবহার করি।

8.7 বিবর্ধন (Magnification)

আমরা যেহেতু দেখতে পেয়েছি যে একটা প্রতিবিম্ব কখনো প্রকৃত বস্তু থেকে ছোট হয় কখনো বড় হয় তাই বিষয়টীকে ব্যাখ্যা করার জন্য বিবর্ধন বলে একটা শব্দ ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রতিবিম্বটি মূল বস্তু থেকে কত বড় সেটাকে বিবর্ধন m বলা হয়। যদি একটা বস্তুর আকার হয় l এবং তার প্রতিবিম্বের আকার হয় l' তাহলে বিবর্ধন হচ্ছে:

$$m = \frac{l'}{l}$$

আমরা যখন টেলিস্কোপে কোনো বস্তুকে দেখি, খালি চোখে দেখলে সেটাকে যত বড় দেখানোর কথা টেলিস্কোপে দেখলে সেটাকে সে তুলনায় যত বড় দেখাবে, সেটাই হচ্ছে টেলিস্কোপের বিবর্ধন।

৪.৪ আয়নার ব্যবহার (Use of Mirrors)

৪.৪.1 সাধারণ আয়না

দৈনন্দিন জীবনে সাধারণ আয়নার ব্যবহার সবচেয়ে বেশি। যখনই একদিকে পাঠানো আলোকে অন্যদিকে নিতে হয় তখন আমরা সাধারণ আয়না ব্যবহার করি। তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ সাধারণ আয়নার ডান এবং বাম দিক বদলে যায়। তাই যদি আমাদের ডান-বাম অবিকৃত রাখতে হয় তাহলে একটি আয়নার প্রতিবিম্ব অন্য একটি আয়নার দ্বিতীয়বার প্রতিফলিত করে আবার ঠিক করে নিতে হয়।

সাধারণ আয়নার প্রতিবিম্ব ডান এবং বামের পরিবর্তন হয়। দুটি আয়নাকে পরস্পরের সাথে 90° তে রেখে সেটাকেই একটা আয়না হিসেবে ব্যবহার করলে ডান-বামের পরিবর্তন হয় না। দুটি আয়না দিয়ে বিষয়টা পরীক্ষা করে দেখো (চিত্র ৪.26)।

চিত্র ৪.26: সাধারণ আয়নায় প্রতিবিম্ব ডান এবং বাম পাল্টে যায়, প্রতিবিম্বে বাম-ডান অবিকৃত রাখতে হলে দুটি আয়নাকে সমকোণে রাখতে হবে।

এখানে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জেনে রাখা ভালো, যখন খুব ভালো প্রতিফলনের প্রয়োজন হয় তখন কিন্তু সাধারণ আয়না ব্যবহার না করে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক ধরনের প্রতিফলন করা হয়। আমরা পরের অধ্যায়ে দেখব পুরোপুরি স্বচ্ছ মাধ্যম দিয়ে কীভাবে আলোকে প্রতিফলিত করা যায়।

৪.৪.2 উত্তল আয়না

উত্তল আয়নায় যেহেতু সোজা এবং ছোট প্রতিবিম্ব তৈরি করা যায় তাই বড় কোনো দৃশ্যকে ছোট আয়নায় দেখতে হলে উত্তল আয়না ব্যবহার করা হয়। গাড়ির দক্ষ ড্রাইভাররা গাড়ি চালানোর সময়

সব সময় পেছনে কী হচ্ছে দেখার চেষ্টা করেন, সে জন্য গাড়ির ড্রাইভারের সামনে রিয়ার ভিউ মিরর থাকে। এই মিররগুলোতে উত্তল আয়না ব্যবহার করা হয় যেন ছোট একটা আয়না দিয়েই গাড়ির ড্রাইভাররা পেছনের বড় একটা জায়গা দেখতে পারেন।

8.8.3 অবতল আয়না

অবতল আয়নার সবচেয়ে বড় ব্যবহার হচ্ছে টেলিস্কোপে। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে সূক্ষ্ম টেলিস্কোপে অবতল আয়না ব্যবহার করা হয়। অনেকে সাধারণভাবে মনে করে দূরের কোনো ছোট জিনিসকে অনেক বড় করে দেখালেই বুঝি ভালো টেলিস্কোপের দায়িত্ব। আসলে সেটি সত্যি নয়, ভালো টেলিস্কোপের দায়িত্ব অনেক কম আলোতেও স্পষ্ট প্রতিবিম্ব তৈরি করা। সেজন্য অবতল আয়নার আকার যত বড় হবে, সেটি তত বেশি আলো সংগ্রহ করে তত স্পষ্ট প্রতিবিম্ব তৈরি করতে পারবে। পৃথিবীর সব বড় বড় টেলিস্কোপে অবতল আয়না ব্যবহার করা হয়।

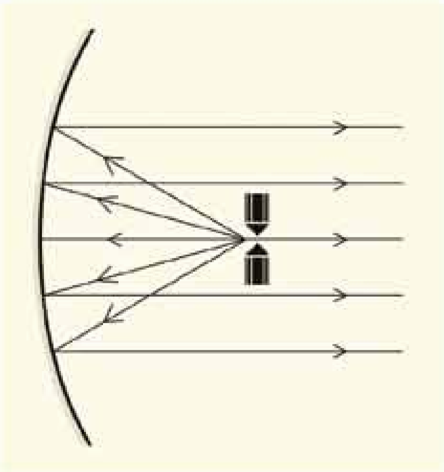

চিত্র 8.27 ফোকাস দূরত্বে তীব্র আলো তৈরি করলে সেটি অবতল আয়নায় প্রতিফলিত হয়ে সমান্তরাল আলো হিসেবে বের হয়ে আসবে।

অবতল আয়নার আরেকটি ব্যবহার হচ্ছে আলোকের সমান্তরাল বিম তৈরি করা। জাহাজ বা লঞ্চের সার্চলাইটে অবতল আয়না ব্যবহার করা হয়। আলোর উৎসটুকু থাকে ফোকাস বিন্দুতে (চিত্র 8.27), তাই সেটি অবতল আয়নায় প্রতিফলিত হয়ে সমান্তরাল বিম হিসেবে বের হয়ে যায়। তোমরা দৈনন্দিন জীবনে যে টর্চলাইট ব্যবহার করো সেখানেও বাল্বটি রাখা হয় একটি অবতল আয়নার ফোকাস বিন্দুতে।

অবতল আয়নায় ফোকাস দূরত্বের ভেতরে কিছু থাকলে যেহেতু সোজা এবং বড় প্রতিবিম্ব তৈরি হয় তাই কোনো কিছু বড় করে দেখতে হলেও অবতল আয়না ব্যবহার করা হয়। ডাক্তার কিংবা ডেন্টিস্টরা তাই অনেক সময়ই কিছু দেখার জন্য অবতল আয়না ব্যবহার করেন।

8.8.4 নিরাপদ ড্রাইভিং

একটি দেশ যখন উন্নত হতে শুরু করে তখন প্রথমেই তার যোগাযোগ ব্যবস্থাকে উন্নত করতে হয়। রাস্তাঘাট তৈরি করতে হয় এবং সেই রাস্তাঘাট দিয়ে নানা ধরনের যানবাহন চলতে শুরু করে। তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ আমাদের দেশের রাস্তাঘাট দিয়ে কত ধরনের যানবাহন যায় এবং প্রতিদিনই

তার সংখ্যা কীভাবে বেড়ে যাচ্ছে। রাস্তাঘাট যথেষ্ট না হওয়ায় ট্রাফিক জ্যামে আমাদের প্রচুর সময় নষ্ট হয় এবং দূরপাল্লার যানবাহনে গাড়ি দুর্ঘটনায় অনেক মানুষের মৃত্যু হয়। এই মৃত্যুর একটি বড় কারণ আমাদের ড্রাইভাররা অনেক সময়ই নিরাপদ ড্রাইভিং না করে দ্রুত এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে চায়। নিরাপদ ড্রাইভিংয়ের জন্য অনেক ধরনের সচেতনতা দরকার, তার মাঝে আলোর সঠিক ব্যাপার একটি।

গাড়ি চালানোর সময় ব্রেক লাইট একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, এই লাইট দেখে পেছনের গাড়ির ড্রাইভার বুঝতে পারে সামনের ড্রাইভার তার গতি কমাতে যাচ্ছে, গাড়ি কোনদিকে যাবে কিংবা লেন পরিবর্তন করবে কি না। সেটা অন্যদের জানানোর জন্য টার্ন লাইট ব্যবহার করা হয়। গাড়ির সামনের হেড লাইট অন্ধকার রাস্তা আলোকিত করে, কিন্তু সেটি ব্যবহারের একটা সুনির্দিষ্ট নিয়ম আছে, বিপরীত থেকে একটা গাড়ি আসতে থাকলে তীব্র আলোতে যেন তার চোখ ধাঁধিয়ে না যায় সেজন্য কখনোই হাই বিম অন করতে হয় না। একজন ড্রাইভার যখন গাড়ি চালায় তখন শুধু সামনে নয়, পেছনে এবং পাশে কোন যানবাহন আছে সেটি জানতে হয়। সেজন্য ড্রাইভারের সামনে রিয়ার ভিউ মিরর এবং দুই পাশে সাইডভিউ মিরর থাকে। ছোট আয়নাতে যেন অনেকটুকু জায়গা দেখা যায় সেজন্য এই আয়নাগুলো হয় অবতল। একজন ভালো ড্রাইভার যখন গাড়ি চালায় সে শুধু সামনের যানবাহন নয় পাশে এবং পেছনের যানবাহন নিয়েও সব সময় সজাগ থাকে।

8.8.5 পাহাড়ি রাস্তার অদৃশ্য বাঁক

পাহাড়ি রাস্তা সাধারণত আঁকাবাঁকা হয় আবার একই সাথে উঁচু-নিচু হয়। শুধু তাই নয়, অনেক সময়ই রাস্তার এক পাশে উঁচু পাহাড় অন্য পাশে গভীর খাদ থাকে। কাজেই পাহাড়ি রাস্তায় গাড়ি চালানোর সময় অনেক সতর্ক থাকতে হয়। তারপরও স্থানে স্থানে গাড়ি চালানো ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। বিশেষ করে যখন প্রায় সমকোণে বাঁক নিতে হয় তখন রাস্তার অন্য পাশ দিয়ে কী আসছে সেটা জানার কোনো উপায় থাকে না। এরকম অবস্থায় বাঁকগুলোতে 45° কোণে বড় আকারের সমতল আয়না বসানো হয়। তখন রাস্তার দুই পাশের সব যানবাহনই রাস্তার অন্য পাশে কী আছে সেটি দেখতে পায় এবং রাস্তায় গাড়ি চালানো তুলনামূলকভাবে নিরাপদ হয়ে যায়।

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন

1. চোখের সংবেদনশীলতার পরিমাপটি কেমন করে নির্ণয় করা হতে পারে?
2. মানুষের চোখ সবচেয়ে বেশি দেখতে পায় হলুদাভ সবুজ রং তাহলে বিপদসংকেত সব সময় লাল দিয়ে কেন করা হয়?
3. আয়নাতে ডান-বাম উল্টে যায়, ওপর-নিচ উল্টায় না কেন?
4. জোছনার আলোতে রং দেখা যায় না কেন?
5. জ্যোতির্বিদদের বড় টেলিস্কোপে সব সময় অবতল আয়না ব্যবহার করা হয় কেন?
6. আলোর প্রতিফলন বলতে কী বোঝ?
7. নিয়মিত প্রতিফলন ও ব্যাপ্ত প্রতিফলন বলতে কী বোঝ?
8. দর্পণ কাকে বলে?
9. প্রতিবিম্ব কাকে বলে? প্রতিবিম্ব কয় প্রকার ও কী কী?
10. অবতল দর্পণে কীভাবে বাস্তব প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয় তা রশ্মি চিত্রের সাহায্যে দেখাও।
11. অবতল দর্পণে কীভাবে অবাস্তব প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয় তা চিত্রসহ বর্ণনা করো।

গাণিতিক প্রশ্ন

1. ৪.28 চিত্রের মতো করে আয়না রাখা আছে। চিত্রে দেখানো আলোক রশ্মিটি কোন দিকে যাবে দেখাও।
2. উত্তল আয়নায় XY বস্তুটির জন্য (চিত্র ৪.29 a) আলোক রশ্মিগুলো এঁকে প্রতিবিম্বটি কোথায় হবে দেখাও।
3. অবতল আয়নায় XY বস্তুটির জন্য (চিত্র ৪.29 b) আলোক রশ্মিগুলো এঁকে প্রতিবিম্বটি কোথায় হবে দেখাও।

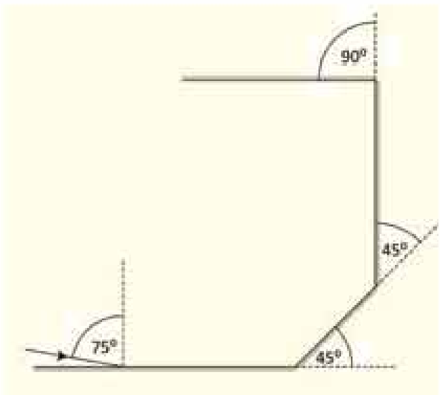

চিত্র ৪.28: ভিন্ন ভিন্ন কোণে রাখা আয়নার একটিতে আলো আপতিত হচ্ছে।

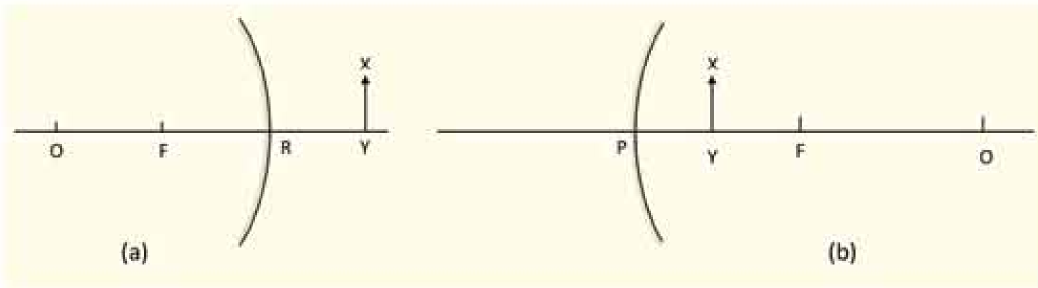

চিত্র ৪.29: (a) উত্তল আয়নায় ফোকাস দূরত্বের ভেতরে রাখা একটি বস্তু। (b) অবতল আয়নায় ফোকাস দূরত্বের ভেতরে রাখা একটি বস্তু।

4. অবতল আয়নায় XY বস্তুটির জন্য (চিত্র ৪.30 a) আলোক রশ্মিগুলো এঁকে প্রতিবিম্বটি কোথায় হবে দেখাও।

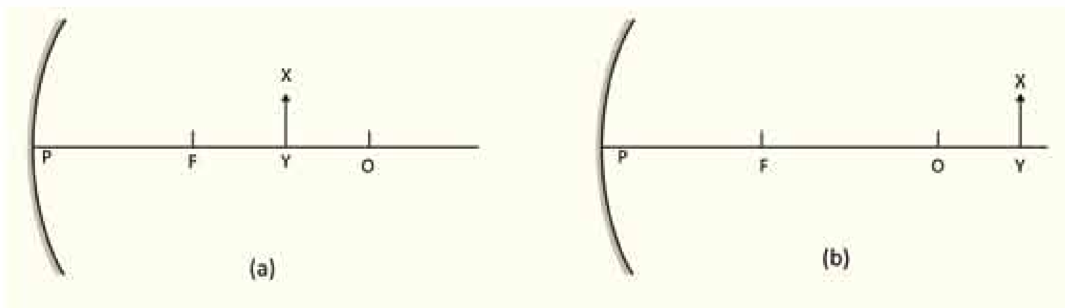

চিত্র ৪.30: (a) অবতল আয়নায় ফোকাস দূরত্বের বাইরে রাখা একটি বস্তু। (b) অবতল আয়নায় দ্বিগুণ ফোকাস দূরত্বের বাইরে রাখা একটি বস্তু।

5. অবতল আয়নায় XY বস্তুটির জন্য (চিত্র ৪.30 b) আলোক রশ্মিগুলো এঁকে প্রতিবিম্বটি কোথায় হবে দেখাও।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটির পাশে ঠিক (√) চিহ্ন দাও

1. উত্তল দর্পণ কোথায় ব্যবহার হয়?

(ক) গাড়িতে (খ) টর্চলাইটে

(গ) সৌরচুল্লিতে (ঘ) রাডারে

2. প্রতিফলন কত প্রকার?

(ক) 4 (খ) 3

(গ) 2 (ঘ) 1

3. সমতল দর্পণে সৃষ্ট প্রতিবিম্ব-

(i) আকারে লক্ষ্যবস্তুর সমান

(ii) পর্দায় গঠন করা যায়

(iii) দর্পণ থেকে বস্তুর দূরত্বের সমান দূরত্বে গঠিত হয়।

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii

(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

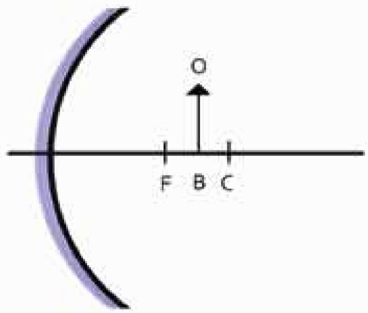

চিত্র ৪.31

৪.31 চিত্রের আলোকে 4 ও 5 নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

4. BO বস্তুর প্রতিবিম্বের আকৃতি কীরূপ হবে-

(ক) বিবর্ধিত (খ) খর্বিত

(গ) অত্যন্ত বিবর্ধিত (ঘ) অত্যন্ত খর্বিত

5. BO বস্তুর প্রতিবিম্বের অবস্থান কোথায় হবে?

(ক) ফোকাস ও মেরুর মাঝে (খ) প্রধান ফোকাসে

(গ) বক্রতার কেন্দ্রে (ঘ) বক্রতার কেন্দ্র ও অসীমের মাঝে

সৃজনশীল প্রশ্ন

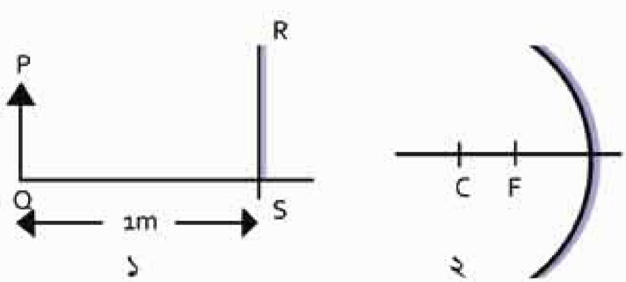

চিত্র ৪.32

1. চিত্র ৪.32

(ক) সমতল দর্পণ কী?

(খ) দর্পণের পেছনে ধাতুর প্রলেপ লাগানো হয় কেন?

(গ) চিত্র এঁকে দর্পণ থেকে PQ বস্তুর প্রতিবিম্বের অবস্থান নির্ণয় করো।

(ঘ) প্রতিবিম্ব গঠনের ক্ষেত্রে 1 এবং 2 নম্বর দর্পণের তুলনা করো।

2. চিত্র ৪.33

(ক) প্রতিবিম্ব কাকে বলে?

(খ) দর্পণে লম্বভাবে আপতিত রশ্মি একই পথে ফিরে আসে কেন?

(গ) চিত্রের আলোকে প্রতিফলন কোণের মান নির্ণয় করো।

(ঘ) PQ দর্পণে গঠিত প্রতিবিম্ব অবাস্তব—চিত্রসহ ব্যাখ্যা করো।

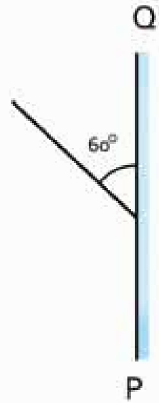

চিত্র ৪.33

3. একদল শিক্ষার্থী ব্যবহারিক ক্লাসে পরীক্ষণের প্রথম পর্যায়ে একটি অবতল দর্পণের সামনে 2cm দৈর্ঘ্যের একটি কাঠি রাখায় পর্দায় এর 3.51 গুণ প্রতিবিম্ব দেখতে পেল। পরীক্ষণের দ্বিতীয় পর্যায়ে পর্দায় এর 6 গুণ প্রতিবিম্ব দেখতে পেল।

(ক) বিবর্ধন কী?

(খ) ভিউ মিরর হিসেবে সমতল দর্পণ ব্যবহার করা হয় না কেন?

(গ) পরীক্ষণের প্রথম পর্যায়ে কাঠিটির প্রতিবিম্বের দৈর্ঘ্য ও প্রকৃতি নির্ণয় করো।

(ঘ) পরীক্ষণের দ্বিতীয় পর্যায়ে কী কী পরিবর্তন করা হয়েছিল?

নবম অধ্যায়

আলোর প্রতিসরণ

(Refraction of Light)

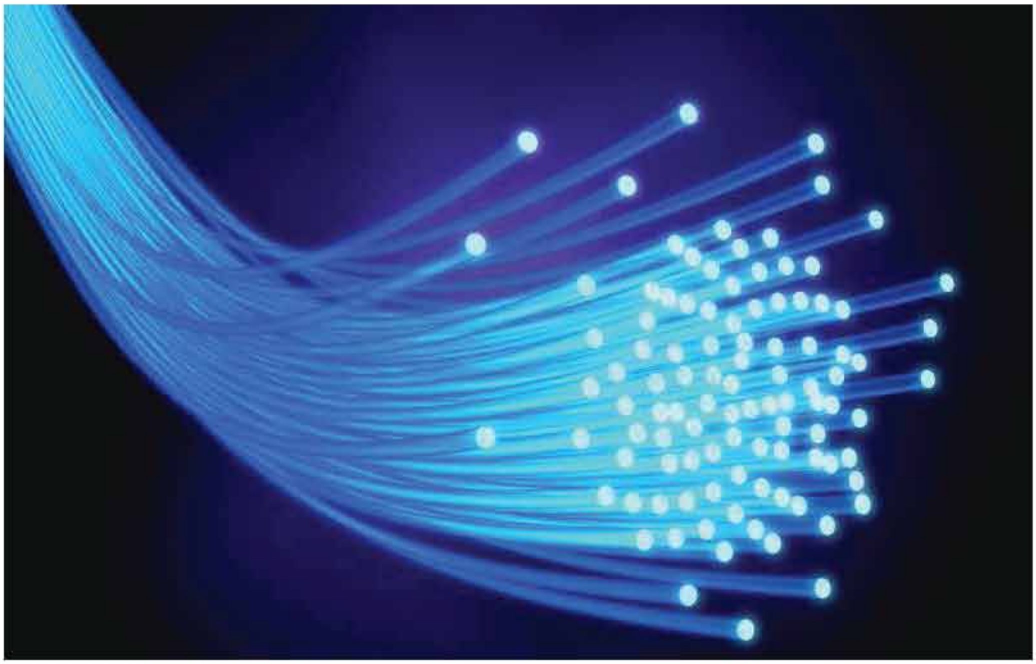

শূন্যস্থানে আলোর বেগ সেকেন্ডে 2.99×10^8 m/s, আলো যখন কোনো মাধ্যমে প্রবেশ করে তখন আলোর বেগ এর থেকে কমে যায় এবং এই প্রক্রিয়াটিকে ব্যাখ্যা করার জন্য প্রতিসরণাঙ্ক বলে একটি রাশি সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। তোমরা ইচ্ছে করলেই দেখাতে পারবে আলোর বেগের তারতম্যের জন্য এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে যাবার সময় আলোক রশ্মি বেঁকে যায়।

আলোর এই ধর্ম বা প্রতিসরণের কারণে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন নামে একটি অত্যন্ত চমকপ্রদ ব্যাপার ঘটতে পারে। এই অধ্যায়ে আমরা পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের নানা ধরনের ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করব।

আলোর প্রতিসরণকে ব্যবহার করে উত্তল এবং অবতল লেন্স তৈরি করা যায়। এই দুই ধরনের লেন্স দিয়ে কোন ধরনের প্রতিবিম্ব তৈরি করা হয় সেগুলোও এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- প্রতিসরণের সূত্র ব্যাখ্যা করতে পারব।
- প্রতিসরণাঙ্ক ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন ব্যাখ্যা করতে পারব।
- অপটিক্যাল ফাইবারের ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে পারব।
- লেন্স এবং এর প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- আলোকরশ্মির ক্রিয়ারেখা অঙ্কন করে লেন্সসংক্রান্ত বিভিন্ন রাশি বর্ণনা করতে পারব।
- লেন্সে সৃষ্ট প্রতিবিম্ব আলোক রশ্মির ক্রিয়ারেখা অঙ্কন করে বর্ণনা করতে পারব।
- লেন্সের ক্ষমতা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- আলোক রশ্মির ক্রিয়ারেখা অঙ্কন করে চোখের ক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারব।
- স্পষ্ট দর্শনের নিকটতম বিন্দু ব্যাখ্যা করতে পারব।
- দৃষ্টির ত্রুটি ব্যাখ্যা করতে পারব।
- আলোক রশ্মির ক্রিয়ারেখা অঙ্কন করে দৃষ্টির ত্রুটি সংশোধনে লেন্সের ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে পারব।
- রঙিন বস্তুর আলোকীয় উপলব্ধি ব্যাখ্যা করতে পারব।
- দৈনন্দিন জীবনে আলোর প্রতিসরণের ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে পারব।

9.1 আলোর প্রতিসরণ (Refraction of Light)

তোমরা এর মাঝে জেনে গেছ যে আলো যখন একটা মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে প্রবেশ করতে চায় তখন তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ঘটনা ঘটে। একটা হচ্ছে প্রতিফলন যখন প্রথম মাধ্যম থেকে দ্বিতীয় মাধ্যমে যাবার সময় খানিকটা আলো আবার প্রথম মাধ্যমে ফিরে আসে এবং সে বিষয়টি আমরা আগের অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। একটি হচ্ছে প্রতিসরণ যখন প্রথম মাধ্যম থেকে আলো দ্বিতীয় মাধ্যমে প্রবেশ করে যে বিষয়টি আমরা এই অধ্যায়ে আলোচনা করব। আরেকটি হচ্ছে শোষণ যখন খানিকটা আলো শোষিত হয় যে বিষয়টি আমরা আলোচনা করব না।

আলোর প্রতিসরণ বোঝার জন্য প্রতিসরণাঙ্ক বলে একটা রাশি (n) ব্যবহার করা হয়। আমরা জানি, শূন্য স্থানে আলোর বেগ 2.99×10^8 m/s, এবং এটি যখন কোনো মাধ্যমের ভেতর দিয়ে যায় তখন এই বেগটি কমে যায়। একটি মাধ্যমে আলোর বেগ কত গুণ কমে যায় সেটাই হচ্ছে এই মাধ্যমটার প্রতিসরণাঙ্ক। যেমন পানিতে আলোর বেগ হচ্ছে 2.26×10^8 m/s কাজেই পানির প্রতিসরণাঙ্ক হচ্ছে:

$$n = \frac{c}{v} = \frac{2.99 \times 10^8 \text{ m/s}}{2.26 \times 10^8 \text{ m/s}} = 1.33$$

অর্থাৎ শূন্য স্থানে আলোর বেগ পানিতে আলোর বেগ থেকে 1.33 গুণ বেশি।

ফাইবার অপটিক ক্যাবলের কাচের তন্তুর প্রতিসরণাঙ্ক 1.5, কাজেই ফাইবারের ভেতর দিয়ে আলোর বেগ

$$v = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}/1.50 = 2.00 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$$

টেবিল 9.01: ভিন্ন ভিন্ন মাধ্যমে আলোর প্রতিসরণাঙ্ক

শূন্য মাধ্যম	1.00
বাতাস	1.00029
পানি	1.33
সাধারণ কাচ	1.52
হীরা	2.42

প্রতিসরণাঙ্ক একটি সংখ্যা এবং এর কোনো একক নেই। যেহেতু আলোর সর্বোচ্চ বেগ c, কাজেই n এর মান সবসময়ই 1 থেকে বেশি। 9.01 টেবিলে কিছু পদার্থের প্রতিসরণাঙ্ক দেওয়া হয়েছে। শূন্য মাধ্যমে স্বাভাবিকভাবেই n এর মান হবে 1, বাতাসের প্রতিসরণাঙ্ক 1.00029, এটি 1 এর এত কাছাকাছি যে আমরা এটাকে 1 ধরেই হিসাব করব।

উদাহরণ

প্রশ্ন: 9.01 টেবিলে দেখানো মাধ্যমগুলোতে আলোর বেগ কত বের করো।

উত্তর: কোনো মাধ্যমে আলোর বেগ $v = \frac{c}{n}$

শূন্য মাধ্যমে $v = 3 \times 10^8 \ \text{ms}^{-1}/1.00 = \ 3 \times 10^8 \ \text{ms}^{-1}$

বাতাসে $v = 3 \times 10^8 \ \text{ms}^{-1}/1.00029 = \ 3 \times 10^8 \ \text{ms}^{-1}$

পানিতে $v = 3 \times 10^8 \ \text{ms}^{-1}/1.33 = \ 2.26 \times 10^8 \ \text{ms}^{-1}$

সাধারণ কাচে $v = 3 \times 10^8 \ \text{ms}^{-1}/1.52 = \ 2 \times 10^8 \ \text{ms}^{-1}$

হীরাতে $v = 3 \times 10^8 \ \text{ms}^{-1}/2.42 = 1.24 \times 10^8 \ \text{ms}^{-1}$

এখানে উল্লেখ্য, কোনো মাধ্যমের প্রতিসরণাঙ্ক বলতে হলে সেটি কোন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোতে মাপা হয়েছে সেটি বলে দিতে হয়। কারণ আলোর প্রতিসরণাঙ্ক আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ওপর নির্ভর করে।

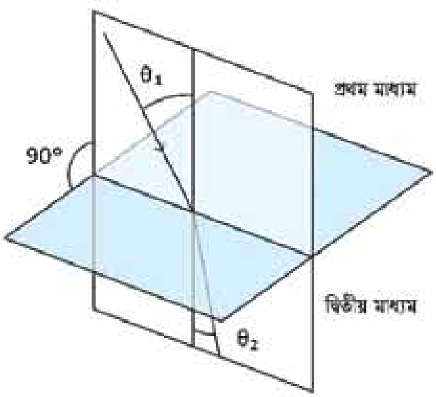

চিত্র 9.01: প্রথম মাধ্যম থেকে দ্বিতীয় মাধ্যমে আলোর প্রতিসরণ।

9.1.1 প্রতিসরণের সূত্র

প্রতিসরণের সূত্র বোঝার জন্য যে বিষয়গুলো জানা প্রয়োজন ছিল সেগুলো জানা হয়েছে। প্রতিফলনের বেলায় আমরা আলোক রশ্মি যে বিন্দুতে পড়েছে সেই বিন্দু থেকে একটি লম্ব কল্পনা করে নিয়েছিলাম, এখানেও সেই একই বিষয়টি করতে হবে। 9.01 চিত্রটিতে লম্বের সাথে আপতিত রশ্মিটির কোণকে বলব আপতন কোণ, দ্বিতীয় মাধ্যমে লম্বের সাথে প্রতিসরিত রশ্মির কোণকে বলব প্রতিসরণ কোণ।

প্রতিসরণের প্রথম সূত্র: আপতন রশ্মি এবং লম্ব দিয়ে আমরা যে সমতলটি কল্পনা করে নিয়েছি প্রতিসরিত রশ্মি সেই একই সমতলে থাকবে।

প্রতিসরণের দ্বিতীয় সূত্র: প্রথম মাধ্যমের প্রতিসরণাঙ্ক n_1, দ্বিতীয় মাধ্যমের প্রতিসরণাঙ্ক n_2, আপাতন কোণ θ_1, এবং প্রতিসরিত কোণ θ_2 হলে

$$n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$$

এই অতি সহজ সূত্রটি মনে রাখলে তুমি প্রতিসরণ-সংক্রান্ত সব সমস্যার সমাধান করে ফেলতে পারবে।

যদি প্রথম মাধ্যমটি বাতাস হয় তাহলে $n_1 = 1$ ধরে লিখতে পারি (চিত্র 9.02)

$$n_2 = \frac{\sin\theta_1}{\sin\theta_2}$$

যেহেতু n_2 এর মান 1 থেকে বেশি তাই $\theta_2 < \theta_1$ অর্থাৎ প্রতিসরণের পর আলোক রশ্মিটি লম্বের দিকে বেঁকে যাবে। n বেশি হলে আমরা অনেক সময় তাকে ঘন মাধ্যম বলি। মনে রাখতে হবে এখানে মাধ্যমের ভরের কারণে ঘন বলছি না। এটাকে ঘন বলতে বোঝানো হচ্ছে এর n বেশি। কাজেই প্রতিসরণের দ্বিতীয় সূত্র থেকে আমরা বলতে পারি আলো হালকা মাধ্যম থেকে ঘন মাধ্যমে যাবার সময় প্রতিসরিত রশ্মি লম্বের দিকে বেঁকে যাবে। আবার ঘন মাধ্যম থেকে হালকা মাধ্যমে যাবার সময় সেটি লম্ব থেকে দূরে সরে যাবে। (চিত্র 9.02)

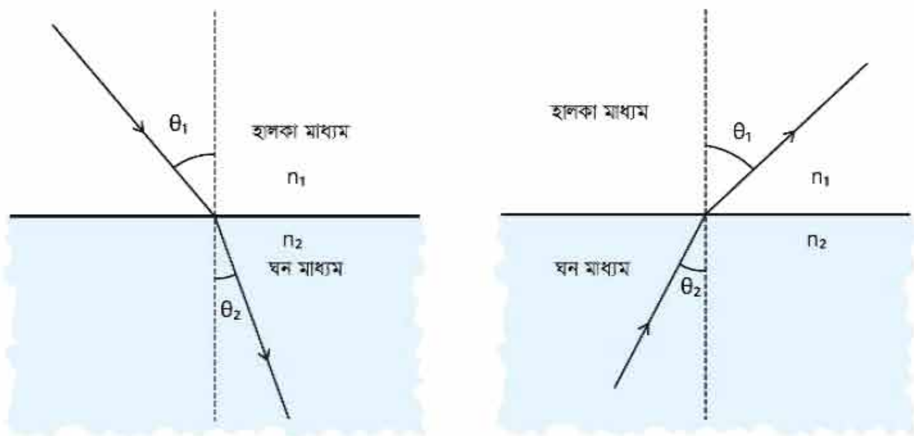

চিত্র 9.02: হালকা মাধ্যম থেকে ঘন মাধ্যমে যাবার সময় আলো লম্বের দিকে বেঁকে যায়। ঘন মাধ্যম থেকে হালকা মাধ্যমে যাবার সময় আলো লম্ব থেকে দূরে সরে যায়।

প্রতিসরণ নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে বলে এখানে শুধু আপতন রশ্মি এবং প্রতিসরিত রশ্মি আঁকা হয়েছে কিন্তু সবাইকে মনে রাখতে হবে যখনই একটি আলোক রশ্মি এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে প্রবেশ করে তখন সব সময়ই খানিকটা আলো প্রতিফলিত হয়। দুটো মাধ্যমের মাঝে কতখানি প্রতিফলিত হবে এবং কতখানি প্রতিসরিত হবে সেটা নির্ভর করে আপতন কোণের ওপর। আপতন কোণ বাড়তে থাকলে সব সময়ই প্রতিফলন বাড়তে থাকে।

নিজে করো

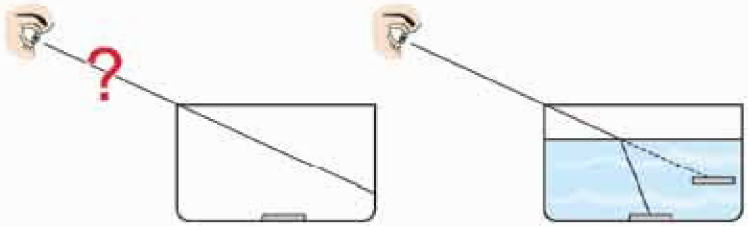

চিত্র 9.03: পানি ও কাচের ভেতর আলোর প্রতিসরণ।

একটি কাপের মাঝে একটা মুদ্রা রেখে সেটাকে সামনে এমনভাবে রাখো যেন সেটি দেখা না যায়। মাথা না নাড়িয়ে মুদ্রাটি কীভাবে দেখা সম্ভব? কাপে পানি ঢাললেই মুদ্রাটি দৃশ্যমান হয়ে যাবে (চিত্র 9.03)। প্রতিসরণের কারণে আলো বাঁকা হয়ে এসে তোমার চোখে পড়বে। শুধু তাই নয়, তোমার কাছে মনে হবে মুদ্রাটি বুঝি উপরে উঠে এসেছে।

উদাহরণ

প্রশ্ন: বাতাস থেকে আলোক রশ্মি $n = 1.6$ মাধ্যমে $45°$ তে আপতিত হয়েছে। (চিত্র 9.04 a) এটি কত ডিগ্রি কোণে দ্বিতীয় মাধ্যমে প্রবেশ করবে?

উত্তর: আমরা জানি $n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$ কাজেই

$$\sin\theta_2 = \frac{n_1}{n_2}\sin\theta_1 = \frac{1}{1.6}\times\frac{1}{\sqrt{2}} = 0.44$$

$$\theta_2 = 26°$$

প্রশ্ন: 9.04 b চিত্রটিতে একটি রশ্মি $60°$ তে বাতাস থেকে একটি মাধ্যমে প্রবেশ করে $45°$ কোণে দ্বিতীয় মাধ্যমে প্রতিসরিত হচ্ছে। দ্বিতীয় মাধ্যমটির প্রতিসরণাঙ্ক কত?

২০২৩

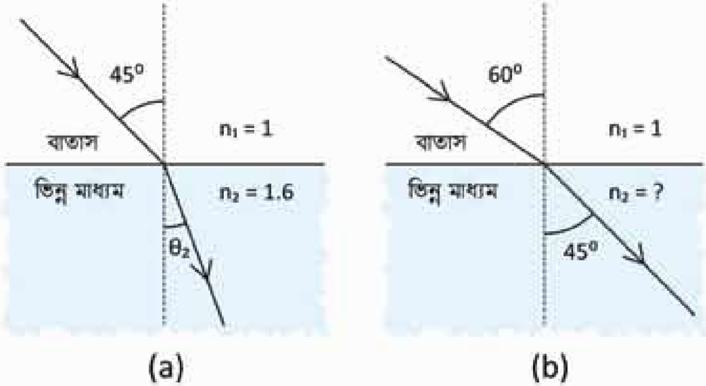

চিত্র 9.04: (a) আলো 45° কোণে আপতিত হচ্ছে (b) আলো 60° কোণে আপতিত হয়ে 45° কোণে প্রতিসরিত হচ্ছে।

উত্তর: আমারা জানি $n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$

$$1 \times \sin 60° = n_2 \sin 45°$$

$$n_2 = \frac{\sin 60°}{\sin 45°} = 1.22$$

9.1.3 আপেক্ষিক প্রতিসরণাঙ্ক

আমরা বলেছি কোনো মাধ্যমের প্রতিসরণাঙ্ক সব সময় 1 থেকে বেশি হয়। কারণ প্রতিসরণাঙ্ক যেহেতু শূন্য মাধ্যমের সাথে সেই মাধ্যমে আলোর বেগের তুলনা এটা 1 থেকে বেশি হবে। মাঝে মাঝে এক মাধ্যমের প্রতিসরণাঙ্কের তুলনায় অন্য মাধ্যমের প্রতিসরণাঙ্ক প্রকাশ করা হয় তখন কোনটির সাথে কোনটির তুলনা করা হয়েছে তার ওপর নির্ভর করে সেটা 1 থেকে কম হতে পারে।

যেমন পানিকে প্রথম মাধ্যম এবং কাচকে দ্বিতীয় মাধ্যম ধরলে (চিত্র 9.05)

$$n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$$

$$n_1 = 1.33$$

$$n_2 = 1.52$$

পানির তুলনায় কাচের প্রতিসরণাঙ্ক

$$\frac{n_2}{n_1} = \frac{\sin\theta_1}{\sin\theta_2} = 1.14$$

যেটি 1 থেকে বেশি।

আবার কাচের তুলনায় পানির প্রতিসরণাঙ্ক

$$\frac{n_1}{n_2} = \frac{\sin\theta_2}{\sin\theta_1} = 0.88$$

যেটি 1 থেকে কম।

অর্থাৎ যে মাধ্যমের প্রতিসরণাঙ্ক বের করতে চাচ্ছ সেটিকে যার তুলনায় বের করতে চাইছ সেই প্রতিসরণাঙ্ক দিয়ে ভাগ দিতে হবে।

পানির তুলনায় হীরা: 1.82
হীরার তুলনায় পানি: 0.55
কাচের তুলনায় হীরা: 1.59
হীরার তুলনায় কাচ: 0.63

তবে পদার্থবিজ্ঞানে সাধারণত দুটির তুলনা হিসেবে প্রতিসরণাঙ্ক ব্যবহার না করে নির্দিষ্ট বস্তুর প্রতিসরণাঙ্ক হিসেবেই ব্যবহার করা হয়।

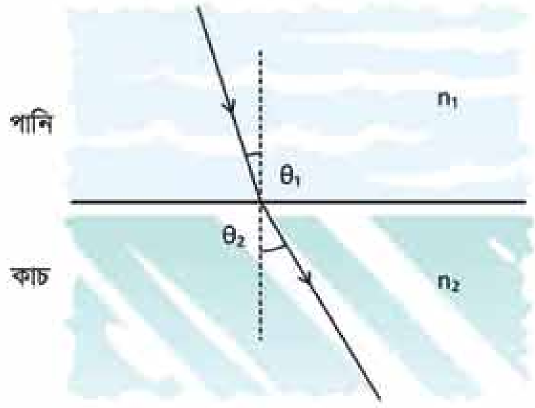

চিত্র 9.05: পানি ও কাচের ভেতর আলোর প্রতিসরণ।

9.2 পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন (Total Internal Reflection)

প্রতিফলন সম্পর্কে আলোচনা করার সময় বলা হয়েছিল যখন অত্যন্ত নিখুঁত এবং পূর্ণাঙ্গ প্রতিফলন প্রয়োজন হয় তখন আয়না ব্যবহার না করে পুরোপরি স্বচ্ছ মাধ্যম ব্যবহার করে এক ধরনের প্রতিফলন করানো হয়। এই প্রতিফলনের নাম পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন। এটি অত্যন্ত সহজ এবং চমকপ্রদ একটি প্রক্রিয়া, এখানে প্রতিসরণের নিয়ম ব্যবহার করে আলোক রশ্মিটি ঘন মাধ্যম থেকে হালকা মাধ্যমে পাঠাতে হয় মাত্র।

আমরা এর মাঝে জেনে গেছি (এবং অনেকবার ব্যবহার করেছি), প্রতিসরণের সূত্র হচ্ছে

$$n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$$

অর্থাৎ যদি n_1 থেকে n_2 বড় হয় তাহলে θ_2 থেকে θ_1 বড় হবে। ধরা যাক তুমি একটি ঘন মাধ্যম (n_2) থেকে একটি আলোক রশ্মি হালকা মাধ্যমের (n_1) দিকে পাঠাচ্ছ (চিত্র 9.06)। প্রতিসরণ এবং প্রতিফলনের নিয়ম অনুযায়ী খানিকটা আলো প্রতিফলিত হবে এবং খানিকটা প্রতিসরিত হবে। যেহেতু θ_2 থেকে θ_1 বড় হবে কাজেই $\theta_2 < 90°$ থাকতেই $\theta_1 = 90°$ হয়ে যাবে এবং এর পর থেকে আলোর প্রতিসরিত হবার আর কোনো সুযোগ থাকবে না। অর্থাৎ যখন $\theta_1 = 90°$ হবে তখন থেকে পুরো

আলোকেই প্রতিফলিত হতে হবে। θ_2 এর যে মানের জন্য $\theta_1 = 90°$ হয় সেই কোণকে ক্রান্তি কোণ বা সংকট কোণ (Critical Angle) θ_c বলে।

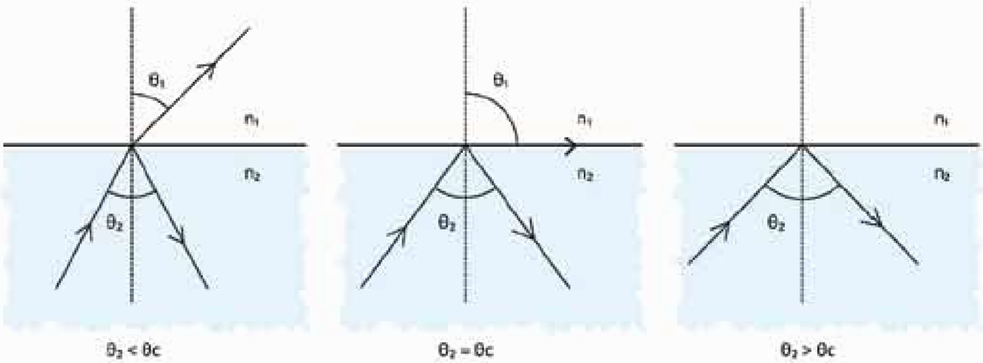

চিত্র 9.06: ঘন মাধ্যম থেকে হালকা মাধ্যমে যাবার সময় আলোর পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন হতে পারে।

অর্থাৎ $n_1 \sin 90° = n_2 \sin \theta_c$

কিংবা

$$\sin \theta_c = \frac{n_1}{n_2}$$

n_1 এবং n_2 এর মান জানা থাকলে আমরা একটি কোণ θ_c বের করতে পারব যার জন্য উপরের সূত্রটি সত্যি। কাজেই সূত্রটাকে এভাবেও লেখা যেতে পারে:

$$\theta_c = sin^{-1}\left(\frac{n_1}{n_2}\right)$$

কাচের $n_2 = 1.52$ এবং
বাতাসের $n_1 = 1.00$ হলে

$$\frac{n_1}{n_2} = \frac{1.00}{1.52} = 0.66$$

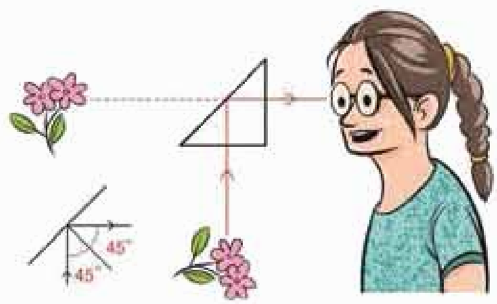

চিত্র 9.07: সবচেয়ে পরিপূর্ণ প্রতিফলন হয় পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনে।

এটা দেখানো সম্ভব যে

$$\sin 41.8° = 0.66 \text{ বা } sin^{-1}(0.66) = 41.8°$$

কাজেই ক্রান্তি কোণ $\theta_c = 41.8°$

অর্থাৎ যদি স্বচ্ছ কাচ থেকে বাতাসের মাঝে আলো পাঠানের সময় আলোক রশ্মি 41.8° থেকে বেশি আপাতন কোণ করে তাহলে আলোক রশ্মিটি স্বচ্ছ কাচ থেকে বের না হয়ে পুরোপুরি প্রতিফলিত হয়ে যায়। তোমরা যদি একটি প্রিজম সংগ্রহ করতে পারো তাহলে খুব সহজেই পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন ব্যাপারটি নিজের চোখে দেখতে পাবে। 9.07 চিত্রটিতে কাচ-বাতাস বিভেদতলে আলোর আপাতন কোণ 45° কাচ-বাতাসের ক্রান্তি কোণ 41.8° থেকে বেশি। কাজেই এখানে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন হবে।

উদাহরণ

প্রশ্ন: পানিতে ডুবে যদি এই পরীক্ষাটা করতে চাও তাহলে কী হবে? (কাচের $n_2 = 1.52$ এবং পানির $n_1 = 1.33$)

উত্তর: পানিতে $\frac{n_1}{n_2} = 0.88$ কাজেই কাচের ক্রান্তি কোণ হবে $61.6°$ কারণ $sin\, 61.6° = 0.88$ অথবা $sin^{-1}(0.88) = 61.6°$

আপাতন কোণ যেহেতু 45°, এটি ক্রান্তি কোণ 61.6° থেকে কম তাই পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন হবে না।

প্রশ্ন: 1.45 প্রতিসরণাঙ্কের একটি মাধ্যমের ভেতর থেকে আলো 75° তে আপতিত হয়েছে। (চিত্র 9.08) মাধ্যমটির অন্য পাশে বাতাস থাকলে আলোটি কত ডিগ্রি কোণে বের হয়ে আসবে।

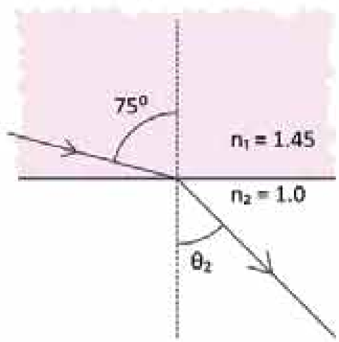

চিত্র 9.08: আলো 75° কোণে আপতিত হচ্ছে।

উত্তর: আমারা জানি

$$n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$$

$$1.45 \times \sin 75° = 1 \times \sin\theta_2$$

$$\sin\theta_2 = 1.40$$

কিন্তু আমরা জানি $\sin\theta_2$ এর মান কখনো 1 থেকে বেশি হতে পারবে না। এখানে এ ব্যাপারটি ঘটেছে কারণ আলো প্রতিসরিত না হয়ে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলিত হয়েছে কাজেই যখনই ঘন মাধ্যম থেকে হালকা মাধ্যমে আলোর প্রতিসরণ দেখতে হয় তখন প্রথমে ক্রান্তি কোণটি বের করে নেওয়া ভালো, এই ক্রান্তি কোণ থেকে কম কোণে আলো আপতিত হলে শুধুমাত্র প্রতিসরণ হওয়া সম্ভব।

এই ক্ষেত্রে ক্রান্তি কোণ θ_c হলে

$$sin\theta_c = \frac{1}{1.45} = 0.69$$
$$\theta_c = 43.6°$$

কাজেই 75° তে আলো আপতিত হলে সেটি প্রতিসরিত না হয়ে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন হবে।

9.2.1 রংধনু

তোমরা যারা ভাবছ যে তোমরা সত্যি সত্যি কখনো পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন দেখনি তাদেরকে মনে করিয়ে দেওয়া যায় যে যারা রংধনু দেখেছে তারাই পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন দেখেছে। রংধনু তৈরি হয় পানির পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন দিয়ে।

শুধু তাই নয়, যারা প্রিজমের অভাবে সাদা আলোকে তার রংগুলোতে ভাগ করে দেখতে পারোনি তারাও এই ব্যাপারটি রংধনুতে ঘটতে দেখেছ। বৃষ্টি হবার পরপর যদি রোদ ওঠে তাহলে আমরা রংধনু দেখি। তার কারণ তখন বাতাসে পানির কণা থাকে এবং পানির কণায় সেই আলো পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলিত হবার সময় ভিন্ন ভিন্ন রঙের আলো ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে বেঁকে যায়। এই আলোর রশ্মিগুলো দিয়ে রংধনুর ভিন্ন ভিন্ন রঙের ব্যান্ড (band) তৈরি হয়।

তোমরা যারা রংধনু দেখেছ তারা নিশ্চয়ই আবিষ্কার করেছ এটি সব সময়ই সূর্যের বিপরীত আকাশে দেখা যায় এবং এখন তার কারণটি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ।

9.2.2 মরীচিকা

মরুভূমিতে মরীচিকা খুবই পরিচিত দৃশ্য। তোমরা হয়তো শুনে অবাক হবে যে মরীচিকাও রংধনুর মতো পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের কারণে ঘটে থাকে।

কোনো কিছু পাওয়ার আশা করে শেষ পর্যন্ত না পেলে সেটাকেও মরীচিকা বলা হয় কিন্তু মূল শব্দটি এসেছে মরুভূমিতে উত্তাপের কারণে বাতাসের ঘনত্বের পরিবর্তন থেকে। যদিও আমরা জানি উত্তপ্ত বাতাস হালকা বলে উপরে চলে যায় কিন্তু মরুভূমির উত্তপ্ত বালুর কারণে তার কাছাকাছি বাতাস উপরের বাতাস থেকে উত্তপ্ত থাকতে পারে। কাজেই মরুভূমির বাতাসকে আমরা 9.09 চিত্রের মতো করে কল্পনা করে নিতে পারি।

সহজভাবে বোঝানোর জন্য এখানে মাত্র কয়েকটি স্তরে দেখানো হয়েছে। উপরের স্তরে বাতাসের ঘনত্ব বেশি তাই প্রতিসরণাঙ্ক বেশি। নিচের স্তরে বাতাস উত্তপ্ত তাই ঘনত্ব কম এবং প্রতিসরণাঙ্কও কম। গাছ থেকে আলো প্রতিটি স্তরে প্রতিসরিত হবার সময় প্রতিসরণ কোণ বেড়ে যাবে এবং একেবারে নিচের স্তরে এসে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন হয়ে যেতে পারে। বেশি প্রতিসরণাঙ্কের

২০২৫

থেকে কম প্রতিসরণাঙ্কের মাধ্যমে যাবার সময় দূর থেকে দেখা হলে আপাতন কোণের মান বেশি হওয়ার কারণে ক্রান্তি কোণকে অতিক্রম করার সম্ভাবনা বেশি থাকে। তাই মরীচিকাকে দূর থেকে দেখা যায়, কাছে এলে দেখা যায় না। যেহেতু কোনো মানুষ দূরের একটি গাছের দিকে তাকালে সরাসরি গাছটি দেখতে পাবে এবং পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের কারণে গাছের একটি প্রতিবিম্ব গাছের নিচেও দেখতে পাবে। মনে হবে নিচে পানি থাকার কারণে সেখানে গাছের প্রতিবিম্ব দেখা যাচ্ছে। কাছে গেলে দেখা যাবে কোনো পানি নেই।

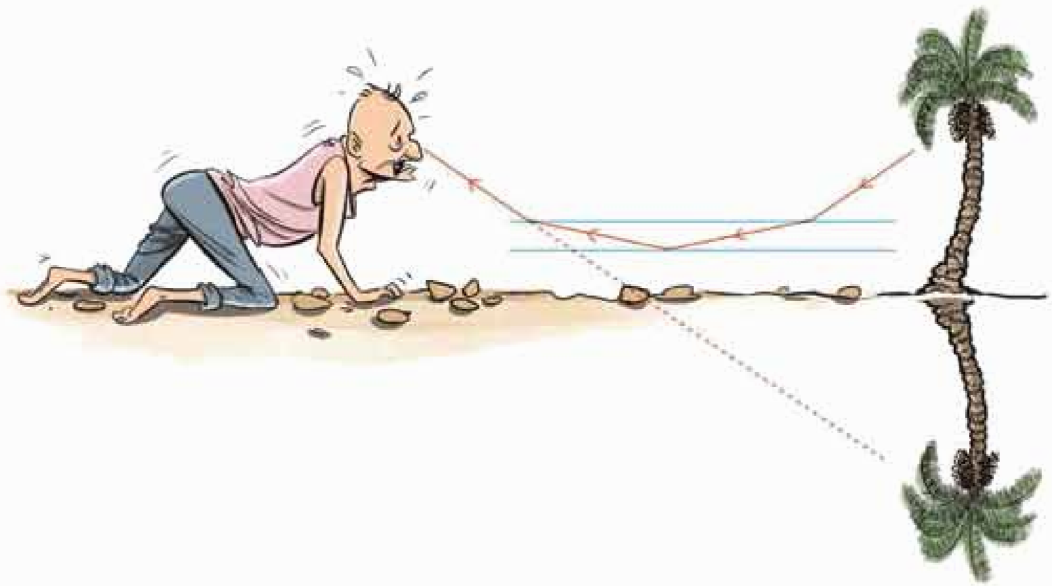

চিত্র 9.09: মরুভূমিতে বাতাসের ঘনত্বের পার্থক্যের কারণে মরীচিকা দেখা যায়।

গরমের দিনে উত্তপ্ত রাস্তায় গাড়ি চালিয়ে যাবার সময় একই কারণে দূরে কালচে ভেজা রাস্তা দেখা যায়। সেখানে পৌঁছানোর পর দেখা যায় রাস্তাটি খটখটে শুকনো। এটাও এক ধরনের মরীচিকা।

9.3 প্রতিসরণের ব্যবহার

আলোর প্রতিসরণের নানা ধরনের ব্যবহার রয়েছে। আমাদের জীবনের নানা ক্ষেত্রে যে ব্যবহারগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে তোমাদের সেরকম কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে:

২০২৫

9.3.1 অপটিক্যাল ফাইবার

নতুন পৃথিবীর যোগাযোগের মাধ্যমে বৈদ্যুতিক তারকে অত্যন্ত সরু কাচের তন্তু দিয়ে পাল্টে দেওয়া হয়েছে। আগে যেখানে বৈদ্যুতিক সিগন্যাল দিয়ে তথ্য পাঠানো হতো এখন সেখানে আলোর সিগন্যাল দিয়ে তথ্য পাঠানো হয়। মুক্ত অবস্থায় আলো সরলরেখায় যায় কিন্তু ফাইবারে আলো আটকা পড়ে যায় বলে সেটাকে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে যেকোনো দিকে নেওয়া সম্ভব।

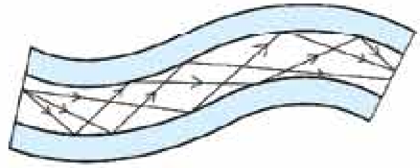

চিত্র 9.10: অপটিক্যাল ফাইবারে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের মাধ্যমে আলো যেতে পারে।

অপটিক্যাল ফাইবার অত্যন্ত সরু কাচের তন্তু, এর ভেতরের অংশকে বলে কোর (core), বাইরের অংশকে বলে ক্ল্যাড (clad)। দুটিই একই কাচ দিয়ে তৈরি হলেও ভেতরের অংশের (কোর) প্রতিসরণাঙ্ক বাইরের অংশ থেকে বেশি। এ কারণে আলোকে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের মাধ্যমে কোরের মাঝে আটকে রেখে অনেক দূরে নিয়ে যাওয়া যায়। (চিত্র 9.10) অপটিক্যাল ফাইবার দিয়ে আলো শত শত কিলোমিটার নিয়ে যাওয়া যায়, কারণ এই কাচের তন্তুতে আলোর শোষণ হয় খুবই কম। দৃশ্যমান আলো হলে শোষণ বেশি হতো বলে ফাইবারে লম্বা তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ইনফ্রারেড বা অবলাল রশ্মি ব্যবহার করা হয়।

শেষ অধ্যায়ে এন্ডোস্কোপি নামের চিকিৎসাবিজ্ঞানের একটি প্রক্রিয়ায় কীভাবে অপটিক্যাল ফাইবার ব্যবহার করা হয় সেটি বর্ণনা করা হয়েছে।

উদাহরণ

প্রশ্ন: অপটিক্যাল ফাইবারের কোরের প্রতিসরণাঙ্ক 1.50 এবং ক্ল্যাডের প্রতিসরণাঙ্ক 1.45 হলে (চিত্র 9.11) আলোকে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন হওয়ার জন্য কত ডিগ্রিতে আপতিত হতে হবে?

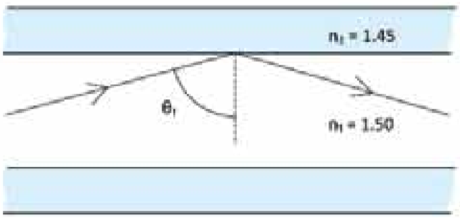

চিত্র 9.11: অপটিক্যাল ফাইবারের কোর থেকে ক্ল্যাডে আলোর পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন হয়।

উত্তর:

$$\theta_c = sin^{-1}\left(\frac{n_1}{n_2}\right)$$

এখানে

$n_1 = 1.45$ এবং $n_2 = 1.50$

$$\theta_c = sin^{-1}\left(\frac{1.45}{1.50}\right) = sin^{-1}(0.97) = 75°$$

কাজেই আলোক রশ্মিকে 75° কিংবা তার চেয়ে বেশি কোণে আপতিত হতে হবে।

9.3.2 পেরিস্কোপ ও বাইনোকুলার

আমরা সবাই জানি সাবমেরিনে পেরিস্কোপ থাকে এবং সেই পেরিস্কোপ দিয়ে পানির নিচ থেকে পানির উপরের দৃশ্য দেখা সম্ভব। সাধারণ আয়না দিয়ে যে ধরনের পেরিস্কোপ তৈরি করা যায় তার থেকে অনেক বেশি কার্যকর পেরিস্কোপ তৈরি করা হয় প্রিজম এবং তার পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন দিয়ে (চিত্র 9.12)। বাইনোকুলারের দৈর্ঘ্য কমানোর জন্যও এর ভেতরে প্রিজম দিয়ে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন করা হয়ে থাকে।

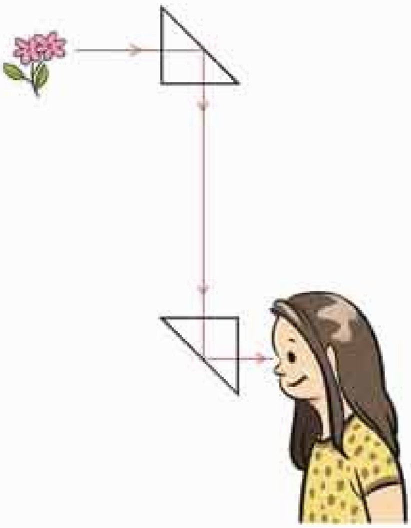

চিত্র 9.12: আধুনিক পেরিস্কোপে আয়নার পরিবর্তে প্রিজম ব্যবহার হয়।

9.3.3 প্রিজম

কোনো স্বচ্ছ মাধ্যমের দুই পৃষ্ঠ সমান্তরাল না হলে তাকে প্রিজম বলে। স্বচ্ছ সমান্তরাল মাধ্যমে যেদিকে আলো প্রবেশ করে সেই দিকের সাথে সমান্তরাল হয়ে আলোক রশ্মি বের হয়ে যায়। দিক অপরিবর্তিত থাকলেও আলোক রশ্মি মূল রশ্মি থেকে খানিকটা সরে যায়। প্রিজমের বেলায় আলোক রশ্মির দিক পাল্টে যায়। (চিত্র 9.13) প্রথম পৃষ্ঠ দিয়ে আলোক রশ্মিটি প্রবেশ করার সময় লম্বের দিকে বেঁকে যায়। যেহেতু দ্বিতীয় পৃষ্ঠটি সমান্তরাল নয় তাই সেই পৃষ্ঠ দিয়ে আলো বের হবার সময় লম্ব থেকে সরে গেলেও সেটি আর মূল দিকে ঘুরে যেতে পারে না।

প্রিজমে আলোর দিক পাল্টে যাবার ঘটনা ঘটলেও সেটি অন্য একটি কারণে আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ। প্রিজমে একটি আলোক রশ্মি প্রবেশ করার পর সেটি মূল দিক থেকে কতটুকু বেঁকে যাবে সেটি প্রিজমের প্রতিসরণাঙ্কের ওপর নির্ভর করে। আমরা আগেই বলেছি প্রতিসরণাঙ্ক আসলে আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বা রঙের ওপর নির্ভর করে। তাই ভিন্ন ভিন্ন রঙের জন্য প্রতিসরণাঙ্ক ভিন্ন, কাজেই একই আলোক রশ্মিতে ভিন্ন ভিন্ন রং থাকলে প্রিজমের ভেতর দিয়ে যাবার সময় সেই রঙের

২০২৫

আলোগুলো ভিন্ন ভিন্ন কোণে দিক পরিবর্তন করবে। কাজেই আমরা দেখব প্রিজম থেকে আলো বের হবার সময় তার রংগুলো আলাদা হয়ে গেছে, নিউটন যেটি প্রথম দেখিয়েছিলেন।

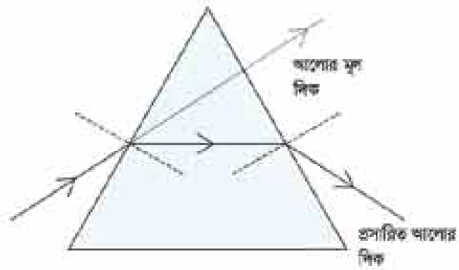

চিত্র 9.13: প্রিজমের আলোক রশ্মির দিক প্রিজমের ভূমির দিকে বেঁকে যায়।

9.3.4 লেন্স

আলোর প্রতিসরণ ব্যবহার করে লেন্স তৈরি করা হয়। এই লেন্স দিয়ে চশমা থেকে শুরু করে টেলিস্কোপ বা মাইক্রোস্কোপের মতো সূক্ষ্ম অপটিক্যাল যন্ত্রপাতি তৈরি করা হয়। ভিডিও প্রজেক্টর বা ক্যামেরাতেও লেন্স ব্যবহার করা হয়। এই অধ্যায়ে আমরা বিস্তৃতভাবে লেন্স, লেন্সের প্রকারভেদ এবং তার ধর্ম নিয়ে আলোচনা করব।

9.4 লেন্স ও তার প্রকারভেদ (Types of Lenses)

আমরা উত্তল এবং অবতল আয়না পড়ার সময় দেখেছি এই আয়নাগুলোর ভেতর দিয়ে আলো যাবার সময় কখনো একবিন্দুতে কেন্দ্রীভূত (অভিসারী রশ্মি) হয় আবার কখনো ছড়িয়ে পড়ে (অপসারী রশ্মি) এবং সে কারণে প্রতিবিম্বের তৈরি হয়। সেই প্রতিবিম্ব কখনো সত্যিকারের প্রতিবিম্ব হয় কখনো অবাস্তব হয়। কখনো ছোট হয় কখনো বড় হয়। আলোর এই প্রতিবিম্বকে নানাভাবে ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের অপটিক্যাল যন্ত্রপাতি তৈরি করা হয়ে থাকে।

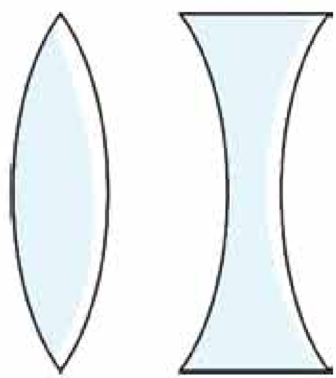

চিত্র 9.14: একটি উত্তল ও একটি অবতল লেন্সের প্রস্থচ্ছেদ

উত্তল এবং অবতল আয়না দিয়ে যে রকম নানা ধরনের প্রতিবিম্ব তৈরি করা হয় ঠিক সে রকম লেন্স দিয়েও নানা ধরনের প্রতিবিম্ব তৈরি হয় এবং নানাভাবে সেগুলো ব্যবহার হয়। আমরা সবাই লেন্স দেখেছি (তার কারণ চশমার কাচগুলো আসলে এক ধরনের লেন্স)। তোমাদের মাঝে যারা চশমা ব্যবহার করো কিংবা যারা অন্যদের চশমা ব্যবহার করতে দেখেছ তারা নিশ্চিতভাবেই লক্ষ করেছ যে চশমার লেন্সকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। এক ধরনের লেন্স দিয়ে ছোট জিনিসকে বড় দেখা যায়। (সাধারণত বয়স্কদের চশমার লেন্স এ রকম হয়।) আবার অন্য ধরনের লেন্স দিয়ে বড় জিনিসকে ছোট দেখা যায় (সাধারণত কম বয়সীদের চশমার লেন্স এ রকম

হয়)। যে লেন্স দিয়ে ছোট জিনিসকে বড় দেখা যায় সেগুলোকে উত্তল (convex) কিংবা (কদাচিৎ) অভিসারী লেন্স বলে। যে লেন্স দিয়ে বড় জিনিসকে ছোট দেখা যায় সেই লেন্সগুলোকে অবতল লেন্স (concave) কিংবা (কদাচিৎ) অপসারী লেন্স বলে। যে লেন্স দিয়ে ছোট জিনিসকে বড় দেখা যায় অর্থাৎ উত্তল লেন্সগুলোর মাঝখানের অংশ প্রান্ত থেকে পুরু হয়। আর অবতল লেন্সগুলোর মাঝখানের অংশ প্রান্ত থেকে সরু হয় 9.14 চিত্রটিতে যে রকম দেখানো হয়েছে। লেন্সের প্রস্থচ্ছেদের দিকে তাকালেই আমরা বুঝতে পারি উত্তল কিংবা অবতল লেন্সের দুটিই দুটি গোলীয় বৃত্ত দিয়ে সীমাবদ্ধ। এই দুটি গোলীয় বৃত্তের ব্যাসার্ধ সমানও হতে পারে ভিন্নও হতে পারে। এই বৃত্তগুলোর কেন্দ্রকে বক্রতার কেন্দ্র বলে। 9.15 চিত্রটিতে C_1 এবং C_2 বক্রতার কেন্দ্র।

দৈনন্দিন জীবনে বা বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে নানা ধরনের লেন্স ব্যবহার করা হয়। তবে আমরা

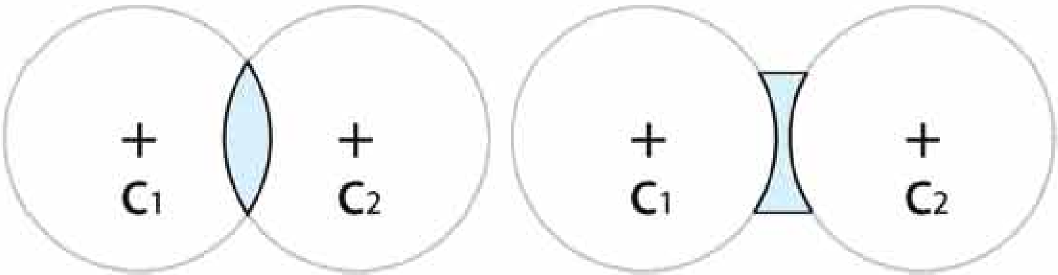

চিত্র 9.15: উত্তল এবং অবতল লেন্সকে দুটি গোলকের অংশ হিসেবে কল্পনা করা যায়

আমাদের এই বইয়ে আমাদের আলোচনা পাতলা লেন্সের মাঝে সীমাবদ্ধ রাখব। পাতলা লেন্স এবং পুরু লেন্সের পার্থক্য নামকরণ থেকেই বোঝা গেলেও আমরা পার্থক্যটুকু আরেকটু পরিষ্কার করে নিই। লেন্সের প্রস্থচ্ছেদের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই যদিও লেন্সের পৃষ্ঠদেশের এক ধরনের বক্রতা আছে কিন্তু ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় দুটি পৃষ্ঠ প্রায় সমান্তরাল। আমরা জানি সমান্তরাল পৃষ্ঠ দিয়ে আলো যাবার সময় প্রতিসরণের কারণে আলোক রশ্মিটি মূল দিক থেকে খানিকটা বিচ্যুৎ হয়ে যায় (চিত্র 9.16)।

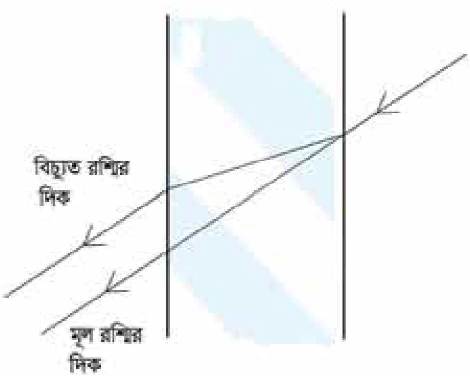

চিত্র 9.16: পুরু কাচের ভেতর দিয়ে যাবার সময় প্রতিসরণের কারণে মূল রশ্মি থেকে আলোক রশ্মি বিচ্যুত হয়।

সমান্তরাল পৃষ্ঠ দুটি যত পুরু হবে আলোক রশ্মিটি মূল রশ্মির দিক থেকে তত বেশি সরে যাবে। যদি সমান্তরাল পৃষ্ঠ দুটি খুব কাছাকাছি হয় তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি মূল আলোক রশ্মি যে দিক দিয়ে এসেছে মোটামুটি সেদিক দিয়েই

বের হয়েছে, তার কোনো বিচ্যুতি হয়নি। যেসব লেন্সের বেলায় তার কেন্দ্র দিয়ে আলোক রশ্মি যাবার সময় ধরে নেওয়া যায় যে রশ্মিটির দিক অপরিবর্তিত আছে সেই সব লেন্সকে পাতলা লেন্স বলে (চিত্র 9.17)। কিংবা একটু অন্যভাবে বলতে পারি পাতলা লেন্সের মাঝখানের যে বিন্দু দিয়ে আলোক রশ্মি যাবার সময় বেঁকে যায় না সেটি হচ্ছে লেন্সের কেন্দ্র (চিত্র 9.17, O বিন্দু) বা লেন্সের আলোকীয় কেন্দ্র (Optical Center)।

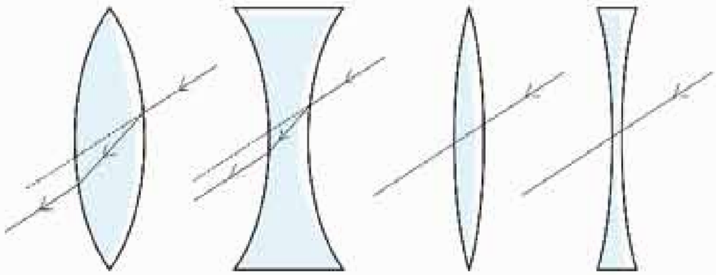

চিত্র 9.17: পুরু লেন্সে কেন্দ্র দিয়ে যাওয়া আলোক রশ্মি সমান্তরালভাবে বের হলেও একটু সরে যায়, পাতলা লেন্সে কেন্দ্র দিয়ে যাওয়া আলোক রশ্মি তার দিক পরিবর্তন না করে সোজাসুজি বের হয়ে যায়।

9.4.1 অবতল লেন্স (Concave lens)

উত্তল এবং অবতল আয়না আলোচনা করার সময় আমরা প্রথমে উত্তল আয়না নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। লেন্সের বেলায় আমরা প্রথমে অবতল লেন্স নিয়ে আলোচনা করি। কারণ উত্তল আয়নায় যে ধরনের প্রতিবিম্ব তৈরি হয় অবতল লেন্সে সেই একই ধরনের প্রতিবিম্ব তৈরি হয়।

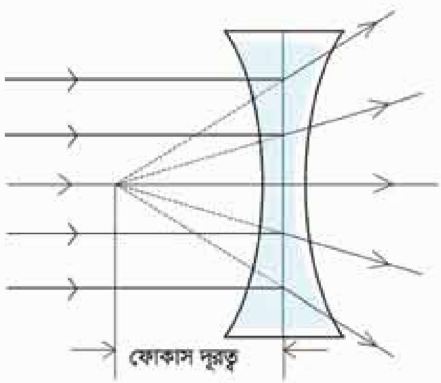

চিত্র 9.18: অবতল লেন্সের ভেতর দিয়ে যাবার সময় সমান্তরাল রশ্মি ছড়িয়ে পড়ে।

উত্তল আয়নার বেলায় আমরা দেখেছিলাম সেখানে সমান্তরাল আলো পড়লে সেটি প্রতিফলিত হবার সময় চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। অবতল লেন্সের বেলাতেও ঠিক এই ধরনের ব্যাপার ঘটে। এই লেন্সে সমান্তরাল আলো পড়লে প্রতিসরিত হবার সময় সেটি ছড়িয়ে পড়ে।

প্রতিসরিত আলোগুলো যদি আমরা পেছনের দিকে বাড়িয়ে নিই তাহলে মনে হবে সেগুলো বুঝি একটি বিন্দু থেকে সোজা ছড়িয়ে পড়ছে। সেই বিন্দুটিকে বলে ফোকাস বিন্দু এবং লেন্সের কেন্দ্র থেকে এই ফোকাস পয়েন্টের দূরত্বটিকে বলে ফোকাস দূরত্ব। (চিত্র 9.18)

উত্তল আয়নার বেলায় আমরা শুধু এক দিক থেকে আয়নার ওপর আলো ফেলতে পারতাম। লেন্সের বেলায় দুই দিক থেকেই আলো ফেলা যায়। প্রত্যেকটা লেন্সের একটা ফোকাস দূরত্ব থাকে। আলো যেদিক দিয়েই ফেলা হোক তার ফোকাস দূরত্ব সমান থাকে। সমান্তরাল আলো ফেলা হলে সেটি ছড়িয়ে পড়ে এবং মনে হয় সেটি বুঝি ফোকাস বিন্দু থেকে বিচ্ছুরিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। আলোক রশ্মির গতিপথ উল্টো করে দিলে এটি যেদিক দিয়ে এসেছে ঠিক সেদিক দিয়ে ফিরে যায়। তাই অবতল লেন্সের ছড়িয়ে যাওয়ার আলোর গতিপথ কোনোভাবে উল্টো করে দিতে পারলে সেটি সমান্তরাল হয়ে উল্টো দিকে বের হয়ে যাবে (চিত্র 9.19)।

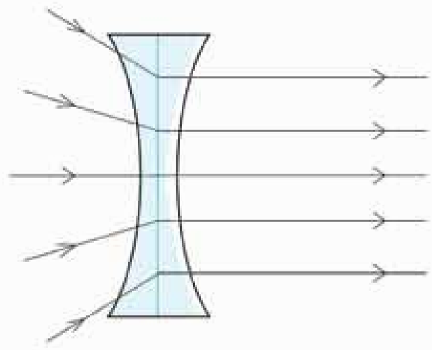

চিত্র 9.19: অবতল লেন্সের ভেতর দিয়ে যাবার সময় অভিসারী রশ্মি সমান্তরাল হয়ে যাবে।

অবতল লেন্সে কীভাবে প্রতিবিম্ব তৈরি হয় সেটি বোঝার জন্য আলোক রশ্মি অবতল লেন্সে কীভাবে প্রতিসরিত হয় সেটি জানতে হবে। সেটি নির্ভর করে আলোক রশ্মি কী কোণে অবতল লেন্সে এসে পড়ছে তার উপর। আমরা তিনটি বিশেষ আলোক রশ্মির প্রতিসরণের নিয়ম জানলেই কীভাবে প্রতিবিম্ব তৈরি হয় সেটি ব্যাখ্যা করতে পারব:

(i) আলোক রশ্মি কেন্দ্রমুখী হলে (চিত্র 9.20, YO কিংবা XO রশ্মি) সেটি প্রতিসরণের পর সোজাসুজি চলে যায়।

(ii) প্রধান অক্ষের সমান্তরাল (চিত্র 9.20, XP) রশ্মিটি প্রতিসরণের পর মনে হবে যেন রশ্মিটি (PS) ফোকাস বিন্দু (F) থেকে আসছে।

(iii) আলোক রশ্মির দিক পরিবর্তন করা হলে এটি যেদিক থেকে এসেছে ঠিক সেদিক দিয়ে ফিরে যায়। কাজেই কোনো আলোক রশ্মি (চিত্র 9.20, SP) ফোকাস অভিমুখী হলে সেটি প্রধান অক্ষের সাথে সমান্তরাল হয়ে (PX) প্রতিসরিত হবে।

আমরা এখন ইচ্ছে করলে অবতল লেন্সে একটা বস্তুর প্রতিবিম্ব কেমন হবে সেটা বের করতে পারি। ধরা যাক একটা বস্তু XY একটা অবতল লেন্সের কাছে রাখা হয়েছে। (চিত্র 9.20) বিশ্লেষণটি সহজ করার জন্য ধরে নিয়েছি বস্তুটির Y বিন্দুটি লেন্সের মূল অক্ষ YR এর উপরে। বস্তুটির কোন বিন্দুর প্রতিবিম্বটি কোথায় হবে সেটি বের করার জন্য সেই বিন্দু থেকে অন্তত দুটি রশ্মি আঁকা দরকার।

তবে Y বিন্দু থেকে দুটি রশ্মি না এঁকেও আমরা প্রতিবিম্বটি বের করতে পারব। Y বিন্দু থেকে YR অক্ষ বরাবর একটি রশ্মি আঁকা সম্ভব, তাই আমরা জানি Y বিন্দুটির প্রতিবিম্ব এই অক্ষের ওপর তৈরি হবে। X বিন্দুটির প্রতিবিম্ব থেকে অক্ষের ওপর লম্বটি এঁকে নিলেই আমরা Y বিন্দুর প্রতিবিম্ব পেয়ে যাব।

X বিন্দু থেকে দুটি রশ্মি কল্পনা করি, একটি অক্ষের সাথে সমান্তরাল XP সেটি লেন্স থেকে বের হওয়ার সময় ছড়িয়ে যাবে এবং যেহেতু মনে হবে ফোকাস থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে তাই ফোকাস F থেকে P পর্যন্ত একটি রেখা টেনে বর্ধিত করলেই সেই রশ্মিটি পেয়ে যাব। দ্বিতীয় রশ্মিটি X বিন্দু থেকে লেন্সের কেন্দ্রের দিকে এঁকে নিই। পাতলা লেন্সের নিয়ম অনুযায়ী এটি সরাসরি XT দিকে বের হয়ে যাবে। XT এবং FS রেখা দুটি যে বিন্দুতে ছেদ করবে সেটিই হচ্ছে X এর প্রতিবিম্ব X', X' থেকে অক্ষের ওপর লম্ব আঁকলে আমরা XY এর প্রতিবিম্ব X'Y' পেয়ে যাব।

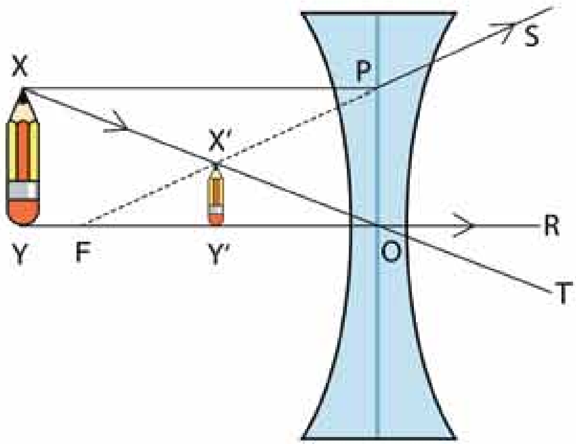

চিত্র 9.20: অবতল লেন্সে একটি বস্তুকে ছোট দেখায়।

উত্তল আয়নার বেলায় আমরা যা দেখেছিলাম অবতল লেন্সের প্রতিবিম্বের বেলাতেও সেটি সত্যি

(a) এটার অবস্থান হবে লেন্সের কেন্দ্র এবং ফোকাস বিন্দুর মাঝখানে
(b) এটা অবাস্তব
(c) এটা সোজা এবং এটা
(d) ছোট।

9.4.2 উত্তল লেন্স (Convex Lens)

উত্তল লেন্সের প্রতিবিম্বগুলো অনেক চমকপ্রদ। অবতল আয়নায় আমরা যে ধরনের প্রতিবিম্ব পেয়েছিলাম উত্তল লেন্সে ঠিক সেই একই ধরনের প্রতিবিম্ব পাওয়া যায়।অবতল আয়নায় আমরা দেখেছিলাম তার ওপর সমান্তরাল রশ্মি ফেলা হলে সেটি ফোকাস বিন্দুতে এসে কেন্দ্রীভূত হয়। উত্তল লেন্সেও ঠিক একই ব্যাপার ঘটে, সমান্তরাল রশ্মি ফেলা হলে সেগুলো এই লেন্সের ফোকাস বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত হয় (চিত্র 9.21) এবং তারপর আবার ছড়িয়ে যায়।

কাজেই আগের যুক্তি ব্যবহার করে বলা যায় যদি কোনো বিন্দু থেকে আলো বিচ্ছুরিত হয় এবং একটা উত্তল লেন্সের ফোকাস বিন্দুতে সেই বিচ্ছুরিত আলো উৎসটাকে (চিত্র 9.22) রাখা যায় তাহলে আলোটা লেন্সের ভেতর দিয়ে যাবার সময় সমান্তরাল রশ্মি হয়ে যাবে। (আলোর বেলায় এটি সব সময় সত্যি, এটি যদি A থেকে B তে যায় তাহলে রশ্মির দিক পরিবর্তন করে দিলে এটি সব সময় B থেকে A তে যাবে।) এখন আমরা ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানে একটা বস্তু থাকলে তার প্রতিবিম্ব কোথায় হবে সেটি বের করে ফেলি।

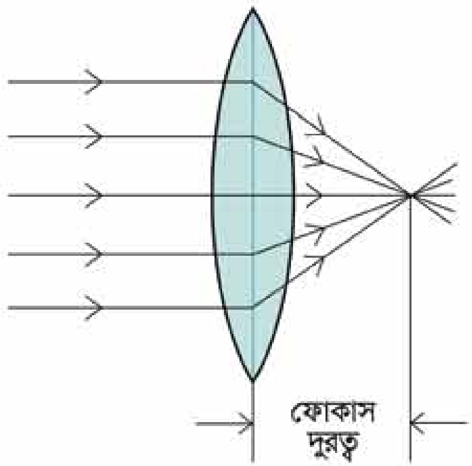

চিত্র 9.21: উত্তল লেন্সের ভেতর দিয়ে যাবার সময় সমান্তরাল রশ্মি ফোকাস বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত হয়।

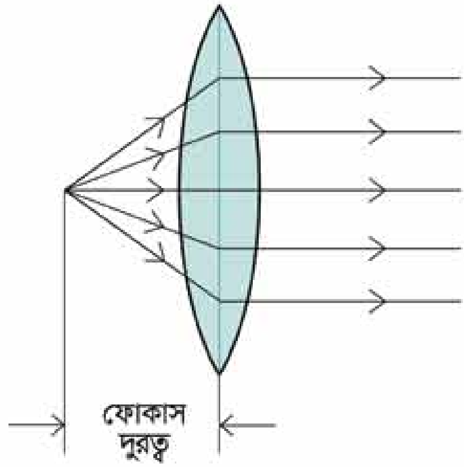

চিত্র 9.22: ফোকাস দূরত্বে আলোক বিন্দু রাখা হলে উত্তল লেন্স সেটিকে সমান্তরাল রশ্মিতে পরিণত করে।

সেটি শুরু করার আগে আমরা আলোক রশ্মি উত্তল লেন্সে কীভাবে প্রতিসরিত হয় সেটি জেনে নিই। উত্তল লেন্সে তিনটি বিশেষ আলোক রশ্মির প্রতিসরণের নিয়ম জানলেই কীভাবে প্রতিবিম্ব তৈরি হয় সেটি ব্যাখ্যা করতে পারব:

(i) আলোক রশ্মি কেন্দ্রমুখী হলে (চিত্র 9.23, YO কিংবা XO রশ্মি) সেটি প্রতিসরণের পর সোজাসুজি চলে যায়।

(ii) প্রধান অক্ষের সমান্তরাল (চিত্র 9.23, XQ) রশ্মিটি প্রতিসরণের পর ফোকাস বিন্দু (F) দিয়ে যাবে (CT)।

(iii) আলোক রশ্মির দিক পরিবর্তন করা হলে এটি যেদিক থেকে এসেছে ঠিক সেদিক দিয়ে ফিরে যায়। কাজেই কোনো আলোক রশ্মি (চিত্র 9.23, TC) ফোকাস দিয়ে গেলে সেটি প্রধান অক্ষের সাথে সমান্তরাল হয়ে (CX) প্রতিসরিত হবে।

এবারে আমরা উত্তল লেন্সের জন্য প্রতিবিম্ব তৈরি করতে পারব।

ফোকাস দূরত্ব থেকে কম দূরত্ব

প্রথমে ধরা যাক একটি বস্তু XY কে লেন্স এবং তার ফোকাস বিন্দুর F মাঝখানে রাখা হলো। (চিত্র 9.23) আগে যেভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে ঠিক সেই একই যুক্তিতে বলতে পারি Y বিন্দুর প্রতিবিম্বটি YOF অক্ষ রেখার ওপর হবে। X বিন্দুটির প্রতিবিম্ব X' থেকে এই অক্ষের ওপর লম্ব আঁকা হলেই আমরা Y এর প্রতিবিম্বের অবস্থান পেয়ে যাব।

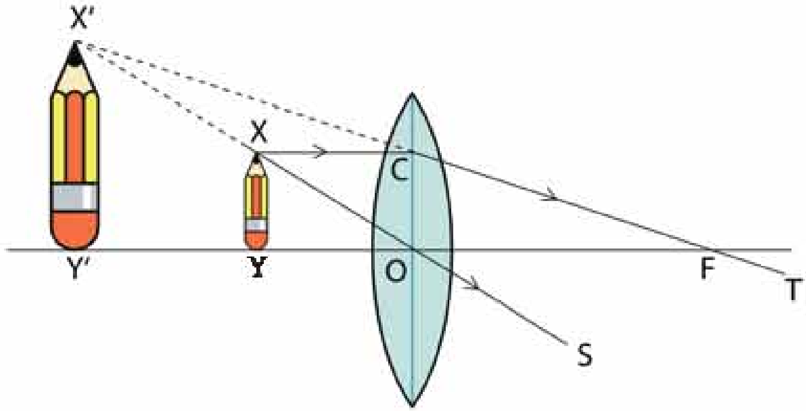

চিত্র 9.23: ফোকাস দূরত্বের ভেতরে বস্তু রাখা হলে উত্তল লেন্সে বড় প্রতিবিম্ব দেখা যায়।

এবারে X বিন্দু থেকে দুটি রশ্মি আঁকি, অক্ষের সাথে সমান্তরাল XC রেখাটি ফোকাস বিন্দু F এর ভিতর দিয়ে T এর দিকে যাবে। X বিন্দু থেকে রশ্মি লেন্সের কেন্দ্রবিন্দু দিয়ে আঁকা হলে সেটি সোজা সরলরেখায় XO হয়ে S এর দিকে যাবে। দেখতেই পাচ্ছ CFT এবং XOS রেখা দুটি সামনে গিয়ে মিলিত হতে পারবে না। যার অর্থ বাস্তব প্রতিবিম্ব তৈরি হবার কোনো সুযোগ নেই। রেখা দুটো পেছন দিকে বাড়িয়ে দিলে যে X' বিন্দুতে মিলিত হবে সেটাই X বিন্দুর প্রতিবিম্ব।

এই বিন্দু থেকে YF রেখার উপর লম্ব আঁকা হলে Y' বিন্দুতে স্পর্শ করে সেটা Y বিন্দুর প্রতিবিম্ব।

দেখাই যাচ্ছে XY বস্তুটি যতই লেন্সের কাছাকাছি আনা হবে প্রতিবিম্বটি ততই বড় হতে থাকবে। আবার বস্তুটি যতই ফোকাস বিন্দু F এর কাছাকাছি আনা হবে প্রতিবিম্বটি ততই বড় হতে থাকবে। বস্তুটি যখন ঠিক ফোকাস বিন্দু F এর ওপর হবে তখন প্রতিবিম্বটির আকার হবে অসীম। আমরা এখন বলতে পারি যদি একটা উত্তল লেন্সের কেন্দ্রবিন্দু এবং ফোকাস বিন্দুর মাঝখানে একটি বস্তু রাখা হয় তাহলে বস্তুটির প্রতিবিম্ব

(a) যে দিকে বস্তুটি রয়েছে সেই দিকেই তৈরি হবে
(b) প্রতিবিম্বটি হবে অবাস্তব
(c) সোজা এবং
(d) বড়।

ফোকাস দূরত্বের বাইরে

এবারে আমরা দেখি বস্তুটি ফোকাস দূরত্ব থেকে বাইরে রাখলে কী হয়। অবতল আয়নার মতো এখানেও তিনটি ভিন্ন ভিন্ন বিষয় হতে পারে। (i) বস্তুটি ফোকাস দূরত্বের বাইরে কিন্তু দ্বিগুণ ফোকাস দূরত্বের ভেতরে (ii) বস্তুটি দ্বিগুণ ফোকাস দূরত্বের বাইরে এবং (iii) বস্তুটি ঠিক দ্বিগুণ ফোকাস দূরত্বে। একটি একটি করে দেখা যাক।

(i) প্রথমে বস্তুটিকে ফোকাস দূরত্বের বাইরে কিন্তু ফোকাস দূরত্বের দ্বিগুণ দৈর্ঘ্যের ভেতরে রাখা হবে। 9.24 চিত্রটিতে XY বস্তুটির Y বিন্দুর প্রতিবিম্বটি YO রেখার উপরে হবে তাই আগের মতো আমরা শুধু X বিন্দুটির প্রতিবিম্ব বের করি। X বিন্দু থেকে অক্ষের সাথে সমান্তরাল রশ্মিটি ফোকাস বিন্দু F এর ভেতর দিয়ে যাবে। লেন্সের কেন্দ্রবিন্দু দিয়ে অন্য একটি রশ্মি XO সরলরেখায় যাবে। দুটি রেখা যেখানে ছেদ করবে সেই X′ বিন্দুটি হচ্ছে X এর প্রতিবিম্ব। X′ থেকে অক্ষ YO রেখার ওপর লম্ব আঁকা হলে Y′ বিন্দুটি হবে Y এর প্রতিবিম্বের অবস্থান। কাজেই X′Y′ হচ্ছে XY এর প্রতিবিম্ব। অর্থাৎ এই প্রতিবিম্বের জন্য আমরা বলতে পারি:

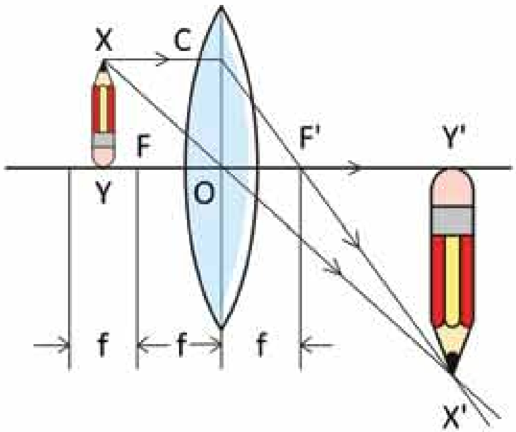

চিত্র 9.24: ফোকাস দূরত্বের বাইরে কিন্তু দ্বিগুণ ফোকাস দূরত্বের ভেতরে বস্তু রাখা হলে তার বাস্তব উল্টো বড় প্রতিবিম্ব তৈরি হয়।

(a) প্রতিবিম্বটির অবস্থান হবে ফোকাস দূরত্বের দ্বিগুণ দূরত্বের বাইরে
(b) বাস্তব
(c) উল্টো
(d) এবং বস্তুর আকার থেকে বড়

(ii) এবারে আমরা দেখি বস্তুটি ফোকাস দূরত্বের ঠিক দ্বিগুণ দূরত্বে রাখা হলে কী হয়। দেখতেই পাচ্ছি XY বস্তুটি যদি ঠিক ফোকাস দূরত্বের দ্বিগুণ দূরত্বে (চিত্র 9.25) রাখা হয় তাহলে প্রতিবিম্বটির আকার হবে XY বস্তুটির সমান এবং প্রতিবিম্বটির অবস্থান হবে লেন্সের কেন্দ্র থেকে ঠিক সমান দূরত্বে। বস্তুটি যতই ফোকাস বিন্দুর কাছাকাছি আনা হতে থাকবে প্রতিবিম্বটি ততই দূরে তৈরি হবে

এবং তার আকার বড় হতে থাকবে। যেহেতু এই প্রতিবিম্বের ভেতর দিয়ে সত্যিকার আলোক রশ্মি যায় তাই এটি বাস্তব প্রতিবিম্ব এবং ছবিটিতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে প্রতিবিম্বটি উল্টো অর্থাৎ:

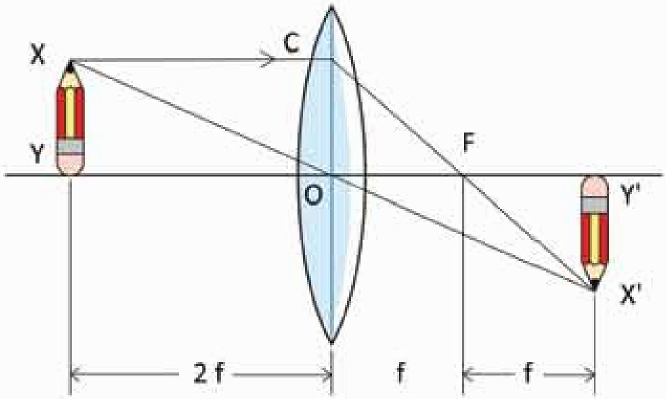

চিত্র 9.25: ঠিক ফোকাস দূরত্বের দ্বিগুণ দূরত্বে কোনো বস্তু রাখা হলে তার প্রতিবিম্বটি হবে বস্তুটির সমান।

(a) প্রতিবিম্বটির অবস্থান হবে ফোকাস দূরত্বের দ্বিগুণ দূরত্বে
(b) বাস্তব
(c) উল্টো
(d) এবং বস্তুর সমান

(iii) এখন আমরা দেখি বস্তুটি যদি ফোকাস দূরত্বের দ্বিগুণ দূরত্বের বাইরে থাকে তাহলে তার কী ধরনের প্রতিবিম্ব কোথায় তৈরি হয়।

এই প্রতিবিম্বটি আঁকার পদ্ধতি ঠিক আগেরটির মতো শুধু (চিত্র 9.26) বস্তুটিকে বসাতে হবে ফোকাস দূরত্বের দ্বিগুণ দূরত্বের বাইরে। আমরা আগেই বলেছি বস্তুটি যদি ফোকাস দূরত্বের দ্বিগুণ দূরত্বে রাখা হয় তাহলে তার সমদূরত্বে সমান আকারের একটা প্রতিবিম্ব তৈরি হয়। যতই বস্তুটা দূরে

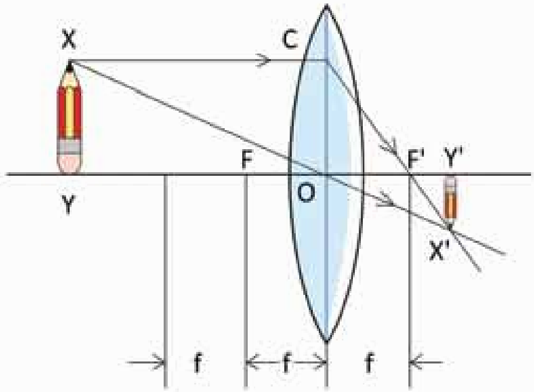

চিত্র 9.26: দ্বিগুণ ফোকাস দূরত্বের বাইরে বস্তু রাখা হলে তার ছোট উল্টো বাস্তব প্রতিবিম্ব তৈরি হয়।

সরিয়ে নেওয়া হতে থাকে প্রতিবিম্বটি ততই ছোট হতে থাকে এবং ফোকাস বিন্দুর দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। বস্তুটি যদি অসীম দূরত্বে সরিয়ে নেওয়া হয় তাহলে তার প্রতিবিম্বটি তৈরি হবে ঠিক ফোকাস বিন্দুতে। কাজেই ফোকাস দূরত্বের দ্বিগুণ দূরত্বের বাইরে কোনো বস্তু রাখা হলে বস্তুটির

(a) প্রতিবিম্বের অবস্থান হয় ফোকাস দূরত্ব এবং ফোকাস দূরত্বের দ্বিগুণ দূরত্বের মাঝখানে
(b) বাস্তব
(c) উল্টো
(d) ছোট।

উদাহরণ

প্রশ্ন: উত্তল লেন্সের ফোকাস দূরত্বের বাইরে কোনো বস্তু রাখা হলে তার বাস্তব প্রতিবিম্ব তৈরি হয়। প্রতিবিম্বটির জায়গায় বস্তুটি রাখা হলে তার প্রতিবিম্ব কোথায় হবে?

উত্তর: আলোর রশ্মির দিক পরিবর্তন করলে একটি অন্যটিতে পরিবর্তিত হয়।

নিজে করো

উত্তল লেন্সে যদি বহুদূর থেকে কোনো বস্তুর আলো এসে পড়ে তাহলে সেটি লেন্সের ফোকাস বিন্দুতে তার প্রতিবিম্ব তৈরি করে। এই পদ্ধতি ব্যবহার করে তুমি উত্তল লেন্সের ফোকাস দূরত্ব বের করতে পারবে। এটি করার জন্য তুমি একটা দেয়ালের সামনে তোমার লেন্সটি ধরে সামনে-পেছনে নিতে থাকো যতক্ষণ পর্যন্ত না দেয়ালে প্রতিবিম্বটা স্পষ্ট হয়। যখন প্রতিবিম্বটি স্পষ্ট হবে তখন লেন্স থেকে দেয়ালের দূরত্বটি মেপে নাও, এটিই হচ্ছে এই লেন্সের ফোকাস দূরত্ব।

যদি তোমার কাছে কোনো উত্তল লেন্স না থাকে তাহলে চশমার কাচ দিয়ে পরীক্ষা করতে পারো। বয়স্ক মানুষের চশমার কাচ অনেক সময় উত্তল লেন্স দিয়ে তৈরি হয়। যদি চশমার কাচ দিয়ে কাছাকাছি বস্তুকে বড় দেখায় বুঝে নেবে এটি উত্তল লেন্স।

9.4.3 লেন্সের ক্ষমতা

লেন্সের সবচেয়ে প্রচলিত ব্যবহার আমরা দেখি চশমার মাঝে। তোমরা যদি বিভিন্ন মানুষের চশমার লেন্স পরীক্ষা করে দেখো তাহলে দেখবে কারো কারো চশমার লেন্স তৈরি হয় উত্তল লেন্স দিয়ে, কারো কারো চশমার লেন্স তৈরি হয় অবতল লেন্স দিয়ে। আমরা লেন্সগুলোকে প্রায় সময়ই পাওয়ার

দিয়ে ব্যাখ্যা করি। তোমরা নিশ্চয়ই বলেছ কিংবা বলতে শুনেছ, অমুকের চশমার পাওয়ার অনেক বেশি। পাওয়ার কথাটি দিয়ে আমরা কী বোঝানোর চেষ্টা করি?

পাওয়ারের ধারণাটি এসেছে লেন্স দিয়ে বড় এবং ছোট দেখার ব্যাপারটি থেকে। দুটি উত্তল লেন্স দিয়ে যদি একটি জিনিসকে লেন্সের কাছাকাছি একই দূরত্বে রেখে দেখি এবং একটি লেন্সে জিনিসটি অন্য লেন্সটি থেকে বড় দেখায় তাহলে যে লেন্সটিতে বড় দেখায় আমরা বলি সেই লেন্সের পাওয়ার বেশি। তোমরা একটু চিন্তা করলেই দেখবে আসলে যে লেন্সের ফোকাস দূরত্ব যত কম সেই লেন্সে জিনিসটিকে তত বড় দেখাবে। (চিত্র 9.27)

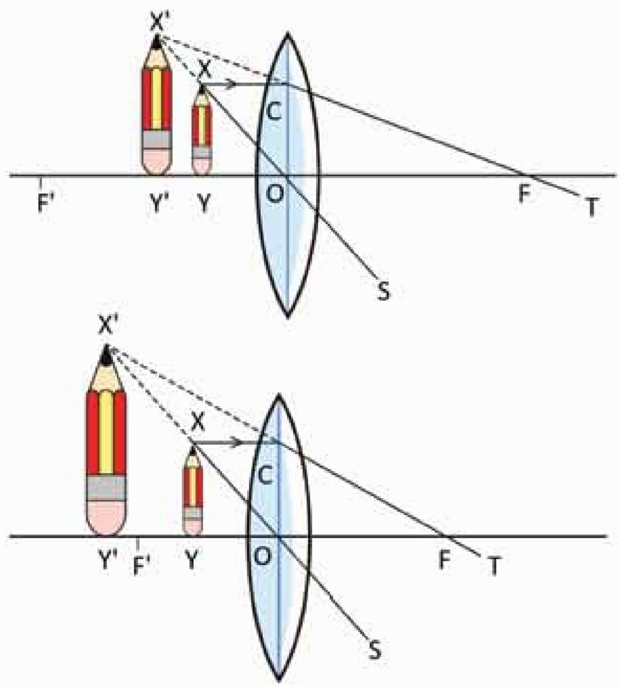

চিত্র 9.27: যে লেন্সের ফোকাস দূরত্ব যত কম সেই লেন্সে জিনিসটিকে তত বড় দেখায়।

কাজেই লেন্সের পাওয়ার P হচ্ছে ফোকাস দূরত্বের ব্যস্তানুপাতিক। যদি ফোকাস দূরত্ব f মিটারে দেওয়া হয় তাহলে পাওয়ার P এর একক ডায়াপটার। অর্থাৎ তোমার পরিচিত কারো চশমার পাওয়ার যদি হয় 2.5 (সাধারণ কথাবার্তায় ডায়াপটার শব্দটা কেউ ব্যবহার করে না।) তাহলে তার চশমার লেন্সের ফোকাস দূরত্ব হবে

$$f = \frac{1}{P} = \frac{1}{2.5}\ \mathrm{m} = 0.4\ \mathrm{m}\ (\text{এককটি মিটারে})$$

পাওয়ারের ধারণাটি শুধু উত্তল লেন্সের বড় দেখানোর জন্য নয়। অবতল লেন্সে ছোট দেখানোর সময়ও একই পাওয়ার শব্দটি ব্যবহার করা হয়। যে অবতল লেন্সে বস্তুকে (সমান দূরত্বে) যত ছোট দেখা যাবে বুঝতে হবে তার পাওয়ার তত বেশি বা ফোকাস দূরত্ব তত ছোট। উত্তল লেন্সের বেলায় পাওয়ার ধনাত্মক বা পজিটিভ, অবতল লেন্সের বেলায় পাওয়ার ঋণাত্মক বা নেগেটিভ এটাই হচ্ছে পার্থক্য।

9.5 চোখের ক্রিয়া (Function of the Eye)

9.5.1 আমরা কীভাবে দেখতে পাই

চোখের উপাদানগুলোর মাঝে রয়েছে রেটিনা, চোখের লেন্স, অ্যাকুয়াস হিউমার, ভিট্রিয়াস হিউমার এবং কর্নিয়া (চিত্র 9.28)। তোমরা লেন্স কীভাবে কাজ করে তার একটি ধারণা পেয়েছ। তাই নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ চোখের লেন্সও একটি উত্তল লেন্সের মতো কাজ করে। আমরা দেখেছি উত্তল বা অভিসারী লেন্স সব সময় উল্টো প্রতিবিম্ব তৈরি করে। ক্যামেরায় ছবি তোলার জন্য এভাবে প্রতিবিম্ব তৈরি করা হয়। যখনই আমাদের সামনে কোনো বস্তু থাকে, তখন ঐ বস্তুর থেকে আলোক রশ্মি এই লেন্স দ্বারা প্রতিসারিত হয় এবং রেটিনার ওপর একটি উল্টো প্রতিবিম্ব তৈরি করে। রেটিনার ওপর আলো পড়লে স্নায়ুর সাথে সংযুক্ত আলোকসংবেদী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষগুলো সেই আলো গ্রহণ করে তাকে তড়িৎ বা বিদ্যুৎ সিগন্যালে পরিণত করে। স্নায়ু এই বিদ্যুৎ বা তড়িৎ সিগন্যালকে তাৎক্ষণিকভাবে অপটিক নার্ভ বা অক্ষি স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কে পাঠায়। মস্তিষ্ক রেটিনায় সৃষ্ট উল্টো প্রতিবিম্বকে সোজা করে নেয় বলে আমরা বস্তুটির যে রকম থাকে সেরকমই দেখি। চোখের ভেতরে আলোর পরিমাণ বাড়ানো কিংবা কমানোর জন্য রয়েছে আইরিশ। তোমরা যারা আগে কখনো লক্ষ করোনি তারা চোখের ওপর টর্চলাইটের আলো ফেলে দেখতে পারো আইরিশটা কী চমৎকারভাবে সংকুচিত হয়ে পিউপিলটাকে ছোট করে ফেলে।

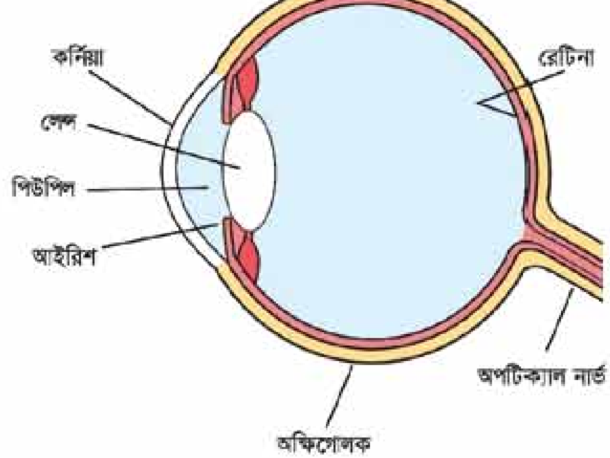

চিত্র 9.28: চোখের বিভিন্ন অংশ

9.5.2 চোখের উপযোজন

কোনো কিছু ভালো করে দেখার জন্য আমরা সেটিকে আমাদের চোখের কাছে নিয়ে আসি। তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ চোখের বেশি কাছে নিয়ে আসা হলে আবার সেটি অস্পষ্ট হতে শুরু করে। মানুষের চোখের লেন্স অনেক চমকপ্রদ, এর সাথে মাংসপেশি লাগানো থাকে এবং এই মাংসপেশি লেন্সটাকে টেনে কিংবা ঠেলে পুরু কিংবা সরু করে ফোকাস দৈর্ঘ্য বাড়াতে কিংবা কমাতে পারে।

কাজেই রেটিনার ওপর স্পষ্ট প্রতিবিম্ব তৈরি করার জন্য লেন্সটি সব সময়ই তার ফোকাস দৈর্ঘ্য বাড়িয়ে কিংবা কমিয়ে যাচ্ছে। তোমরা নিজেরা খুব সহজে এটা পরীক্ষা করতে পারো, চোখের সামনে একটি আঙুল রেখে একই সাথে এই আঙুলটি এবং দূরের কিছু দেখার চেষ্টা করো। যখন আঙুলটি স্পষ্ট করে দেখবে তখন দূরের জিনিসটি ঝাঁপসা দেখাবে আবার দূরের জিনিসটি যখন স্পষ্ট দেখাবে তখন আঙুলটি ঝাঁপসা দেখাবে। যেকোনো দুরত্বের কোনো লক্ষ্যবস্তু দেখার জন্য চোখের লেন্সের ফোকাস দূরত্ব নিয়ন্ত্রণ করার এই ক্ষমতাকে চোখের উপযোজন বলে।

9.5.3 স্পষ্ট দৃষ্টির ন্যূনতম দূরত্ব

লক্ষ্যবস্তু চোখের কাছাকাছি একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব থেকে বেশি কাছে এলে আর স্পষ্ট দেখা যায় না। চোখের সবচেয়ে কাছে যে বিন্দু পর্যন্ত লক্ষ্যবস্তুকে খালি চোখে স্পষ্ট দেখা যায়, তাকে স্পষ্ট দৃষ্টির নিকট বিন্দু বলে এবং চোখ থেকে ঐ বিন্দুর দূরত্বকে স্পষ্ট দৃষ্টির ন্যূনতম দূরত্ব ধরে নেওয়া হয়। এই দূরত্ব মানুষের বয়সের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। একজন শিশুর এই দূরত্ব 5 সেন্টিমিটারের কাছাকাছি এবং একজন স্বাভাবিক বয়স্ক লোকের এই দূরত্ব 25 সেন্টিমিটার পর্যন্ত হতে পারে।

সবচেয়ে বেশি যে দূরত্বে কোনো বস্তু থাকলে সেটি স্পষ্ট দেখা যায় সেটাকে চোখের দূরবিন্দু বলে। স্বাভাবিক চোখের জন্য দূরবিন্দু অসীম, যে কারণে আমরা কয়েক আলোকবর্ষ দূরের নক্ষত্রও স্পষ্ট দেখতে পাই।

9.5.4 চোখের ত্রুটি এবং তার প্রতিকার

আমরা জানি সুস্থ এবং স্বাভাবিক চোখ "নিকট বিন্দু" (Near point) থেকে শুরু করে অসীম দূরত্বের দূরবিন্দুর মাঝখানে যে স্থানেই কোনো বস্তু থাকুক না কেন সেটা স্পষ্ট দেখতে পারে। এটাই চোখের স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি। এই স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি ব্যাহত হলেই তাকে চোখের দৃষ্টির ত্রুটি বলা হয়।

চোখের দৃষ্টির অনেক ধরনের ত্রুটি থাকলেও আমরা প্রধান দুটি ত্রুটি নিয়ে আলোচনা করব। সেই দুটি হচ্ছে;

(a) হ্রস্বদৃষ্টি বা ক্ষীণদৃষ্টি
(b) দীর্ঘদৃষ্টি বা দূরদৃষ্টি

হ্রস্বদৃষ্টি বা ক্ষীণদৃষ্টি (Myopia or Nearsightedness)

যখন চোখ কাছের বস্তু দেখতে পায় কিন্তু দূরের বস্তু দেখতে পায় না, তখন চোখের এই ত্রুটিকে হ্রস্বদৃষ্টি বলে। এরূপ চোখের দূরবিন্দুটি অসীম দূরত্ব না হয়ে কাছে থাকে এবং বস্তুকে স্পষ্ট দৃষ্টির

ন্যূনতম দূরত্ব থেকে আরও কাছে আনলে অধিকতর স্পষ্ট দেখায়। নিম্নলিখিত দুটি কারণে এই ত্রুটি হয়ে থাকে।

(i) চোখের লেন্সের অভিসারী শক্তি বৃদ্ধি পেলে বা ফোকাস দূরত্ব কমে গেলে ও
(ii) কোনো কারণে অক্ষিগোলকের ব্যাসার্ধ বৃদ্ধি পেলে।

এর ফলে দূরের বস্তু থেকে আসা আলোক রশ্মি চোখের লেন্সের মধ্য দিয়ে প্রতিসরণের পর রেটিনার উপরে প্রতিবিম্ব তৈরি না করে একটু সামনে (F) প্রতিবিম্ব তৈরি করে (চিত্র 9.29 a)। ফলে চোখ বস্তুটি স্পষ্ট দেখতে পায় না।

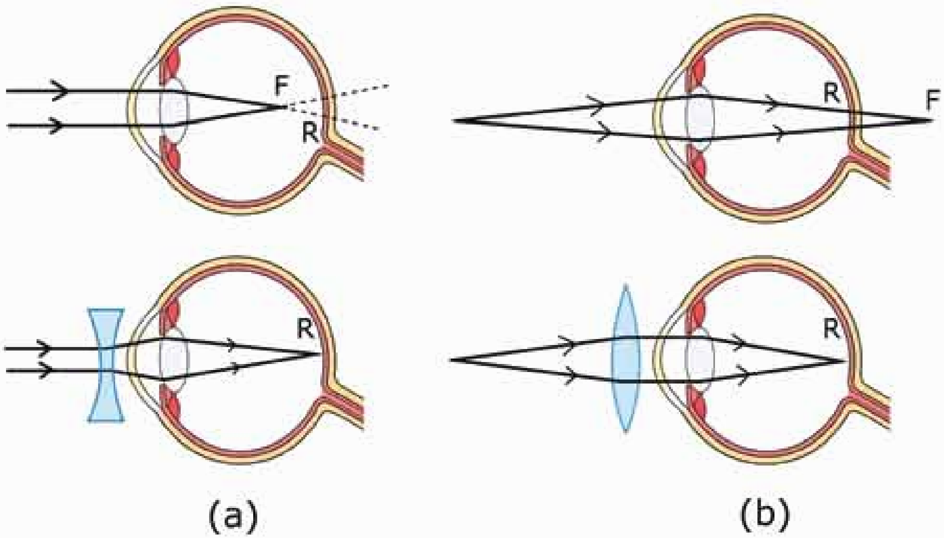

চিত্র 9.29: চোখের লেন্স রেটিনার সঠিক জায়গায় প্রতিবিম্ব তৈরি করতে না পারলে লেন্স ব্যবহার করে সেই সমস্যা মেটানো সম্ভব।

প্রতিকার

এই ত্রুটি দূর করার জন্য এমন একটি অবতল লেন্সের চশমা ব্যবহার করতে হবে। চশমার এই লেন্সের অপসারী ক্রিয়া চোখের উত্তল লেন্সের অভিসারী ক্রিয়ার বিপরীত, কাজেই চোখের ফোকাস দূরত্ব বেড়ে যাবে বলে প্রতিবিম্বটি আরো পেছনে তৈরি হবে। অর্থাৎ অসীম দূরত্বের বস্তু থেকে আসা সমান্তরাল আলোক রশ্মি চশমার অবতল লেন্স (চিত্র 9.29a) এর মধ্য দিয়ে চোখে পড়ার সময়

প্রয়োজনমতো অপসারিত হয়। এই অপসারিত রশ্মিগুলো চোখের লেন্সে প্রতিসরিত হয়ে ঠিক রেটিনা বা অক্ষিপট R এর স্পষ্ট প্রতিবিম্ব তৈরি করে।

দীর্ঘদৃষ্টি বা দূরদৃষ্টি (Hypermetropia or Farsightedness)

যখন কোনো চোখ দূরের বস্তু দেখে কিন্তু কাছের বস্তু দেখতে পায় না তখন এই ত্রুটিকে দীর্ঘদৃষ্টি বলে। সাধারণত বয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যে এই ত্রুটি দেখা যায়। নিম্নলিখিত দুটি কারণে এই ত্রুটি ঘটে।

(i) চোখের লেন্সের অভিসারী ক্ষমতা হ্রাস পেলে বা চোখের লেন্সের ফোকাস দূরত্ব বেড়ে গেলে।
(ii) কোনো কারণে অক্ষিগোলকের ব্যাসার্ধ কমে গেলে।

এর ফলে দূর থেকে আসা আলো সঠিকভাবে চোখের রেটিনাতে প্রতিবিম্ব তৈরি করলেও কাছাকাছি বিন্দু থেকে আসা আলোক রশ্মি চোখের লেন্সের মধ্য দিয়ে প্রতিসরণের পর রেটিনার ঠিক উপরে না হয়ে পেছনে (F) বিন্দুতে মিলিত হয় (চিত্র 9.29b)। ফলে চোখ কাছের বস্তু স্পষ্ট দেখতে পায় না।

প্রতিকার

এই ত্রুটি দূর করার জন্য একটি উত্তল লেন্সের চশমা ব্যবহার করতে হবে। ফলে কাছাকাছি বিন্দু (চিত্র 9.29b) থেকে আসা আলোক রশ্মি চশমার লেন্সে এবং চোখের লেন্সে পর পর দুইবার প্রতিসারিত হওয়ার কারণে ফোকাস দূরত্ব কমে যাবে এবং প্রয়োজনমতো অভিসারী হয়ে প্রতিবিম্বটি রেটিনা (R) এর উপরে পড়বে।

9.5.5 চোখ এবং চোখের দৃষ্টির বৈশিষ্ট্য

চোখ অত্যন্ত চমকপ্রদ বিষয়, এর অনেক ধরনের বৈশিষ্ট্য রয়েছে। চোখ এবং চোখের দৃষ্টি নিয়ে সহজ কয়েকটা বৈশিষ্ট্য এখানে আলোচনা করা হলো।

(a) চোখের সামনে কোনো বস্তু রাখা হলে রেটিনাতে তার প্রতিবিম্ব তৈরি হয় এবং আমরা বস্তুটি দেখতে পাই। বস্তুটি চোখের সামনে থেকে সরিয়ে নেওয়ার সাথে সাথে কিন্তু বস্তুটি দেখার অনুভূতি চলে যায় না, সেটি আরও 0.03 সেকেন্ডের মতো থেকে যায়। এই সময়কে দর্শনানুভূতির স্থায়িত্বকাল বলে। দর্শনানুভূতির স্থায়িত্বকালের কারণে আমরা চলচ্চিত্র বা ভিডিও দেখার অনুভূতি পাই।

(b) আমাদের দুটি চোখ সামনে (পাখিদের মতো দুই পাশে নয় তবে প্যাঁচার কথা আলাদা, প্যাঁচার চোখ মানুষের মতো সামনে), তাই আমরা একই সাথে দুই চোখে দুটি প্রতিবিম্ব দেখি। আমাদের মস্তিষ্ক এই দুটি প্রতিবিম্বকে উপস্থাপন করে আমাদেরকে দূরত্বের অনুভূতি দেয়।

নিজে করো

আমাদের দুটি চোখ হওয়ার কারণে আমরা যখন কোথাও তাকাই তখন আমরা দূরত্বের অনুভূতিটি পাই, এটাকে বলা হয় বাইনোকুলার ভিশন। আমরা যদি এক চোখ ব্যবহার করে দেখি তখন দূরত্বের অনুভূতি থাকে না। বিষয়টি পরীক্ষা করার জন্য এক চোখ বন্ধ করে সুইয়ে সুতা ঢোকানোর চেষ্টা করো দেখবে সেটা কত কঠিন। সুতা ঢোকানোর আগে চোখ বন্ধ রেখে সুই এবং সুতা ধরে রাখা হাত দুটো পর্যায়ক্রমে সামনে পেছনে করে নিও।

চিত্র 9.30: চোখের ব্লাইন্ড স্পটের অস্তিত্ব এই ছবিটি দিয়ে বের করা যায়।

(c) তোমরা এর মাঝে জেনেছ যে আমাদের রেটিনাতে একটা বস্তুর উল্টো প্রতিবিম্ব পড়লেও আমরা বস্তুটিকে সোজা দেখার অনুভূতি পাই কারণ দেখার অনুভূতিটি চোখ থেকে আসে না, সেটি আসে মস্তিষ্ক থেকে। চোখের রেটিনাতে যে প্রতিবিম্ব পড়ে সেটি থেকে আলোর সংকেত অপটিক নার্ভে করে মস্তিষ্কে যায়, মস্তিষ্ক সেটাকে বিশ্লেষণ করে আমাদেরকে দেখার অনুভূতি দেয়।

নিজে করো

রেটিনার যে অংশে অপটিক নার্ভ সংযুক্ত হয়েছে সেই অংশটি দেখার অনুভূতি তৈরি করে না, তাই এটাকে বলে ব্লাইন্ড স্পট। তুমি কি সেটা পরীক্ষা করতে চাও?

বাম চোখ বন্ধ করে ডান চোখ দিয়ে 9.30 চিত্রটিতে বাম দিকের ক্রস চিহ্নটির দিকে তাকিয়ে মাথাটা ছবিটির দিকে নামিয়ে আনো, যখন ডান দিকের কালো বৃত্তটির প্রতিবিম্ব ঠিক অপটিক নার্ভের সংযোগস্থল ব্লাইন্ড স্পটে পড়বে তখন হঠাৎ করে সেটি অদৃশ্য হয়ে যাবে।

9.6 রঙিন বস্তুর আলোকীয় উপলব্ধি (Perceptions of Coloured Objects)

তোমরা সবাই জানো আমরা যখন কোনো কিছু দেখি তখন তার উপর থেকে প্রতিফলিত হয়ে আলো আমাদের চোখে এসে পড়ে। চোখের কর্নিয়া এবং লেন্স মিলে সেই আলোটির একটি নিখুঁত প্রতিবিম্ব তৈরি করে আমাদের চোখের রেটিনার উপর ফেলে। আমাদের রেটিনাতে আলো সংবেদী দুই ধরনের কোষ রয়েছে। এক ধরনের কোষের নাম "রড", অন্য ধরনের কোষের নাম "কোন"। রড জাতীয় কোষগুলো অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং খুব অল্প আলোতে কাজ করতে পারে কিন্তু সেগুলো রং শনাক্ত করতে পারে না। সে জন্য জোছনার মৃদু আলোতে আমরা আবছাভাবে সবকিছু দেখতে পেলেও তাদের রং দেখতে পারি না। যদি আলোর তীব্রতা বেশি হয় তখন চোখের রেটিনার কোনগুলো কাজ করতে পারে। এই কোনগুলো রং সংবেদী, তাই আমরা তখন যদি কোনো কিছু দেখি তার রংগুলো দেখতে পারি।

তোমরা টেলিভিশনের কিংবা কম্পিউটারের মনিটরে কিংবা বইপুস্তকের রঙিন ছবি যদি খুব সূক্ষ্মভাবে দেখতে পারো তাহলে দেখবে সেখানকার রংগুলো আসে লাল, সবুজ এবং নীল রঙের সূক্ষ্ম বিন্দু দিয়ে অর্থাৎ এই তিনটি রং প্রয়োজনীয় তীব্রতা দিয়ে অন্য সব রং তৈরি করা যায়।

নিজে করো

মোবাইল ফোন, টেলিভিশন বা ল্যাপটপের স্ক্রিনে খুব ছোট একটা পানির বিন্দু বসাও, সেটা তখন উত্তল লেন্সের মতো কাজ করবে, তুমি তখন স্ক্রিনের পিক্সেলগুলো দেখতে পাবে। ভিন্ন ভিন্ন রং কী রঙের পিক্সেল দিয়ে তৈরি হয় দেখো। হলুদ রঙের জন্য পিক্সেলগুলো কী রঙের?

নিজে করো

উজ্জ্বল আলোতে বিপরীত রঙে আঁকা 9.31 চিত্রটির দিকে স্থির দৃষ্টিতে কমপক্ষে এক মিনিট তাকিয়ে থাকো, চোখ একেবারেই নাড়াবে না। তারপর পাশের ধূসর রঙের আয়তাকার জায়গাটির দিকে তাকাও। তুমি সেখানে সঠিক রঙের আঁকা ছবিটি দেখতে পাবে। তোমার চোখের রং সংবেদী কোষগুলো দীর্ঘ সময় একটি রং দেখে ক্লান্ত হয়ে যায়। তুমি যখন রংবিহীন ধূসর ক্ষেত্রটির দিকে তাকাও তখন যে কোষগুলো ব্যবহৃত হয়নি বা ক্লান্ত হয়ে যায়নি সেগুলো বেশি সক্রিয় থাকে। তখন রেটিনায় বিপরীত রঙের সংবেদী কোষগুলো সেই রংটি দেখায় বলে এটি ঘটে।

চিত্র 9.31: বিপরীত রঙে আঁকা একটি ছবি।

দলীয় কাজ

উদ্দেশ্য: বিভিন্ন ব্যক্তির স্পষ্ট দর্শণের ন্যূনতম দূরত্ব এবং চশমার পাওয়ারের সাথে সম্পর্ক নির্ণয়
উপকরণ: ছোট অক্ষরে ছাপানো বই অথবা খবরের কাগজ, দূরত্ব মাপার ফিতা অথবা রুলার
কাজের ধারা: (a) তোমার শিক্ষক, সহপাঠী, মা-বাবা, ভাই-বোনদের মধ্য থেকে পজিটিভ এবং নেগেটিভ বিভিন্ন পাওয়ারের চশমা ব্যবহারকারী এবং চশমা ব্যবহার করে না এরকম দশজনকে বাছাই করো।

(b) তাদের সবাইকে বই অথবা খবরের কাগজটি পড়তে দাও এবং সবচেয়ে কম যে দূরত্বে বই অথবা খবরের কাগজটি স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে পড়তে পারেন সেই দূরত্বটি রুলার অথবা টেপের সাহায্যে মেপে নাও। এটি তাঁদের স্পষ্ট দর্শনের ন্যূনতম দূরত্ব।

(c) যারা চশমা ব্যবহার করেন তাদেরকে চশমা ছাড়া আবার বই কিংবা খবরের কাগজটি পড়তে দিয়ে তাদের স্পষ্ট দর্শনের ন্যূনতম দূরত্ব বের করে নাও।

(d) নিচের ছকে ব্যক্তির নাম, আনুমানিক বয়স চশমা ব্যবহারকারীদের চশমার পাওয়ার এবং চশমাসহ ও চশমা ছাড়া স্পষ্ট দর্শনের ন্যূনতম দূরত্ব লিখ।

পজিটিভ এবং নেগেটিভ চশমার পাওয়ারের কারণে স্পষ্ট দর্শনের ন্যূনতম দূরত্বটির তারতম্যের বিষয়টি ব্যাখ্যা করো।

পর্যবেক্ষণ ছক

নাম	আনুমানিক বয়স	চশমা ব্যবহারকারীদের চশমার পাওয়ার	চশমাসহ স্পষ্ট দর্শনের ন্যূনতম দূরত্ব	চশমা ছাড়া স্পষ্ট দর্শনের ন্যূনতম দূরত্ব

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন

1. চোখের লেন্স রেটিনাতে উল্টো প্রতিবিম্ব তৈরি করে, তাহলে আমরা সবকিছু উল্টো দেখি না কেন?
2. চোখের সাথে ক্যামেরার একটা গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যের কথা বলো।
3. ঘন মাধ্যমে আলোর বেগ কম, এ রকম অবস্থায় কোনো কিছু কি আলো থেকে দ্রুত যেতে পারবে?
4. ভরদুপুরে রংধনু দেখা যায় না কেন?
5. পানির ফোঁটা লেন্সের মতো কাজ করতে পারে, এই লেন্সের ফোকাস দূরত্ব কত হতে পারে?

গাণিতিক প্রশ্ন

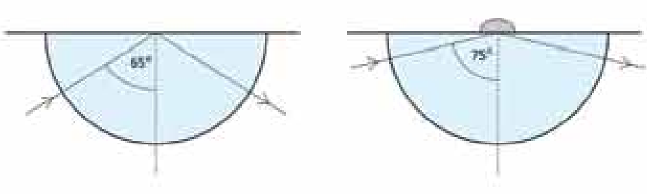

চিত্র 9.32: আপতিত বিন্দুতে ভিন্ন প্রতিসরণাঙ্কের এক ফোঁটা তরল রাখা হলে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ কোণ পরিবর্তিত হয়ে যাবে।

২০২৫

1. 9.32 চিত্রটিতে দেখানো আকারের একটা কাচের মাধ্যমে আলোক রশ্মি প্রবেশ করিয়ে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের ক্রান্তি কোণ পাওয়া গেছে 65°। ঠিক যে বিন্দুতে আলোক রশ্মিটি আপতিত হয়েছে সেখানে এক বিন্দু তরল রাখার কারণে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন হয়েছে 75° তে। তরলের প্রতিসরণাঙ্ক কত?

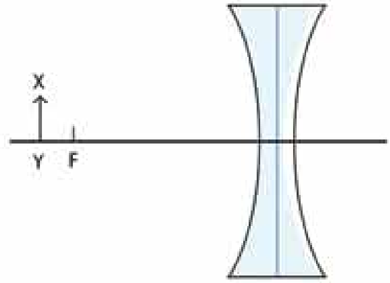

চিত্র 9.33: অবতল লেন্সের ফোকাস দূরত্বের বাইরে রাখা একটি বস্তু।

2. কাচের তৈরি একটি উত্তল লেন্সের ফোকাস দৈর্ঘ্য 10 cm। ঠিক একই আকৃতির একটি লেন্স হীরা দিয়ে তৈরি করলে তার ফোকাস দৈর্ঘ্য কত হবে?

3. XY বস্তুটির জন্য তার রশ্মিগুলো যতটুকু সম্ভব সঠিকভাবে এঁকে প্রতিবিম্বটি কোথায় হবে দেখাও। (চিত্র 9.33)

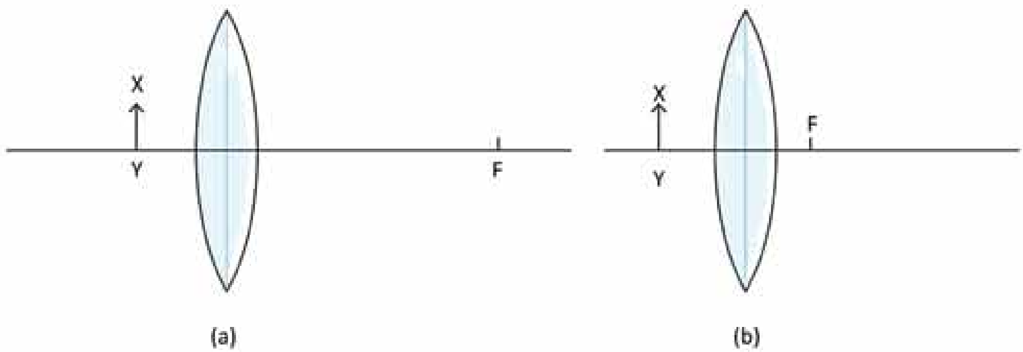

চিত্র 9.34: (a) উত্তল লেন্সের ফোকাস দূরত্বের ভেতরে রাখা একটি বস্তু (b) উত্তল লেন্সের ফোকাস দূরত্বের বাইরে রাখা একটি বস্তু।

4. XY বস্তুটির জন্য তার রশ্মিগুলো যতটুকু সম্ভব সঠিকভাবে এঁকে প্রতিবিম্বটি কোথায় হবে দেখাও। (চিত্র 9.34 a)

5. XY বস্তুটির জন্য তার রশ্মিগুলো যতটুকু সম্ভব সঠিকভাবে এঁকে প্রতিবিম্বটি কোথায় হবে দেখাও। (চিত্র 9.34 b)

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটির পাশে ঠিক (√) চিহ্ন দাও

1. ঘন মাধ্যমের ভেতরে রাখা কোনো বস্তুকে হালকা মাধ্যম থেকে দেখালে এর প্রতিবিম্ব কোথায় হবে?

(ক) উপরের দিকে উঠে আসবে (খ) নিচের দিকে সরে যাবে
(গ) একই জায়গায় থাকবে (ঘ) পাশে সরে যাবে

9.35 চিত্র থেকে 2 ও 3 নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

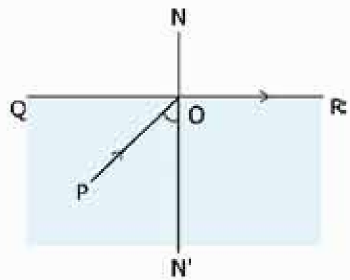

চিত্র 9.35

2. এখানে প্রতিসরণ কোণ কত?

(ক) 0° (খ) 90°
(গ) 180° (ঘ) 45°

3. আপতন কোণটি যদি আরও বড় হয় তাহলে কী ঘটবে?

(ক) পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিসরণ (খ) পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন
(গ) প্রতিসরণ (ঘ) প্রতিফলন

4. উত্তল লেন্স অঙ্কনের ক্ষেত্রে সচরাচর ব্যবহৃত রশ্মি চিত্র–

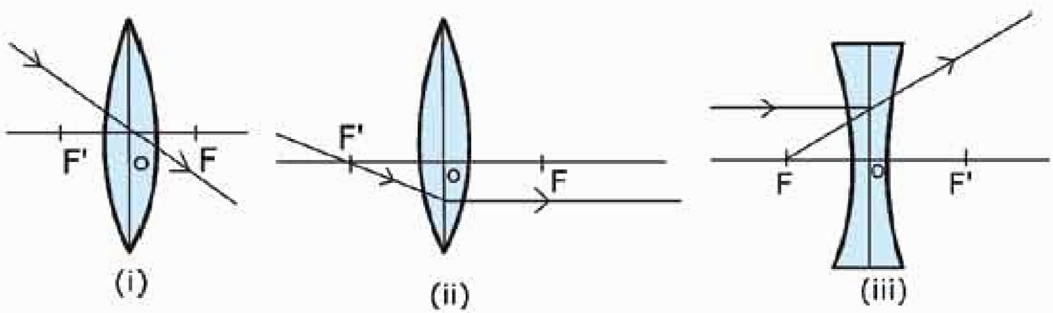

চিত্র 9.36

(ক) i (খ) ii
(গ) i ও ii (ঘ) i, ii ও iii

5. লেন্সের ক্ষমতার একক কোনটি?

(ক) ডায়াপ্টার (খ) ওয়াট

(গ) অশ্ব ক্ষমতা (ঘ) কিলোওয়াট-ঘন্টা

সৃজনশীল প্রশ্ন

1. দশম শ্রেণির ছাত্রী শিউলী শ্রেণিকক্ষে ব্ল্যাকবোর্ডের লেখা ভালোভাবে দেখতে পায় না। ফলে ডাক্তারের শরণাপন্ন হলে ডাক্তার তাকে -2D ক্ষমতাসম্পন্ন লেন্স চশমা হিসেবে ব্যবহারের পরামর্শ দিলেন।

   (ক) লেন্স কাকে বলে?

   (খ) স্পর্শ না করে কীভাবে একটি লেন্স শনাক্ত করা যায়?

   (গ) শিউলির চশমার ফোকাস দূরত্ব নির্ণয় করো।

   (ঘ) শিউলীকে ঋণাত্মক (-) ক্ষমতার লেন্স ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়ার যৌক্তিকতা লিখ।

2. তপু আবিষ্কার করল তার ম্যাগনিফাইং গ্লাসকে সূর্যের আলোতে ধরলে গ্লাসটি থেকে 6 সেমি দূরে রাখা কাগজ পুড়তে শুরু করে। গ্লাসটি থেকে ৪ সেমি দূরে একটি 2 সেমি লম্বা ইরেজার রেখে অপর দিক থেকে সে বিভিন্নভাবে প্রতিবিম্ব দেখার চেষ্টা করল। সে আরও আবিষ্কার করল চশমা পরা অবস্থায় সে যেখানে চোখ রাখলে প্রতিবিম্ব দেখতে পায়, চশমা খুলে ফেললে তাকে আরেকটু দূরে গিয়ে প্রতিবিম্ব দেখতে হয়।

   (ক) লেন্সের ধরনগুলোর নাম লিখ।

   (খ) পানির সাপেক্ষে কাচের প্রতিসরণাঙ্ক 1.11 বলতে কী বুঝ?

   (গ) ইরেজারের কি ধরনের প্রতিবিম্ব কোথায় তৈরি হবে তার রশ্মিচিত্র আঁকো।

   (ঘ) তপুর চোখের সমস্যাটি বিশ্লেষণ করো।

দশম অধ্যায়

স্থির বিদ্যুৎ

(Static Electricity)

শীতকালে চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়ানোর পর সেই চিরুনি ছোট ছোট কাগজের টুকরোর কাছে আনা হলে কাগজের টুকরোগুলো লাফিয়ে চিরুনির দিকে ছুটে আসে। আবার ঝড়ের সময় বজ্রপাতের আলোর ঝলকানির সাথে দিগ্বিদিক প্রকম্পিত করে প্রচণ্ড শব্দে বজ্রপাত হয়। দুটো বিষয়ের জন্য দায়ী স্থির বিদ্যুৎ। আমাদের চারপাশের সবকিছুই আসলে অণু-পরমাণু দিয়ে তৈরি। পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে নিউক্লিয়াস এবং সেটিকে ঘিরে বাইরে ইলেকট্রন ঘুরছে। ইলেকট্রনের ঋণাত্মক চার্জ এবং নিউক্লিয়াসের চার্জ ধনাত্মক। কোনো প্রক্রিয়ায় যদি পরমাণুর এক বা একাধিক ইলেকট্রনকে আলাদা করে ফেলা হয় তাহলে স্থির বিদ্যুতের জন্ম হয়। এই অধ্যায়ে আমরা এই স্থির বিদ্যুতের বিভিন্ন প্রক্রিয়া আলোচনা করব। দুটো চার্জকে পাশাপাশি রাখা হলে তারা কী বলে নিজেদের আকর্ষণ করে সেটিও আমরা এই অধ্যায়ে জেনে নেব।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- পরমাণু গঠনের ভিত্তিতে আধান সৃষ্টির মৌলিক কারণ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ঘর্ষণ ও আবেশ প্রক্রিয়ায় আধান সৃষ্টি ব্যাখ্যা করতে পারব।
- তড়িৎবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে আধান শনাক্ত করতে পারব।
- কুলম্বের সূত্র ব্যবহার করে তড়িৎ বল পরিমাপ করতে পারব।
- তড়িৎ ক্ষেত্র সৃষ্টির কারণ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- তড়িৎ বলরেখার দিক তড়িৎ ক্ষেত্রের দিককে কেমনভাবে নির্দেশ করে ব্যাখ্যা করতে পারব।
- তড়িৎ বিভব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- তড়িৎ শক্তি সংরক্ষণে ধারকের কার্যক্রম ব্যাখ্যা করতে পারব।
- স্থির তড়িৎ ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে পারব।
- স্থির তড়িৎজনিত বিপজ্জনক ঝুঁকি হতে রক্ষার কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারব।

10.1 আধান বা চার্জ (Charge)

শীতকালে শুকনো চুল চিরুনি দিয়ে আঁচড়িয়ে তোমাদের প্রায় সবাই নিশ্চয়ই কখনো না কখনো ছোট ছোট কাগজের টুকরাকে সেই চিরুনি দিয়ে আকর্ষণ করেছ। শীতপ্রধান দেশে শীতকালে বাতাস খুব শুকনো থাকে, তখন ছোট শিশু যখন কার্পেটে হামাগুড়ি দেয় তখন তাদের চুল খাড়া হয়ে যায়, দেখে মনে হয় একটি চুল বুঝি অন্য চুলকে ঠেলে খাড়া করিয়ে দিয়েছে। তোমরা সবাই নিশ্চয়ই ঝড়ের রাতে আকাশ চিড়ে বিদ্যুতের ঝলককে নিচে নেমে আসতে দেখেছ।

কাগজের আকর্ষণ, চুলের বিকর্ষণ কিংবা বজ্রপাত– এই তিনটি ব্যাপারের মূলেই কিন্তু একই বিষয় কাজ করেছে, সেটি হচ্ছে চার্জ বা আধান। চার্জ বা আধান কী, কেন সেটা কখনো আকর্ষণ করে, কখনো বিকর্ষণ করে আবার কখনো বিদ্যুৎ ঝলক তৈরি করে বোঝার জন্য আমাদের একেবারে গোড়ায় যেতে হবে, অণু-পরমাণু কেমন করে তৈরি হয় সেটা জানতে হবে।

আমরা সবাই জানি সবকিছু অণু-পরমাণু দিয়ে তৈরি। পৃথিবীতে 118টি পরমাণু আছে, এর মাঝে মাত্র 83টি টেকসই, মাত্র এই কয়টি পরমাণু দিয়ে লক্ষ লক্ষ ভিন্ন অণু তৈরি হয়েছে। একটা অক্সিজেন পরমাণুর সাথে দুটো হাইড্রোজেন পরমাণু দিয়ে পানি, একটা সোডিয়াম পরমাণুর সাথে একটা ক্লোরিন পরমাণু দিয়ে লবণ, একটা কার্বন পরমাণুর সাথে চারটা হাইড্রোজেন পরমাণু দিয়ে রান্না করার গ্যাস ইত্যাদি ইত্যাদি। (অবাক হবার কিছু নেই বাংলায় মাত্র পঞ্চাশটা বর্ণ, সেই বর্ণমালা, দিয়ে হাজার হাজার শব্দ তৈরি হয়েছে।)

পরমাণু হচ্ছে সবকিছুর বিল্ডিং ব্লক (Building Block)। এই পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে ছোট একটা নিউক্লিয়াস, তাকে ঘিরে ঘুরতে থাকে ইলেকট্রন। নিউক্লিয়াস তৈরি হয় প্রোটন আর নিউট্রন দিয়ে। এর ভেতরে প্রোটনের চার্জ হচ্ছে ধনাত্মক বা পজিটিভ (নিউট্রনের কোনো চার্জ নেই) আর ইলেকট্রনের চার্জ ঋণাত্মক বা নেগেটিভ। প্রোটন আর ইলেকট্রনের চার্জ সমান কিন্তু বিপরীত অর্থাৎ তার মান ($1.6 \times 10^{-19}\, coulomb$) কিন্তু একটা পজিটিভ অন্যটা নেগেটিভ। একটা পরমাণুর নিউক্লিয়াসে যে কয়টা প্রোটন থাকে তার বাইরে ঠিক সেই কয়টা ইলেকট্রন ঘুরতে থাকে তাই পরমাণুর সম্মিলিত চার্জ শূন্য, অর্থাৎ পরমাণু হচ্ছে বিদ্যুৎ নিরপেক্ষ বা নিস্তড়িৎ বা নিউট্রাল। সবচেয়ে সহজ পরমাণু হচ্ছে হাইড্রোজেন, তার নিউক্লিয়াসটা হচ্ছে শুধু একটা প্রোটন, তাকে ঘিরে ঘুরছে একটা ইলেকট্রন। এরপরের পরমাণু হচ্ছে হিলিয়াম, নিউক্লিয়াসে দুটো প্রোটন (এবং চার্জবিহীন দুটো নিউট্রন) আর বাইরে দুটো ইলেকট্রন। এভাবে আস্তে আস্তে আরো বড় বড় পরমাণু তৈরি হয়েছে। হাইড্রোজেনকে যদি বাদ দিই তাহলে বলা যায় নিউক্লিয়াসে যতগুলো প্রোটন থাকে কমপক্ষে ততগুলো এবং সাধারণত আরো বেশি নিউট্রন থাকে।

নিউক্লিয়াসের বাইরে ইলেকট্রনগুলো সব একই কক্ষপথে থাকে না, 10.01 চিত্রটিতে যেভাবে দেখানো হয়েছে সেভাবে একটা কক্ষপথ পূর্ণ করে পরের কক্ষপথে যেতে থাকে। ভেতরের কক্ষপথের ইলেকট্রনগুলো অনেক শক্তভাবে আটকে থাকে, তবে কিছু কিছু পরমাণুর বেলায় বাইরের কক্ষপথের ইলেকট্রনগুলোকে একটু চেষ্টা করলে আলাদা করা যায়। ইলেকট্রন আলাদা করার একটা উপায় হচ্ছে ঘর্ষণ।

এমনিতে পরমাণুগুলো চার্জ নিরপেক্ষ অর্থাৎ প্রত্যেক পরমাণুতে সমান সংখ্যক প্রোটন আর ইলেকট্রন। কিন্তু কোনো কারণে যদি বাইরের কক্ষপথের একটা ইলেকট্রন সরিয়ে নেওয়া হয় তাহলে ইলেকট্রনের তুলনায় প্রোটনের সংখ্যা বেড়ে যায় অর্থাৎ পরমাণুটা আর বিদ্যুৎ নিরপেক্ষ বা নিউট্রাল থাকে না, তার ভেতরে পজিটিভ চার্জের পরিমাণ বেড়ে যায়। একটা ইলেকট্রন সরিয়ে নিলে পরমাণুটিতে একটি পজিটিভ চার্জ হয়, দুটি সরিয়ে নিলে দুটি পজিটিভ চার্জ হয়। আমরা তখন বলি পরমাণুটি আয়নিত বা আহিত হয়েছে। একটা পরমাণু যে রকম পজিটিভভাবে আয়নিত হতে পারে ঠিক সে রকম নেগেটিভভাবেও আয়নিত হতে পারে অর্থাৎ যখন বিচ্ছিন্ন একটি বা দুটি ইলেকট্রন পরমাণুর সাথে যুক্ত হয়ে যায়, তখন পরমাণুর মোট চার্জ হয় নেগেটিভ।

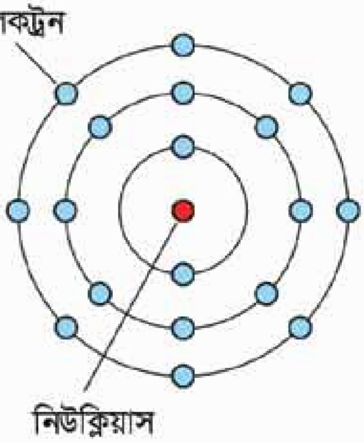

চিত্র 10.01: একটি আরগনের পরমাণু। এক কক্ষপথ পূর্ণ করে ইলেকট্রন পরের কক্ষপথে যায়।

পরমাণুগুলোর ইলেকট্রনগুলো তার কক্ষপথে ঘুরতে থাকে, এগুলো কীভাবে সাজানো হবে তার সুনির্দিষ্ট নিয়ম আছে। তোমরা তোমাদের রসায়ন বইয়ে সেটি বিস্তৃতভাবে দেখেছ। এখন তার গভীরে আমরা যাব না। শুধু বলে রাখি কখনো কখনো শেষ কক্ষপথে একটি-দুটি ইলেকট্রন প্রায় মুক্ত অবস্থায় থাকে, এ রকম পদার্থে ইলেকট্রনগুলো খুব সহজে পুরো পদার্থের মাঝে ছোটাছুটি করতে পারে। এ রকম পদার্থকে আমরা বলি বিদ্যুৎ পরিবাহী। আবার কিছু কিছু পদার্থে ছোটাছুটি করার মতো ইলেকট্রন নেই, যে কয়টি আছে খুব শক্তভাবে আবদ্ধ সেগুলো হচ্ছে বিদ্যুৎ অপরিবাহী। ধাতব পদার্থ যেমন সোনা, রুপা, তামা হচ্ছে বিদ্যুৎ সুপরিবাহী। কাঠ, প্লাস্টিক, কাচ, রাবার এসব হচ্ছে বিদ্যুৎ অপরিবাহী।

পরমাণুর গঠন সম্পর্কে এখন পর্যন্ত যা যা বলা হয়েছে আমরা যদি সেগুলো বুঝে থাকি তাহলে স্থির বিদ্যুতের পরের বিষয়গুলো মনে হবে খুবই সহজ।

10.2 ঘর্ষণে স্থির বিদ্যুৎ তৈরি (Static Electricity due to Friction)

এক টুকরো কাচকে যদি এক টুকরো সিল্ক দিয়ে ঘষা হয় (10.02 চিত্র) তাহলে কাচ থেকে ইলেকট্রনগুলো সিল্কে আসতে শুরু করবে অর্থাৎ কাচটি হবে পজিটিভ বা ধনাত্মক চার্জযুক্ত আর সিল্কটি হবে নেগেটিভ চার্জযুক্ত। ব্যাপারটি ঘটে কারণ ইলেকট্রনের জন্য কাচের যত আসক্তি সিল্কের

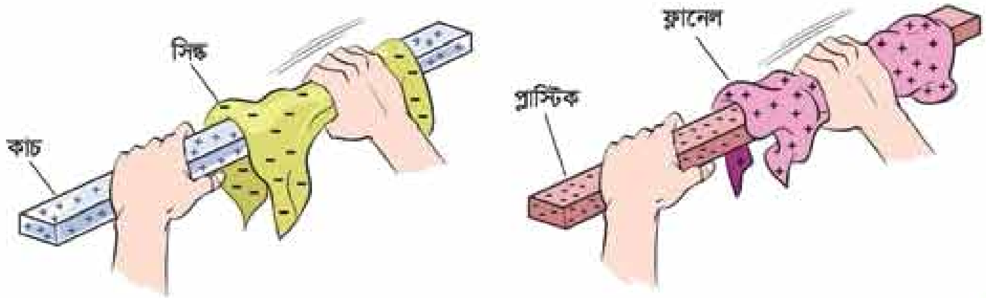

চিত্র 10.02: কাচকে সিল্ক দিয়ে এবং প্লাস্টিককে ফ্লানেল দিয়ে ঘষে পজিটিভ ও নেগেটিভ চার্জ গঠন করা যায়।

আসক্তি তার থেকে বেশি। আবার যদি এক টুকরো প্লাস্টিককে ফ্লানেল (বা পশমি কাপড়) দিয়ে ঘষা হয় তাহলে ফ্লানেল থেকে ইলেকট্রন চলে আসবে প্লাস্টিকের টুকরোতে। তার কারণ ইলেকট্রনের জন্য প্লাস্টিকের আকর্ষণ ফ্লানেল থেকে বেশি।

এবারে আমরা একটা এক্সপেরিমেন্ট করতে পারি। ধরা যাক কাচ এবং সিল্ক ব্যবহার করে আমরা দুই টুকরো কাচকে পজিটিভ চার্জ দিয়ে আহিত করেছি। এখন একটাকে যদি সাবধানে একটা বিদ্যুৎ অপরিবাহী সিল্কের সুতো দিয়ে ঝুলিয়ে দিয়ে তার কাছে অন্যটা নিয়ে আসি তাহলে দেখবে ঝুলন্ত কাচের টুকরোটি বিকর্ষিত হয়ে সরে যাচ্ছে। (চিত্র 10.03)

আমরা যদি একইভাবে দুই টুকরো প্লাস্টিককে নেগেটিভ চার্জ দিয়ে আহিত করে একটাকে সিল্কের সুতো দিয়ে বেঁধে ঝুলিয়ে দিই এবং অন্যটা তার কাছে নিয়ে আসি তাহলে আমরা একই ব্যাপার দেখব, একটা আরেকটাকে বিকর্ষণ করছে। এবারে যদি প্লাস্টিকের দণ্ডটা যখন ঝুলে আছে তখন তার কাছে পজিটিভ চার্জে আহিত কাচের দণ্ডটা নিয়ে আসি তখন দেখব একটা আরেকটাকে আকর্ষণ করছে।

আমরা যখন মহাকর্ষ বল পড়েছি তখন দেখেছি সেখানে শুধু এক রকম ভর, তাই মাত্র এক রকম বল সেটি হচ্ছে আকর্ষণ। এখন আমরা দেখছি এখানে দুই রকম চার্জ এবং বলটিও দুই রকম, কখনো

আকর্ষণ, কখনো বিকর্ষণ। এক্সপেরিমেন্টটা যদি ঠিকভাবে করে থাকি তাহলে দেখতে পাব একই ধরনের চার্জ একে অন্যকে বিকর্ষণ করে এবং ভিন্ন ভিন্ন চার্জ একে অন্যকে আকর্ষণ করে।

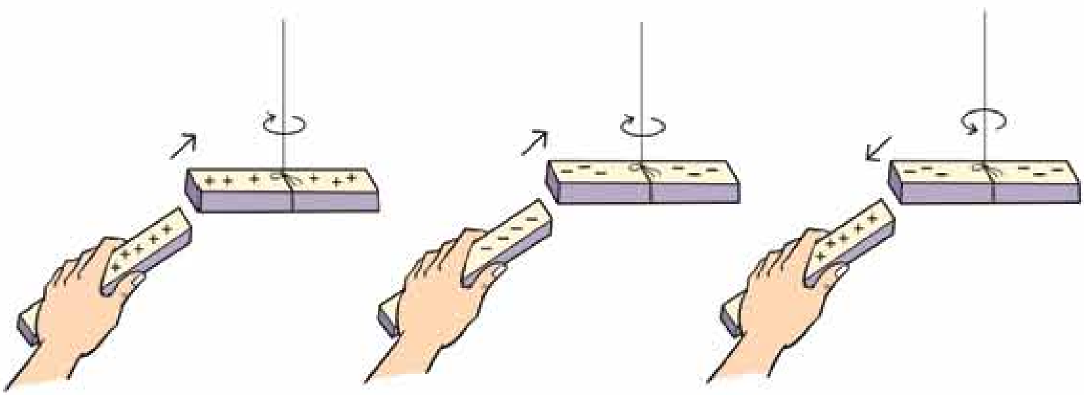

চিত্র 10.03: একই ধরনের চার্জ বিকর্ষণ করে এবং বিপরীত ধরনের চার্জ আকর্ষণ করে।

10.3 বৈদ্যুতিক আবেশ (Electrical Induction)

এই অধ্যায়ের শুরুতে বলা হয়েছে চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়ানোর পর সেই চিরুনিটি যখন ছোট ছোট কাগজের কাছে আনা হয় তখন কাগজগুলো লাফিয়ে চিরুনির কাছে চলে আসে। বোঝা যায় চিরুনিটা কাগজের টুকরোগুলোকে আকর্ষণ করছে। আমরা এখন জানি চিরুনিটাতে নেগেটিভ চার্জ জমা হয়েছে এবং সে কারণেই চিরুনিটা কাগজের টুকরোগুলোকে আকর্ষণ করছে। কিন্তু এখানে একটা ছোট জটিলতা আছে। আমরা দেখেছি বিপরীত চার্জ আকর্ষণ করে, তাই কাগজগুলোকে আকর্ষণ করতে হলে সেগুলোকে অবশ্যই চিরুনির বিপরীত চার্জ হতে হবে কিন্তু আমরা জানি কাগজের টুকরোগুলোতে কোনো চার্জই নেই তাহলে চিরুনি কেন এগুলোকে আকর্ষণ করছে?

ব্যাপারটা ঘটে বৈদ্যুতিক আবেশ নামের একটা প্রক্রিয়ার জন্য। কাচ কিংবা প্লাস্টিকে চার্জ জমা করে সেটাকে যদি চার্জহীন কোনো কিছুর কাছে আনা হয় তাহলে সেই চার্জহীন বস্তুটার মাঝে এক ধরনের চার্জ জন্ম নেয়। বিষয়টা বোঝানোর জন্য 10.04 চিত্রটিতে একটা ধাতব গোলক দেখানো হয়েছে, এটাকে রাখা হয়েছে বিদ্যুৎ অপরিবাহী স্ট্যান্ডের ওপর। এখন একটা কাচকে সিল্ক দিয়ে খুব ভালো করে ঘষে তার মাঝে চার্জ জমা করে নিয়ে সেটা ধাতব গোলকের কাছে নিয়ে এলে ধাতব গোলকের নেগেটিভ চার্জগুলো আকর্ষিত হয়ে কাছে চলে আসবে এবং গোলকের পেছন দিকে পজিটিভ চার্জগুলো সরে যাবে। এখন কাচ দণ্ড পজিটিভ চার্জযুক্ত, কাচ দণ্ডের কাছাকাছি গোলকের অংশটুকু নেগেটিভ চার্জযুক্ত কাজেই এরা পরস্পরকে আকর্ষণ করবে।

এবারে আমরা চিরুনি দিয়ে কাগজের টুকরোকে আকর্ষণ করার ব্যাপারটা বুঝতে পারব। যখন কাগজের টুকরোর কাছাকাছি নেগেটিভ চার্জযুক্ত চিরুনিটা আনা হয় তখন কাগজের টুকরোর যে অংশ কাছাকাছি সেখানে পজিটিভ চার্জ আবেশিত হয় আর সাথে সাথে যে অংশ দূরে সেখানে নেগেটিভ

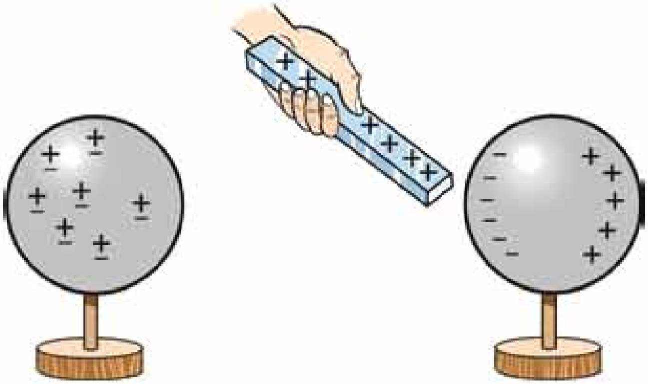

চিত্র 10.04: চার্জবিহীন বস্তুর কাছে চার্জসহ বস্তু আনা হলে বিপরীত চার্জ আবেশিত হয়।

চার্জ জমা হয়। কাগজের টুকরোর পজিটিভ চার্জের অংশটুকু চিরুনির আকর্ষণ অনুভব করে আর কাগজের টুকরোর নেগেটিভ অংশটুকু চিরুনির বিকর্ষণ অনুভব করে। কিন্তু যেহেতু পজিটিভ চার্জের অংশটুকু চিরুনির কাছে তাই আকর্ষণটুকু বিকর্ষণ থেকে বেশি, সেজন্য কাগজের টুকরো আকর্ষিত হয়ে লাফিয়ে চিরুনির কাছে চলে আসে (চিত্র 10.05)।

এরপর আরো একটা ব্যাপার ঘটে, তোমরা হয়তো নিজেরাই সেটা লক্ষ করেছ। কাগজের যে টুকরোগুলো লাফিয়ে চিরুনির গায়ে লেগে যায় সেগুলো আবার প্রায় সাথে সাথেই চিরুনি থেকে ছিটকে নিচে চলে আসে।

এর কারণটাও নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পারছ, কাগজের টুকরোটা যদি আকর্ষিত হয়ে চিরুনির গায়ে লেগে যায় তাহলে সেটার আর আবেশিত থাকতে হয় না। চিরুনির নেগেটিভ চার্জ দিয়ে এটা নিজেই নেগেটিভ চার্জে ভরে যায়। তখন সেগুলো চিরুনি থেকে বিকর্ষিত হয়ে ছিটকে নিচে নেমে আসে। যারা বিশ্বাস করো না তারা বিষয়টা একবার পরীক্ষা করে দেখতে পারো।

চিত্র 10.05: শীতকালে চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়ে ছোট কাগজের কাছে ধরলে সেগুলো আকর্ষণ অনুভব করে।

বাতাসে জলীয় বাষ্প থাকলে জমা হওয়া চার্জ দ্রুত হারিয়ে যায়। তাই স্থির বিদ্যুতের এই এক্সপেরিমেন্টগুলো শীতকালে অনেক বেশি ভালো কাজ করে।

উদাহরণ

প্রশ্ন: দুটি ধাতব গোলক রয়েছে। একটি পজিটিভ চার্জযুক্ত কাচের দণ্ড দিয়ে দুটি গোলকে কি দুই রকমের চার্জ তৈরি করতে পারবে?

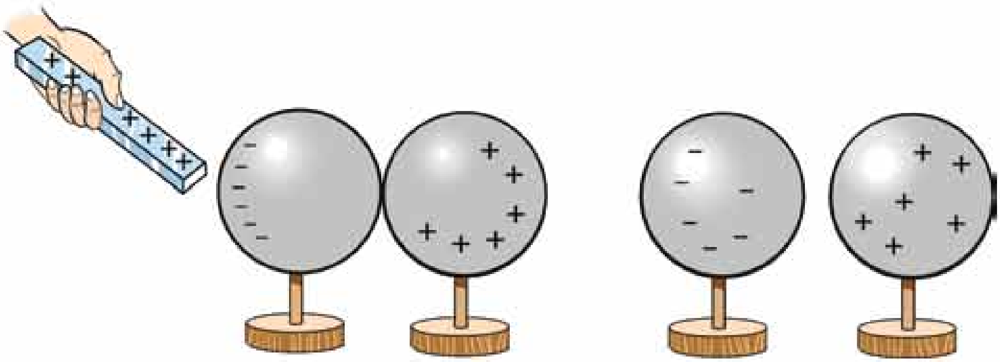

চিত্র 10.06: দুটি ধাতব গোলককে একসাথে রেখে তাদের ভেতরে ভিন্ন চার্জ আবেশিত করা সম্ভব।

উত্তর: হ্যাঁ 10.06 চিত্রটিতে যেভাবে দেখানো হয়েছে সেভাবে দুটো গোলকে ভিন্ন চার্জ আবেশিত করে আলাদা করা সম্ভব।

এই অধ্যায়ের শুরুতে আমরা তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ঘটনার কথা বলেছিলাম। এতক্ষণে সেগুলো কেন ঘটেছে তোমরা নিশ্চয়ই সেটা বুঝে গেছ। চিরুনির বিষয়টা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ছোট শিশুর হামাগুড়ি দেওয়ার বিষয়টাও বোঝা কঠিন নয়। কার্পেটে ঘষে ঘষে যাবার জন্য তার শরীরে চার্জ জমা হয়, সারা শরীরের সাথে সাথে চুলেও সেই চার্জ ছড়িয়ে পড়ে। সব চুলে একই চার্জ। আমরা জানি এক ধরনের চার্জ বিকর্ষণ করে তাই একটা চুল অন্য চুলকে বিকর্ষণ করে খাড়া হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। এখন আমরা বজ্রপাতের বিষয়টাও ব্যাখ্যা করতে পারব। মেঘের সাথে মেঘের ঘর্ষণে সেখানে চার্জ আলাদা হয়ে যায়। আকাশের মেঘে যখন বিপুল পরিমাণ চার্জ জমা হয় তখন সেটা নিচে বিপরীত চার্জের আবেশ তৈরি করে এবং মাঝে মাঝে সেটা এত বেশি হয় যে বাতাস ভেদ করে সেটা মেঘের সাথে যুক্ত হয়ে যায়, যেটাকে আমরা বজ্রপাত বলি। (চিত্র 10.07)

10.3.1 ইলেকট্রোস্কোপ

ইলেকট্রোস্কোপ স্থির বিদ্যুৎ পরীক্ষার জন্য খুব চমৎকার একটা যন্ত্র। যন্ত্রটা খুবই সহজ, এখানে চার্জের অস্তিত্ব বোঝার জন্য রয়েছে খুবই হালকা সোনা, অ্যালুমিনিয়াম বা অন্য কোনো ধাতুর দুটি পাত। এই পাত দুটো একটা সুপরিবাহী দণ্ড দিয়ে একটা ধাতব চাকতির সাথে লাগানো থাকে, পুরোটা একটা অপরিবাহী ছিপি দিয়ে কাচের বোতলের ভেতর রাখা হয়, যেন বাইরে থেকে দেখা যায় কিন্তু বাতাস বা অন্য কিছু যেন পাতলা ধাতব পাত দুটোকে নাড়াচাড়া করতে না পারে।

চিত্র 10.07: মেঘ থেকে বিপুল পরিমাণ চার্জ যখন মাটিতে নেমে আসে তাকে আমরা বজ্রপাত বলি।

চার্জ আহিতকরণ

একটা কাচের টুকরোকে সিল্ক দিয়ে ঘষা হলে কাচ দণ্ডটাতে পজিটিভ চার্জ জমা হবে। এখন কাচ দণ্ডটা যদি ইলেকট্রোস্কোপের ধাতব চাকতিতে ছোঁয়ানো যায় তাহলে সাথে সাথে খানিকটা চার্জ চাকতিতে চলে যাবে। চাকতি যেহেতু ধাতব দণ্ড আর সোনার পাতের সাথে লাগানো আছে, তাই চার্জটুকু সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়বে। সোনার পাতে যখন একই পজিটিভ চার্জ এসে হাজির হবে আর তখন দেখা যাবে পাত দুটো বিকর্ষণ করে তাদের মাঝে একটা ফাঁক তৈরি হয়েছে।

চিত্র 10.08: ইলেকট্রোস্কোপে চার্জের উপস্থিতির কারণে সূক্ষ্ম ধাতব পাত পরস্পর থেকে সরে যায়।

ঠিক একইভাবে একটা চিরুনিকে যদি ফ্লানেল দিয়ে ঘষা হয় তাহলে চিরুনিটাতে নেগেটিভ চার্জ জমা হবে, এখন সেটা যদি চাকতিতে স্পর্শ করা হয় তাহলে নেগেটিভ চার্জ সোনার পাত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়বে এবং দুটো পাত একটা আরেকটাকে বিকর্ষণ করে ফাঁক হয়ে যাবে।

চার্জের প্রকৃতি বের করা

কোনো একটা বস্তুতে যদি চার্জ জমা হয় তাহলে সেটা কি পজিটিভ নাকি নেগেটিভ চার্জ সেটা ইলেকট্রোস্কোপ দিয়ে বের করা যায়। প্রথমে ইলেকট্রোস্কোপের চাকতিতে পরিচিত কোনো চার্জ

দিতে হবে। ধরা যাক কাচকে সিল্ক দিয়ে ঘষে পজিটিভ চার্জ তৈরি করে আমরা সেটাকে চাকতিতে স্পর্শ করলে যদি সোনার পাত দুটির ফাঁক কমে যায় তাহলে বুঝতে হবে এর মাঝে নেগেটিভ চার্জ। যদি ফাঁকটি আরো বেড়ে যায় তাহলে বুঝতে হবে চার্জটি নিশ্চয়ই পজিটিভ।

চার্জের আবেশ

কোনো একটা বস্তুতে চার্জ আছে কি না সেটা চাকতিকে স্পর্শ না করেই বোঝা সম্ভব। ধরা যাক পজিটিভ চার্জ আছে এ রকম একটা দণ্ডকে চাকতির কাছে আনা হয়েছে, তাহলে চাকতির মাঝে নেগেটিভ চার্জের আবেশ হবে। (চিত্র 10.08) এই নেগেটিভ চার্জের আবেশ তৈরি করার জন্য ইলেকট্রোস্কোপের অন্যান্য অংশ থেকে নেগেটিভ চার্জকে চাকতির মাঝে চলে আসতে হবে, সে কারণে সোনার পাত দুটিতেও পজিটিভ চার্জ তৈরি হবে। সেই পজিটিভ চার্জ সোনার পাত দুটোর মাঝে একটা ফাঁক তৈরি করবে।

যদি পজিটিভ চার্জ দেওয়া কোনো কিছু না এনে নেগেটিভ চার্জ দেওয়া কিছু আনি তাহলেও আমরা দেখব সোনার পাত দুটো ফাঁক হয়ে যাচ্ছে, তবে এবারে সেটি হবে সেখানে নেগেটিভ চার্জ জমা হওয়ার কারণে।

10.4 বৈদ্যুতিক বল (Electric Force)

আমরা একটু আগেই দেখেছি বিপরীত চার্জ একে অন্যকে আকর্ষণ করে কিন্তু এক ধরনের চার্জ একে অন্যকে বিকর্ষণ করে। তবে আমরা এখনো জানি না ঠিক কতখানি আকর্ষণ কিংবা বিকর্ষণ করে, সেটা বুঝতে হলে আমাদের কুলম্বের সূত্রটি একটুখানি দেখতে হবে। বিজ্ঞানী কুলম্ব দুটি চার্জের মাঝে কতখানি বল কাজ করে সেটা বের করেছিলেন। এ রকম একটা বলের সূত্র আমরা এর মাঝে একটা দেখে ফেলেছি সেটা হচ্ছে নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ বলের সূত্র। সেটি ছিল এ রকম:

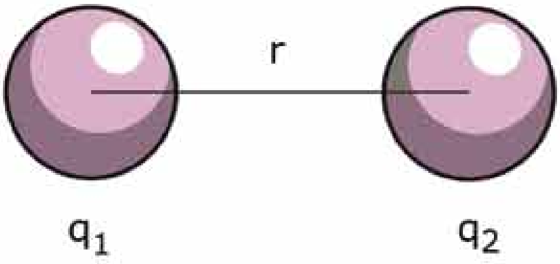

চিত্র 10.09: দুটি চার্জ q_1 এবং q_2 এর ভেতর বল F, আকর্ষণ এবং বিকর্ষণ দুই-ই হতে পারে।

$$F = G\frac{m_1 m_2}{r^2}$$

মজার ব্যাপার হচ্ছে, ভর m_1 আর m_2 কে চার্জ q_1 আর q_2 দিয়ে পরিবর্তন করে দিলেই আমরা কুলম্বের সূত্র পেয়ে যাব। মাধ্যাকর্ষণ বলের জন্য ধ্রুবটি ছিল G, এবারে ধ্রুবটির জন্য আমরা k ব্যবহার করব এইটুকুই পার্থক্য। অর্থাৎ যদি q_1 আর q_2 দুটি চার্জ r দূরত্বে থাকে তাহলে তাদের ভেতরে বল F এর পরিমাণ (চিত্র 10.09):

$$F = k\frac{q_1 q_2}{r^2}$$

এখানে q_1 আর q_2 দুটি চার্জের একক হচ্ছে কুলম্ব C এবং r বা দূরত্বের একক হচ্ছে m, কাজেই k এর একক আমরা বলতে পারি Nm^2/C^2 যেন F এর একক হয় N তাহলে

$$k = 9 \times 10^9\ Nm^2/C^2$$

কুলম্ব হচ্ছে চার্জের একক, আমরা পরের অধ্যায়েই দেখব চার্জের প্রবাহ হচ্ছে বৈদ্যুতিক প্রবাহ বা কারেন্ট এবং কারেন্টের একক হচ্ছে অ্যাম্পিয়ার। এক সেকেন্ডব্যাপী এক অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট প্রবাহ করা হলে যে পরিমাণ চার্জ প্রবাহিত হয় সেটা হচ্ছে এক কুলম্ব (C)।

তবে কুলম্ব বোঝার সবচেয়ে খাঁটি পদ্ধতি হচ্ছে ইলেকট্রন বা প্রোটনের চার্জের পরিমাণটি বোঝা। তার পরিমাণ

ইলেকট্রনের চার্জ: -1.6×10^{-19} C
প্রোটনের চার্জ: $+1.6 \times 10^{-19}$ C

তোমরা দেখতেই পাচ্ছ q_1 এবং q_2 দুটিই যদি পজিটিভ বা নেগেটিভ হয় তাহলে F এর মান হবে পজিটিভ এবং তখন একটি অন্যটিকে বিকর্ষণ করে। যদি একটা পজিটিভ আর অন্যটি নেগেটিভ হয় তাহলে F এর মান হবে নেগেটিভ, যার অর্থ বলের দিক পরিবর্তন হলো অর্থাৎ চার্জ দুটি একটা আরেকটিকে আকর্ষণ করবে। আমরা আগেই সেটা দেখেছিলাম, সূত্র থেকেও সেটা আসছে।

উদাহরণ

প্রশ্ন: একটি +1 কুলম্ব চার্জ এবং একটি -1 কুলম্ব চার্জ 10 cm দূরে রাখা হলো। দুটো চার্জের ভেতর বল কতটুকু?

উত্তর: দুটো বিপরীত চার্জ একে অন্যকে আকর্ষণ করবে। তাদের ভেতরকার বল: (চিত্র 10.10a)

$$F = k\frac{q_1 q_2}{r^2}$$

এখানে

$$q_1 = 1\,\text{C}$$
$$q_2 = -1\,\text{C}$$
$$r = 10\,\text{cm} = 0.10\,\text{m}$$
$$k = 9 \times 10^9\ \text{Nm}^2/\text{C}^2$$

কাজেই

$$F = \frac{9 \times 10^9 \times 1 \times (-1)}{(0.10)^2}\ \text{N} = -9 \times 10^{11}\ \text{N}$$

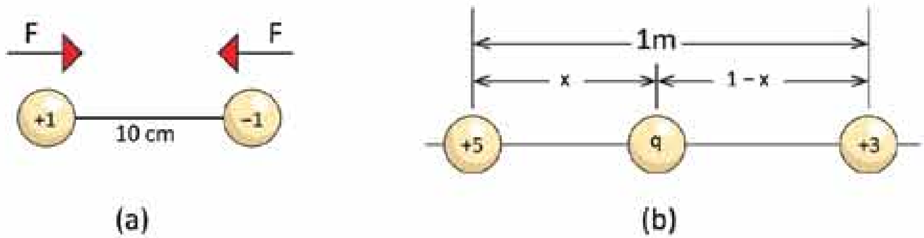

চিত্র 10.10: (a) 10 cm দূরে অবস্থিত +1 C এবং −1 C চার্জ (b) 1 m দূরে অবস্থিত +5 C এবং +3 C চার্জ

প্রশ্ন: একটি +5 C এবং +3 C চার্জ 1 m দূরে রাখা হয়েছে। এখন তৃতীয় একটি চার্জ $+q$ এমনভাবে দুটি চার্জের মাঝখানে রাখো যেন সেটি কোনো বল অনুভব না করে। (চিত্র 10.10 b)

উত্তর: $+q$ চার্জটি +5 C ডান দিকে ঠেলে দেবে এবং +3 C বাম দিকে ঠেলে দেবে। দুটি চার্জ যখন একই বলে ঠেলবে তখন $+q$ চার্জটি কোনো বল অনুভব করবে না। কাজেই

$$k\frac{(+5)q}{x^2} = k\frac{(+3)q}{(1-x)^2}$$

$$5(1-x)^2 = 3x^2$$

$$2x^2 - 10x + 5 = 0$$

$$x = \frac{10 \pm \sqrt{100 - 40}}{4}$$

$$x = 4.435 \text{ কিংবা } 0.565$$

x এর মান 0 থেকে 1 এর ভেতরে হবে কাজেই এটি নিশ্চয়ই 0.565 (x যদি 4.435 হয় তাহলে কী হবে নিজেরা চিন্তা করে বের করো)।

প্রশ্ন: হাইড্রোজেন অ্যাটমের কেন্দ্রে একটা প্রোটন এবং বাইরে একটা ইলেকট্রন। প্রোটনের চার্জ $+1.6 \times 10^{-19}$ C এবং ইলেকট্রনের চার্জ -1.6×10^{-19} C. যদি নিউক্লিয়াস থেকে ইলেকট্রনের কক্ষপথের দূরত্ব 0.5×10^{-8} m হয় তাহলে তাদের ভেতরে আকর্ষণ কতটুকু?

উত্তর:

$$F = k\frac{q_1 q_2}{r^2}$$

এখানে

$$q_1 = +1.6 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}$$

$$q_2 = -1.6 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}$$

$$k = 9 \times 10^{9}\ \mathrm{Nm^2/C^2}$$

$$r = 0.5 \times 10^{-8}\ \mathrm{m}$$

কাজেই

$$F = \frac{9 \times 10^{9} \times 1.6 \times 10^{-19} \times (-1.6 \times 10^{-19})}{(0.5 \times 10^{-8})^2}\ \mathrm{N} = -9.22 \times 10^{-12}\ \mathrm{N}$$

প্রশ্ন: পৃথিবীতে এবং চাঁদে কী পরিমাণ চার্জ জমা রাখলে মহাকর্ষ বল শূন্য হয়ে চাঁদ কক্ষপথ থেকে ছুটে বের হয়ে যাবে?

উত্তর: পৃথিবী এবং চাঁদের মাঝে মাধ্যাকর্ষণ বল:

$$F_G = G\frac{mM}{r^2}$$

এখানে

$$G = 6.67 \times 10^{-11}\ \mathrm{Nkg^{-2}m^2}$$

$$m = 7.35 \times 10^{22}\ \mathrm{kg}$$

$$M = 5.97 \times 10^{24}\ \mathrm{kg}$$

$$r = 3.84 \times 10^{5}\ \mathrm{km}$$

কাজেই

$$F_G = \frac{6.67 \times 10^{-11} \times 7.35 \times 10^{22} \times 5.97 \times 10^{24}}{(3.84 \times 10^{5})^2}\ \mathrm{N} = 1.98 \times 10^{26}\ \mathrm{N}$$

পৃথিবী এবং চাঁদে সমান পরিমাণ (q) চার্জ রাখা হলে বিকর্ষণ বল:

$$F_E = \frac{9 \times 10^9 \times q^2}{(3.84 \times 10^5)^2} \text{ NC}^{-2}$$

মাধ্যাকর্ষণকে কুলম্ব বল দিয়ে কমিয়ে দিতে হলে দুটো বল সমান হতে হবে

অর্থাৎ $F_G = F_E$

$$1.98 \times 10^{26} \text{ N} = \frac{9 \times 10^9 \times q^2}{(3.84 \times 10^5)^2} \text{ NC}^{-2}$$

$$q^2 = 3.24 \times 10^{27} \text{ C}^2$$
$$q = 5.69 \times 10^{13} \text{ C}$$

সুতরাং ইলেকট্রনের সংখ্যা

$$n = \frac{q}{e} = \frac{5.69 \times 10^{13} \text{ C}}{1.6 \times 10^{-19} \text{ C}} = 3.56 \times 10^{32}$$

একটা ইলেকট্রনের ভর 9.11×10^{-31} kg, কাজেই সবগুলো ইলেকট্রনের ভর:

$$(3.56 \times 10^{32}) \times (9.11 \times 10^{-31}) \text{ kg} = 324 \text{ kg}$$

অর্থাৎ পৃথিবী পৃষ্ঠে এবং চাঁদে মাত্র 324 kg ইলেকট্রন রেখে দিতে পারলে চাঁদ কক্ষপথ থেকে ছুটে বের হয়ে যাবে। (একটা মাঝারি গরুর ভরের সমান!)

10.5 তড়িৎ ক্ষেত্র (Electric Field)

দুটি চার্জের ভেতরকার বল আমরা কুলম্বের সূত্র দিয়ে বের করতে পারি। তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে মাধ্যাকর্ষণ বলের জন্য প্রত্যেকবারই আলাদা করে মহাকর্ষ বল থেকে শুরু না করে আমরা মাধ্যাকর্ষণজনিত ত্বরণ বের করে নিয়েছিলাম। সেটার সঙ্গে ভর গুণ দিলেই বল বের হয়ে যেত।

তড়িৎ বলের বেলাতেও আমরা সেটা করতে পারি, আমরা তড়িৎ ক্ষেত্র বলে একটা নতুন রাশি সংজ্ঞায়িত করতে পারি, তার সাথে চার্জ q গুণ করলেই আমরা সেই চার্জের ওপর আরোপিত বল F পেয়ে যাব। অর্থাৎ যেকোনো চার্জ q তার চারপাশে একটা তড়িৎ ক্ষেত্র তৈরি করে, সেই তড়িৎ ক্ষেত্র E হচ্ছে

$$E = k\frac{q}{r^2}$$

এই তড়িৎ ক্ষেত্রে যদি কোনো চার্জ q আনা হয় তাহলে চার্জটি F বল অনুভব করবে, আর F বলের পরিমাণ হবে:

$$F = Eq$$

বল F যেহেতু ভেক্টর, q যেহেতু স্কেলার তাই E হচ্ছে ভেক্টর এবং তার একক হচ্ছে N/C তোমরা দেখবে তড়িৎ ক্ষেত্র দিয়ে ব্যাখ্যা করা হলে পুরো বিষয়টি বিশ্লেষণ করা অনেক সহজ হয়।

তড়িৎ ক্ষেত্র দেখা যায় না কিন্তু কাউকে বোঝানোর জন্য অনেক সময় তড়িৎ বলরেখা নামে পুরোপুরি কাল্পনিক এক ধরনের রেখা এঁকে দেখানো হয় (মাইকেল ফ্যারাডে প্রথম সেটা করেছিলেন।) আমাদের পরিচিত জগৎ ত্রিমাত্রিক কাজেই বলরেখাগুলো চারদিকেই ছড়িয়ে পড়বে। তোমাদের দেখানোর জন্য সেগুলো একটা সমতলে এঁকে দেখানো হয়েছে। (চিত্র 10.11)

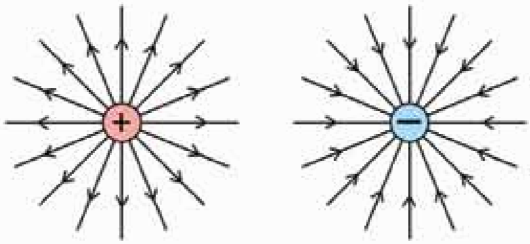

চিত্র 10.11: পজিটিভ চার্জ থেকে বলরেখা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং নেগেটিভ চার্জের দিকে বলরেখা কেন্দ্রীভূত হয়।

বলরেখা আঁকার সময় কিছু নিয়ম মেনে চলা হয়। যেমন:

(a) পজিটিভ চার্জের বেলায় বলরেখা পজিটিভ চার্জ থেকে বের হবে নেগেটিভ চার্জের বেলায় বলরেখা নেগেটিভ চার্জে এসে কেন্দ্রীভূত হবে। একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে বলরেখার দিক হচ্ছে তড়িৎ ক্ষেত্রের দিক।

(b) চার্জের পরিমাণ যত বেশি হবে বলরেখার সংখ্যা তত বেশি হবে।

(c) বলরেখাগুলো যত কাছাকাছি থাকবে তড়িৎ ক্ষেত্র তত বেশি হবে।

(d) একটি চার্জের বলরেখা কখনো অন্য চার্জের বলরেখার ওপর দিয়ে যাবে না।

10.12 a চিত্রটিতে দুটো বিপরীত চার্জের জন্য বলরেখা দেখানো হয়েছে এবং তোমরা দেখতে পাচ্ছ এক চার্জের বলরেখা অন্য চার্জে গিয়ে সমাপ্ত হয়েছে। যেখানে তড়িৎ ক্ষেত্র বেশি সেখানে বলরেখার সংখ্যাও বেশি। শুধু তাই নয় চিত্রটি দেখলে দুটো চার্জ একটা আরেকটাকে টানছে এ রকম একটা অনুভূতি হয়! 10.12 b চিত্রটিতে দুটোই পজিটিভ চার্জ দেখানো হয়েছে এবং চিত্রটি দেখেই দুটো চার্জ একটি আরেকটিকে ঠেলে দিচ্ছে এ রকম অনুভূতি হচ্ছে। শুধু তাই নয় দুটো চার্জের মাঝামাঝি অংশে একটি চার্জের তড়িৎ ক্ষেত্র অন্য চার্জের তড়িৎ ক্ষেত্রকে কাটাকাটি করে ফেলে ফলে সেখানে বলরেখা

কম এবং এর মাঝখানে একটি বিন্দু রয়েছে যেখানে তড়িৎ ক্ষেত্রের মান শূন্য। যদি দুটোই নেগেটিভ চার্জ হতো তাহলে শুধু বলরেখার দিক পরিবর্তন হতো, তাছাড়া অন্য সবকিছু আগের মতোই হতো।

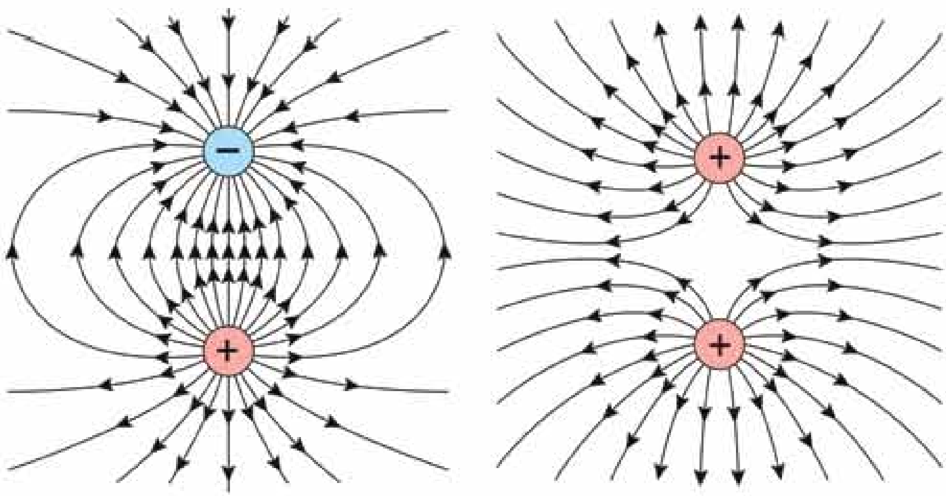

চিত্র 10.12: (a) বিপরীত এবং (b) সমচার্জের জন্য তৈরি বলরেখা।

উদাহরণ

প্রশ্ন: 5 C চার্জের জন্য 10 m দূরে ইলেকট্রিক ফিল্ড কত?

উত্তর:

$$E = k\frac{q}{r^2}$$

এখানে $q = 5\,\text{C}$

$q_2 = -1.6 \times 10^{-19}\,\text{C}$

$r = 10\,\text{m}$

$k = 9 \times 10^9\,\text{Nm}^2/\text{C}^2$

কাজেই

$$E = \frac{9 \times 10^9 \times 5}{10^2}\,\text{N/C} = 4.5 \times 10^8\,\text{N/C}$$

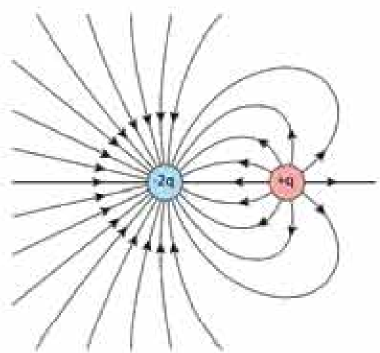

চিত্র 10.13: চার্জ এবং দ্বিগুণ পরিমাণ বিপরীত চার্জের জন্য বলরেখা।

প্রশ্ন: 3C চার্জের একটি বস্তু $10N$ বল অনুভব করছে, ঐ জায়গায় ইলেকট্রিক ফিল্ড কত?

উত্তর: $\boldsymbol{F = qE}$

কাজেই

$$E = \frac{F}{q}$$

এখানে

$$F = 10\ \mathrm{N}$$
$$q = 3\ \mathrm{C}$$

কাজেই

$$E = \frac{F}{q} = \frac{10\ \mathrm{N}}{3\ \mathrm{C}} = 3.33\ \mathrm{N/C}$$

প্রশ্ন: চার্জ এবং তার দ্বিগুণ পরিমাণ বিপরীত চার্জ থাকলে তার বলরেখা কেমন হয়।

উত্তর: 10.13 চিত্রটিতে দেখানো হয়েছে।

10.6 ইলেকট্রিক পটেনশিয়াল (Electric Potential)

তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে দুটি পাত্রে যদি পানি থাকে এবং একটি নল দিয়ে যদি পানির পাত্র দুটোকে জুড়ে দেওয়া যায় তাহলে যে পাত্রে পানির পৃষ্ঠতল উঁচুতে থাকবে সেখান থেকে অন্য পাত্রে পানি চলে আসবে। কোন পাত্র থেকে কোন পাত্রে পানি আসবে সেটা পানির পরিমাণের ওপর নির্ভর করে না, সেটা নির্ভর করে পানির পৃষ্ঠতলের উচ্চতার উপরে।

ঠিক সে রকমভাবে আমরা দেখেছিলাম ভিন্ন তাপমাত্রায় দুটো পদার্থকে যদি একটার সাথে আরেকটাকে স্পর্শ করানো যায় তাহলে তাপ কোন পদার্থ থেকে কোথায় যাবে সেটা সেই পদার্থের তাপের পরিমাণের ওপর নির্ভর করে না, সেটা নির্ভর করে তাপমাত্রার ওপর। তাপমাত্রা যার বেশি সেখান থেকে তাপ প্রবাহিত হয় তাপমাত্রা যার কম সেখানে। তাপমাত্রা বেশি হলেও অনেক কম তাপ রয়েছে সেরকম বস্তু থেকেও অনেক বেশি তাপ যেখানে আছে সেখানে প্রবাহিত হতে পারে।

আমরা স্থির বিদ্যুৎ আলোচনা করার সময় বেশ কয়েকবার বলেছি কোনো একটা বস্তুতে চার্জ জমা করে সেটা যদি অন্য কোনো বস্তুতে স্পর্শ করা হয় তাহলে সেখানে চার্জ প্রবাহিত হয়। এখানেও কি পানির পরিমাণ আর পৃষ্ঠদেশের উচ্চতা কিংবা তাপ এবং তাপমাত্রার মতো চার্জ এবং চার্জ মাত্রা বলে কিছু আছে? যেটা ঠিক করবে চার্জ কোন বস্তু থেকে কোন বস্তুতে যাবে? সেটি আসলেই আছে এবং সেটাকে বলা হয় পটেনশিয়াল বা বিভব। যদি দুটো বস্তুর ভেতরে ভিন্ন ভিন্ন চার্জ থাকে এবং দুটোকে স্পর্শ করানো হয় তাহলে যে বস্তুটিতে পটেনশিয়াল বেশি সেখান থেকে কম পটেনশিয়ালে চার্জ প্রবাহিত হবে।

একটা ধাতব গোলকের ব্যাসার্ধ যদি r হয় এবং তার ওপর যদি Q চার্জ দেওয়া হয় তাহলে তার পটেনশিয়াল হবে V

$$V = \frac{Q}{C}$$

এখানে C হচ্ছে গোলকের ধারকত্ব বা Capacitance. গোলাকার ধাতব গোলকের জন্য C এর মান

$$C = \frac{r}{k}$$

যেখানে $k = 9 \times 10^9\ \text{Nm}^2/\text{C}^2$

কাজেই যদি R_1 এবং R_2 ব্যাসার্ধের দুটো ধাতব গোলক থাকে এবং দুটো গোলকেই সমান পরিমাণ চার্জ Q দেওয়া হয় তাহলে যে গোলকের ব্যাসার্ধ কম হবে সেখানে পটেনশিয়াল বা বিভব বেশি হবে। যদি একটি তার দিয়ে দুটো গোলককে জুড়ে দেওয়া হয় তাহলে ছোট গোলক থেকে বড় গোলকে চার্জ যেতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না দুটো গোলকের পটেনশিয়াল সমান হয়। (চিত্র 10.14)

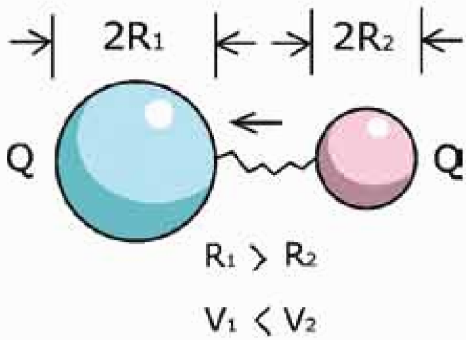

চিত্র 10.14: বেশি পটেনশিয়াল থেকে কম পটেনশিয়ালে চার্জ প্রবাহিত হয়।

পটেনশিয়ালের এককটি সম্পর্কে আমরা সবাই পরিচিত, এটা হচ্ছে ভোল্ট। এবারে আমরা জানার চেষ্টা করি পটেনশিয়াল বলতে আমরা আসলে কী বোঝাই।

আমরা বিভব বা পটেনশিয়ালকে পানির পৃষ্ঠের উচ্চতা কিংবা তাপমাত্রার সাথে তুলনা করেছি, চার্জের প্রবাহ কোন দিকে হবে সেটা বোঝার জন্য এই তুলনাটি ঠিক আছে কিন্তু আমরা যদি আক্ষরিকভাবে সেটা বিশ্বাস করে নিই তাহলে কিন্তু হবে না, তার কারণ পটেনশিয়াল বা বিভব কিন্তু আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা রাশি।

যেমন ধরা যাক যদি কোনো একটা ধাতব গোলকে পজিটিভ Q চার্জ দেওয়া হয়েছে তাহলে তার পৃষ্ঠদেশের বিভব বা পটেনশিয়াল হচ্ছে

$$V = k\frac{Q}{r}$$

পৃষ্ঠদেশের বাইরে তার পটেনশিয়াল কত? এটি কিন্তু মোটেও শূন্য নয়। গোলকের চারপাশে কোথায় কত বিভব সেটাও বের করা সম্ভব।

তোমরা জানো একটা গোলকে চার্জ থাকার কারণে তার চারপাশে ইলেকট্রিক ফিল্ড E আছে, কাজেই সেখানে যদি একটা চার্জ q আনা হয় সেই চার্জটি একটা বল F অনুভব করবে যেখানে

$$F = Eq$$

যেহেতু গোলকে চার্জ Q পজিটিভ এবং গোলকের বাইরে রাখা q চার্জটাও পজিটিভ কাজেই সেটা বিকর্ষণ অনুভব করবে এবং আমরা যদি q চার্জটাকে ছেড়ে দিই তাহলে সেই বলের জন্য তার ত্বরণ হবে, গতি বাড়বে ইত্যাদি ইত্যাদি। আবার q চার্জটাকে যদি আমরা গোলকের কাছে আনার চেষ্টা করি (কল্পনা করে নাও ধাতব গোলকটা শক্ত করে কোথাও লাগানো q চার্জ সেটাকে ঠেলে সরাতে পারবে না) তাহলে বলের বিরুদ্ধে কাজ করতে হবে, কাজেই যতই আমরা গোলকের কাছে আনব ততই তার ভেতরে স্থিতি শক্তি হতে থাকবে।

বিভব হচ্ছে একক চার্জকে (অর্থাৎ q এর মান 1) কোনো একটা জায়গায় হাজির করতে (ধরে নাও শুরু করা হচ্ছে অনেক দূর থেকে যেখানে ইলেকট্রিক ফিল্ড খুব কম, কাজেই বল বলতে গেলে নেই) যেটুকু কাজ করতে হয় তার পরিমাণ। আশপাশে যদি কোনো চার্জ না থাকে, তাহলে কোনো ইলেকট্রিক ফিল্ডও থাকবে না, চার্জটা কোনো বলও অনুভব করবে না তাই একক চার্জটাকে আনতে কোনো কাজও করতে হবে না, তাই আমরা বলব কোনো বিভব নেই।

কিন্তু যদি চার্জ থাকে তাহলে একক চার্জটাকে আনতে কাজ করতে হবে এবং ঠিক যেটুকু কাজ করতে হয়েছে তার পরিমাণটা হচ্ছে বিভব। অর্থাৎ q চার্জকে আনতে যদি W কাজ হয় তাহলে বিভব V হচ্ছে

$$V = \frac{W}{q}$$

গোলকের চার্জটা যদি নেগেটিভ হয় তাহলে উল্টো ব্যাপার ঘটবে, চার্জটাকে ছেড়ে দিলে সেটা গোলকের চার্জের আকর্ষণে তার দিকে ছুটে যেতে চাইবে। তাই অনেক দূর থেকে এই চার্জটাকে যদি কোনো রকম ত্বরণ তৈরি না করে কোনো বাড়তি গতিশক্তি না দিয়ে ধীরে ধীরে আনতে যাই তাহলে সারাক্ষণই চার্জটার আকর্ষণ বলটাকে সামলানোর মতো একটা বল দিয়ে কাছে আনতে হবে অর্থাৎ

আমরা যেদিকে বল দিচ্ছি তার বিপরীত দিকে চার্জটা যাচ্ছে কাজেই আমাদের দেওয়া বল নেগেটিভ কাজ করছে অর্থাৎ আমরা এই চার্জের খানিকটা শক্তি সরিয়ে নিচ্ছি।

তবে এবারেও বিভব হচ্ছে

$$V = \frac{W}{q}$$

শুধু মনে রাখতে হবে W বা কাজ যেহেতু নেগেটিভ তাই V এর মান নেগেটিভ।

আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত যা যা শিখেছি সেগুলো একবার ঝালাই করে নিই:

চার্জ থাকলেই তার আশপাশে যেমন ইলেকট্রিক ফিল্ড থাকে ঠিক সে রকম পটেনশিয়ালও থাকে। সত্যি কথা বলতে কি আমরা যদি পটেনশিয়ালটা কেমনভাবে আছে সেটা জানি তাহলে ইলেকট্রিক ফিল্ডটা বের করে ফেলতে পারব। কেমন করে কোথাও পটেনশিয়াল বের করতে হয়, কেমন করে সেখান থেকে ইলেকট্রিক ফিল্ড বা তড়িৎ ক্ষেত্র বের করতে হয় সেগুলো তোমরা উঁচু ক্লাসে গেলে জানতে পারবে। তবে সাধারণভাবে একটা বিষয় জেনে রাখতে পারো পটেনশিয়ালের পরিবর্তন যত বেশি হয় ইলেকট্রিক ফিল্ডও তত বেশি হয়।

উদাহরণ

প্রশ্ন: একটি পজিটিভ এবং একটা নেগেটিভ চার্জের পাশে পটেনশিয়াল কেমন হবে?

উত্তর: বিপরীত সমান চার্জের জন্য সম পটেনশিয়াল রেখাগুলো 10.15 চিত্রটিতে দেখানো হয়েছে। বাম পাশে পটেনশিয়াল পজিটিভ সমপরিমাণে কমে কমে ডান পাশে নেগেটিভ হয়েছে। ঠিক মাঝখানে পটেনশিয়াল শূন্য।

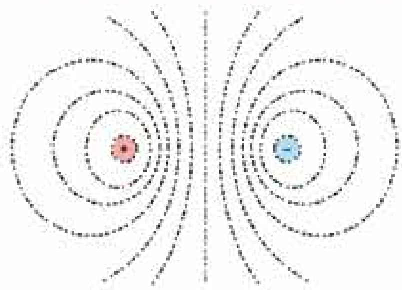

চিত্র 10.15: বিপরীত চার্জের জন্য সম পটেনশিয়াল রেখা।

10.6.1 বিভব পার্থক্য

তোমরা সবাই ইলেকট্রিক লাইনের গায়ে নানা রকম সতর্কবাণী দেখেছ, যেমন, "বিপজ্জনক দশ হাজার ভোল্ট।" তোমরা সবাই জানো ইলেকট্রিক শক বলে একটা বিষয় আছে, এটি খুব বিপজ্জনক। অসতর্ক মানুষ ইলেকট্রিক শক খেয়ে মারা গেছে সে রকম উদাহরণও আছে। তোমরা যদি বিভব

বিষয়টা বুঝে থাক তাহলে নিশ্চয়ই এখন অনুমান করতে পারছ আসলে কী ঘটে। কোথাও যদি বিভব বা পটেনশিয়াল বেশি থাকে এবং তুমি যদি সেটা স্পর্শ করো, তোমার শরীরের পটেনশিয়াল যেহেতু কম সেজন্য বেশি বিভবের জায়গা থেকে চার্জ তোমার শরীরে চলে আসবে। চার্জের সেই প্রবাহ কতটুকু তার ওপর নির্ভর করে তোমার ভেতরে অনেক কিছু হতে পারে।

তুমি যেটা স্পর্শ করছ তার পটেনশিয়াল পজিটিভ বা নেগেটিভ দুটোই হতে পারে। এক জায়গায় তোমার শরীর থেকে চার্জ (ইলেকট্রন) যাবে অন্য ক্ষেত্রে তোমার শরীরে চার্জ আসবে, দুটোই বিদ্যুৎ প্রবাহ–শুধু দিকটা ভিন্ন।

তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ চার্জ প্রবাহিত হয় বিভব পার্থক্যের জন্য, বিভবের মানের জন্য নয়। সে কারণে একটা কাক যখন হাইভোল্টেজ ইলেকট্রিক তারের ওপর বসে সে ইলেকট্রিক শক খায় না, কারণ তারের বিভব এবং তার নিজের বিভব সমান, কোনো পার্থক্য নেই। শুধু তাই নয়, দশ হাজার কিংবা বিশ হাজার ভোল্টের প্রচণ্ড উচ্চ ভোল্টেজে কর্মীরা হেলিকপ্টার দিয়ে খালি হাতে কাজ করে। তারা কোনো ইলেকট্রিক শক খায় না। কারণ শূন্যে থাকার কারণে তারা যখন হাইভোল্টেজ তার স্পর্শ করে তাদের শরীরের ভোল্টেজ তারের সমান হয়ে যায়। কোনো পার্থক্য নেই, তাই কোনো চার্জ প্রবাহিত হয় না। তারা ইলেকট্রিক শক খায় না। তার মানে হচ্ছে ভোল্টেজের পার্থক্যটা গুরুত্বপূর্ণ, ভোল্টেজের মান নয়–এটা সবার জানা দরকার।

তারপরও যখন ভোল্টেজের মান মাপতে হয় তখন তার জন্য একটা নির্দিষ্ট ভোল্টেজ থাকলে ভালো। তাপমাত্রার বেলায় একটা পরম শূন্য তাপমাত্রা ছিল, অনেকটা সে রকম। আমাদের জীবনে আমরা পৃথিবীকে শূন্য বিভব ধরে নিই। পৃথিবীটা এত বিশাল যে এর মাঝে খানিকটা চার্জ দিলেও সেটা গ্রহণ করতে পারে তার জন্য তার বিভব বেড়ে যায় না, আবার খানিকটা চার্জ নিয়ে গেলেও তার বিভব কমে যায় না। তাই সেটাকে শূন্য বিভব ধরে সবকিছু তার সাপেক্ষে মাপা হয়। তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ করে থাকবে ভারী বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি সব সময় খুব ভালো করে ভূমির সাথে লাগানো (Earthing) হয়। যার অর্থ কোনো দুর্ঘটনায় হঠাৎ করে কোনো কারণে যদি প্রচুর চার্জ চলে আসে তাহলে সেটা যেন দ্রুত এবং নিরাপদে পৃথিবীর মাটিতে চলে যেতে পারে, যারা আশপাশে আছে তাদের যেন কোনো ক্ষতি না হয়।

10.7 ধারক (Capacitor)

কোনো পদার্থে তাপ দেওয়া হলে তার তাপমাত্রা কত বাড়বে সেটা সেই পদার্থের তাপ ধারণ ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে। তাপ ধারণ ক্ষমতা বেশি হলে অনেক তাপ দেওয়া হলেও তাপমাত্রা অল্প একটু বাড়ে, কম হলে অল্প তাপ দেওয়া হলেই অনেকখানি তাপমাত্রা বেড়ে যায়। ঠিক সে রকম কোনো পদার্থে চার্জ দেওয়া হলে তার বিভব কতটুকু বাড়বে সেটা তার ধারকত্বের ওপর নির্ভর করে। কোনো

বস্তুর ধারকত্ব বেশি হলে অনেক চার্জ দেওয়া হলেও তার বিভব বাড়বে অল্প একটু, আবার ধারকত্ব কম হলে অল্প চার্জ দিলেই বিভব অনেক বেড়ে যায়। আমরা আগেই বলেছি, কোনো কিছুর ধারকত্ব C হলে সেখানে যদি Q চার্জ দেওয়া হয় তাহলে বিভব V হবে

$$V = \frac{Q}{C}$$

আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি r ব্যাসার্ধের ধাতব গোলকের জন্য C হচ্ছে

$$C = \frac{r}{k}$$

তবে সবচেয়ে পরিচিত সহজ এবং কার্যকর ধারক তৈরি করা হয় দুটো ধাতব পাত পাশাপাশি রেখে (চিত্র 10.16:)। ধাতব পাতের একটিতে যদি পজিটিভ, অন্যটিতে নেগেটিভ চার্জ রাখা হয় তাহলে দুটি পাতের মাঝখানে ইলেকট্রিক ফিল্ড তৈরি হয় এবং সেই ইলেকট্রিক ফিল্ডে শক্তি সঞ্চিত থাকে। একটা ক্যাপাসিটরের ধারকত্ব যদি C এবং ভোল্টেজ V হয় তাহলে তার ভেতরে যে শক্তি (Energy) জমা থাকে সেটি হচ্ছে

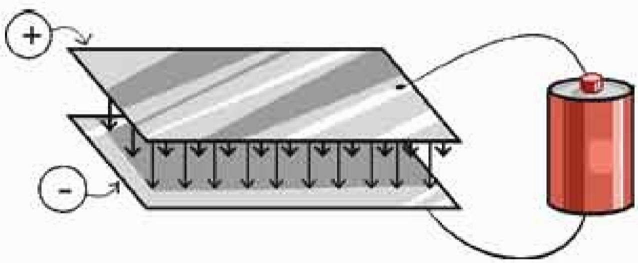

চিত্র 10.16: সমান্তরাল ধাতব প্লেট দিয়ে তৈরি ক্যাপাসিটর।

$$\text{শক্তি} = \frac{1}{2}CV^2$$

উদাহরণ

প্রশ্ন: একটা 20 μF ক্যাপাসিটরে 10 V বৈদ্যুতিক পটেনশিয়াল দেওয়া হয় তাহলে সেখানে কী পরিমাণ শক্তি সঞ্চিত থাকবে?

উত্তর: $\text{শক্তি} = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{1}{2} \times 20 \times 10^{-6} \times 10^2\ \text{J} = 10^{-3}\ \text{J} = 1\ \text{mJ}$

10.8 স্থির বিদ্যুতের ব্যবহার (Uses of Static Electricity)

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে, কলকারখানা, ল্যাবরেটরি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল সব জায়গায় বিদ্যুৎ ব্যবহার করি, তবে প্রায় সব জায়গাতেই সেটা হয় চলবিদ্যুৎ (পরের অধ্যায়ে আমরা সেটা দেখব) তবে বিশেষ বিশেষ জায়গাতে এখনো স্থির বিদ্যুৎ ব্যবহার করা হয়:

10.8.1 ফটোকপি

আমরা সবাই কখনো না কখনো কাগজের কোনো লেখার কপি তৈরি করার জন্য ফটোকপি মেশিন ব্যবহার করেছি। এখানে কাগজের লেখার ওপর আলো ফেলে তার একটি প্রতিচ্ছবি একটি বিশেষ ধরনের রোলারে ফেলা হয় এবং সেই রোলারে কাগজের লেখাটির মতো করে স্থির চার্জ তৈরি করা হয়। তারপর এই রোলারটিকে পাউডারের মতো সূক্ষ্ম কালির সংস্পর্শে আনা হলে যেখানে যেখানে চার্জ জমা হয়েছে সেখানে কালো কালি লেগে যায়। তারপর নতুন একটা সাদা কাগজের ওপর ছাপ দিয়ে এই কালিটি বসিয়ে দেওয়া হয়। কালিটি যেন লেপ্টে না যায় সেজন্য তাপ দিয়ে কালিটিকে আরো ভালো করে কাগজে যুক্ত করে প্রক্রিয়াটি শেষ করা হয়।

10.8.2 ভ্যান ডি গ্রাফ মেশিন

অত্যন্ত উচ্চ বিভব দিয়ে নানা ধরনের কাজ করা হয়। ভ্যান ডি গ্রাফ মেশিনে সেটি করা সম্ভব হয় স্থির বিদ্যুৎ ব্যবহার করে। একটি ঘূর্ণন্ত বিদ্যুৎ অপরিবাহী বেল্টে স্থির বিদ্যুৎ স্প্রে করা হয়, বেল্টটি ঘুরিয়ে একটি ধাতব গোলকের ভেতর নেওয়া হয় (চিত্র 10.17)। বেল্টের ওপর থেকে একটা স্পর্শক এই চার্জটা গ্রহণ করে ধাতব গোলকের কাছে পৌঁছে দেয়। আমরা জানি চার্জ সব সময়ই বেশি থেকে কম বিভবে প্রবাহিত হয়। ভ্যান ডি গ্রাফ জেনারেটরে এটি সব সময় ঘটে থাকে, কারণ ধাতব গোলকের ভেতরে সব সময়ই গোলকের সমান বিভব থাকে। বেল্টের উপরের বাড়তি চার্জটুকুর জন্য যে বাড়তি ভোল্টেজ তৈরি হয় সেটি তাই সব সময়ই গোলকের ভোল্টেজ থেকে বেশি। সে কারণে গোলকের ভেতরে চার্জ থাকলেই সেটা গোলকপৃষ্ঠে চলে যায়। এভাবে বিশাল পরিমাণ চার্জ জমা করিয়ে অনেক উচ্চ পটেনশিয়াল তৈরি করা সম্ভব।

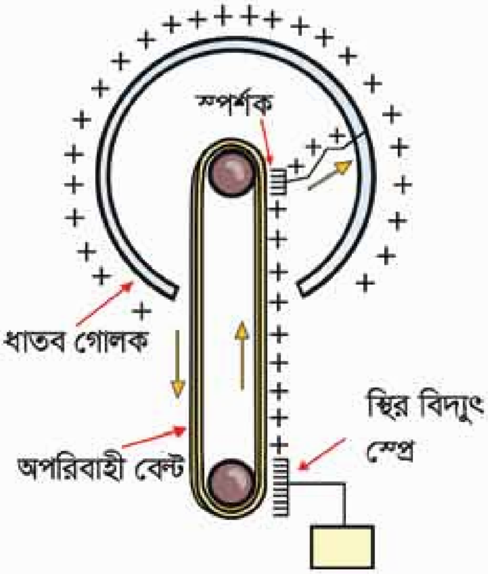

চিত্র 10.17: ভ্যান ডি গ্রাফ মেশিন।

10.8.3 জ্বালানি ট্রাক

পেট্রল বা অন্য জ্বালানির ট্রাক যখন তাদের জ্বালানি সরবরাহ করে তখন তাদের খুব সতর্ক থাকতে হয় যেন হঠাৎ করে কোনো বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ তৈরি হয়ে বড় কোনো বিস্ফোরণের জন্ম না দেয়। জ্বালানি ট্রাকের চাকার সাথে রাস্তার ঘর্ষণে স্থির বিদ্যুৎ তৈরি হলে এটা ঘটতে পারে, সেজন্য এই ধরনের ট্রাকের পেছনে ট্যাংক থেকে একটা শেকল ঝুলিয়ে দেওয়া হয়, সেটা রাস্তার সাথে ঘষা খেতে থাকে যেন কোনো স্থির বিদ্যুৎ তৈরি হলে সেটা যেন সাথে সাথে মাটিতে চলে যেতে পারে।

10.8.4 ইলেকট্রনিকস

শীতপ্রধান দেশে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ খুব কম থাকে এবং সেখানে স্থির বিদ্যুতের প্রভাব অনেক বেশি। ইলেকট্রনিকসের কাজ করার সময় নানা ধরনের আইসি ব্যবহার করতে হয়। কিছু কিছু আইসি (Integrated Circuit) তাদের পিনে অল্প ভোল্টেজের তারতম্যের কারণেই নষ্ট হয়ে যেতে পারে। কাজেই ইলেকট্রনিকসের কাজ করার সময় শুধু হাত দিয়ে স্পর্শ করার কারণেই একটি মূল্যবান আইসি কিংবা সার্কিট বোর্ড নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এরকম পরিস্থিতিতে কাজ করার জন্য পুরো টেবিলে উপরের অংশ বিদ্যুৎ পরিবাহী পদার্থ দিয়ে তৈরি ভূমির সাথে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়। একই সাথে যে কাজ করে তার হাতেও বিদ্যুৎ পরিবাহী স্ট্র্যাপ দিয়ে ভূমির সাথে সংযুক্ত রাখা হয়।

10.8.5 বজ্রপাত ও বজ্রনিরোধক

আকাশে মেঘ জমা হবার সময় জলীয় বাষ্প যখন উপরে উঠতে থাকে তখন সেই জলীয় বাষ্পের ঘর্ষণের কারণে কিছু ইলেকট্রন আলাদা হয়ে নিচের মেঘগুলোর মাঝে জমা হতে থাকে। তখন স্বাভাবিকভাবেই উপরের মেঘের মাঝে ইলেকট্রন কম পড়ে এবং সেখানে পজিটিভ চার্জ জমা হয়। মেঘের ভেতর যখন প্রচুর চার্জ জমা হয় তখন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার জন্য মেঘের ভেতরে বড় স্পার্ক হয়, যেটাকে আমরা বলি বিজলি চমকানো। মাঝে মাঝে আকাশের মেঘে এত বেশি চার্জ জমা হয় যে সেগুলো বাতাসকে আয়নিত করে আক্ষরিক অর্থে লক্ষ মাইল বেগে মাটিতে নেমে আসে এবং আমরা সেটাকে বলি বজ্রপাত। বজ্রপাতের সময় মেঘ থেকে বিশাল পরিমাণ চার্জ পৃথিবীতে নেমে আসে। বাতাসের ভেতর দিয়ে যাবার সময় সেটা বাতাসকে আয়নিত করে ফেলে, তখন সেখানে প্রচণ্ড তাপ আর আলো আর শব্দ তৈরি হয়ে এই বিশাল পরিমাণ চার্জ যেখানে হাজির হয় সেখানে ভয়ংকর ক্ষতি হতে পারে।

বজ্রপাতের সময় লক্ষ অ্যাম্পিয়ারের মতো বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে পারে এবং এই বিদ্যুৎ প্রবাহের জন্য বাতাসের তাপমাত্রা 20 থেকে 30 হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে যায়, যেটা সূর্য পৃষ্ঠের তাপমাত্রা থেকে বেশি।

এই তাপমাত্রার কারণে আমরা নীলাভ সাদা আলোর একটা ঝলকানি দেখতে পাই। তাপমাত্রার কারণে আরো একটা ব্যাপার ঘটে, বাতাসটুকু উত্তপ্ত হয়ে ফুলে ফেঁপে উঠে বাইরের দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং পরের মুহূর্তে বাইরের বাতাস এসে সেই শূন্যস্থান পূরণ করে। পুরো বিষয়টি ঘটে শব্দের গতির চাইতে তাড়াতাড়ি এবং একটি গগনবিদারী শব্দ হয়। বাতাসের গতি শব্দের চাইতে দ্রুত হলে তাকে শকওয়েভ বলে এবং বজ্রপাতের শব্দ একধরনের শকওয়েভ। আলোর ঝলকানি এবং শব্দ একই সাথে তৈরি হলেও আমরা আলোটিকে প্রথম দেখি আলোর গতিবেগ এত বেশি যে সেটা প্রায় সাথে সাথে পৌঁছে যায়। শব্দের গতি $330\,m/s$ এর মতো অর্থাৎ এক কিলোমিটার যেতে প্রায় $3s$ সময় নেয়। কাজেই আলোর কত সেকেন্ড পর শব্দটা শোনা গেছে সেখান থেকে আমরা বজ্রপাতটা কত দূরে হয়েছে সেটা অনুমান করতে পারি। আনুমানিকভাবে প্রতি তিন সেকেন্ডের জন্য এক কিলোমিটার।

বজ্রপাতের সময় যেহেতু আকাশের মেঘ থেকে বিদ্যুতের প্রবাহ নিচে নেমে আসে তাই এটা সাধারণত উঁচু জিনিসকে সহজে আঘাত করে। তাই বজ্রপাত থেকে রক্ষা করার জন্য উঁচু বিল্ডিংয়ের উপর ধাতব একাধিক সুচালো মুখযুক্ত শলাকা লাগানো হয়। সেটা মোটা বিদ্যুৎ সুপরিবাহী তার দিয়ে মাটির গভীরে নিয়ে যাওয়া হয়। এর পেছনের বিজ্ঞানটুকু খুবই সহজ। আমরা আগেই দেখেছি চার্জযুক্ত কোনো কিছু চার্জহীন কোনো কিছুর কাছে আনলে সেখানে বিপরীত চার্জ আবেশিত হয়। তাই বজ্রপাত হবার উপক্রম হলে বজ্র শলাকাতে পজিটিভ চার্জ জমা হয় এবং সুচালো শলাকা থাকার কারণে সেখানে তীব্র ইলেকট্রিক ফিল্ড তৈরি করে। সেই ইলেকট্রিক ফিল্ডের কারণে আশপাশে থাকা বাতাস, জলীয় বাষ্প আয়নিত হয়ে যায় এবং আকাশের দিকে উঠে মেঘের নেগেটিভ চার্জকে চার্জহীন করে বজ্রপাতের আশঙ্কাকে কমিয়ে দেয়। অনেক উঁচু বিল্ডিংয়ে যখন বজ্র শলাকা রাখা হয় সেটি প্রায় সময়ই সত্যিকার বজ্রপাত গ্রহণ করে আর বিশাল পরিমাণ চার্জকে সেই দণ্ড নিরাপদে মাটির ভেতরে নিয়ে যায়। আকাশ থেকে নেমে আসা বিদ্যুৎ অনিয়ন্ত্রিতভাবে না গিয়ে এই মোটা তার দিয়ে মাটির গভীরে চলে যাবে।

সুচালো শলাকায় শুধু যে বজ্রপাত হয় তা নয়, এই সুচালো শলাকা দিয়ে বিপরীত চার্জ বের করে মেঘের মাঝে জমে থাকা চার্জকে নিষ্ক্রিয় করে দিতে পারে। এই কারণে উঁচু বিল্ডিংগুলোতে বজ্রপাত নিরোধক শলাকা লাগানো হলে বজ্রপাতের আশঙ্কা অনেক কমে যায়।

10.8.6 স্থির বৈদ্যুতিক রং স্প্রে

গাড়ি, সাইকেল, স্টিলের আলমারি বা অন্যান্য ধাতব জিনিস রং করার জন্য আজকাল স্থির বৈদ্যুতিক রং স্প্রে ব্যবহার করা হয়। এই স্প্রেগুলোতে রঙের খুবই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা তৈরি করা হয় এবং স্প্রে থেকে বের হওয়ার সময় চার্জযুক্ত হওয়ার কারণে একটি কণা অন্যকে বিকর্ষণ করে ছড়িয়ে পড়ে এবং সে কারণে একটা বড় জায়গাকে খুবই মসৃণভাবে রং করা সম্ভব হয়।

রঙের কণাগুলোকে চার্জ করার জন্য রং স্প্রে করার সুচালো মাথাটি একটা উঁচু পটেনশিয়ালের উৎসের সাথে যুক্ত করে নেওয়া হয়। যে জিনিসটিকে চার্জ করা হবে সেটি বিপরীত পটেনশিয়ালে কিংবা ভূমির সাথে সংযুক্ত করে নেওয়া হয়। রঙের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা চার্জড হওয়ার কারণে জিনিসটির দিকে আকর্ষিত হয় এবং সেখানে খুবই দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত হয়। শুধু তাই নয়, রঙের কণাগুলো বৈদ্যুতিক বলরেখা বরাবর গিয়ে কাঠামোর যে অপ্রকাশ্য স্থান আছে সেখানেও পৌঁছাতে পারে এবং রঙের আস্তরণ তৈরি করতে পারে।

অনুসন্ধান 10.01

ঘর্ষণ এবং আবেশ

উদ্দেশ্য: ঘর্ষণ এবং আবেশের সাহায্যে চার্জ বা আধান তৈরি করা

যন্ত্রপাতি: চিরুনি, অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলের টুকরো

তত্ত্ব: শীতকালে চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়ালে চিরুনিতে নেগেটিভ স্থির বিদ্যুৎ বা নেগেটিভ চার্জ জমা হয়।

কাজের ধারা:

(a) খুবই ছোট এক টুকরো অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল নিয়ে সেটাকে ছোট করে গুটি পাকিয়ে বলের মতো করে নাও।

(b) চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়িয়ে সেটি অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল দিয়ে তৈরি ক্ষুদ্র বলটির কাছে আনো। চিরুনিতে যথেষ্ট পরিমাণ নেগেটিভ চার্জ জমা হয়ে থাকলে সেটি অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলের সম্মুখভাগে পজিটিভ চার্জ আবেশ করবে। (অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল পরিবাহী বলে সহজেই সম্মুখভাগের ইলেকট্রনগুলো পেছন দিকে সরে যাবে।) সম্মুখভাগটিকে চিরুনি আকর্ষণ করবে এবং আকর্ষণের কারণে সেটি লাফিয়ে চিরুনির গায়ে লেগে যাবে।

(c) অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল বিদ্যুৎ পরিবাহী বলে সাথে সাথে চার্জ যুক্ত হয়ে যাবে এবং চিরুনি থেকে বিকর্ষিত হয়ে ছিটকে সরে যাবে।

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন

1. চার্জের ক্ষুদ্রতম একটি মান আছে, সেটি হচ্ছে 1.6×10^{-19} C এ রকম কি ভরের একটি ক্ষুদ্রতম মান আছে?
2. বর্ষাকালে স্থির বিদ্যুতের পরীক্ষাগুলো ঠিক করে কাজ করে না কেন?
3. দুটো এক আকারের ধাতব গোলককে স্পর্শ না করে তাদের মাঝে সমান এবং বিপরীত চার্জ দিতে পারবে?
4. ধারকত্ব বা capacitance কে যদি একটা পাত্রের সাথে তুলনা করা হয় তাহলে পটেনশিয়ালটি কিসের সাথে তুলনা করব?
5. কোনো বিন্দুতে পটেনশিয়াল শূন্য কিন্তু ইলেকট্রিক ফিল্ড শূন্য নয়, এটি কি সম্ভব?
6. পরমাণুর গঠনের ভিত্তিতে কোনো বস্তুর আহিত হওয়ার ঘটনা ব্যাখ্যা করো।
7. কোনো বস্তুকে ঘর্ষণ পদ্ধতিতে কীভাবে আহিত করা যায় বর্ণনা করো।
8. তড়িৎ আবেশ কী?
9. আবেশী আধান ও আবিষ্ট আধান বলতে কী বোঝ?
10. কোনো বস্তুকে আবেশ পদ্ধতিতে কীভাবে আহিত করা যায় বর্ণনা করো।
11. একটি স্বর্ণপাত তড়িৎবীক্ষণ যন্ত্রের গঠন বর্ণনা করো।
12. একটি স্বর্ণপাত তড়িৎবীক্ষণ যন্ত্রকে কীভাবে ধনাত্মক আধানে আহিত করা যায় বর্ণনা করো।
13. একটি স্বর্ণপাত তড়িৎবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে কীভাবে কোনো আহিত বস্তুর আধানের প্রকৃতি নির্ণয় করা যায় বর্ণনা করো।
14. দুটি আধানের মধ্যবর্তী তড়িৎ বল কোন কোন বিষয়ের ওপর নির্ভর করে?

গাণিতিক প্রশ্ন

1. 4 C এবং -1 C চার্জ 1 m দূরে রাখা আছে। চার্জ দুটির সংযুক্ত রেখার কোথায় ইলেকট্রিক ফিল্ড শূন্য?
2. হাইড্রোজেন পরমাণুতে একটি ইলেকট্রন কুলম্ব বলের কারণে একটি প্রোটনকে ঘিরে ঘুরতে থাকে। ইলেকট্রনের ভর 9.11×10^{-31} kg এবং প্রোটনের ভর 1.67×10^{-27} kg এই

ভরের কারণে তাদের ভেতরে নিশ্চয়ই একটি মাধ্যাকর্ষণ বলও আছে। দুটি বলের ভেতর কোনটি বড় এবং কত বড়?

3. 1 নম্বর প্রশ্নের চার্জ দুটির জন্য ইলেকট্রিক ফিল্ডের বলরেখাগুলো এঁকে দেখাও।

4. 10.15 চিত্রটিতে চার্জের জন্য সমপটেনশিয়াল রেখা দেখানো হয়েছে, সেখান থেকে তুমি ইলেকট্রিক ফিল্ড দেখাও।

5. 10.13 চিত্র দুটি চার্জের জন্য ইলেকট্রিক ফিল্ড দেখানো আছে, পটেনশিয়াল এঁকে দেখাও।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটির পাশে ঠিক (√) চিহ্ন দাও

1. কোনো বস্তুতে আধানের অস্তিত্ব নির্ণয়ের যন্ত্র হলো—
   (ক) অ্যামিটার (খ) ভোল্টমিটার
   (গ) অণুবীক্ষণ যন্ত্র (ঘ) তড়িৎবীক্ষণ যন্ত্র

2. দুটি আধানের মধ্যকার তড়িৎ বল নিচের কোনটির ওপর নির্ভর করে না?
   i. আধান দুটির মধ্যবর্তী দূরত্বের ওপর।
   ii. আধান দুটি যে মাধ্যমে অবস্থিত তার প্রকৃতির ওপর।
   iii. আধান দুটির ভরের ওপর।

কোনটি সঠিক
   (ক) i ও ii (খ) iii
   (গ) ii ও iii (ঘ) i, iii ও iii

3. তড়িৎ তীব্রতার একক হচ্ছে
   (ক) N (খ) N m
   (গ) $N\ m^{-1}$ (ঘ) $N\ C^{-1}$

4. 10.18 চিত্রে
   i. A গোলক থেকে কিছু আধান B গোলকে যাবে
   ii. B গোলক থেকে কিছু আধান A গোলকে যাবে
   iii. আধান পার্থক্য সর্বদা সমান থাকে।

নিচের কোনটি সঠিক?
   (ক) i (খ) ii
   (গ) iii (ঘ) i, ii ও iii

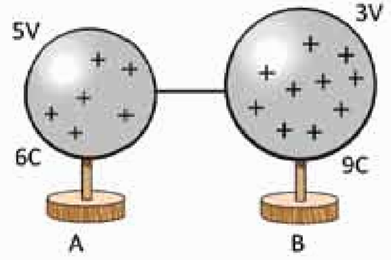

চিত্র 10.18

5. ভোল্ট কিসের একক?
   (ক) তড়িৎ ক্ষেত্র (খ) তড়িৎ বিভব
   (গ) তড়িৎ আধান (ঘ) তড়িৎ প্রবাহ

সৃজনশীল প্রশ্ন

1. রিমা চুল আঁচড়ানোর পর দেখতে পেল তার চিরুনি ছোট ছোট কাগজের টুকরাকে আকর্ষণ করছে। সীমা বলল চিরুনিটি ধনাত্মকভাবে আহিত হয়েছে, যার জন্য এটা ঘটেছে। রিমার বক্তব্য চিরুনিটি ঋণাত্মক আধানে আহিত হয়েছে। বিষয়টির সুরাহার জন্য দুজন তাদের পদার্থবিজ্ঞান শিক্ষককে খুঁজতে গিয়ে তাকে পদার্থবিজ্ঞান গবেষণাগারে পেল। তিনি সব শুনে তাদেরকে তড়িৎবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করে চিরুনির আধানের প্রকৃতি নির্ণয় করতে বললেন।
   (ক) আধান বলতে কী বোঝ?
   (খ) ঘর্ষণে কেন বস্তু আহিত হয় বুঝিয়ে দাও।
   (গ) চিরুনিটি আহিত হওয়ার কারণ বর্ণনা করো।
   (ঘ) যন্ত্রটির সাহায্যে কীভাবে চিরুনিটির আধানের প্রকৃতি নির্ণয় করা যাবে ব্যাখ্যা করো।

2. চিত্র 10.19
   (ক) তড়িৎ ক্ষেত্র কী?
   (খ) P বিন্দুতে স্থাপিত বস্তুর অবস্থান পরিবর্তন করলে এটির উপর অনুভূত বলের কীরূপ পরিবর্তন ঘটবে?
   (গ) 'ক' চিত্রে P বিন্দুতে তড়িৎ প্রাবল্য নির্ণয় করো।
   (ঘ) চিত্র 'ক' অপেক্ষা চিত্র 'খ' এ অনুভূত পরিবর্তন বিশ্লেষণ করো।

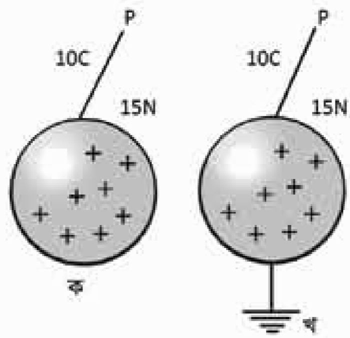

চিত্র 10.19

3. q_1 (2 C), q_2(−1 C) এবং q_3(1 C) এই তিনটি আধান একটি সরল রেখায় পর্যায়ক্রমে পরস্পর থেকে সমদূরত্বে রাখা আছে।
   (ক) তড়িৎ বল কী?
   (খ) তড়িৎ ক্ষেত্র ও তড়িৎ তীব্রতা একই নয় কেন?
   (গ) তিনটি চার্জের জন্য যে বলরেখা তৈরি হবে তার চিত্র আঁকো।
   (ঘ) q_1 আধানটির মান কত হলে q_3 আধানটি কোনো বল অনুভব করবে না সেটি বিশ্লেষণ করো?

একাদশ অধ্যায়

চল বিদ্যুৎ

(Current Electricity)

ইলেকট্রিসিটি বা চলবিদ্যুৎ ছাড়া আজকাল এক মুহূর্তও আমাদের জীবন ঠিকভাবে চলতে পারে না। আমাদের চারপাশের সব ধরনের যন্ত্রপাতি বা সাজ সরঞ্জাম চালানোর জন্য আমাদের ইলেকট্রিসিটির দরকার হয়। আগের অধ্যায়ে আমরা যে স্থির বিদ্যুতের কথা বলেছি সেই স্থির বিদ্যুৎ বা চার্জগুলো যখন কোনো পরিবাহকের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয় আমরা সেটাকেই চলবিদ্যুৎ বা ইলেকট্রিসিটি বলি। এই অধ্যায়ে এই চলবিদ্যুৎকে ব্যাখ্যা করার জন্য প্রয়োজনীয় রাশিগুলো বর্ণনা করব এবং যে নিয়মে চলবিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় সেগুলো জেনে নেব। এই নিয়মগুলো ব্যবহার করে কীভাবে একটা সার্কিটে বিদ্যুৎ প্রবাহ বা পটেনশিয়াল পরিমাপ করা যায় সেটিও এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- স্থির তড়িৎ হতে চল তড়িৎ সৃষ্টি প্রদর্শন করতে পারব।
- তড়িৎ প্রবাহের দিক এবং ইলেকট্রন প্রবাহের দিক ব্যাখ্যা করতে পারব।
- তড়িৎ যন্ত্র ও উপকরণের প্রতীক ব্যবহার করে বর্তনী অঙ্কন করতে পারব।
- পরিবাহী, অপরিবাহী ও অর্ধপরিবাহী ব্যাখ্যা করতে পারব।
- লেখচিত্রের সাহায্যে তড়িৎ প্রবাহ ও বিভব পার্থক্য—এই দুইয়ের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারব।
- স্থির রোধ এবং পরিবর্তনশীল রোধ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- তড়িচ্চালক শক্তি এবং বিভব পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- রোধের নির্ভরশীলতা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- আপেক্ষিক রোধ ও পরিবাহকত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- শ্রেণি ও সমান্তরাল রোধ ব্যবহার করতে পারব।
- বর্তনীতে তুল্য রোধ ব্যবহার করতে পারব।
- তড়িৎ ক্ষমতার হিসাব করতে পারব।
- তড়িতের সিস্টেম লস এবং লোডশেডিং ব্যাখ্যা করতে পারব।
- তড়িতের নিরাপদ ও কার্যকর ব্যবহার বর্ণনা করতে পারব।
- বাসাবাড়িতে ব্যবহার উপযোগী বর্তনীর নকশা প্রণয়ন করে এর বিভিন্ন অংশে এসি উৎস এর ব্যবহার প্রদর্শন করতে পারব।
- তড়িতের নিরাপদ ও কার্যকর ব্যবহারের বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করতে পারব।
- তড়িৎ শক্তির অপচয় রোধ ও সংরক্ষণে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য পোস্টার অঙ্কন করতে পারব।

11.1 বিদ্যুৎ প্রবাহ (Electric Current)

আমরা আগের অধ্যায়ে দেখেছি যে যদি দুটো ভিন্ন বস্তুর পটেনশিয়াল বা বিভবের মাঝে পার্থক্য থাকে তাহলে যেটার বেশি পটেনশিয়াল সেখান থেকে যেটার পটেনশিয়াল কম সেখানে চার্জ বা আধান প্রবাহিত হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত পটেনশিয়াল দুটো সমান না হচ্ছে চার্জের প্রবাহ হতেই থাকে। চার্জের এই প্রবাহ হচ্ছে তড়িৎ বা বিদ্যুতের প্রবাহ, আমরা যেটাকে সাধারণভাবে "ইলেকট্রিসিটি" বলি, যেটা দিয়ে লাইট জ্বলে, ফ্যান ঘুরে, মোবাইল টেলিফোন চার্জ দেওয়া হয়।

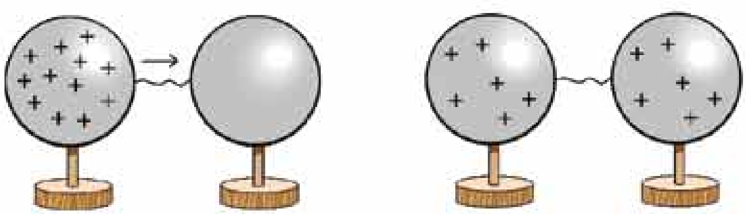

চিত্র 11.01: চার্জ সংযুক্ত গোলক থেকে চার্জহীন গোলকে বিদ্যুৎ প্রবাহ।

11.1.1 তড়িৎ চালক শক্তি এবং বিভব পার্থক্য

একটা বিষয় নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, পটেনশিয়াল বা বিভব পার্থক্য থাকলেই শুধু বিদ্যুৎ প্রবাহ হয়, তাই আমরা যদি বিদ্যুৎ প্রবাহ অবিচ্ছিন্ন রাখতে চাই তাহলে পটেনশিয়ালের পার্থক্যটাও বজায় রাখতে হবে, সেটাকে কমে সমান হয়ে যেতে দেওয়া যাবে না। যদি দুটো ধাতব গোলকের একটির মাঝে ধনাত্মক চার্জ দিয়ে সেখানে একটি পটেনশিয়াল তৈরি করে চার্জবিহীন অন্য গোলকটির সাথে একটা তার দিয়ে জুড়ে দিই (চিত্র 11.01), তাহলে বিদ্যুতের প্রবাহ শুরু হবার সাথে সাথে পটেনশিয়াল বা বিভবের পার্থক্য কমতে থাকবে এবং মুহূর্তের মাঝে দুটি পটেনশিয়াল সমান হয়ে যাবে। ধারক বা ক্যাপাসিটরের দুটো সমান্তরাল ধাতব পাতের মাঝে আধান বা চার্জ জমা রেখে বিভবের পার্থক্য তৈরি করা সম্ভব। ধারকের সেই দুটো পাত একটা তার দিয়ে জুড়ে দিলেও মুহূর্তের মাঝে পুরো চার্জ প্রবাহিত হয়ে তাদের বিভব সমান হয়ে যাবে। কাজেই বুঝতেই পারছ আমরা যদি ব্যবহার করার মতো সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ চাই তাহলে অন্য কোনো পদ্ধতি দরকার যেটা এমন একটা পটেনশিয়াল বা বিভব পার্থক্য তৈরি করে দেবে যেন চার্জ প্রবাহিত হলেও তার পার্থক্য কমে না যায়।

২০২৩

তোমরা সবাই সে রকম পদ্ধতি দেখেছ, এগুলো হচ্ছে ব্যাটারি সেল এবং জেনারেটর। ব্যাটারি সেলের ভেতর রাসায়নিক বিক্রিয়া করে পটেনশিয়ালের পার্থক্য তৈরি করা হয়, সেখান থেকে চার্জ প্রবাহ করা হলে রাসায়নিক দ্রব্যগুলো খরচ হতে থাকে, যখন রাসায়নিক দ্রব্যগুলো শেষ হয়ে যায় তখন ব্যাটারি সেল আর বিদ্যুৎ প্রবাহ করতে পারে না। আমরা সাধারণ যে ব্যাটারি সেলগুলো দেখি সেগুলোর বিভব পার্থক্য হচ্ছে 1.5 ভোল্ট।

তোমাদের স্কুলে কিংবা বাসায় যে ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই আছে সেখানে তোমরা সবাই দেখেছ সেটি ব্যবহার করার জন্য সব সময় দুটো পয়েন্ট থাকে, তার একটাতে থাকে কম পটেনশিয়াল বা বিভব অন্যটাতে বেশি, এই পার্থক্যটা বজায় রাখে জেনারেটর, যেটি ক্রমাগত পটেনশিয়াল পার্থক্য তৈরি করতে থাকে। একটা ব্যাটারি সেল বা একটা জেনারেটরে ক্রমাগত বিদ্যুৎ প্রবাহের জন্য ক্রমাগত চার্জকে কম পটেনশিয়াল বা বিভব থেকে বেশি পটেনশিয়াল বা বিভবে হাজির করে রাখতে হয় এবং এর জন্য শক্তির প্রয়োজন হয়। যদি কোনো ব্যাটারিতে Q চার্জকে কম পটেনশিয়াল থেকে বেশি পটেনশিয়াল আনতে W পরিমাণ কাজ করতে হয় তাহলে এই ব্যাটারি সেলের তড়িৎ চালক শক্তি বা ইএমএফ হচ্ছে:

$$EMF = \frac{W}{Q}$$

ব্যাটারি সেল বা জেনারেটর, যেগুলো বিদ্যুৎ শক্তি সরবরাহ করে তার তড়িৎ চালক শক্তি বা ইএমএফ থাকে। যখন কোনো ব্যাটারি সেল বা জেনারেটরকে কোনো সার্কিটে লাগানো হয় তখন এই তড়িৎ চালক শক্তিই চার্জকে পুরো সার্কিটের ভেতর দিয়ে ঘুরিয়ে আনে। একটা ব্যাটারি যে পরিমাণ পটেনশিয়াল তৈরি করে সেটাই হচ্ছে তার তড়িৎ চালক শক্তি (Electromotive Force) বা ইএমএফ। ইংরেজিতে এটাকে বলা হচ্ছে ফোর্স বা "বল" বাংলায় বলছি "শক্তি"। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে "ইএমএফ" বা "তড়িৎ চালক শক্তি" বলও নয় আবার শক্তিও নয়। তোমাদের আগে বলা হয়েছে পদার্থবিজ্ঞানে "বল" "শক্তি" এই বিষয়গুলো খুবই সুনির্দিষ্ট, ইচ্ছেমতো একটা শব্দের জায়গায় অন্য শব্দ ব্যবহার করা যাবে না। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এখানে সেটি করা হয়ে গেছে। তোমাদের বিভ্রান্ত হওয়ার কোনো কারণ নেই কারণ যেহেতু একটা ব্যাটারি সেল বা জেনারেটর যে পরিমাণ পটেনশিয়াল তৈরি করে সেটাই হচ্ছে তার ইএমএফ তাই আমরা সেখান থেকেই শুরু করব, পটেনশিয়াল কথাটি দিয়েই সব কাজ করে ফেলব, দেখবে কোনো সমস্যা হবে না।

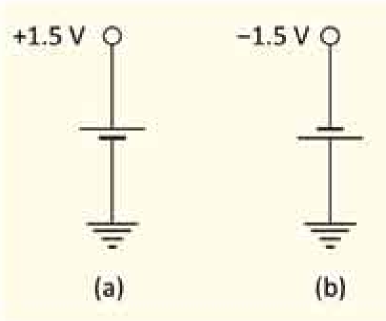

চিত্র 11.02: একটি ব্যাটারি সেল দিয়ে পজেটিভ বা নেগেটিভ ভোল্টেজ দুটোই তৈরি করা সম্ভব।

আমরা আগেই বলেছি পটেনশিয়ালের মানটি গুরুত্বপূর্ণ নয়, তার পার্থক্যটুকু গুরুত্বপূর্ণ। তাই দেখবে অনেক সময় একটা ব্যাটারি সেলের এক মাথার পটেনশিয়ালের মান ভিন্ন করে ফেলা সম্ভব, কিন্তু পার্থক্যটা সব সময়ই সমান থাকবে।

উদাহরণ

প্রশ্ন: একটা ব্যাটারি সেলের পটেনশিয়ালের পার্থক্য 1.5 V কিন্তু আসলে দুই প্রান্তের পটেনশিয়াল কত? নেগেটিভটা শূন্য এবং পজিটিভটা 1.5 V নাকি নেগেটিভটা -1.5 V এবং পজিটিভটা শূন্য?

উত্তর: দুটোই সত্য হতে পারে। যদি 11.02a চিত্রের মতো হয় তাহলে নেগেটিভটা শূন্য এবং পজিটিভটা 1.5 V। যদি 11.02b চিত্রের মতো হয় তাহলে পজিটিভটা শূন্য এবং নেগেটিভটা -1.5 V।

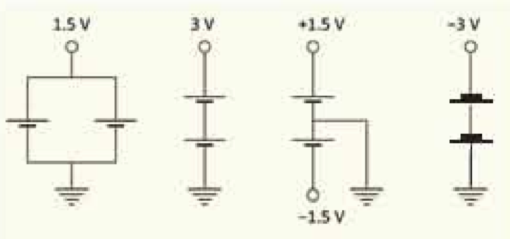

চিত্র 11.03: দুটি ব্যাটারি সেল দিয়ে বিভিন্ন পজিটিভ বা নেগেটিভ ভোল্টেজ তৈরি করা।

প্রশ্ন: দুটি 1.5 V ভোল্টের ব্যাটারি দিয়ে 1.5 V, 3.0 V, ±1.5 V, −3.0 V তৈরি করো।

উত্তর: 11.03 চিত্রটিতে করে দেখানো হয়েছে।

11.1.2 পরিবাহী, অপরিবাহী এবং অর্ধপরিবাহী পদার্থ

পরিবাহী পদার্থ: আমরা যদি পদার্থের গঠনটা ভালো করে বুঝে থাকি তাহলে একটা বিষয় খুব ভালো করে জেনেছি। কঠিন পদার্থে তার অণু-পরমাণু শক্ত করে নিজের জায়গায় বসে থাকে। তাপমাত্রা বাড়লে তারা নিজের জায়গায় কাঁপাকাঁপি করতে পারে কিন্তু সেখান থেকে সরে অন্য জায়গায় চলে যায় না। তোমাদের রসায়ন বইয়ে তোমরা যখন ধাতব বন্ধন পড়েছ সেখানে দেখেছ, ধাতব পরমাণুর কিছু ইলেকট্রন প্রায় মুক্ত অবস্থায় থাকে সেগুলো এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে পারে। সেজন্য আমরা সেগুলোকে বলি পরিবাহী পদার্থ। সোনা, রুপা, তামা, অ্যালুমিনিয়াম এগুলো সুপরিবাহী

পদার্থ। পরিবাহী পদার্থ দিয়ে চার্জকে স্থানান্তর করা যায়, তবে সব সময় মনে রাখতে হবে এই স্থানান্তর হয় ইলেকট্রন দিয়ে, বিদ্যুতের প্রবাহ হয় ইলেকট্রন দিয়ে, নেগেটিভ চার্জের ইলেকট্রন।

অপরিবাহী পদার্থ: যে পদার্থের ভেতর তড়িৎ বা বিদ্যুৎ পরিবহনের জন্য কোনো মুক্ত ইলেকট্রন নেই সেই পদার্থগুলো হচ্ছে বিদ্যুৎ অপরিবাহী বা অন্তরক পদার্থ। প্লাস্টিক, রাবার, কাঠ, কাচ এগুলো হচ্ছে অপরিবাহী পদার্থের উদাহরণ। মূলত অধাতুগুলো বিদ্যুৎ অপরিবাহী হয়।

অর্ধপরিবাহী পদার্থ: কিছু কিছু পদার্থের বিদ্যুৎ পরিবহন ক্ষমতা সাধারণ তাপমাত্রায় পরিবাহী এবং অপরিবাহী পদার্থের মাঝামাঝি, তবে তাপমাত্রা বাড়ালে পরিবহন ক্ষমতা বেড়ে যায়। এই ধরনের পদার্থকে অর্ধপরিবাহী বা সেমিকন্ডাক্টর বলে। সিলিকন বা জার্মেনিয়াম সেমিকন্ডাক্টরের উদাহরণ। এই বইয়ের শেষ অধ্যায়ে সেমিকন্ডাক্টর নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

11.1.3 বিদ্যুৎ প্রবাহের দিক

আমরা দেখেছি দুটো ভিন্ন বিভবের বস্তুকে পরিবাহী দিয়ে সংযুক্ত করে দিলে আধানের প্রবাহ শুরু হয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত পটেনশিয়াল সমান না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আধানের প্রবাহ হয় এবং আমরা বলি তাদের মাঝে বিদ্যুৎ প্রবাহ হচ্ছে। তোমাদের কেউ কেউ নিশ্চয়ই এখন একটু ভাবনার মাঝে পড়েছ, কারণ আমরা যখন আধান বা চার্জের প্রবাহ দিয়ে দুটি ভিন্ন বিভবের মাঝে সমতা আনার কথা বলেছি তখন কিন্তু একবারও বলিনি এটা শুধু নেগেটিভ চার্জের জন্য সত্যি, কারণ শুধু নেগেটিভ চার্জের ইলেকট্রনই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে পারে। পজিটিভ চার্জের বেলায় তাহলে কী হয়? পজিটিভ আয়ন তো খুবই শক্তভাবে নিজের জায়গায় আটকে থাকে, তাহলে কেমন করে পজিটিভ চার্জ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যায়?

তোমরা নিশ্চয়ই কী ঘটে সেটা অনুমান করে ফেলেছ, ইলেকট্রনের অভাব হচ্ছে পজিটিভ চার্জ। তাই ইলেকট্রনকে সরিয়ে অভাব আরো বাড়িয়ে দেওয়ার অর্থ হচ্ছে পজিটিভ চার্জ সরবরাহ করা। কাজেই 11.01 চিত্রে যদি বলা হয় বিদ্যুৎ প্রবাহের মাধ্যমে A থেকে B তে পজিটিভ চার্জ গিয়েছে তার প্রকৃত অর্থ হচ্ছে B থেকে A তে ইলেকট্রন গিয়েছে।

আধান বা চার্জের প্রবাহ হচ্ছে বিদ্যুৎ প্রবাহ বা তড়িৎ প্রবাহ। আমরা এতক্ষণ সাধারণভাবে এটা বোঝার চেষ্টা করেছি, এখন এটাকে আরো একটু নির্দিষ্ট করা যাক। বিদ্যুৎ বা তড়িৎ প্রবাহ বলতে আমরা সময়ের সাথে চার্জ প্রবাহের হারকে বোঝাই অর্থাৎ t সময়ে যদি Q চার্জ প্রবাহিত হয় তাহলে বিদ্যুৎ বা তড়িৎ প্রবাহ হচ্ছে:

$$I = \frac{Q}{t}$$

আধান বা চার্জের একক কুলম্ব C এবং সময়ের একক সেকেন্ড t হলে বিদ্যুৎ প্রবাহের একক হচ্ছে অ্যাম্পিয়ার A। মজার ব্যাপার হচ্ছে, আমরা কিন্তু চার্জের একক বের করার জন্য বলেছিলাম এক সেকেন্ডে এক অ্যাম্পিয়ার বিদ্যুৎ প্রবাহ করতে যে পরিমাণ চার্জ প্রবাহিত হয় সেটাই হচ্ছে কুলম্ব। তড়িৎ বা বিদ্যুৎ প্রবাহ (কারেন্ট) হচ্ছে চার্জ প্রবাহের হার, A থেকে B তে যদি 1 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট প্রবাহিত হয় তার অর্থ 1 কুলম্ব পজিটিভ চার্জ A থেকে B তে গিয়েছে। যার প্রকৃত অর্থ 1 কুলম্ব চার্জের সমপরিমাণ ইলেকট্রন B থেকে A তে গিয়েছে। কাজেই তোমরা দেখতে পাচ্ছ, বিদ্যুৎ প্রবাহের দিক হচ্ছে ইলেকট্রন প্রবাহের দিকের উল্টো। (ইলেকট্রনের চার্জকে পজিটিভ ধরে নিলেই সব সমস্যা মিটে যেত কিন্তু সেটার জন্য এখন দেরি হয়ে গেছে।)

11.2 বিভব পার্থক্য এবং তড়িৎ প্রবাহের মধ্যে সম্পর্ক (Relationship between Potential Difference and Electricity)

এবারে আমরা সত্যিকারের বর্তনী বা সার্কিটে সত্যিকারের বিদ্যুৎ প্রবাহ নিয়ে আলোচনা করব। আমরা অনেকবার বলেছি যে দুটি বিন্দুতে যদি পটেনশিয়াল বা বিভব পার্থক্য থাকে এবং আমরা যদি একটি পরিবাহী তার দিয়ে সেই দুটি বিন্দুকে জুড়ে দিই তাহলে বিন্দু দুটির ভেতরে বিদ্যুৎ প্রবাহ হবে, কিন্তু কতটুকু বিদ্যুৎ প্রবাহ হবে সেটি নিয়ে এখনো কিছু বলা হয়নি। শুধু তাই নয় একটা সোনার পরিবাহী তার দিয়ে জুড়ে দিলে যেটুকু বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে একটা লোহার তার জুড়ে দিলেও কি সমান পরিমাণ বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে?

11.2.1 ও'মের সূত্র

পটেনশিয়াল বা বিভব পার্থক্য এবং তড়িৎ প্রবাহের মাঝে সম্পর্ক দেখার জন্য আমরা একটা এক্সপেরিমেন্ট করতে পারি। বিভব মাপার জন্য যে যন্ত্রটি ব্যবহার করা হয় তার নাম ভোল্টমিটার, বিদ্যুৎ প্রবাহ বা কারেন্ট মাপার জন্য যে যন্ত্র ব্যবহার করা হয় সেটার নাম অ্যামিটার। (আসলে একই যন্ত্রের সুইচ ঘুরিয়ে এটাকে কখনো ভোল্টমিটার বা কখনো অ্যামিটার হিসেবে ব্যবহার করা যায়) আমরা কয়েকটা ব্যাটারি সেল নিতে পারি, একটা ব্যাটারি সেলের জন্য বিভব 1.5 V হলে দুটি ব্যাটারি সেলের জন্য $2 \times 1.5 =$

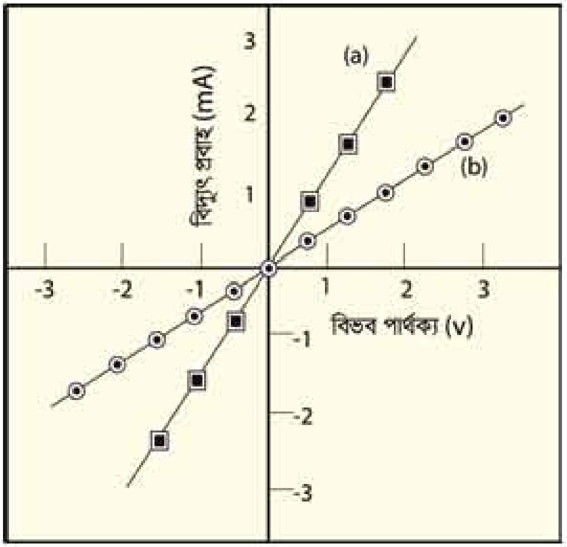

চিত্র 11.04: রেজিস্ট্যান্স-এর কারণে বিভব পার্থক্যের সাপেক্ষে বিদ্যুৎ প্রবাহ।

3 V, তিনটির জন্য $3 \times 1.5 = 4.5$ V এভাবে ভিন্ন ভিন্ন বিভব পার্থক্য প্রয়োগ করতে পারি। শুধু তাই নয়, আমরা ব্যাটারিগুলো উল্টে দিয়ে বিভব পার্থক্যের দিকও পরিবর্তন করে দিতে পারি। কাজেই আমরা যদি একটা তার বা অন্য কোনো পরিবাহীর দুই পাশে একটা বিভিন্ন পজিটিভ এবং নেগেটিভ বিভব পার্থক্য প্রয়োগ করে কতখানি বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়েছে সেটা মাপার চেষ্টা করি তাহলে দেখব

(a) যত বেশি বিভব পার্থক্য তত বেশি বিদ্যুৎ প্রবাহ
(b) বিভব পার্থক্য নেগেটিভ হলে বিদ্যুৎ প্রবাহও দিক পরিবর্তন করছে।

গ্রাফে এক্সপেরিমেন্টের ফলাফল বসানো হলে সেটা 11.04 (a) চিত্রের মতো দেখাবে:

অর্থাৎ $I \propto V$

আমরা যদি অন্য কোনো উপাদানের তৈরি একটা তার দিয়ে একই পরীক্ষাটি করি তাহলে একই ধরনের ফলাফল পাব। তবে সরলরেখার ঢালটা হয়তো অন্য রকম হবে (চিত্র 11.04 (b))। এখন এই দুটি পরীক্ষার ফলাফল যদি বিশ্লেষণ করি তাহলে বুঝতে পারব প্রথমে একটা নির্দিষ্ট বিভব পার্থক্যে যতটুকু বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়েছে দ্বিতীয় বস্তুর জন্য সেই একই বিভব পার্থক্যে বিদ্যুৎ প্রবাহ হচ্ছে কম। প্রথমটিতে যেন বিদ্যুৎ প্রবাহ তুলনামূলকভাবে সহজ, দ্বিতীয়টিতে যেন বিদ্যুৎ প্রবাহের বাধা একটু বেশি। বিষয়টা ব্যাখ্যা করার জন্য বিদ্যুৎ প্রবাহের বাধা (Resistance) বা সত্যি সত্যি রোধ নামের একটা রাশি তৈরি করা হয়েছে। আমরা দেখতে পারি বিভব পার্থক্য এবং বিদ্যুৎ প্রবাহের সম্পর্কটি একটা সূত্র হিসেবে লেখা যায় যেটি ও'মের সূত্র (Ohm's Law) হিসেবে পরিচিত।

$$I = \frac{V}{R}$$

অর্থাৎ রোধ বেশি হলে বিদ্যুৎ প্রবাহ হবে কম। রোধ কম হলে বিদ্যুৎ প্রবাহ হবে বেশি।

এই রোধ বা Resistance এর একক হচ্ছে Ohm। এটাকে গ্রিক অক্ষর Ω (সিগমা) দিয়ে প্রকাশ করা হয়। কোনো বৈদ্যুতিক সার্কিটে 1 V বিভব পার্থক্য দেওয়ার পর যদি দেখা যায় 1 A বিদ্যুৎ প্রবাহিত হচ্ছে তাহলে বুঝতে হবে সেই সার্কিটের রোধ 1Ω।

উদাহরণ

প্রশ্ন: মজা করার জন্য ও'মের সূত্রটিকে অন্যভাবেও লিখতে পারো:

$$\frac{V}{I \times R}$$

একটু বড় করে লিখে আঙুল দিয়ে V, I কিংবা R এর যেকোনো একটি ঢেকে দাও, যেটি ঢেকে দিয়েছ তার মানটি যেটুকু ঢাকা পড়েনি সেখান থেকে পেয়ে যাবে।

উত্তর: 11.05 চিত্রটিতে বিষয়টি করে দেখানো হয়েছে।

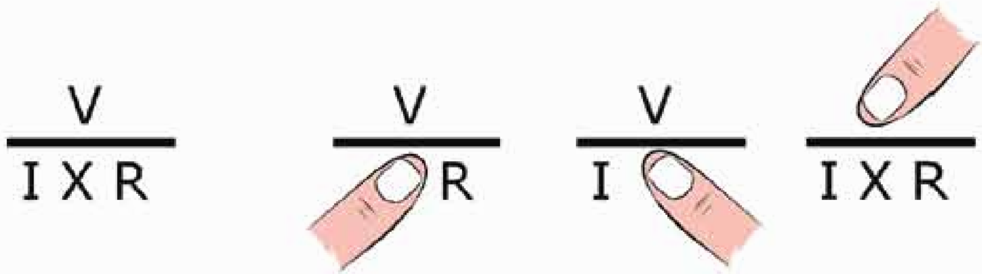

চিত্র 11.05: ও'মের সূত্র এই চিত্রটি দিয়ে ব্যবহার করা সম্ভব। আঙুল দিয়ে ঢাকা রাশিটির মান বাকি দুটি রাশি দিয়ে প্রকাশ করা সম্ভব।

11.2.2 রোধ

রোধ হচ্ছে বিদ্যুৎ প্রবাহের বাধা, তাই কোনো পদার্থের দৈর্ঘ্য (L) যত বেশি হবে তার বাধা তত বেশি হবে অর্থাৎ রোধও বেশি হবে।

$$R \propto L$$

আবার সরু একটা পথ দিয়ে যত সহজে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে পারবে, চওড়া একটা পথ দিয়ে তার থেকে অনেক সহজে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে পারবে অর্থাৎ প্রস্থচ্ছেদ (A) যত বেশি হবে রোধ তত কম হবে।

$$R \propto \frac{1}{A}$$

এই দুটি বিষয়কে আমরা যদি একসাথে আনুপাতিক না লিখে সমীকরণ হিসেবে লিখতে চাই তাহলে একটা ধ্রুবক ρ ব্যবহার করতে হবে। অর্থাৎ রোধ R হচ্ছে

$$R = \rho\frac{L}{A}$$

যেখানে ধ্রুবক ρ হচ্ছে

$$\rho = R\frac{A}{L}$$

একটা নির্দিষ্ট পদার্থের জন্য ρ হচ্ছে আপেক্ষিক রোধ এবং তাই এর একক হচ্ছে Ω m.

কোনো পদার্থ কতটুকু বিদ্যুৎ পরিবাহী সেটা বোঝানোর জন্য পরিবাহকত্ব বলে একটা রাশি σ তৈরি করা হয়েছে, যে পদার্থ যত বেশি বিদ্যুৎ পরিবাহী তার পরিবাহকত্ব তত বেশি, যেটা আপেক্ষিক রোধ ρ (টেবিল 11.01) এর ঠিক বিপরীত।

টেবিল 11.01: পদার্থের আপেক্ষিক রোধ

পদার্থ	আপেক্ষিক রোধ (Ω m)
রূপা	1.59×10^{-8}
তামা	1.68×10^{-8}
সোনা	2.44×10^{-8}
গ্রাফাইট	2.50×10^{-6}
হীরা	1.00×10^{12}
বাতাস	1.30×10^{16}

$$\sigma = \frac{1}{\rho}$$

পরিবাহকত্ব σ এর একক হচ্ছে $(\Omega\ m)^{-1}$

এখানে একটা বিষয় মনে রাখতে হবে কোনো পদার্থের রোধ হচ্ছে ইলেকট্রন প্রবাহের বাধা, অণু-পরমাণুগুলো যত বেশি কাঁপাকাঁপি করে একটা ইলেকট্রন তাদের ভেতর দিয়ে যেতে তত বেশি বাধাগ্রস্ত হয়, কিংবা তার রোধ তত বেশি। তাপমাত্রা বাড়িয়ে দিলে যেহেতু অণু-পরমাণুগুলো বেশি কাঁপাকাঁপি করে তাই সব সময়ই তাপমাত্রা বাড়ালে পরিবাহী পদার্থের আপেক্ষিক রোধ বেড়ে যায়। সেজন্য যখন কোনো পদার্থের রোধ বা আপেক্ষিক রোধ প্রকাশ করতে হয় তখন তার জন্য তাপমাত্রাটা নির্দিষ্ট করে বলে দিতে হয়।

স্থির মানের রোধ: বিভিন্ন বর্তনী বা সার্কিটে ব্যবহার করার জন্য নির্দিষ্ট মানের রোধ বা রেজিস্টর ব্যবহার করা হয়। এগুলো নানা আকারের এবং নানা ধরনের হতে পারে। ল্যাবরেটরিতে ব্যবহার করার জন্য যে রোধ ব্যবহার করা হয় সাধারণত তার উপরে বিভিন্ন রঙের ব্যান্ডের মাধ্যমে তার মান প্রকাশ করা হয়। একটি রোধের মান ছাড়াও সেটি কত বৈদ্যুতিক ক্ষমতা সহ্য করতে পারবে সেটিও নির্দিষ্ট করে দেওয়া থাকে।

(a) (b)

চিত্র 11.06: (a) স্থির এবং (b) পরিবর্তী রোধ

পরিবর্তী রোধ: মাঝে মাঝেই কোনো ইলেকট্রিক সার্কিটে একটি রোধের প্রয়োজন হয়, যেটির মান প্রয়োজনমতো পরিবর্তন করা যেতে পারে। যে ধরনের রোধের মান একটি নির্দিষ্ট সীমার ভেতরে পরিবর্তন করা যায় সেটিকে পরিবর্তী রোধ বা রিওস্টেট বলে। স্থির রোধের দুটি প্রান্ত থাকে, পরিবর্তী রোধে দুই প্রান্ত ছাড়াও মাঝখানে আরেকটি প্রান্ত থাকে, যেখানে পরিবর্তন করা রোধের মানটুকু পাওয়া যায়। 11.06 চিত্রে স্থির এবং পরিবর্তী রোধের ছবি দেখানো হয়েছে।

উদাহরণ

প্রশ্ন: রুপা, তামা, টাংস্টেন ও নাইক্রোম তারের রোধকত্ব ρ যথাক্রমে 1.6×10^{-8}, 1.7×10^{-8}, 5.5×10^{-8}, $100 \times 10^{-8}\ \Omega\,\text{m}$ এইগুলো ব্যবহার করে $1\ \Omega$ রোধ তৈরি করো।

উত্তর: আমরা জানি, রোধ

$$R = \frac{\rho L}{A}$$

যেখানে L দৈর্ঘ্য এবং A প্রস্থচ্ছেদ।

কাজেই $A = 1\ \text{m}^2$ ধরে নিলে

$$L = \frac{RA}{\rho} = \frac{1 \times 1}{\rho} = \frac{1}{\rho}$$

রুপার জন্য:

$$L = \frac{1}{1.6 \times 10^{-8}} = 6.25 \times 10^{7}\ \text{m}$$

তামার জন্য:

$$L = \frac{1}{1.7 \times 10^{-8}} = 5.9 \times 10^{7}\ \text{m}$$

টাংস্টেনের জন্য:

$$L = \frac{1}{5.5 \times 10^{-8}} = 1.8 \times 10^{7}\ \text{m}$$

নাইক্রোমের জন্য:

$$L = \frac{1}{100 \times 10^{-8}} = 10^{6}\ \text{m}$$

দেখতেই পাচ্ছ $1\ \Omega$ রোধ তৈরি করার জন্য অনেক দীর্ঘ (প্রায় লক্ষ কিলোমিটার) পদার্থ নিতে হয়। বাস্তবে কখনোই $A = 1\ \text{m}^2$ হয় না দৈনন্দিন ব্যাবহারের জন্য অনেক সরু তার ব্যবহার করা হয়। যদি 0.1 mm ব্যাসার্ধের প্রস্থচ্ছেদ নির্দিষ্ট করে দিই তাহলে $1\ \Omega$ রোধ তৈরি করতে কত দীর্ঘ তারের প্রয়োজন?

আমরা জানি

$$L = \frac{RA}{\rho}$$

$$A = \pi r^2 = \pi(10^{-4})^2 \text{m}^2 = 3.14 \times 10^{-8}\ \text{m}^2$$

রুপার জন্য:

$$L = \frac{3.14 \times 10^{-8}}{1.6 \times 10^{-8}} = 1.96\ \text{m}$$

তামার জন্য:

$$L = \frac{3.14 \times 10^{-8}}{1.7 \times 10^{-8}} = 1.84\ \text{m}$$

টাংস্টেনের জন্য:

$$L = \frac{3.14 \times 10^{-8}}{5.5 \times 10^{-8}} = 0.57\text{m} = 57\ \ \text{cm}$$

নাইক্রোমের জন্য:

$$L = \frac{3.14 \times 10^{-8}}{100 \times 10^{-8}} = 0.03\text{m} = 3\ \text{cm}$$

পরিবাহীতে তাপমাত্রা বাড়ালে রোধ বেড়ে যায় কিন্তু সেমিকন্ডাক্টরের বেলায় ঠিক তার উল্টো ব্যাপারটা ঘটে। সেমিকন্ডাক্টরে তাপমাত্রা বাড়ালে রোধ কমে যায়। তার কারণ কন্ডাক্টরে যেমন বিদ্যুৎ প্রবাহের জন্য মুক্ত ইলেকট্রন রয়েছে সেমিকন্ডাক্টরে তা নেই। সেখানে তাপমাত্রা বাড়ালেই শুধু কিছু ইলেকট্রন বিদ্যুৎ প্রবাহের জন্য পাওয়া যায়। তাই সেখানে তাপমাত্রা বাড়ালে রোধ কমে যায়।

11.2.3 বর্তনী বা সার্কিট

আমরা যদি ও'মের সূত্র বুঝে থাকি তাহলে আমরা এখন সার্কিট বিশ্লেষণ করতে পারি। সেটা করার আগে সার্কিটে ব্যবহার করা হয় এ রকম কয়েকটি প্রতীকের সাথে আগে পরিচিত হয়ে নিই: (চিত্র 11.07)

সব পদার্থেরই কিছু না কিছু রোধ আছে কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সার্কিটে ব্যবহারের সময় বৈদ্যুতিক তারের রোধকে আমরা ধর্তব্যের মাঝে নিই না। যখন রোধ প্রয়োজন হয় তখন আমরা বিশেষভাবে তৈরি বিভিন্ন মানের রোধ ব্যবহার করি। কখনো কখনো বিশেষ প্রয়োজনে এমন রোধ ব্যবহার করা হয় যেখানে তার মানটি পরিবর্তনও করা যায়, এগুলোকে পরিবর্তনশীল রোধ বলে।

কোনো সার্কিট বিশ্লেষণ করতে হলে নিচের কয়েকটা সোজা বিষয় মনে রাখাই যথেষ্ট:

চিত্র 11.07: সার্কিট বা বর্তনীতে ব্যবহৃত হয় এ রকম কিছু প্রতীক।

(a) বিদ্যুতের উৎসের (ব্যাটারি সেল, জেনারেটর যাই হোক) উঁচু পটেনশিয়াল থেকে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ বের হয় পুরো সার্কিটের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ঠিক সেই পরিমাণ বিদ্যুৎ কম পটেনশিয়ালে ফিরে আসে।

(b) সার্কিটের যেকোনো জায়গায় যেকোনো বিন্দুতে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ ঢোকে ঠিক সেই পরিমাণ বিদ্যুৎ বের হয়ে যায়, সার্কিটের ভেতরে বিদ্যুতের কোনো সৃষ্টি বা ধ্বংস নেই।

(c) সার্কিটের ভেতরে যেকোনো অংশের দুই বিন্দুতে ও'হমের সূত্র সব সময় সত্যি হবে, অর্থাৎ সেই দুই অংশের যে পরিমাণ বিভব পার্থক্য রয়েছে তাকে সেই অংশের রোধ দিয়ে ভাগ দিলেই তার ভেতর দিয়ে প্রবাহিত বিদ্যুৎ বের হয়ে যাবে।

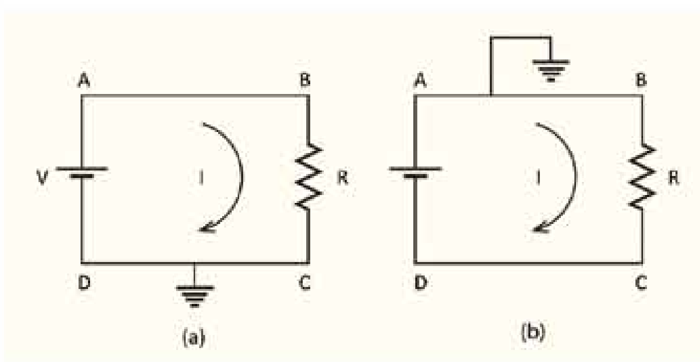

চিত্র 11.08: একটি ব্যাটারি সেল এবং একটি রোধ বা রেজিস্টর সংযুক্ত দুটি বর্তনী বা সার্কিট।

আমরা এখন যেকোনো বর্তনী বা সার্কিট বিশ্লেষণ করতে প্রস্তুত। একটা সার্কিটের যেকোনো অংশ দিয়ে কতটুকু বিদ্যুৎ প্রবাহিত হচ্ছে এবং যেকোনো অংশের বিভব কত সেটা জানলেই আমরা ধরে নেব সার্কিটটা আমরা পুরোপুরি বুঝে গেছি। একটা সার্কিটে ব্যাটারি সেল, রোধ, ক্যাপাসিটর, ডায়োড, ট্রানজিস্টর অনেক কিছু থাকতে পারে। তবে আমরা আপাতত শুধু ব্যাটারি সেল আর রোধ দিয়ে তৈরি সার্কিট বিশ্লেষণ করব। সার্কিটে বিভিন্ন রোধ তামার তার দিয়ে সংযুক্ত করা হয়, যদিও আমরা দেখেছি তামারও একটি আপেক্ষিক রোধ আছে। কিন্তু বাস্তব জীবনে সার্কিটে যে রোধ ব্যবহার করা হয় তাদের তুলনায় এটি এত কম যে আমরা এটাকে ধর্তব্যের মাঝেই আনব না। ধরে নেব তারের রোধ নেই। কাজেই একটা তারের সব জায়গায় বিভব সমান।

এবারে 11.08a চিত্রে দেখানো একটা বর্তনী বিশ্লেষণ করা যাক, এখানে একটা রোধকে দুটো তার দিয়ে একটা ব্যাটারি সেলের দুই মাথায় লাগানো হয়েছে। যেহেতু CD অংশটুকু ভূমিসংলগ্ন করা হয়েছে তাই আমরা বলতে পারব ব্যাটারি সেলের নিচের প্রান্তটির বিভব হচ্ছে শূন্য। তাই ব্যাটারির উপরের প্রান্তের বিভব V এবং BC অংশে একটা রোধ, রোধের দুই পাশে বিভব পার্থক্য হচ্ছে

$$V - 0 = V$$

কাজেই রোধ যদি R হয় তাহলে এর ভেতর দিয়ে যে বিদ্যুৎ I প্রবাহিত হচ্ছে তার মান

$$I = \frac{V}{R}$$

কাজেই ব্যাটারির A থেকে I বিদ্যুৎ বের হয়ে B বিন্দুতে ঢুকে যাচ্ছে। আমরা এই সার্কিটের প্রত্যেকটা বিন্দুতে বিভব আর বিদ্যুৎ বের করে ফেলেছি।

ধরা যাক হুবহু একই সার্কিটে আমরা যদি DC অংশ ভূমিসংলগ্ন না করে AB অংশ ভূমিসংলগ্ন করি (চিত্র 11.08b) তাহলে কী হবে? ব্যাটারি সেলটা যেহেতু V ভোল্টের তাই A এবং D এর পার্থক্য V থাকতেই হবে, যেহেতু A এর বিভব শূন্য তাই D এর বিভব নিশ্চয়ই -V. কাজেই B এবং C এর বিভব পার্থক্য

$$0 - (-V) = V$$

ভেতরকার রোধ R, কাজেই বিদ্যুৎ প্রবাহ:

$$I = \frac{V}{R}$$

অর্থাৎ ঠিক আগের মান, যেটাই হওয়ার কথা। লক্ষ করো পটেনশিয়ালের মান পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু পার্থক্য পরিবর্তন হয়নি।

উদাহরণ

প্রশ্ন: 11.09a সার্কিটে A, B, C ও D বিন্দুতে ভোল্টেজ কত?

উত্তর: C ও D বিন্দুতে ভোল্টেজ 0, A বিন্দুতে ভোল্টেজ 3 V

B বিন্দুতে ভোল্টেজ বের করার জন্য বর্তনী বা সার্কিটের কারেন্ট I বের করতে হবে।

$$I = \frac{V}{R} = \frac{3}{1+2}A = 1.0 \text{ A}$$

কাজেই A থেকে B বিন্দুতে যেটুকু ভোল্টেজ কম তার পরিমাণ

$$V = RI = 1\,\Omega \times 1\,\text{A} = 1\,\text{V}$$

কাজেই B বিন্দুর ভোল্টেজ $3\text{V} - 1\,\text{V} = 2\,\text{V}$

যেহেতু প্রত্যেকটা বিন্দুর ভোল্টেজ (পটেনশিয়াল) বের হয়ে গেছে, যাচাই করে দেখো সব ক্ষেত্রে ও'মের সূত্র কাজ করছে কি না।

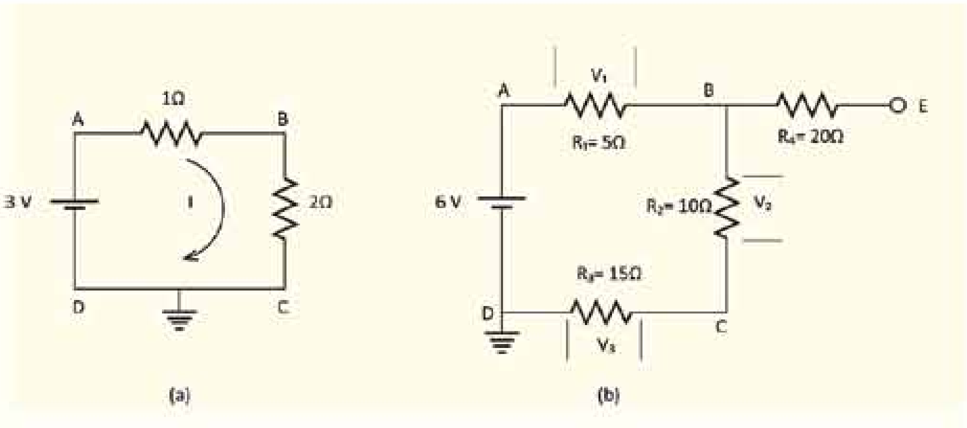

চিত্র 11.09: ব্যাটারি এবং একাধিক রেজিস্টর বা রোধ দিয়ে তৈরি দুটি সার্কিট।

প্রশ্ন: 11.09b চিত্রটির সার্কিটে A, B, C, D এবং E বিন্দুতে ভোল্টেজ কত?

উত্তর: D বিন্দুতে ভোল্টেজ 0 এবং A বিন্দুতে ভোল্টেজ 6 V। E বিন্দুতে ভোল্টেজ কত হতে পারে তা কেমন করে বের করা যেতে পারে সেটা নিয়ে অনেককেই নানা রকম দুশ্চিন্তা করতে দেখা যায়।

আসলে ব্যাপারটা খুবই সহজ। রেজিস্টরের বা রোধের ভেতর দিয়ে কারেন্ট প্রবাহিত হলেই ভোল্টেজের পরিবর্তন হয়। সার্কিটের এই অংশে কোনো কারেন্ট প্রবাহের সুযোগ নেই। B দিয়ে রওনা দিয়ে E বিন্দুতে পৌঁছে অন্য কোথাও যেতে পারবে না। কাজেই B এবং E বিন্দুতে (কিংবা এর ভেতরে যেকোনো বিন্দুতে) ভোল্টেজের কোনো পরিবর্তন নেই, B বিন্দুতে যে ভোল্টেজ E বিন্দুতে একই ভোল্টেজ।

B এবং C বিন্দুর ভোল্টেজ বের করার জন্য কারেন্ট বের করতে হবে। কারেন্ট I হলে

$$I = \frac{V}{R} = \frac{6\text{ V}}{5\,\Omega + 10\,\Omega + 15\,\Omega} = \frac{1}{5}\text{ A}$$

কাজেই A থেকে B তে ভোল্টেজের পার্থক্য :

$$V_1 = R_1 I = 5\,\Omega \times \frac{1}{5}\text{ A} = 1\text{ V}$$

কাজেই A বিন্দুতে ভোল্টেজ 6 V হলে B বিন্দুতে ভোল্টেজ 1 V কম অর্থাৎ

$$6\text{ V} - V_1 = 6\text{ V} - 1\text{ V} = 5\text{ V}$$

B বিন্দুতে যেহেতু ভোল্টেজ 5 V, E বিন্দুতেও ভোল্টেজ 5 V। ঠিক একইভাবে

$$V_2 = R_2 I = 10\,\Omega \times \frac{1}{5}\text{ A} = 2\text{ V}$$

কাজেই C বিন্দুর ভোল্টেজ B বিন্দুর ভোল্টেজ থেকে 2 V কম।

অর্থাৎ C বিন্দুর ভোল্টেজ $5\text{ V} - 2\text{ V} = 3\text{ V}$.

D বিন্দুর ভোল্টেজ 0 সেটা আমরা প্রথমেই বলে দিয়েছি, আসলেই সেটা সত্যি কি না পরীক্ষা করে দেখতে পারি। D বিন্দুর ভোল্টেজ C বিন্দুর ভোল্টেজ থেকে V_3 কম। V_3 হচ্ছে

$$V_3 = R_3 I = 15\,\Omega \times \frac{1}{5}\text{ A} = 3\text{ V}$$

কাজেই D বিন্দুর ভোল্টেজ

$3\text{ V} - 3\text{ V} = 0$, ঠিক যে রকম ভেবেছিলাম।

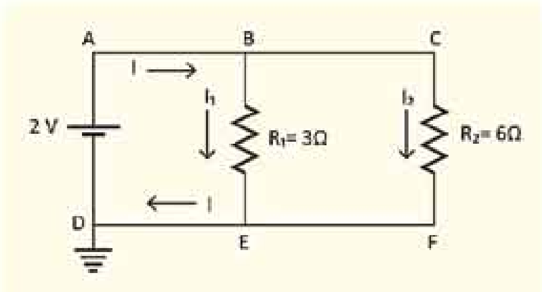

চিত্র 11.10: সমান্তরালভাবে রাখা দুটি রোধ বা রেজিস্টরের একটি সার্কিট।

প্রশ্ন: 11.10 চিত্রটিতে দেখানো সার্কিটে I_1 এবং I_2 এর মান কত?

উত্তর: A, B এবং C বিন্দুতে ভোল্টেজ 2 V

D, E এবং F বিন্দুতে ভোল্টেজ 0 ভোল্ট। কাজেই BE রেজিস্টরের ভেতর দিয়ে কারেন্ট

$$I_1 = \frac{V}{R_1} = \frac{2}{3}\,\text{A}$$

CF রেজিস্টরের ভেতর দিয়ে কারেন্ট

$$I_2 = \frac{V}{R_2} = \frac{2}{6}\,\text{A} = \frac{1}{3}\,\text{A}$$

মোট কারেন্ট

$$I = I_1 + I_2 = \frac{2}{3}\,\text{A} + \frac{1}{3}\,\text{A} = 1\,\text{A}$$

11.2.4 তুল্য রোধ: শ্রেণি বর্তনী

এবারে কোনো বর্তনীতে একাধিক রোধ থাকলে সেগুলোকে কীভাবে একটি তুল্য রোধ হিসেবে বিবেচনা করা যায় আমরা সেই বিষয়টি দেখে নেই। 11.11 চিত্রের সার্কিটে দুটো রোধ লাগানো আছে, যেহেতু C ভূমিসংলগ্ন তাই তার বিভব শূন্য এবং A এর বিভব V। আমরা B এর বিভব কত জানি না, কিন্তু এটুকু জানি যে R_1 এবং R_2 দুটোর ভেতর দিয়েই সমান পরিমাণ বিদ্যুৎ I প্রবাহিত হচ্ছে। আমরা এমনিতেই বলে দিতে পারি যে দুটো রোধের যোগফলটি হবে মোট রোধ R এবং বিদ্যুৎ প্রবাহ হবে $I = V/R$ কিন্তু সেভাবে না লিখে আমরা বরং এটা প্রমাণ করে ফেলি।

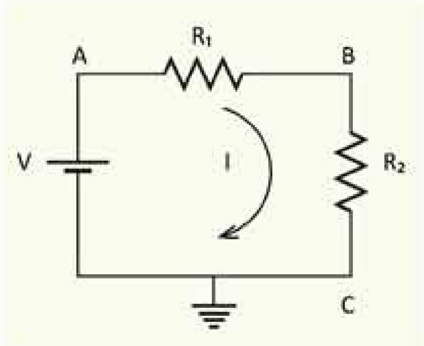

চিত্র 11.11: একটি বর্তনী বা সার্কিটে দুটি রোধ পরপর লাগানো।

যদি ধরে নিই B এর বিভব V_B তাহলে প্রথম রোধ R_1 এর জন্য লিখতে পারি :

$$I = \frac{V - V_B}{R_1}$$

আবার দ্বিতীয় রোধ R_2 এর জন্য লিখতে পারি

$$I = \frac{V_B - 0}{R_2} = \frac{V_B}{R_2}$$

কাজেই

$$I = \frac{V - V_B}{R_1} = \frac{V_B}{R_2}$$

$$(V - V_B)R_2 = V_B R_1$$

$$V_B(R_1 + R_2) = VR_2$$

$$V_B = \frac{R_2}{R_1 + R_2}V$$

কাজেই

$$I = \frac{V_B}{R_2} = \frac{V}{R_1 + R_2}$$

আমরা R_1 এবং R_2 এই দুটি রোধকে একটি রোধ $R = R_1 + R_2$ হিসেবে কল্পনা করতে পারি:

$$I = \frac{V}{R}$$

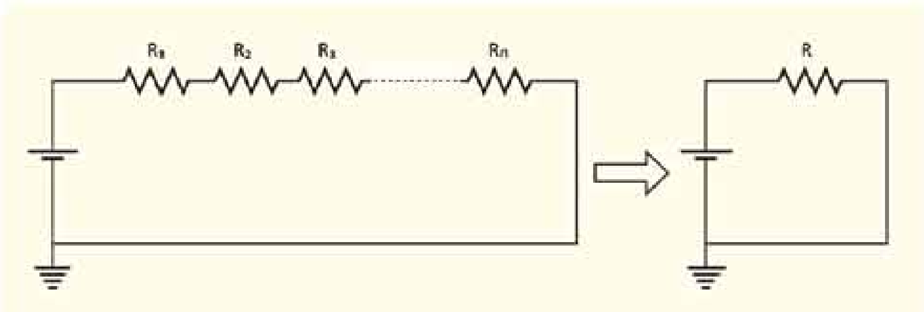

চিত্র 11.12: অনেকগুলো পর্যায়ক্রম রোধ বা রেজিস্টরকে একটি তুল্য রোধ বা রেজিস্টর হিসেবে কল্পনা করা যায়।

যদি এখানে দুটি না হয়ে তিন-চারটি বা আরো বেশি রোধ থাকত (চিত্র 11.12) তাহলেও আমরা দেখাতে পারতাম যে সেগুলোকে সম্মিলিতভাবে একটি রোধ R কল্পনা করতে পারি যেটি সবগুলো রোধের যোগফলের সমান। এটাকে তুল্য রোধ বলে। অর্থাৎ যখন কোনো সার্কিটে R_1, R_2, R_3.. এ রকম অনেকগুলো রোধ পরপর থাকে (শ্রেণি বর্তনী) তখন তাদের তুল্য রোধ

$$R = R_1 + R_2 + R_3 \ldots R_n$$

11.2.5 তুল্য রোধ: সমান্তরাল বর্তনী

এবারে আমরা রোধগুলো পরপর না রেখে সমান্তরালভাবে রাখব (চিত্র 11.13)। এই সার্কিটে আমরা বিভিন্ন বিন্দুকে A, B, C, D, E এবং F নাম দিয়েছি। চিত্রটি দেখেই বোঝা যাচ্ছে D, E এবং F বিন্দু ভূমিসংলগ্ন হওয়ায় এই বিন্দুগুলোর বিভব শূন্য। কাজেই A, B এবং C বিন্দুতে বিভব V.

ব্যাটারি সেল থেকে I কারেন্ট বের হয়েছে। এই বিদ্যুৎ B বিন্দুতে দুই ভাগে ভাগ হয়ে R_1 এবং R_2 রোধের ভেতর দিয়ে যথাক্রমে I_1 এবং I_2 হিসেবে প্রবাহিত হয়ে E বিন্দুতে একত্র হয়ে I হিসেবে ব্যাটারি সেলে ফিরে যাচ্ছে। আমরা আগেই বলেছি সার্কিটে ব্যাটারি থেকে বিদ্যুৎ বের হয়, সার্কিটে ঘুরে আবার ব্যাটারি সেলে ফিরে যায়। পুরো সার্কিটে এর বাইরে কোনো বিদ্যুতের জন্ম হতে পারে না, আবার ক্ষয়ও হতে পারে না। তাই

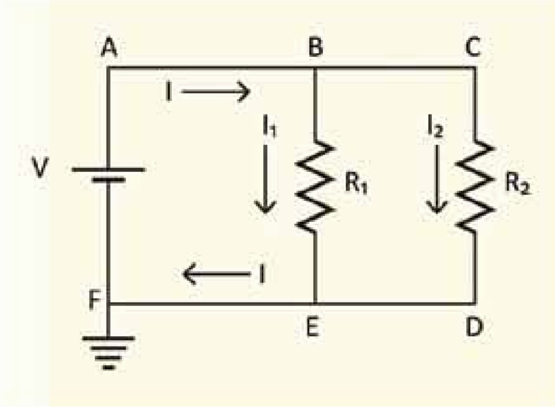

চিত্র 11.13: একটি সার্কিটে দুটি রোধ সমান্তরালভাবে রাখা।

$$I = I_1 + I_2$$

এবারে আমরা I_1 এবং I_2 কত হবে বের করতে পারি

$$I_1 = \frac{V_B - V_E}{R_1} = \frac{V - 0}{R_1} = \frac{V}{R_1}$$

$$I_2 = \frac{V_C - V_D}{R_2} = \frac{V - 0}{R_2} = \frac{V}{R_2}$$

কাজেই

$$I = I_1 + I_2 = \frac{V}{R_1} + \frac{V}{R_2} = V\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right)$$

অর্থাৎ এবারেও আমরা একটা তুল্য রোধ R সংজ্ঞায়িত করতে পারি যেখানে

$$I = \frac{V}{R} \text{ এবং } \frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

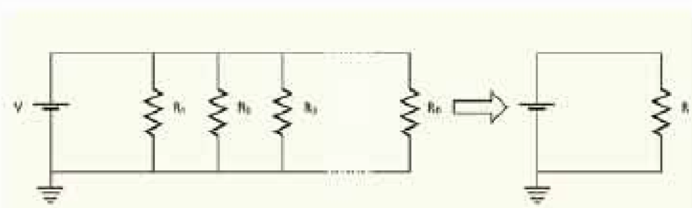

চিত্র 11.14: অনেকগুলো সমান্তরাল রোধ বা রেজিস্টরকে একটি তুল্য রোধ বা রেজিস্টর হিসেবে কল্পনা করা যায়।

এখানে যদি দুটো না হয়ে আরো বেশি রোধ থাকে (চিত্র 11.14) তাহলেও আমরা দেখতে পারি: তুল্য রোধ R হচ্ছে

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \dots \frac{1}{R_n}$$

11.3 তড়িৎ ক্ষমতা (Electric Power)

আমরা যখন বিভব বা পটেনশিয়াল আলোচনা করছিলাম তখন দেখেছি পটেনশিয়াল প্রয়োগ করে চার্জকে সরানো হলে কাজ করা হয় বা শক্তি ক্ষয় হয়। তাই যদি একটা সার্কিটে V বিভব প্রয়োগ করে Q চার্জকে সরানো হয় তাহলে কাজের পরিমাণ বা শক্তি প্রয়োগের পরিমাণ

$$W = VQ \ \text{Joule}$$

ক্ষমতা P হচ্ছে প্রতি সেকেন্ডে কাজ করার ক্ষমতা, কাজেই যদি t সময়ে Q চার্জ সরানো হয়ে থাকে তাহলে

$$P = \frac{W}{t} = \frac{VQ}{t} = VI \ \text{Watt}$$

যদি একটা রোধ R এর ওপর এটা ব্যবহার করি তাহলে ও'মের সূত্র ব্যবহার করে লিখতে পারি

যেহেতু

$$V = RI$$

$$P = I^2 R$$

কিংবা

$$I = \frac{V}{R}$$

কাজেই

$$P = \left(\frac{V}{R}\right)^2 R = \frac{V^2}{R}$$

একটি রোধের ভেতর যদি t সময় বিদ্যুৎ প্রবাহিত করা হয় তাহলে তার ভেতর Pt শক্তি দেওয়া হয়। এই শক্তিটি কোথায় যায়? তোমরা যখন সার্কিটে একটি রোধ ব্যবহার করবে তখন দেখবে তার ভেতর দিয়ে যথেষ্ট বিদ্যুৎ প্রবাহ করলে সব সময়ই সেটা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে অর্থাৎ শক্তিটুকু তাপশক্তি হিসেবে বের হয়ে আসে।

ফিলামেন্ট দেওয়া বাল্বগুলোর প্রচলন ধীরে ধীরে কমে আসছে, কারণ এটা দিয়ে আলো তৈরি করার জন্য ফিলামেন্টকে উত্তপ্ত করতে হয়, বিদ্যুৎ শক্তির বড় অংশ তাপ হিসেবে খরচ হয়ে যায় বলে

এখানে শক্তির অপচয় হয়। এই ধরনের বাল্বগুলো হাত দিয়ে স্পর্শ করলেই দেখা যায় এখানে কী পরিমাণ তাপশক্তি তৈরি হয় এবং এই তাপশক্তি তৈরি হয় প্রতি সেকেন্ডে I^2R কিংবা $\frac{V^2}{R}$ হিসেবে।

বৈদ্যুতিক শক্তি শুধু যে একটি রোধে তাপশক্তি হিসেবে খরচ হয় তা নয়, সেটি ফ্যান, ফ্রিজ, টেলিভিশন, কম্পিউটার, চার্জার ইত্যাদি নানা ধরনের যন্ত্রপাতিতে নানা ধরনের কাজ করার সময় শক্তি সরবরাহ করে থাকে। কোনো একটি বৈদ্যুতিক যন্ত্রে প্রতি সেকেন্ডে কী পরিমাণ বৈদ্যুতিক শক্তি খরচ হচ্ছে সেটি খুব সহজেই VI থেকে বের করতে পারব। প্রত্যেক বাসায় বিদ্যুৎ মিটার থাকে, সেটি কত পটেনশিয়ালে (V) কত বিদ্যুৎ প্রবাহ (I) করছে সেটি মাপতে থাকে, সেখান থেকে একটি বাসায় প্রতি সেকেন্ডে কী পরিমাণ বৈদ্যুতিক শক্তি ($P = VI$) সরবরাহ করছে সেটি জানতে পারে। এর সাথে মোট সময় গুণ করে ব্যবহৃত মোট বৈদ্যুতিক শক্তি বের করা হয়। বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যয়ের প্রচলিত একক হচ্ছে কিলোওয়াট-ঘণ্টা (kW-h)। এই একককে বোর্ড অব ট্রেড (BOT) ইউনিট বা সংক্ষেপে ইউনিট বলে। আমরা যে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করি তা এই এককেই হিসাব করা হয়।

উদাহরণ

প্রশ্ন: 100 W একটা বাল্বে ফিলামেন্টের রোধ কত?

উত্তর: 220 V এর বাল্বে 100 W লেখা, যেহেতু

$$P = \frac{V^2}{R}$$

কাজেই

$$R = \frac{V^2}{P} = \frac{(220)^2}{100}\Omega = 484\,\Omega$$

এখানে কী পরিমাণ কারেন্ট প্রবাহিত হচ্ছে?

$$I = \frac{V}{R} = \frac{220}{484} = 0.45\text{ A}$$

অন্যভাবেও এটি বের করা সম্ভব: $P = VI$

$$I = \frac{P}{V} = \frac{100}{220} = 0.45\text{ A}$$

প্রশ্ন: 60 ওয়াটের একটি বাল্ব প্রতিদিন 5 ঘণ্টা করে 30 দিন জ্বালালে কত তড়িৎ শক্তি ব্যয় হবে? যদি প্রতি ইউনিটের মূল্য 10 টাকা হয় তা হলে এই পরিমাণ বিদ্যুতের জন্য মোট ব্যয় কত?

২০২২

উত্তর: আমরা জানি, ব্যয়িত শক্তি = $(P \times t)/1000$ কিলোওয়াট-ঘণ্টা বা ইউনিট

$P = 60$ W এবং $t = 5 \times 30$ hour

ব্যয়িত শক্তি = $60 \times (5 \times 30)/1000$ ইউনিট = 9 ইউনিট

প্রতি ইউনিটের মূল্য 10 টাকা হিসাবে মোট তড়িৎ ব্যয় = 9 × 10 টাকা = 90 টাকা

11.4 বিদ্যুৎ পরিবহন (Electrical Supply)

যখন দেশের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বিদ্যুৎ পরিবহন করতে হয় তখন সেটি অনেক উচ্চ ভোল্টেজে নিয়ে যাওয়া হয়। বৈদ্যুতিক তারে বিদ্যুতের অপচয় কমানোর জন্য এটি করা হয়। তোমরা জানো তাপ হিসেবে প্রতি সেকেন্ডে যে পরিমাণ শক্তি ক্ষয় হয় সেটি হচ্ছে I^2R কাজেই যদি বৈদ্যুতিক তারে কোনো রোধ R না থাকত তাহলে তাপ হিসেবে কোনো শক্তির অপচয় হতো না। কিন্তু সেটি বাস্তবসম্মত নয়, সব কিছুরই কিছু না কিছু রোধ থাকে। তাই কারেন্ট বা বিদ্যুৎ প্রবাহ I কমাতে পারলে তাপ হিসেবে শক্তি ক্ষয় I^2R এর মান কমানো সম্ভব। প্রতি সেকেন্ডে বৈদ্যুতিক শক্তি যেহেতু VI হিসেবে যায় তাই যদি পটেনশিয়াল দশ গুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয় তাহলে দশ গুণ কম কারেন্টে সমান শক্তি প্রেরণ করা সম্ভব। দশ গুণ কম কারেন্ট প্রবাহিত হলে 100 গুণ কম তাপশক্তির অপচয় হবে। কারণ তারের রোধ R এর মান দুইবারই সমান।

এখানে তোমাদের মনে হতে পারে তাপশক্তির অপচয় $\frac{V^2}{R}$ হিসেবেও লেখা যায় তাই দশ গুণ বেশি ভোল্টেজ নেওয়া হলে 100 গুণ বেশি তাপশক্তির অপচয় কেন হবে না? মনে রাখতে হবে আমরা যখন প্রতি সেকেন্ডে তাপশক্তির অপচয় হিসেবে $\frac{V^2}{R}$ বের করেছিলাম তখন V ছিল রোধের দুই পাশের বিভব পার্থক্য। এখানে আমরা যখন V বলছি সেটি বৈদ্যুতিক তারের দুই পাশের বিভব পার্থক্য নয়। এটি বৈদ্যুতিক তারের বিভবের মান। বৈদ্যুতিক তারের দুই পাশে বিভব প্রায় একই সমান। সেই পার্থক্য ধর্তব্যের মধ্যে নয়।

11.4.1 তড়িতের সিস্টেম লস

আমরা জানি দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত পাওয়ার প্লান্টগুলোতে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করে। এই বিদ্যুৎকে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন এলাকায় পাঠাতে হয়। বিদ্যুৎ বিতরণ করার জন্য প্রথমে বিভিন্ন এলাকার সাবস্টেশনে পাঠানো হয়। সাবস্টেশন থেকে বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা ব্যবহার করে বিদ্যুৎ শক্তিকে একেবারে গ্রাহক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

বিদ্যুৎ শক্তিকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বিতরণ করার জন্য যে পরিবাহী তার ব্যবহার করা হয় কম হলেও তাদের এক ধরনের রোধ থাকে। একটা রোধের (R) ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ (I) হলে সব সময়ই (I^2R) তাপ উৎপন্ন হয় এবং সেটি বিদ্যুৎ শক্তির লস বা ক্ষয়। এই লসকে বলা হয় সিস্টেম লস। তোমরা এর মাঝে জেনে গেছ যে একটা নির্দিষ্ট বিদ্যুৎ শক্তির জন্য যদি উচ্চ ভোল্টেজ বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয় তাহলে রোধজনিত তাপশক্তি হিসেবে লস কমে যায়। সে জন্য বিদ্যুৎ কেন্দ্রে যে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করা হয় সেটিকে স্টেপ আপ ট্রান্সফর্মার দিয়ে উচ্চ ভোল্টেজে রূপান্তর করা হয়। গ্রাহকদের ব্যবহারের জন্য বিদ্যুৎ শক্তিকে বিতরণ করার আগে স্টেপ ডাউন ট্রান্সফর্মার ব্যবহার করে সেটিকে আবার ব্যবহারযোগ্য ভোল্টেজ নামিয়ে আনা হয়।

11.4.2 লোডশেডিং

প্রত্যেকটি বিদ্যুৎকেন্দ্রে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করে এবং সবগুলো বিদ্যুৎকেন্দ্রের উৎপাদিত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যোগ হয়। আগেই বলা হয়েছে এই বিদ্যুৎ স্থানীয় সাবস্টেশন (বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র) এর মাধ্যমে গ্রাহকদের মাঝে বিতরণ করা হয়। বিভিন্ন এলাকার চাহিদা অনুযায়ী জাতীয় গ্রিড বিদ্যুৎ সরবরাহ করে। কোনো এলাকায় বিদ্যুতের চাহিদা যদি উৎপাদন থেকে বেশি হয় তাহলে স্বাভাবিকভাবেই সেখানে প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে পারে না। তখন সাবস্টেশনগুলো এক এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করার জন্য অন্য একটি এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়। এই প্রক্রিয়াটার নাম লোডশেডিং। সাবস্টেশন যখন আবার প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সরবরাহ পায় তখন সেই এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু করে।

যদি একনাগাড়ে কয়েক ঘণ্টা লোডশেডিং করতে হয় তখন গ্রাহক পর্যায়ে লোডশেডিংকে সহনীয় করার জন্য কর্তৃপক্ষ চক্রাকারে বিভিন্ন জায়গা আলাদা আলাদা সময়ে লোডশেডিং করে থাকে।

11.5 বিদ্যুতের নিরাপদ ব্যবহার (Safe Use of Electricity)

বিদ্যুৎ ছাড়া আমরা এখন এক মুহূর্তও চিন্তা করতে পারি না। আমাদের ঘরে এটি আলো সরবরাহ করে, গরমের সময় ফ্যান চালিয়ে এটা আমাদের শীতল রাখে। এটা দিয়ে আমরা টেলিভিশন চালাই, কম্পিউটার চালাই। খাবার সংরক্ষণ করার জন্য এটা দিয়ে ফ্রিজ চালানো হয়। কাপড় ইস্ত্রি করার জন্য এটি ব্যবহার করা হয়। আমাদের মোবাইলের ব্যাটারি শেষ হয়ে গেলে আমরা এই বিদ্যুৎ দিয়ে ব্যাটারি চার্জ করি। বিলাসী মানুষ বিদ্যুৎ দিয়ে বাসায় এসি ব্যবহার করে, কাপড় ধোয়ার জন্য ওয়াশিং মেশিন ব্যবহার করে, ইলেকট্রিক হিটার দিয়ে রান্না করে। মাইক্রোওয়েভ ওভেনে খাবার গরম করে।

বাসার বাইরে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, ক্ষেত-খামার, কারখানা, হাসপাতাল এসবের কথা বিবেচনা করলে আমরা বিদ্যুতের ব্যবহারের কথা বলে শেষ করতে পারব না। আমাদের দেশে সাধারণত বিদ্যুৎ

220 V (AC) হিসেবে সরবরাহ করা হয়, এই বিদ্যুতের ভোল্টেজের পরিমাণ মানুষকে ইলেকট্রিক শক দিতে পারে এমনকি সেই শকে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। তাই সকল বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি এমনভাবে তৈরি করা হয় যেন ভুলেও কখনো কেউ সরাসরি এর সংস্পর্শে চলে না আসে।

সরাসরি হৃৎপিণ্ডের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ চলে গেলে মাত্র 10 mA বিদ্যুতেই মানুষ মারা যেতে পারে। ব্যবহার করার জন্য আমরা যে বিদ্যুৎ ব্যবহার করি সেটি AC এবং AC বিদ্যুৎ DC বিদ্যুৎ থেকে প্রায় 5 গুণ বেশি ক্ষতিকর। শুকনো অবস্থায় মানুষের চামড়ার রোধ প্রায় 30,00 Ω থেকে 50,000 Ω হলেও ভেজা অবস্থায় সেটি হাজার গুণ কমে আসে। কাজেই ও'মের সূত্র ব্যবহার করে আমরা দেখাতে পারি আমাদের দেশের 220 V শরীরের ভেতর দিয়ে মানুষকে মেরে ফেলার মতো বিদ্যুৎ প্রবাহ করতে পারে। যখন কেউ ভেজা মাটিতে ভেজা পা নিয়ে দাঁড়ানো অবস্থায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয় সেটি হয় সবচেয়ে বিপজ্জনক।

যখন কেউ হঠাৎ করে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয় তখন শরীরের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহের কারণে হাত-পা নাড়াতে পারে না, তাই বিপজ্জনক পরিস্থিতি থেকে নিজেকে সরিয়ে আনার কথা বুঝতে পারলেও সেখান থেকে সরে আসতে পারে না।

আমরা যে বিদ্যুৎ ব্যবহার করি সেটি যথেষ্ট বিপজ্জনক হতে পারে কিন্তু সাধারণ সতর্কতা বজায় রাখলেই নিরাপদে বিদ্যুৎ ব্যবহার করা যায় এবং সারা পৃথিবীতে কোটি কোটি মানুষ প্রতি মুহূর্তে নিরাপদে বিদ্যুৎ ব্যবহার করছে। বিদ্যুতের নিরাপদ ব্যবহার করার জন্য নিচের কয়েকটা বিষয় জানা থাকা প্রয়োজন:

(a) বিদ্যুৎ অপরিবাহক আস্তরণ: বিদ্যুতের খোলা তার বিপজ্জনক তাই সব সময়ই সেটা প্লাস্টিক বা অন্য কোনো ধরনের বিদ্যুৎ অপরিবাহী একটা আস্তরণ দিয়ে ঢাকা থাকে। যদি কোনো কারণে শর্ট সার্কিট হয় অর্থাৎ সরাসরি কোনো রোধ ছাড়াই পজিটিভ এবং নেগেটিভ স্পর্শ করে ফেলে তখন ও'মের সূত্র অনুযায়ী অনেক বেশি বিদ্যুৎ প্রবাহ হয়, তার গরম হয়ে যায়, প্লাস্টিক পুড়ে গিয়ে আগুন পর্যন্ত ধরে যায়। তাই সব সময়ই সতর্ক থাকতে হয় যেন বৈদ্যুতিক তারের ওপর অপরিবাহী আস্তরণটা অবিকৃত এবং অক্ষত থাকে।

(b) ভালো সংযোগ: যখন কোনো বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করার সময় অনেক বিদ্যুৎ ব্যবহার হয় তখন বৈদ্যুতিক সংযোগগুলো খুব ভালো হতে হয়। বৈদ্যুতিক সংযোগ ভালো না হলে সেখানে বাড়তি রোধ তৈরি হয় এবং I^2R হিসেবে সেটা উত্তপ্ত হয়ে যেতে পারে, উত্তপ্ত হয়ে অপরিবাহী আস্তরণ পুড়ে যেতে পারে, বৈদ্যুতিক সংযোগ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

(c) আর্দ্রতা: পানি বিদ্যুৎ পরিবাহী, কাজেই কোনো বৈদ্যুতিক সার্কিটে পানি ঢুকে গেলে সেখানে শর্ট সার্কিট হয়ে বিপজ্জনক অবস্থা হতে পারে। হেয়ার ড্রায়ার বা ইস্ত্রির মতো জিনিস পানির কাছাকাছি

ব্যবহার করা খুব বিপজ্জনক, হঠাৎ করে পানিতে পড়ে গেলে এবং সেই পানি কেউ স্পর্শ করলে বৈদ্যুতিক শক খেয়ে অনেক বড় বিপদ হতে পারে।

(d) সার্কিট ব্রেকার এবং ফিউজ: বিদ্যুতের বড় বড় দুর্ঘটনা হয় যখন হঠাৎ করে কোনো একটা ত্রুটির কারণে অনেক বেশি বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়। হঠাৎ করে বিপজ্জনক বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ করার জন্য সার্কিট ব্রেকার কিংবা ফিউজ ব্যবহার করা হয়। সার্কিট ব্রেকার এমনভাবে তৈরি করা হয় যে এর

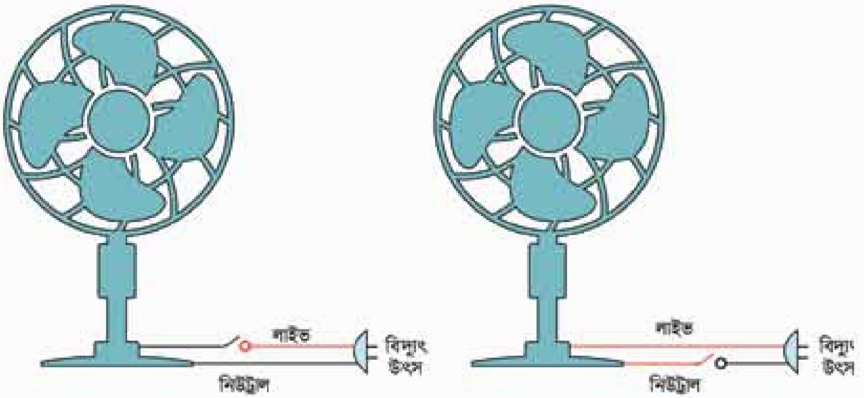

চিত্র 11.15: সুইচের সঠিক এবং ভুল সংযোগ।

ভেতর থেকে নিরাপদ সীমার বেশি বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলেই সার্কিট ব্রেক (বিচ্ছিন্ন) করে দেয়। ফিউজ সে তুলনায় খুবই সরল একটা পদ্ধতি, একটি যন্ত্রে যে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় সেটি যন্ত্রে ঢোকানোর আগে সরু একটা তারের ভেতর দিয়ে নেওয়া হয়। যদি কোনো কারণে বেশি বিদ্যুৎ যাওয়ার চেষ্টা করে ফিউজের সরু তার সেই (রোধ বেশি, কাজেই I^2R বেশি অর্থাৎ তাপ বেশি) বিদ্যুতের কারণে উত্তপ্ত হয়ে পুড়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে ফেলে।

(e) সঠিক সংযোগ: বিদ্যুৎ সরবরাহে সব সময়ই দুটি তার থাকে, একটিতে উচ্চ বিভব (জীবন্ত বা Live) অন্যটি ভোল্টেজহীন নিরপেক্ষ (Neutral)। একটা যন্ত্র যখন ব্যবহার করা হয় তখন Live তার থেকে বিদ্যুৎকে যন্ত্রের ভেতর দিয়ে ঘুরিয়ে নিরপেক্ষ তার দিয়ে তার উৎসে ফিরিয়ে নেওয়া হয়। ভোল্টেজহীন নিরপেক্ষ তারটি নিরাপদ কিন্তু উচ্চ বিভবের তারটিকে সতর্কভাবে ব্যবহার করতে হয়। কোনো যন্ত্রপাতিতে যখন একটা সুইচ দিয়ে বিদ্যুতের সংযোগ দেওয়া হয় তখন সুইচটি উচ্চ ভোল্টেজের তার কিংবা নিরপেক্ষ তার দুটিতেই দেওয়া যায়। বুদ্ধিমানের কাজ হয় যখন সুইচটি লাগানো হয় উচ্চ ভোল্টেজের তারের সাথে (চিত্র 11.15) তাহলে শুধু যখন যন্ত্রটি চালু করা হয় তখনই উচ্চ ভোল্টেজ যন্ত্রের ভেতর প্রবেশ করে। যখন যন্ত্রটি বন্ধ থাকে তখন যন্ত্রের ভেতর কোথাও উচ্চ ভোল্টেজ থাকে না।

(f) গ্রাউন্ড: তোমরা যদি তোমাদের বাসায় স্কুলে কিংবা অন্য কোথাও বিদ্যুতের সংযোগ লক্ষ করে থাকো তাহলে দেখবে সব সময় অন্তত দুটি সংযোগ থাকে, একটি উচ্চ ভোল্টেজ অন্যটি নিউট্রাল। কিন্তু সেই বিদ্যুতের সাথে যদি মূল্যবান কোনো যন্ত্র যুক্ত করা হয় (যেমন কম্পিউটার, ফ্রিজ) তাহলে দেখবে সেখানে উচ্চ বিভব আর নিউট্রাল ছাড়াও তৃতীয় একটা সংযোগ থাকে, যেটি হয়ে ভূমি সংযোগ বা ground. সাধারণত এটা যন্ত্রপাতির ঢাকনা বা কাঠামোতে লাগানো থাকে। যদি কোনো দুর্ঘটনায় যন্ত্রপাতিটি বিদ্যুতায়িত হয়ে যায় তাহলে ঢাকনা বা কাঠামোটি থেকে ভূমিতে সরাসরি বিদ্যুৎ প্রবাহ হয়ে যায়। বিদ্যুতের এই প্রবাহের কারণে সাধারণত ফিউজ পুড়ে যন্ত্রটি বিপদমুক্ত হয়ে যায়। কাজেই কেউ যদি ভুলে যন্ত্রটি স্পর্শ করে তার ইলেকট্রিক শক খাওয়ার আশঙ্কা থাকে না।

চিত্র 11.16: বিদ্যুৎ নিয়ে বিপজ্জনক কাজকর্ম।

নিজে করো

11.16 ছবিতে বিদ্যুতের ব্যবহার নিয়ে কী কী বিপজ্জনক কাজ করা হচ্ছে?

11.6 বাসাবাড়িতে তড়িৎ বর্তনীর নকশা

একটি বাসায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করার জন্য একটি সার্কিট কেমন হতে পারে সেটি 11.17 চিত্রে দেখানো হয়েছে। বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে সাপ্লাই ক্যাবল দিয়ে সেটি একটি বাসায় সরবরাহ করা হয়। এর মাঝে একটি লাইভ অন্যটি নিউট্রাল। লাইভ লাইনটির উচ্চ বিভব, নিউট্রালটি শূন্য বিভব। চিত্রে লাইভ লাইনটি লাল রং এবং নিউট্রাল লাইনটি নীল রং দিয়ে দেখানো হয়েছে। সেটি প্রথমে একটি বৈদ্যুতিক

মিটারের ভেতরে দিয়ে যায়, বাসায় কতটুকু বিদ্যুৎ ব্যবহার হয়েছে সেটি এই মিটারে রেকর্ড করা হয়। মিটারের পর এটি কনজিউমার ইউনিটি দিয়ে বাসার ভেতরে বিতরণ করা হয়।

11.17 চিত্রে 5 A, 15 A এবং 30 A এর তিনটি সার্কিট ব্রেকার বা ফিউজ দেখানো হয়েছে। এই তিনটি সার্কিট ব্রেকারই মেইন সুইচের সাথে সংযুক্ত। মেইন সুইচটি দিয়ে যেকোনো সময় পুরো বাসার

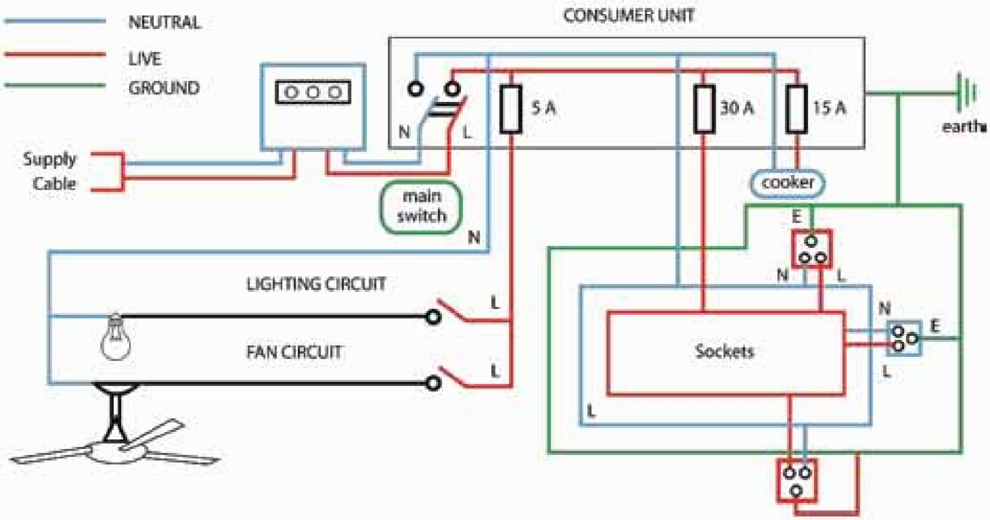

চিত্র 11.17: একটি বাসায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করার জন্য সম্ভাব্য বিদ্যুৎ বর্তনী।

বিদ্যুৎ প্রবাহ কেটে দেওয়া সম্ভব। চিত্রটিতে 5 A এর সার্কিট ব্রেকার থেকে লাইট এবং ফ্যানে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়েছে। 15 A থেকে বাসায় বৈদ্যুতিক চুলার সাথে সংযুক্ত। 30 A সার্কিট ব্রেকারটি দিয়ে বাসার প্লাগ পয়েন্টগুলো যুক্ত করা হয়েছে। তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ এই অংশটুকু একটি রিংয়ের মতো ফলে বিদ্যুৎ প্রবাহ সব সময়ই দুটি ভিন্ন পথে হতে পারে। এই অংশটিতে নিরাপত্তার জন্য ভূমির সংযোগ (সবুজ রং) আলাদাভাবে দেখানো হয়েছে।

নিজে করো

বিদ্যুৎ শক্তির অপচয় রোধ করার জন্য কী কী করা যেতে পারে সেগুলো বর্ণনা করে একটি সুন্দর পোস্টার তৈরি করো।

পোস্টারগুলো দিয়ে সবার সচেতনতা সৃষ্টি করার জন্য স্কুলের ছেলেমেয়েদের দেখানোর জন্য সেগুলো কোথাও টানানোর ব্যবস্থা করো।

নিজে করো

উদ্দেশ্য: শিক্ষার্থীরা বাসাবাড়িতে ব্যবহারের উপযোগী বৈদ্যুতিক সার্কিটের নকশাকে বিশ্লেষণ করতে পারবে।

কাজের ধারা: 11.17 চিত্রে একটি বাসার বিদ্যুৎ সরবরাহ করার জন্য সম্ভাব্য সার্কিট দেখানো হয়েছে। এই সার্কিটটিতে নিচের পরিবর্তনগুলো করে নতুন একটি সার্কিট তৈরি করো।

(a) তিনটি প্লাগ পয়েন্ট যথেষ্ট নয় বলে আরো দুইটি নতুন প্লাগ পয়েন্ট যুক্ত করো।
(b) বিদ্যুৎ ব্যবহার করে এরকম একটি পানির পাম্প উপযুক্ত সার্কিট ব্রেকারসহ যুক্ত করো।
(c) লাইট এবং ফ্যানের সাথে দ্বিতীয় আরেকটি লাইটে দুইটি সুইচ ব্যবহার করে এমনভাবে যুক্ত করো যেন যেকোনো সুইচ দিয়েই লাইটটি জ্বালানো এবং নেভানো যায়।

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন

1. ক্যাপাসিটরকে কি ব্যাটারি হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব?
2. ফিলামেন্ট যুক্ত লাইট বাল্বের ফিলামেন্ট ও'মের সূত্র মানছে কি না পরীক্ষা করা কঠিন কেন?
3. বিদ্যুৎ প্রবাহ হচ্ছে ইলেকট্রন প্রবাহ, যখন বিদ্যুৎ প্রবাহ হয় তখন ইলেকট্রনগুলোর গতি কিন্তু তুলনামূলকভাবে কম থাকে। কিন্তু মুহূর্তের মাঝে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়— কীভাবে?
4. সমান বিভব পার্থক্যে বেশি রোধ বেশি তাপ তৈরি করে নাকি কম রোধ বেশি তাপ তৈরি করে?
5. বৈদ্যুতিক তারে কাক বা পাখিকে মারা যেতে দেখা যায় না কিন্তু বড় বাদুড় প্রায়ই মারা যায়— কারণ কী?
6. তড়িৎ প্রবাহ কাকে বলে?

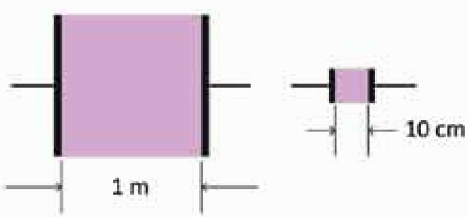

চিত্র 11.18: 1 m এবং 10 cm বর্গের দুটি বর্গাকৃতির দুটি রেজিস্টর।

7. তড়িৎ প্রবাহের প্রচলিত দিক এবং ইলেকট্রন প্রবাহের দিক কোনটি?
8. পরিবাহী, অপরিবাহী এবং অর্ধপরিবাহী পদার্থ কাকে বলে?
9. ও'মের সূত্রটি বিবৃত করো।
10. দেখাও যে, $V = IR$।
11. একটি ছক কাগজে V বনাম I লেখচিত্র অঙ্কন করো।
12. আপেক্ষিক রোধের সংজ্ঞা দাও।
13. দেখাও যে, শ্রেণি সমবায়ে সংযুক্ত রোধগুলোর তুল্য রোধের মান সমবায়ে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন রোধের মানের যোগফলের সমান।
14. কী কী কারণে তড়িৎশক্তি ব্যবহার বিপজ্জনক হতে পারে?
15. একটি বাসের হেডলাইটের ফিলামেন্টের 2.5 A তড়িৎ প্রবাহিত হয়। ফিলামেন্টের প্রান্তদ্বয়ের বিভব পার্থক্য 12 V হলে এর রোধ কত?
16. একটি শুষ্ক কোষের তড়িচ্চালক শক্তি 1.5 V, 0.5 C আধানকে সম্পূর্ণ বর্তনী ঘুরিয়ে আনতে কোষের ব্যয়িত শক্তির পরিমাণ নির্ণয় করো।
17. স্থির এবং পরিবর্তী রোধ কাকে বলে?
18. তড়িচ্চালক শক্তি এবং বিভব পার্থক্য বলতে কী বোঝ?

গাণিতিক প্রশ্ন

1. অসীম সংখ্যক 1 Ω রেজিস্টর ব্যবহার করে 2 Ω রেজিস্টর তৈরি করো।

2. তোমার বন্ধু 1 mm পুরু নাইক্রোমের পাত দিয়ে 10 cm × 10 cm বর্গের (চিত্র 11.18) একটি রেজিস্টর তৈরি করেছে। তুমি 1 m × 1 m বর্গের একটি রেজিস্টর তৈরি করেছ। তোমার বন্ধুর তৈরি রেজিস্টরের মান কত? তোমার রেজিস্টরের মান কত?

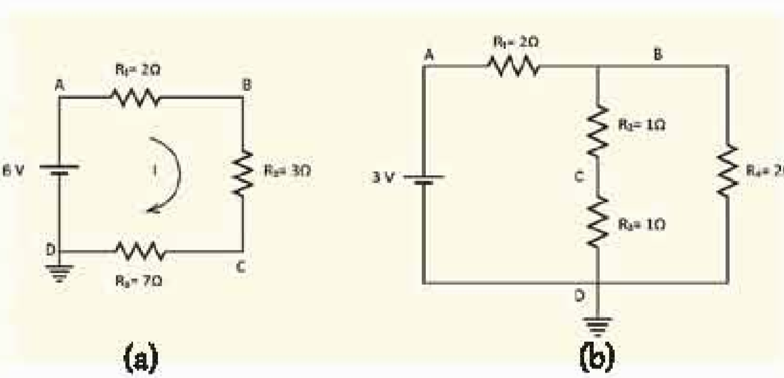

চিত্র 11.19: (a) এবং (b) ব্যাটারি সেল ও রেজিস্টর সংযুক্ত দুটি সার্কিট।

২০২১

3. 11.19 (a) চিত্রটিতে দেখানো সার্কিটে যদি D বিন্দুকে ভূমিসংলগ্ন করা হয় তাহলে A, B, C ও D বিন্দুতে ভোল্টেজ কত? I এর মান কত?

4. 11.19 (a) চিত্রটিতে দেখানো সার্কিটে D বিন্দুকে ভূমিসংলগ্ন না করে যদি C বিন্দুকে ভূমিসংলগ্ন করা হয় তাহলে ভোল্টেজ কত? I এর মান কত?

5. 11.19 (b) চিত্রটিতে দেখানো সার্কিটে D বিন্দুকে ভূমিসংলগ্ন করা হলে সার্কিটে A, B, C ও D বিন্দুতে ভোল্টেজ কত?

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটির পাশে ঠিক (√) চিহ্ন দাও

1. যে সকল পদার্থের মধ্য দিয়ে খুব সহজেই তড়িৎ প্রবাহ চলতে পারে তাদেরকে কী বলে?
   (ক) অপরিবাহী (খ) কুপরিবাহী
   (গ) অর্ধপরিবাহী (ঘ) পরিবাহী

2. 2 Ω, 3 Ω ও 4 Ω মানের তিনটি রোধ শ্রেণি সমবায়ে সংযুক্ত থাকলে তুল্য রোধের মান হবে–
   (ক) 8 Ω (খ) 7 Ω
   (গ) 9 Ω (ঘ) 20 Ω

3. কোনো পরিবাহীর দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য 100 V এবং তড়িৎ প্রবাহমাত্রা 10 A হলে এর রোধ কত?
   (ক) 1000 Ω (খ) 0.1 Ω
   (গ) 10 Ω (ঘ) 1 Ω

4. বর্তনীতে বৈদ্যুতিক অবস্থা পরিমাপের জন্য ব্যবহার করা হয়–
   (i) ভোল্টমিটার
   (ii) অ্যামিটার
   (iii) জেনারেটর

কোনটি সঠিক?
   (ক) i ও ii (খ) i ও iii
   (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

1. একটি বৈদ্যুতিক হিটারে ব্যবহৃত নাইক্রোম তারের দৈর্ঘ্য প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল যথাক্রমে 20 cm এবং $2 \times 10^{-7}\ m^2$। নাইক্রোমের আপেক্ষিক রোধ $100 \times 10^{-8}\ \Omega\ m$। নাইক্রোম তারটিকে একই দৈর্ঘ্যের এবং প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট তামার তার দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হলো। তামার তারের আপেক্ষিক রোধ $1.7 \times 10^{-8}\ \Omega\ m$।
   (ক) রোধ কাকে বলে?
   (খ) বৈদ্যুতিক হিটারে নাইক্রোম তার ব্যবহার করা হয় কেন?
   (গ) ব্যবহৃত তামার তারের রোধ নির্ণয় করো।
   (ঘ) তামার তার ব্যবহারের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো।

2. পড়ার সময় আলভি $220\ V - 100\ W$ এর একটি বাতি দৈনিক ৩ ঘণ্টা করে অন্যদিকে তার ভাই আলিফ $220\ V - 40\ W$ একটি টেবিল ল্যাম্প দৈনিক 4 ঘণ্টা করে ব্যবহার করে। প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ শক্তির মূল্য 3.5 টাকা।
   (ক) ও'মের সূত্রটি লেখ।
   (খ) নির্দিষ্ট তাপমাত্রা, উপাদান ও প্রস্থচ্ছেদের পরিবাহকের দৈর্ঘ্য 5 গুণ বড় করলে রোধের কী পরিবর্তন হবে ব্যাখ্যা করো।
   (গ) আলিফের বাতির প্রবাহমাত্রা নির্ণয় করো।
   (ঘ) আর্থিক দিক বিবেচনায় আলভি ও আলিফের মধ্যে কে মিতব্যয়ী? গাণিতিক যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করো।

3. আমাদের দেশে বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইনের বিভব পার্থক্য 220 ভোল্ট। একটি বৈদ্যুতিক বাল্বের ফিলামেন্টের রোধ 484। বাল্বের গায়ে লেখা আছে 220 V-100 W।
   (ক) অ্যাম্পিয়ারের সংজ্ঞা দাও।
   (খ) একটি ড্রাইসেলের তড়িচ্চালক শক্তি 1.5 V বলতে কী বোঝায়?
   (গ) বাল্বটি সরবরাহ লাইনে সংযুক্ত করা হলে তড়িৎ প্রবাহ কত হবে?
   (ঘ) বাল্বের গায়ে লেখা 220 V-100 W এর সত্যতা যাচাই এর জন্য একটি পরীক্ষণ প্রস্তাব করো।

দ্বাদশ অধ্যায়

বিদ্যুতের চৌম্বক ক্রিয়া

(Magnetic Effects of Current)

কুলিয়ারচরে আয়োজিত পৃথিবীর সবচেয়ে বড় প্র্যাক্টিক্যাল ক্লাসে ছেলেমেয়েরা বৈদ্যুতিক চুম্বক তৈরি করছে।

আমরা সবাই আমাদের জীবনে কখনো না কখনো চুম্বকের আকর্ষণ এবং বিকর্ষণ দেখে চমৎকৃত হয়েছি। আপাতদৃষ্টিতে চৌম্বকত্ব এবং বিদ্যুৎ প্রবাহকে পুরোপুরি ভিন্ন দুটি বিষয় বলে মনে হলেও এই দুটোই যে একই শক্তির ভিন্ন রূপ সেটি এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে। আমরা দেখব বিদ্যুতের প্রবাহ হলে যেরকম চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি হতে পারে ঠিক সেরকম চৌম্বক ক্ষেত্রকে পরিবর্তন করে বিদ্যুৎ প্রবাহ করা যেতে পারে।

এই অধ্যায়ে বিদ্যুতের চৌম্বক ক্রিয়ার সাথে সাথে কীভাবে চুম্বক এবং বিদ্যুৎকে ব্যবহার করে নানা ধরনের যন্ত্রপাতি তৈরি করা হয় এবং ব্যবহার করা হয় সেই বিষয়গুলোও আলোচনা করা হয়েছে।

২০২৩

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- তড়িৎ প্রবাহের চৌম্বক ক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারব।
- তড়িৎচৌম্বক আবেশ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- আবিষ্ট তড়িৎপ্রবাহ ও আবিষ্ট তড়িচ্চালক শক্তি ব্যাখ্যা করতে পারব।
- মোটর ও জেনারেটরের মূলনীতি ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ট্রান্সফর্মারের মূলনীতি ব্যাখ্যা করতে পারব।
- স্টেপ আপ ও স্টেপ ডাউন ট্রান্সফর্মারের কার্যপ্রণালি ব্যাখ্যা করতে পারব।
- আমাদের জীবনে তড়িতের নানারূপের ব্যবহার ও এর অবদানকে প্রশংসা করতে পারব।

12.1 চুম্বক (Magnet)

তোমরা সবাই নিশ্চয়ই চুম্বক দেখেছ, একটা চুম্বক লোহাজাতীয় পদার্থের কাছে আনলে সেটা লোহাকে আকর্ষণ করে। চুম্বক এবং লোহার মাঝখানে কিছু নেই কিন্তু একটা অদৃশ্য শক্তি সেটাকে টেনে আনছে। সেটি প্রথমবার দেখার পর সবারই এক ধরনের বিস্ময় হয়। যারা দুটি চুম্বক হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করার সুযোগ পেয়েছ তারা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ (চিত্র 12.01) যে চুম্বকের দুটি মেরু এবং

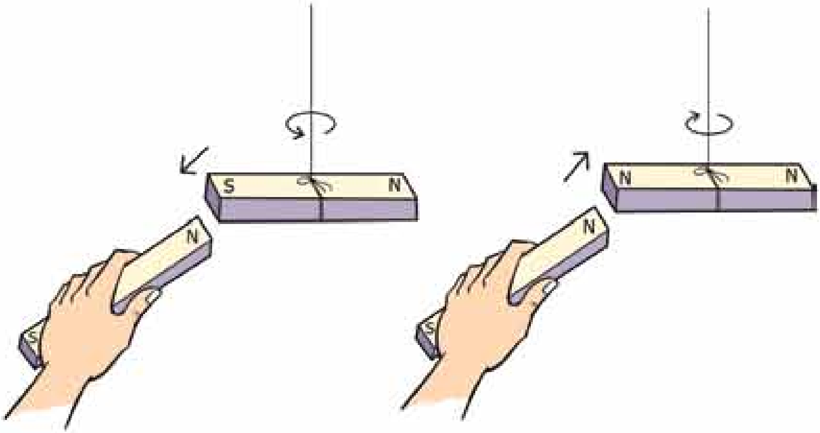

চিত্র 12.01: চুম্বকের বিপরীত মেরুতে আকর্ষণ ও সমমেরুতে বিকর্ষণ হয়।

মেরু দুটি এক ধরনের হয়ে থাকে তাহলে সেটা বিকর্ষণ করে আর মেরু দুটি যদি ভিন্ন ধরনের হয় তাহলে আকর্ষণ করে। চুম্বকের মেরু দুটিকে উত্তর আর দক্ষিণ মেরু নাম দেওয়া হয়েছে। কারণ দেখা গেছে একটা চুম্বককে ঝুলিয়ে দিলে সেটা উত্তর-দক্ষিণ বরাবর থাকে, যে অংশটুকু উত্তর দিকে থাকে সেটার নাম উত্তর মেরু, যেটা দক্ষিণ দিক বরাবর থাকে সেটা দক্ষিণ মেরু। এটা ঘটে তার কারণ পৃথিবীর একটা চৌম্বক ক্ষেত্র রয়েছে, কোনো চুম্বক ঝোলালে সেই ক্ষেত্র বরাবর চুম্বকটা নিজেকে সাজিয়ে নেয়। দুটো চুম্বক কেমন করে একে অন্যকে আকর্ষণ করে আমরা সেগুলো নিয়ে আলোচনা করতেই পারি কিন্তু সবার আগে জানা দরকার চুম্বকের যে বল, সেটা আসে কোথা থেকে?

12.2 বিদ্যুতের চৌম্বক ক্রিয়া (Magnetic Effects of Current)

যারা সাধারণভাবে চুম্বক হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করেছে তারা নিশ্চয়ই কল্পনাও করতে পারবে না যে এটি তড়িৎ বা বিদ্যুৎ থেকে আলাদা কিছু নয় এবং তড়িৎ বা বিদ্যুতের প্রবাহ দিয়ে চুম্বক তৈরি করা

যায়। একটা চার্জ থাকলে তার পাশে যেমন তড়িৎ ক্ষেত্র থাকে ঠিক সে রকম একটা তারের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে সেই তারের চারপাশে চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি হয়। ধরা যাক তুমি একটা কার্ডবোর্ডের মাঝখান দিয়ে একটা তার ঢুকিয়েছ এবং কার্ডের ওপর অনেকগুলো ছোট ছোট কম্পাস রেখেছ (চিত্র 12.02)। কম্পাসগুলো অবশ্যই উত্তর-দক্ষিণ বরাবর থাকবে ঠিক যে রকম থাকার কথা। এখন যদি এই তারের ভেতর দিয়ে কোনোভাবে বিদ্যুৎ বা তড়িৎ প্রবাহিত করতে পারো (মোটামুটি শক্তিশালী) তাহলে তুমি অবাক হয়ে দেখবে হঠাৎ করে সবগুলো কম্পাস একটা আরেকটার পেছনে সারিবদ্ধভাবে নিজেদের সাজিয়ে নেবে। তোমার স্পষ্ট অনুভূতি হবে যে এই বিদ্যুৎ প্রবাহের জন্য তারকে ঘিরে একটা বৃত্তাকার চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে।

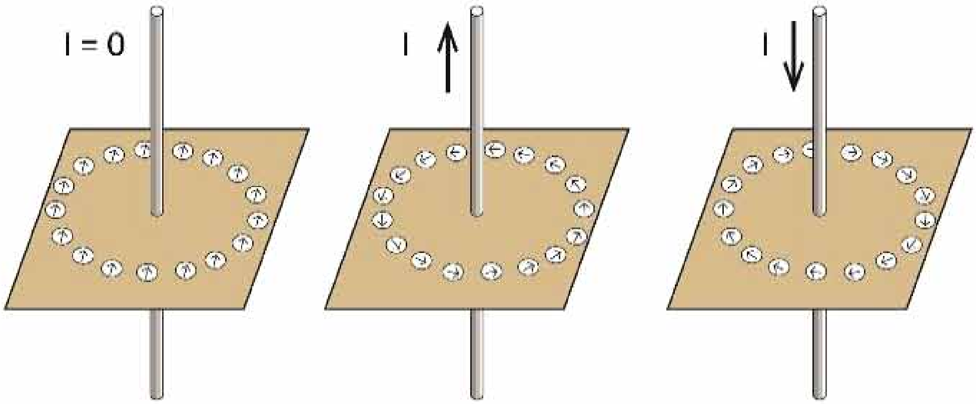

চিত্র 12.02: বিদ্যুৎ প্রবাহকে ঘিরে কম্পাসের দিক।

তুমি যদি বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ করে দাও তাহলে আবার সবগুলো ছোট ছোট কম্পাস উত্তর-দক্ষিণ বরাবর হয়ে যাবে। এবারে তুমি যদি বিদ্যুৎ প্রবাহের দিক পাল্টে দাও তাহলে দেখবে আবার কম্পাসগুলো নিজেদের সাজিয়ে নেবে কিন্তু এবারে বৃত্তটায় কম্পাসের দিকটা হবে উল্টো দিকে। তার কারণ বিদ্যুৎ প্রবাহ সব সময় তাকে ঘিরে একটা নির্দিষ্ট দিকে চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করে।

একটা তারের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে তার জন্য তৈরি হওয়া চৌম্বক বলরেখাগুলোর দিক কোন দিকে হবে সেটা ডান হাতের নিয়ম দিয়ে বের করা যায়। বুড়ো আঙুলটা যদি বিদ্যুৎ প্রবাহের দিক দেখায় তাহলে হাতের অন্য আঙুলগুলো চৌম্বক ক্ষেত্রের দিকটি নির্দেশ করে (চিত্র 12.03)।

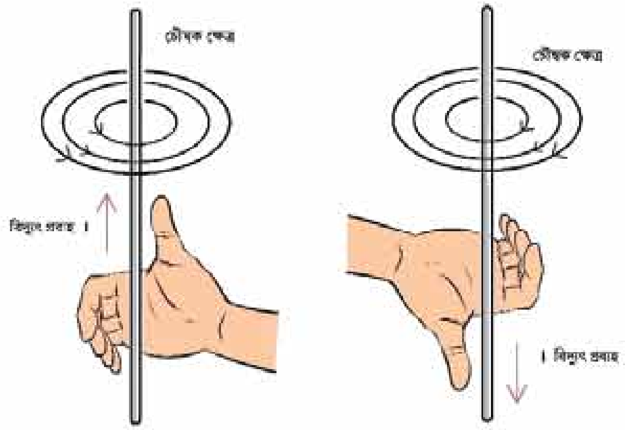

চিত্র 12.03: বিদ্যুৎ প্রবাহকে ঘিরে তৈরি চৌম্বক ক্ষেত্র।

উদাহরণ

প্রশ্ন: 12.04 চিত্রে দেখানো উপায়ে বিদ্যুৎ বইয়ের ভেতর থেকে উপরের দিকে যাচ্ছে, চৌম্বক ক্ষেত্র কোনটি সঠিক?

উত্তর: বাম দিকেরটি সঠিক।

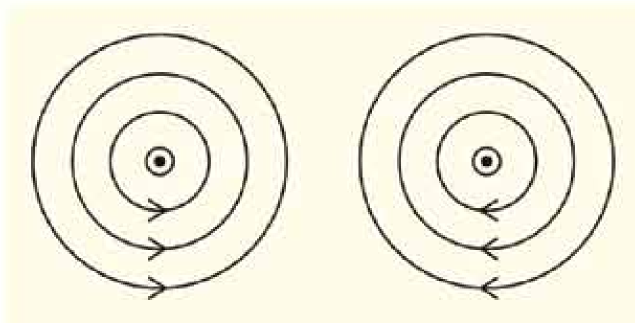

চিত্র 12.04: বিদ্যুৎ প্রবাহী তারকে ঘিরে চৌম্বক ক্ষেত্র। কোনটি সঠিক?

12.2.1 সলিনয়েড

একটা তার যদি সোজা থাকে এবং তার ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ হলে চৌম্বক বলরেখা কেমন হয় সেটা 12.03 চিত্রে দেখানো হয়েছিল। যদি তারটা সোজা না হয়ে বৃত্তাকার হয় তাহলে চৌম্বক বলরেখা কেমন হবে? 12.05 চিত্রে সেটা দেখানো হয়েছে। বুঝতেই পারছ বিদ্যুৎ প্রবাহ যত বেশি হবে চৌম্বক ক্ষেত্রটি তত শক্তিশালী হবে। একটা তারের ভেতর দিয়ে কতখানি বিদ্যুৎ প্রবাহিত করা যায় তার একটা সীমা আছে, তারটা I^2R হিসেবে গরম হয়ে যায় তা ছাড়াও সবচেয়ে বেশি কতখানি বিদ্যুৎ প্রবাহ দেওয়া সম্ভব সেটা বিদ্যুতের উৎসের ওপর নির্ভর করে। তাই যদি শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করতে হয় তাহলে একটা মাত্র বৃত্তাকার লুপ-এর ওপর নির্ভর না করে অপরিবাহী আস্তরণ দিয়ে ঢাকা তার দিয়ে অনেকবার প্যাঁচিয়ে

একটা কুণ্ডলী বা কয়েল তৈরি করা হয়। এরকম কুণ্ডলীকে বলে সলিনয়েড। সেই কুণ্ডলী দিয়ে শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করা যায়। কয়েলের প্রত্যেকটা লুপই তার ভেতর দিয়ে প্রবাহিত বিদ্যুতের জন্য চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করবে, তাই সম্মিলিত চৌম্বক ক্ষেত্র হবে অনেক গুণ বেশি।

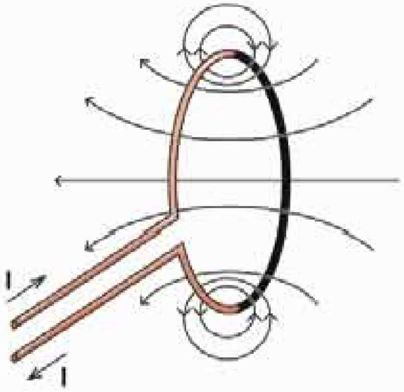

চিত্র 12.05: লুপের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহের কারণে তৈরি চৌম্বক ক্ষেত্র।

চিত্র 12.06: লুপের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ করলে ডান হাতের নিয়ম ব্যবহার করে।

বৃত্তাকার তারের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে তার চৌম্বক ক্ষেত্র কোন দিকে হবে সেটাও ডান হাতের নিয়ম দিয়ে বের করা যায়। বুড়ো আঙুলটি হবে চৌম্বক ক্ষেত্রের দিক যদি অন্য আঙুলগুলো বিদ্যুৎ প্রবাহের দিক দেখায় (চিত্র 12.06)। একটা তারের কুণ্ডলী বা সলিনয়েড আসলে দণ্ড চুম্বকের মতো কাজ করে এবং বুড়ো আঙুলের দিকটা হবে এই চুম্বকের উত্তর মেরু।

একটা তারের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে তার জন্য তৈরি হওয়া চৌম্বক বলরেখাগুলোর দিক কোন দিকে হবে সেটা ডান হাতের নিয়ম দিয়ে বের করা যায়। বুড়ো আঙুলটা যদি বিদ্যুৎ প্রবাহের দিক দেখায় তাহলে হাতের অন্য আঙুলগুলো চৌম্বক ক্ষেত্রের দিকটি নির্দেশ করে।

12.2.2 তাড়িতচুম্বক (Electromagnet)

শুধু বিদ্যুৎ ব্যবহার করে যে চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করা যায় তার থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করা সম্ভব যদি এই কুণ্ডলীর ভেতর এক টুকরো লোহা ঢুকিয়ে দেওয়া যায়। লোহা, কোবাল্ট আর নিকেল এই তিনটি ধাতুর বিশেষ চৌম্বকীয় ধর্ম আছে। এগুলোকে এলোমেলোভাবে থাকা অসংখ্য ছোট ছোট চুম্বক হিসেবে কল্পনা করা যায়। যেহেতু সবগুলো ছোট চুম্বক এলোমেলোভাবে আছে তাই পুরো লোহার টুকরোটা কোনো চুম্বক হিসেবে কাজ করে না।

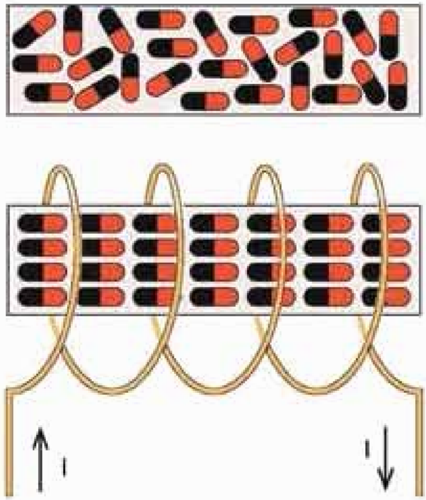

চিত্র 12.07: বিদ্যুৎ প্রবাহের কারণে এলোমেলোভাবে থাকা ছোট ছোট চুম্বক সারিবদ্ধ হয়ে শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করে।

কিন্তু যখন এটাকে একটা কয়েল বা সলিনয়েডের মাঝে ঢোকানো হয় এবং সেই সলিনয়েডে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করা হয় তখন সেটা যে চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করে সেটা লোহার টুকরার ছোট ছোট চুম্বকগুলোকে সারিবদ্ধ করে ফেলে তাই বিদ্যুৎ প্রবাহের জন্য তৈরি চৌম্বক ক্ষেত্রের সাথে সাথে লোহার নিজস্ব চৌম্বক ক্ষেত্র একত্র হয়ে অনেক শক্তিশালী একটা চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি হয়ে যায় (চিত্র 12.07)। মজার ব্যাপার হচ্ছে, বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ করার সাথে সাথে লোহার টুকরোর ভেতরকার সারিবদ্ধ ছোট ছোট চুম্বকগুলো সব আবার এলোমেলো হয়ে যাবে এবং পুরো চৌম্বক ক্ষেত্র অদৃশ্য হয়ে যাবে।

এভাবে তৈরি করা চুম্বককে বলা হয় তাড়িতচুম্বক । তাড়িতচুম্বকের ব্যবহারের কোনো শেষ নেই। স্পিকারে বা এয়ারফোনে যে শব্দ শোনা যায় সেখানে তাড়িতচুম্বক ব্যবহার করা হয়। (চিত্র 12.08) এখানে শব্দের কম্পন এবং তীব্রতার সমান বিদ্যুৎ প্রবাহ পাঠানো হয়, সেই বিদ্যুৎ একটা তাড়িতচুম্বক বা ইলেকট্রোম্যাগনেটের চৌম্বকত্ব শব্দের কম্পন বা তীব্রতার উপযোগী করে তৈরি করে সেটা একটা ডায়াফ্রামকে কাঁপায় এবং সেই ডায়াফ্রাম সঠিক শব্দ তৈরি করে।

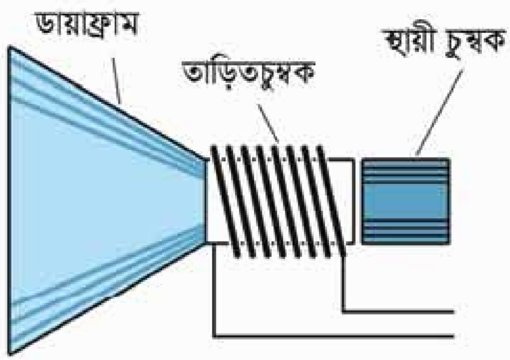

চিত্র 12.08: স্পিকারে তাড়িতচুম্বক ব্যবহার করা হয়।

12.2.3 তড়িৎ প্রবাহী তারের ওপর চুম্বকের প্রভাব

আমরা জানি, একটা চুম্বক অন্য চুম্বকের সমমেরুকে বিকর্ষণ এবং বিপরীত মেরুকে আকর্ষণ করে। আবার একটা তারের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে সেটি তাকে ঘিরে একটি চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করে। কাজেই একটা চৌম্বক ক্ষেত্রে যদি একটা তার রাখা হয় এবং সেই তারের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করা হয় তাহলে তারটি চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করার কারণে একটি

বল অনুভব করে। 12.09 চিত্রে একটা চুম্বকের উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরুতে যাওয়া চৌম্বক বলরেখা এবং তার মাঝে একটা তারকে দেখানো হয়েছে, তারটি কাগজের ভেতর থেকে উপরের দিকে বের হয়ে এসেছে। তারের ভেতর দিয়ে নিচ থেকে উপরে বিদ্যুৎ প্রবাহ হলে এটি তাকে ঘিরে বৃত্তাকার চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করবে এবং উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরুতে যাওয়া চৌম্বক ক্ষেত্রের সাথে যুক্ত হয়ে চৌম্বক বলরেখাকে পুনর্বিন্যাস করবে। তারের নিচে বেশিসংখ্যক চৌম্বক বলরেখা এবং উপরে কমসংখ্যক চৌম্বক বলরেখার তৈরি হবে, যেটি তারটিকে উপরের দিকে ঠেলে দেবে।

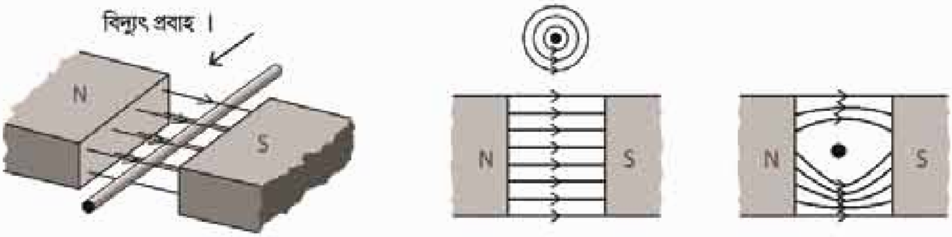

চিত্র 12.09: চৌম্বক ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ প্রবাহী তার রাখা হলে সেটি বল অনুভব করে।

যদি তারটিতে বিদ্যুৎ প্রবাহের দিক পরিবর্তন করা হয় তাহলে তারকে ঘিরে বৃত্তাকার চৌম্বক ক্ষেত্রের দিক পাল্টে যাবে এবং তখন তারের ওপর চৌম্বক বলরেখার ঘনত্ব বেড়ে যাবে যেটি তারটিকে নিচের দিকে ঠেলে দেবে।

12.2.4 ডিসি মোটর

তোমরা জান একটি চুম্বক দিয়ে অন্য চুম্বকের উপর বল প্রয়োগ করা যায়। অন্যভাবে আমরা বলতে পারি একটি চৌম্বক ক্ষেত্র দিয়ে অন্য একটি চৌম্বক ক্ষেত্রে বল প্রয়োগ করা যায়। একটি তারের ভেতর দিয়ে খুব বেশি বিদ্যুৎ প্রবাহিত করা যায় না, তাই সেটি খুব বড় চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করতে পারে না। কাজেই অন্য একটি চৌম্বক ক্ষেত্র দিয়ে তার ওপর শক্তিশালী বল প্রয়োগ করা যায় না। তোমরা দেখেছ যদি অনেকগুলো পাক দিয়ে একটা তারের কুণ্ডলী তৈরি করা যায় এবং তার ভেতরে একটা লোহার টুকরো বা আর্মেচার রাখা হয় তাহলে তারের ভেতর হালকা বিদ্যুৎ প্রবাহিত করা হলেই সেটি একটি তাড়িতচুম্বক বা ইলেকট্রোম্যাগনেট হয়ে শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করতে পারে। এই কয়েলকে আমরা একটা দণ্ড চুম্বক হিসেবে কল্পনা করে অন্য চৌম্বক ক্ষেত্রে তাকে রাখা হলে সেটি কী ধরনের আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বলের মুখোমুখি হবে এবং সে কারণে সেটির কোন দিকে গতি হবে সেটা বিশ্লেষণ করতে পারি। 12.10 চিত্রে এ রকম একটা তাড়িতচুম্বককে অন্য একটি চৌম্বক ক্ষেত্রে বিকর্ষণ বলের কারণে কীভাবে তার অবস্থান পরিবর্তন করবে সেটি দেখানো হয়েছে।

তাড়িতচুম্বকটিকে যদি তার কেন্দ্র বরাবর একটা অক্ষে ঘুরতে দেওয়া হয় তাহলে এটি পরের চিত্রের মতো অবস্থানে যাবার চেষ্টা করবে।

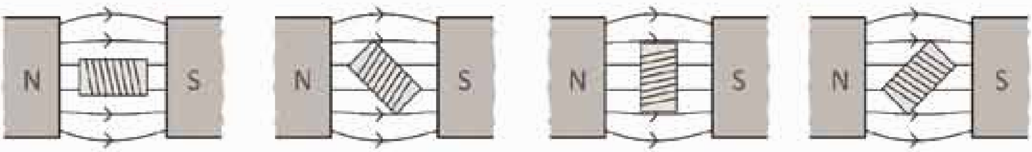

চিত্র 12.10: বৈদ্যুতিক মোটর একটি তাড়িতচুম্বকের ভেতর দিয়ে এমনভাবে বিদ্যুৎ প্রবাহ করানো হয়, যেন সব সময়েই এটি ঘুরতে থাকে।

যদি কোনো বিশেষ অবস্থা তৈরি করে পরের অবস্থানে যাবার সাথে সাথে তাড়িতচুম্বকটির বিদ্যুৎ প্রবাহের দিক পরিবর্তন করে দেওয়া যায় তাহলে সেখানে পৌঁছানোর সাথে সাথে কয়েল দিয়ে তৈরি দণ্ড চুম্বকটির উত্তর মেরু দক্ষিণ মেরুতে আর দক্ষিণ মেরু উত্তর মেরুতে পাল্টে যাবে, তাই বিকর্ষণের কারণে আবার সেটি সরে যাবার চেষ্টা করবে অর্থাৎ এটি একটি ঘূর্ণন বল অনুভব করবে। এটি চেষ্টা করবে পরের স্থায়ী অবস্থানে পৌঁছাতে কিন্তু সেখানে পৌঁছানোর সাথে সাথে আবার এটার বিদ্যুতের দিক পরিবর্তন করে দিলে এটি সেখানে থেমে যাবে না, আবার ঘুরতে শুরু করবে। তাই যখনই এটা একটা স্থায়ী অবস্থানে পৌঁছাবে তখনই যদি এটাতে এমনভাবে বিদ্যুৎ প্রবাহ করানো হয় যেন বিকর্ষণের কারণে এটি একটি ঘূর্ণন বল অনুভব করে তাহলে এটি ঘুরতেই থাকবে।

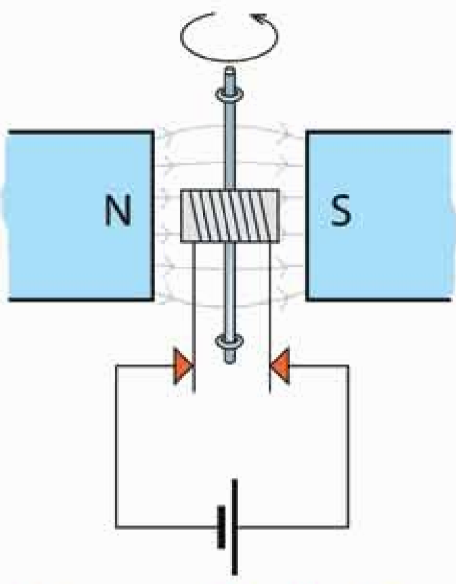

চিত্র 12.11: একটি বৈদ্যুতিক মোটর।

বিদ্যুতের দিক পরিবর্তন করার জন্য কম্যুটেটর নামে একটি উপকরণের মাধ্যমে খানিকটা যান্ত্রিক কৌশল ব্যবহার করতে হয়। মূল কয়েল যে অক্ষে ঘুরতে থাকে সেই ঘূর্ণায়মান অক্ষটির দুই পাশে তড়িৎ চুম্বকের দুটি তার এমনভাবে বসানো হয় যেন সেটি কম্যুটেটরে মূল বিদ্যুৎ প্রবাহের টার্মিনালকে স্পর্শ করে থাকে। যখনই স্পর্শ করে তখনই এমনভাবে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করবে যেন সব সময়ই সেটি তাড়িতচুম্বক টিকে বিকর্ষণ করে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। মাঝামাঝি সময়ে যখন

এটি মূল বিদ্যুৎ প্রবাহের টার্মিনাল থেকে সরে যাওয়ার কারণে তাড়িতচুম্বকটিতে কোনো বিদ্যুৎ প্রবাহ হয় না তখনো এটি থেমে না গিয়ে গতি জড়তার কারণে ঘুরতে থাকে।

তোমাদেরকে বোঝানোর জন্য (চিত্র 12.11) এটাকে সহজভাবে দেখানো হয়েছে। সত্যিকার মোটরে আর্মেচারকে ঘিরে বেশ অনেকগুলো কয়েল থাকতে পারে এবং প্রত্যেকটা কয়েল তারা নিজের মতো করে কম্যুটেটর থেকে বিদ্যুৎ প্রবাহ পায় এবং আর্মেচারটি ঘুরতে থাকে।

12.3 তাড়িতচৌম্বক আবেশ

আমরা আমাদের চারপাশে অসংখ্য যন্ত্রপাতিকে ঘুরতে দেখি, তাই আমাদের মনে হতে পারে এটাই বুঝি চুম্বক এবং চৌম্বক ক্ষেত্রের সবচেয়ে বড় অবদান। আসলে চুম্বকের এবং চৌম্বক ক্ষেত্রের সবচেয়ে বড় অবদান কিন্তু তার তাড়িত আবেশ অর্থাৎ চৌম্বক ক্ষেত্র দিয়ে বিদ্যুৎ তৈরি করা। বিজ্ঞানী ওয়েরস্টেড প্রথমে দেখিয়েছিলেন কোনো একটা পরিবাহী তারের লুপের ভেতর যদি চৌম্বক ক্ষেত্রের পরিবর্তন করা হয় তাহলে সেই লুপের ভেতর তড়িচ্চালক শক্তি (EMF) তৈরি হয়, যেটা সেই লুপের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করতে পারে। এই বিষয়টি ব্যবহার করে বিদ্যুৎ জেনারেটর তৈরি করা হয়েছে, যেখানে পরিবাহী তারের ভেতর দিয়ে চৌম্বক ক্ষেত্রের পরিবর্তন করে বিদ্যুৎ তৈরি হয়।

একটা কয়েলের দুই মাথা যদি একটা অ্যামিটারে লাগানো হয় এবং যদি সেই কয়েলের ভেতর একটা দণ্ড চুম্বক ঢোকানো হয় (চিত্র 12.12) তাহলে আমরা ঠিক ঢোকানোর সময় অ্যামিটারে এক ঝলক বিদ্যুৎ প্রবাহ দেখতে পাব। আমরা যখন চুম্বকটা টেনে বের করে আনব তখন আবার আমরা অ্যামিটারে এক ঝলক বিদ্যুৎ প্রবাহ দেখব তবে এবারে উল্টো দিকে। আমরা যদি চুম্বকের মেরু পরিবর্তন করি তাহলে অ্যামিটারেও বিদ্যুতের দিক পরিবর্তন দেখতে পাব। সুতরাং আমরা বলতে পারি একটি তারের কুণ্ডলীতে চৌম্বক ক্ষেত্রের পরিবর্তন করার সময় কুণ্ডলীর ভেতর ভোল্টেজ এবং বিদ্যুৎ প্রবাহ সৃষ্টি করাকে তাড়িতচৌম্বক আবেশ বলে। এই ভোল্টেজকে আবিষ্ট ভোল্টেজ এবং বিদ্যুৎ প্রবাহকে আবিষ্ট বিদ্যুৎ প্রবাহ বলে।

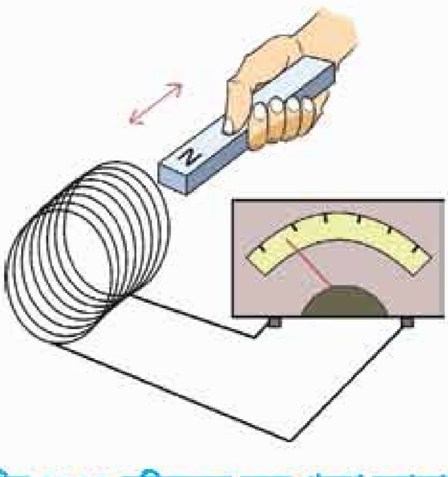

চিত্র 12.12: সলিনয়েডে চুম্বক প্রবেশ করানোর সময় বিদ্যুৎ প্রবাহ দেখা যায়।

এই পরীক্ষাটি করার সময় আমরা কয়েলের ভেতর চৌম্বক ক্ষেত্র পরিবর্তন করার জন্য একটা চুম্বককে কয়েলের ভেতর নিয়েছি এবং বের করে এনেছি। আমরা অন্য কোনোভাবে চৌম্বক ক্ষেত্র পরিবর্তন করতে পারতাম তাহলেও আমরা একই বিষয় দেখতে পেতাম। কয়েলের ভেতর চৌম্বক ক্ষেত্র পরিবর্তন করার আরেকটা উপায় হচ্ছে, এর কাছে চুম্বকের বদলে দ্বিতীয় একটা কয়েল নিয়ে আসা এবং সেই কয়েলে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করিয়ে সেখানে চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করা। যদি দ্বিতীয় কয়েলটিতে চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করার জন্য একটা ব্যাটারিকে একটা সুইচ দিয়ে সংযোগ দেওয়া হয় তাহলে সুইচটি অন করে দ্বিতীয় কয়েলে চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করা যাবে, আবার সুইচটি অফ করে চৌম্বক ক্ষেত্র অদৃশ্য করে দেওয়া যাবে। প্রথম কয়েলটির কাছে দ্বিতীয় কয়েলটি রেখে যদি সেটিতে চৌম্বক ক্ষেত্র একবার তৈরি করা হয় এবং আরেকবার নিঃশেষ করা হয় তাহলে প্রথম কয়েলের ভেতর চৌম্বক ক্ষেত্রের পরিবর্তন হবে এবং আমরা অ্যামিটারে সেজন্য বিদ্যুৎ প্রবাহ দেখব। সুইচ অন করে যখন বিদ্যুৎ প্রবাহ তৈরি করা হবে তখন অ্যামিটারের একদিকে তার কাঁটাটি নড়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ দেখাবে–সুইচটি অফ করার সময় আবার কাঁটাটি অন্যদিকে নড়ে বিপরীত দিকে বিদ্যুৎ প্রবাহ দেখাবে!

এখানে যে বিষয়টি মনে রাখতে হবে সেটি হচ্ছে, যখন চৌম্বক ক্ষেত্র পরিবর্তন হয় শুধু তখন বিদ্যুৎ প্রবাহ হয়। একটা কয়েলের মাঝখানে প্রচণ্ড শক্তিশালী একটা চুম্বক রেখে দিলে কিন্তু কয়েল দিয়ে কোনো বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে না। শুধু যখন চুম্বকটি নাড়িয়ে চৌম্বক ক্ষেত্র পরিবর্তন করা হবে তখন বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে।

12.3.1 জেনারেটর

মোটর কীভাবে কাজ করে সেটা যখন আমরা বোঝার চেষ্টা করছিলাম তখন দেখেছি সেখানে একটা চৌম্বক ক্ষেত্রের মাঝে একটা তাড়িতচুম্বকের ভেতর বিদ্যুৎ প্রবাহ করানো হয়, যে কারণে সেটা ঘোরে। এবারে ব্যাপারটা একটু অন্যভাবে চিন্তা করা যাক, মোটরের তাড়িতচুম্বকের দুই প্রান্তে যদি আমরা ব্যাটারি সেলের সংযোগ না দিয়ে সেখানে একটা অ্যামিটার লাগিয়ে তাড়িতচুম্বকটা ঘোরাই তাহলে কী হবে?

অবশ্যই তখন কয়েলের মাঝে চৌম্বক ক্ষেত্রের পরিবর্তন হবে, কাজেই কুণ্ডলীর ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ হবে। অর্থাৎ বিদ্যুৎ প্রবাহ করিয়ে যে মোটরের তাড়িতচুম্বক বা কয়েলকে আমরা ঘুরিয়েছি, সেই তাড়িতচুম্বক বা কয়েলটিকে ঘোরালে ঠিক তার উল্টো ব্যাপারটা ঘটে, বিদ্যুৎ তৈরি হয়। এভাবেই জেনারেটর তৈরি হয়। অর্থাৎ ডিসি মোটরের আর্মেচারকে ঘোরালে সেটা ডিসি বিদ্যুৎ প্রবাহ দেয়, এসি মোটরকে ঘোরালে ঠিক সেভাবে এসি বিদ্যুৎ প্রবাহ দেয়।

12.3.2 ট্রান্সফর্মার

চৌম্বক ক্ষেত্রের পরিবর্তন হলে বিদ্যুৎ তৈরি হয়—এটি ব্যবহার করে ট্রান্সফর্মার তৈরি করা হয়। ট্রান্সফর্মার কীভাবে কাজ করে বোঝার জন্য 12.13 চিত্রে একটা আয়তাকার লোহার মজ্জা বা কোর দেখানো হয়েছে। এই কোরের দুই পাশে পরিবাহী তার প্যাঁচানো হয়েছে—অবশ্যই এই পরিবাহী তারের ওপর অপরিবাহী আস্তরণ রয়েছে, যেন এটা ধাতব কোনো কিছুকে স্পর্শ করলেও "শর্ট সার্কিট" না হয়। চিত্রে দেখানো হয়েছে কোরের বাম পাশে একটা এসি ভোল্টেজের উৎস লাগানো হয়েছে। তারটি যেহেতু লোহার কোরকে ঘিরে লাগানো হয়েছে তাই যখন বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে তখন লোহার ভেতরে চৌম্বকত্ব তৈরি হবে এবং সেই চৌম্বক বলরেখা আয়তাকার লোহার ভেতর দিয়ে যাবে।

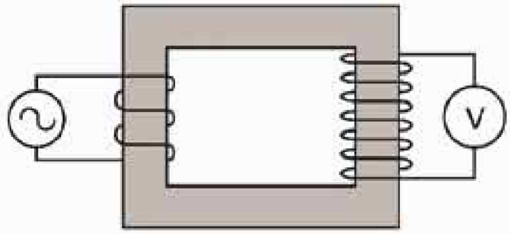

চিত্র 12.13: ট্রান্সফর্মারের প্রাইমারি কয়েলে এসি পটেনশিয়াল প্রয়োগ করা হলে সেকেন্ডারি কয়েলে সেটি পটেনশিয়াল তৈরি করে।

আমরা যেহেতু এসি ভোল্টেজের উৎস লাগিয়েছি তাই লোহার কোরে চৌম্বকত্ব বাড়বে-কমবে এবং দিক পরিবর্তন করবে, অর্থাৎ ক্রমাগত চৌম্বক ক্ষেত্রের পরিবর্তন হবে। লোহার কোরের অন্য পাশেও তার প্যাঁচানো আছে (অবশ্যই অপরিবাহী আবরণে ঢাকা) সেই কয়েলের মাঝে লোহার কোরের ভেতর দিয়ে চৌম্বক ক্ষেত্রটির ক্রমাগত পরিবর্তন হতে থাকবে এবং এই পরিবর্তন ডান পাশের কয়েলে একটা তড়িচ্চালক শক্তি বা EMF তৈরি করবে—একটা ভোল্টমিটারে আমরা সেটা ইচ্ছে করলে দেখতেও পারব। এই পদ্ধতিতে সরাসরি বৈদ্যুতিক সংযোগ ছাড়াই একটি কয়েল থেকে অন্য কয়েলে বিদ্যুৎ পাঠানোর প্রক্রিয়াকে বলে ট্রান্সফর্মার।

এই ট্রান্সফর্মার দিয়ে আমরা অত্যন্ত চমকপ্রদ কিছু বিষয় করতে পারি। দুই পাশে কয়েলের প্যাঁচসংখ্যা যদি সমান হয় তাহলে বাম দিকে আমরা যে এসি ভোল্টেজ প্রয়োগ করব ডান দিকে ঠিক সেই এসি ভোল্টেজ ফেরত পাব। ডান দিকে প্যাঁচের সংখ্যা যদি দশ গুণ বেশি হয় তাহলে ভোল্টেজ দশ গুণ বেশি হবে। প্যাঁচের সংখ্যা যদি দশ গুণ কম হয় তাহলে ভোল্টেজ দশ গুণ কম হবে। বাম দিকের কয়েল যেখানে এসি ভোল্টেজ প্রয়োগ করা হয় তার নাম প্রাইমারি কয়েল বা মুখ্য কুণ্ডলী এবং ডান দিকে যেখান থেকে ভোল্টেজ ফেরত নেয়া হয় তার নাম সেকেন্ডারি কয়েল বা গৌণ কুণ্ডলী।

তোমরা হয়তো মনে করতে পারো যদি সত্যি এটা ঘটানো সম্ভব হয় তাহলে আমরা প্রাইমারিতে অল্পসংখ্যক প্যাঁচ দিয়ে অল্প ভোল্টেজ প্রয়োগ করে, সেকেন্ডারি কয়েলে অনেক বেশি প্যাঁচ দিয়ে বিশাল একটা ভোল্টেজ বের করে অফুরন্ত বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবস্থা করে ফেলি না কেন? এখানে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে প্রতি সেকেন্ডে কতটুকু বৈদ্যুতিক শক্তি প্রয়োগ করা হচ্ছে, সেটা পরিমাপ করা হয় VI (ভোল্টেজ × কারেন্ট) দিয়ে, একটা ট্রান্সফর্মারে প্রাইমারিতে যে পরিমাণ VI

প্রয়োগ করা হয় সেকেন্ডারি কয়েল থেকে ঠিক সেই পরিমাণ VI ফেরত পাওয়া যায়। কাজেই সেকেন্ডারিতে যদি ভোল্টেজ দশ গুণ বাড়িয়ে নেয়া যায় তাহলে সেখানে বিদ্যুৎও দশ গুণ কমে যাবে।

তোমাদেরকে বোঝানোর জন্য আয়তাকার একটি কোর দেখানো হয়েছে। সত্যিকারের ট্রান্সফর্মার একটু অন্যভাবে তৈরি হয়, সেখানে প্রাইমারির উপরেই সেকেন্ডারি কয়েল প্যাঁচানো হয় এবং কোরটাও একটু অন্য রকম হয়।

প্রাইমারি কয়েলে প্যাঁচসংখ্যা যদি n_P এবং সেকেন্ডারি কয়েলের প্যাঁচসংখ্যা n_S হয় তাহলে প্রাইমারি কয়েলে যদি এসি V_P ভোল্টেজ প্রয়োগ করা হয় তাহলে সেকেন্ডারি কয়েলে যে এসি ভোল্টেজ V_S পাওয়া যাবে তার পরিমাণ হবে

$$V_S = \left(\frac{n_S}{n_P}\right) V_P$$

প্রাইমারি কয়েলে যদি I_P বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় তাহলে সেকেন্ডারি কয়েলে বিদ্যুৎ প্রবাহ I_S হবে

$$I_S = \left(\frac{V_P}{V_S}\right) I_P = \left(\frac{n_P}{n_S}\right) I_S$$

যে ট্রান্সফরমারে প্রাইমারি কয়েলের তুলনায় সেকেন্ডারি কয়েলের প্যাঁচসংখ্যা বেশি হয় এবং সে কারণে প্রাইমারি কয়েলে প্রয়োগ করা এসি ভোল্টেজ সেকেন্ডারি কয়েলে বেড়ে যায় তাকে স্টেপ আপ ট্রান্সফরমার বলে। বিদ্যুৎ পরিবহনের জন্য স্টেপ আপ ট্রান্সফরমার ব্যবহার করে ভোল্টেজকে অনেক গুণ বাড়ানো হয়।

যে ট্রান্সফরমারে প্রাইমারি কয়েলের তুলনায় সেকেন্ডারি কয়েলের প্যাঁচসংখ্যা কম হয় এবং সে কারণে প্রাইমারি কয়েলে প্রয়োগ করা এসি ভোল্টেজ সেকেন্ডারি কয়েলে কমে যায় তাকে স্টেপ ডাউন ট্রান্সফরমার বলে।

উদাহরণ

প্রশ্ন: একটি ট্রান্সফর্মারের প্রাইমারি কয়েলের প্যাঁচসংখ্যা 100, সেকেন্ডারি কয়েলের প্যাঁচসংখ্যা 1000, প্রাইমারি কয়েল দিয়ে 10V DC দেওয়া হলো। সেকেন্ডারি কয়েলে ভোল্টেজ কত?

উত্তর: শূন্য। ট্রান্সফর্মার ডিসি ভোল্টেজে কাজ করে না।

প্রশ্ন: একটি ট্রান্সফর্মারের প্রাইমারি কয়েলের প্যাঁচসংখ্যা 100, সেকেন্ডারি কয়েলের প্যাঁচসংখ্যা 1000, প্রাইমারি কয়েল দিয়ে 12V AC দেওয়া হলো। সেকেন্ডারি কয়েলে ভোল্টেজ কত?

উত্তর: $V_S = \left(\frac{n_S}{n_P}\right) V_P = \left(\frac{1000}{100}\right) \times 12V = 120V\ AC$

প্রশ্ন: উপরের ট্রান্সমিটারে প্রাইমারি কয়েল দিয়ে 1A বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে সেকেন্ডারি কয়েলে সর্বোচ্চ কত কারেন্ট প্রবাহিত হতে পারবে?

উত্তর: $I_S = \left(\frac{V_P}{V_S}\right) I_P = \left(\frac{12}{120}\right) \times 1\,A = 0.1\,A$

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন

1. তোমার ঘরের এক মাথা থেকে অন্য মাথায় ইলেকট্রনের বিম পাঠাতে গিয়ে যদি দেখো সেটা উপরে উঠে যাচ্ছে তাহলে তুমি কী ব্যাখ্যা দেবে?

2. বৈদ্যুতিক চুম্বক বানানোর সময় এক টুকরো লোহার ওপর বিদ্যুৎ অপরিবাহী আবরণে ঢাকা তার প্যাঁচানো হয়। মোটা তার দিয়ে একটি প্যাঁচ দেওয়া ভালো নাকি সরু তার দিয়ে অনেকগুলো প্যাঁচ দেওয়া ভালো? কেন?

3. দুটো লোহার দণ্ডের মাঝে একটি চুম্বক অন্যটি নয়, না ঝুলিয়ে বা অন্য কোনো যন্ত্র ব্যবহার না করে কোনটা চুম্বক আর কোনটা সাধারণ লোহা বের করতে পারবে?

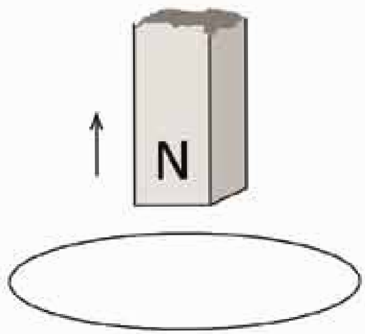

চিত্র 12.14: একটি লুপের ভেতর একটি চুম্বকের অবস্থানের পরিবর্তন।

4. পৃথিবী একটা বিশাল চুম্বক, উত্তর মেরু সেই চুম্বকের উত্তর মেরু নাকি দক্ষিণ মেরু?

5. চুম্বককে নাড়িয়ে বিদ্যুৎ তৈরি করা হয় সব সময়ই এটি পরিবর্তনকে বাধা দিতে চায়–এটা মনে রেখে 12.14 চিত্রের চুম্বকটি উপরের দিকে নিলে লুপে কোন দিকে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে বলো?

6. তড়িৎ প্রবাহের চৌম্বক ক্রিয়া কী?

7. তাড়িতচুম্বক কাকে বলে?

8. জেনারেটর কাকে বলে? জেনারেটর দিয়ে কী কাজ করা হয়?

9. জেনারেটর ও তড়িৎ মোটরের মধ্যে পার্থক্য কী?

10. স্টেপআপ ও স্টেপডাউন ট্রান্সফর্মার দ্বারা কী কাজ করা হয়?

11. তাড়িতচুম্বকের প্রাবল্য কীভাবে বৃদ্ধি করা যায় লেখ।

12. কোনো ট্রান্সফর্মার 240 V এসি উৎসের সাথে সংযুক্ত আছে। এর মুখ্য ও গৌণ কুণ্ডলীর পাকসংখ্যা যথাক্রমে 1000 ও 50। এর গৌণ কুণ্ডলীর ভোল্টেজ কত?

গাণিতিক প্রশ্ন

1. অপরিবাহী আবরণে ঢাকা একটি তার দিয়ে 10 প্যাঁচের একটি কয়েল তৈরি করে তার ভেতর দিয়ে I পরিমাণ বিদ্যুৎ প্রবাহ করার কারণে B চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। প্যাঁচের সংখ্যা 100 করা হলে চৌম্বক ক্ষেত্র কত হবে?

2. উপরের ক্ষেত্রে প্যাঁচসংখ্যা আর 50 বৃদ্ধি করতে গিয়ে ভুলে উল্টো দিকে 50 প্যাঁচ দেওয়ার কারণে চৌম্বক ক্ষেত্র কত হবে?

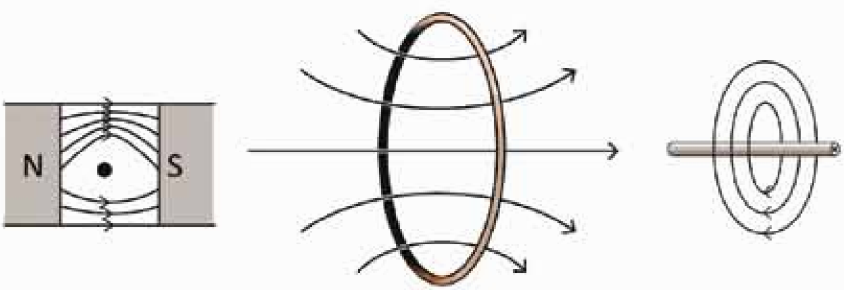

চিত্র 12.15: বিদ্যুৎ প্রবাহী তারকে ঘিরে চৌম্বক ক্ষেত্র।

3. 12.15 চিত্রটি দেখে বলো কোন তারের ভেতর দিয়ে কোন দিকে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হচ্ছে?

5. একটি ট্রান্সফর্মারের প্রাইমারি কয়েলে প্যাঁচসংখ্যা 100, এখানে 15 V AC দিয়ে সেকেন্ডারি কয়েলে 150 V AC পাওয়া গেছে, সেকেন্ডারি কয়েলে প্যাঁচসংখ্যা কত?

২০২৫

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটির পাশে ঠিক (✓) চিহ্ন দাও

1. কোনো চোঙের উপর অন্তরিত তার পেঁচিয়ে সলিনয়েড তৈরি করে তাতে তড়িৎ প্রবাহ চালালে চৌম্বক ক্ষেত্রের কী ঘটবে?

   (ক) ঘনীভূত ও দুর্বল হবে (খ) ঘনীভূত ও শক্তিশালী হবে
   (গ) কম ঘনীভূত ও দুর্বল হবে (ঘ) কম ঘনীভূত কিন্তু শক্তিশালী হবে

2. কোনটির কার্যপ্রণালিতে তাড়িত চৌম্বক আবেশকে ব্যবহার করা হয়?

   (ক) ট্রানজিস্টর (খ) মোটর
   (গ) অ্যামপ্লিফায়ার (ঘ) ট্রান্সফর্মার

3. কোন প্রক্রিয়া বা কার্যধারায় তড়িচ্চালক শক্তি উৎপন্ন হয়?

   (i) কোনো তারকুণ্ডলীর ভেতর একটি চুম্বক স্থির অবস্থায় রাখলে
   (ii) কোনো চৌম্বকক্ষেত্রে কোনো তারকুণ্ডলী ঘোরালে
   (iii) কোনো স্থির তারকুণ্ডলীর চারদিকে কোনো চুম্বক ঘোরালে

নিচের কোনটি সঠিক?

   (ক) i (খ) ii
   (গ) i ও ii (ঘ) ii ও iii

কোনো তারকুণ্ডলীর ভেতর একটি দণ্ড চুম্বক আনা-নেওয়া করা হচ্ছে। এতে তারকুণ্ডলীতে ভোল্টেজ আবিষ্ট হচ্ছে। আবিষ্ট ভোল্টেজ কয়েকটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। এবার নিচের 4 ও 5 নম্বর প্রশ্নের জবাব দাও।

4. তাড়িত চৌম্বক আবেশের বেলায় আবিষ্ট ভোল্টেজ কোনটির উপর নির্ভর করে?

   (i) তারকুণ্ডলীর সাথে সংশ্লিষ্ট চৌম্বকক্ষেত্রের প্রাবল্য
   (ii) চৌম্বকক্ষেত্রে আনা-নেওয়া করা তারকুণ্ডলীর রোধ
   (iii) চৌম্বক ক্ষেত্রে আনা-নেওয়া করা তারকুণ্ডলীর দ্রুতি

নিচের কোনটি সঠিক?

   (ক) i (খ) ii
   (গ) i ও ii (ঘ) ii ও iii

5. তারকুণ্ডলীর পাকের সংখ্যা বাড়ালে আবিষ্ট তড়িৎ প্রবাহের কী ঘটবে?

(ক) তড়িৎ প্রবাহ কমে যাবে
(খ) তড়িৎ প্রবাহ বেড়ে যাবে
(গ) তড়িৎ প্রবাহের মান শূন্য হবে
(ঘ) তড়িৎ প্রবাহের মান সমান হবে

সৃজনশীল প্রশ্ন

1. 12.16 চিত্রটি দেখে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

(ক) A চিহ্নিত বস্তুটির নাম কী?
(খ) যন্ত্রটি যে নীতি বা ঘটনার উপর তৈরি তা ব্যাখ্যা করো।
(গ) এই যন্ত্রের মুখ্য কুণ্ডলীতে প্রবাহমাত্রা নির্ণয় করো।
(ঘ) উপাত্তের আলোকে যন্ত্রটির ক্রিয়া গাণিতিকভাবে ব্যাখ্যা করো।

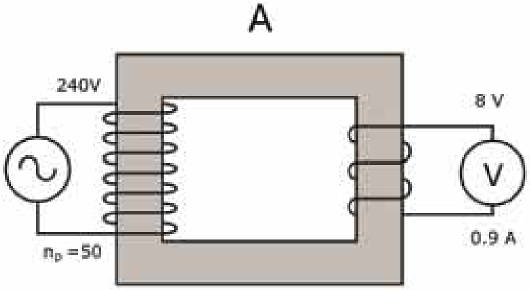

চিত্র 12.16

2. একটি লম্বা সোজা তারকে একটি বড় কাগজের টুকরার মধ্য দিয়ে লম্বভাবে প্রবেশ করিয়ে এর মধ্য দিয়ে 1.5 ভোল্টের পেন্সিল ব্যাটারির সাহায্যে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করা হলো এবং কাগজের উপর কিছু লোহার গুঁড়া ছড়িয়ে দেওয়া হলো।

(ক) তড়িৎ প্রবাহের চৌম্বক ক্রিয়া কী?
(খ) কাগজটির উপর লোহার গুঁড়া কীভাবে সজ্জিত হবে?
(গ) তারটির গঠনে কী পরিবর্তন আনলে এর দ্বারা তৈরি চৌম্বকক্ষেত্রের প্রাবল্য বাড়বে ব্যাখ্যা করো।
(ঘ) তারটিকে একটি লোহার তারকাঁটার উপর পেঁচিয়ে তারকাঁটার এক মাথা লোহার গুঁড়ার কাছাকাছি নিলে যা ঘটবে তা বিশ্লেষণ করো?

ত্রয়োদশ অধ্যায়

আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান ও ইলেকট্রনিকস

(Modern Physics and Electronics)

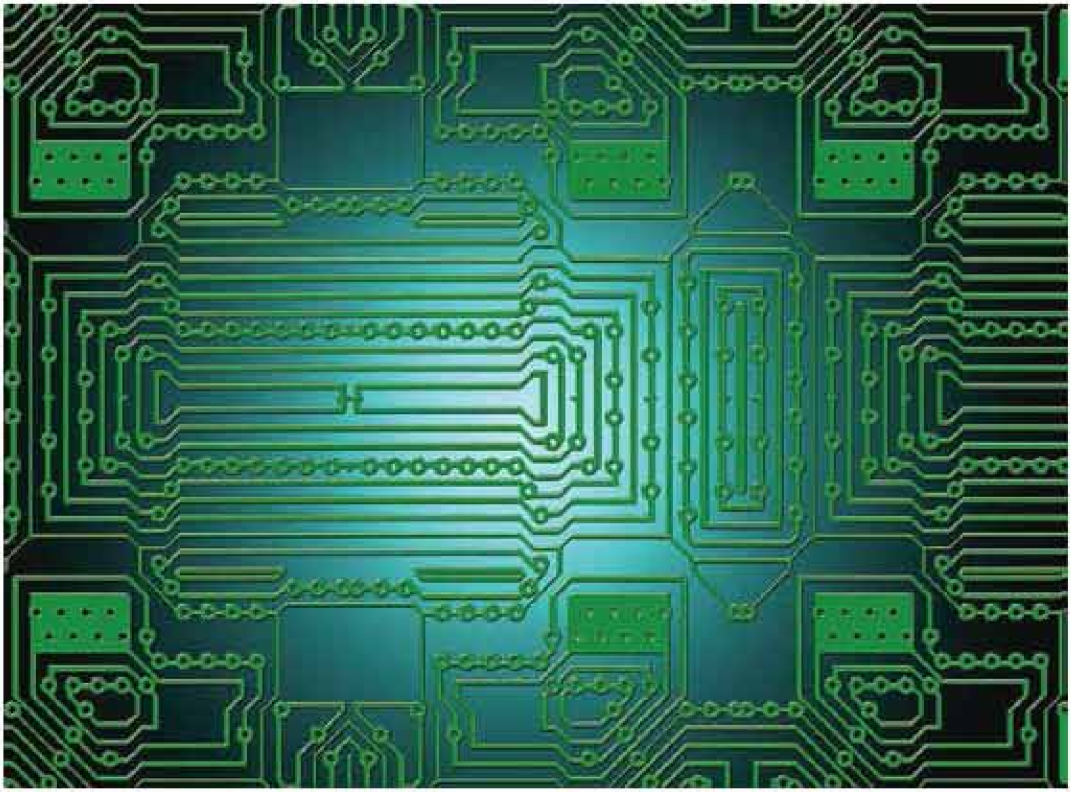

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের সূচনা হলে যে যে নতুন বিষয়গুলোর জন্ম হয় তার একটি হচ্ছে তেজস্ক্রিয়তা। এই অধ্যায়ে তেজস্ক্রিয়তার বিষয়টি তোমাদের জন্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

আমাদের বর্তমান সভ্যতার মূল চালিকাশক্তি হচ্ছে ইলেকট্রনিকস—এই উক্তিটি মোটেই অতিরঞ্জিত নয়। বর্তমান ইলেকট্রনিকসের পেছনে পদার্থবিজ্ঞানের অবদানটুকু এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। যেসব যন্ত্রপাতি আমাদের জীবনকে পুরোপুরি পাল্টে দিয়েছে এই অধ্যায়ে সেই সব যন্ত্রের সাথেও তোমাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- তেজস্ক্রিয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- আলফা, বিটা ও গামা রশ্মির বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ইলেকট্রনিকসের ক্রমবিকাশ বর্ণনা করতে পারব।
- অ্যানালগ ও ডিজিটাল ইলেকট্রনিকসের পার্থক্য করতে পারব।
- অর্ধপরিবাহী ও সমন্বিত বর্তনী ব্যাখ্যা করতে পারব।
- মাইক্রোফোন ও স্পিকারের কার্যক্রম ব্যাখ্যা করতে পারব।
- নির্বাচিত যোগাযোগ প্রযুক্তি ডিভাইসের কার্যক্রমের মূলনীতি ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ইন্টারনেট এবং ই-মেইলের সাহায্যে যোগাযোগ প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারব।
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিগত ডিভাইস কীভাবে আমাদের জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করছে তা অনুসন্ধান করতে পারব।
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ডিভাইস সঠিক ও কার্যকর ব্যবহারে নিজে সচেতন হব এবং অন্যদের সচেতন করব।

13.1 তেজস্ক্রিয়তা (Radioactivity)

আমরা সবাই জানি একটা পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে নিউক্লিয়াস, সেখানে থাকে প্রোটন এবং নিউট্রন। পরমাণুর নিউক্লিয়াসে যতগুলো প্রোটন থাকে ঠিক ততগুলো ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসকে ঘিরে ঘুরতে থাকে। নিউক্লিয়াসের ব্যাসার্ধ পরমাণুর ব্যাসার্ধ থেকে প্রায় লক্ষ গুণ ছোট। নিউক্লিয়াসের আকার খুবই ছোট হলেও একটা পরমাণুর মূল ভরটি আসলে নিউক্লিয়াসের ভর, তার কারণ ইলেকট্রনের ভর প্রোটন কিংবা নিউট্রনের ভর থেকে 1800 গুণ কম।

প্রোটন পজিটিভ চার্জযুক্ত (ধনাত্মক আধান) তাই শুধু প্রোটন দিয়ে নিউক্লিয়াস তৈরি হতে পারে না, তাহলে প্রবল বিকর্ষণে প্রোটনগুলো ছিটকে যাবে। সেজন্য নিউক্লিয়াসের ভেতরে প্রোটনের সাথে চার্জহীন নিউট্রনও থাকে এবং নিউট্রন আর প্রোটন মিলে প্রবল শক্তিশালী নিউক্লিয়ার বলের আকর্ষণে নিউক্লিয়াসগুলো স্থিতিশীল থাকতে পারে। সাধারণ হাইড্রোজেনের কেন্দ্রে একটি মাত্র প্রোটন থাকলেও বাড়তি একটি কিংবা দুটি নিউট্রনসহ হাইড্রোজেনের নিউক্লিয়াসও রয়েছে।

নিউক্লিয়াসের ভেতরে প্রোটনের সংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে সেটাকে স্থিতিশীল রাখার জন্য নিউট্রনের সংখ্যাও বেড়ে যেতে থাকে, কিন্তু তারপরও নিউক্লিয়াসের ভেতরে প্রোটনের সংখ্যা 82 অতিক্রম করার পর থেকে নিউক্লিয়াসগুলো অস্থিতিশীল হতে শুরু করে। অস্থিতিশীল নিউক্লিয়াসগুলো কোনো এক ধরনের বিকিরণ করে স্থিতিশীল হওয়ার চেষ্টা করে এবং এই প্রক্রিয়াটাকে আমরা বলি তেজস্ক্রিয়তা। নিউক্লিয়াসের ভেতর থেকে যে বিকিরণ বের হয়ে আসে সেটাকে বলে তেজস্ক্রিয় রশ্মি।

নিউক্লিয়াসের ভেতরে প্রোটনের সংখ্যা 82 অতিক্রম করলেই (পারমাণবিক সংখ্যা 82 থেকে বেশি) যে নিউক্লিয়াসগুলো তেজস্ক্রিয় হয়ে থাকে তা নয়, অন্য পরমাণুর নিউক্লিয়াসও তেজস্ক্রিয় হতে পারে। আমরা পরমাণুর শ্রেণিবিন্যাস করেছি তার ইলেকট্রনের সংখ্যা দিয়ে, যেটা প্রোটনের সংখ্যার সমান। একটি মৌলের বাহ্যিক ধর্ম, প্রকৃতি, রাসায়নিক গুণাগুণ সবকিছু নির্ভর করে বাইরের ইলেকট্রনের শ্রেণিবিন্যাসের ওপর। কাজেই কোনো একটি মৌলের পরমাণুতে তার ইলেকট্রন এবং প্রোটনের সংখ্যা সুনির্দিষ্ট হলেও নিউট্রনের সংখ্যা ভিন্ন হতে পারে। ভিন্ন নিউট্রন সংখ্যায় নিউট্রনযুক্ত নিউক্লিয়াসের পরমাণুকে বলা হয় সেই মৌলের আইসোটোপ। কাজেই কোনো একটি মৌলের একটি আইসোটোপ স্থিতিশীল হতে পারে আবার সেই মৌলের অন্য একটি আইসোটোপ অস্থিতিশীল বা তেজস্ক্রিয় হতে পারে। উদাহরণ দেবার জন্য আমরা কার্বন মৌলটির কথা বলতে পারি যার নিউক্লিয়াসে ছয়টি প্রোটন এবং এর তিনটি আইসোটোপ:

C_{12} : 6টি প্রোটন এবং 6টি নিউট্রন

C_{13} : 6টি প্রোটন এবং 7টি নিউট্রন

C_{14} : 6টি প্রোটন এবং 8টি নিউট্রন

কার্বনের এই তিনটি আইসোটোপের মাঝে C_{14} অস্থিতিশীল বা তেজস্ক্রিয়।

1896 সালে হেনরি বেকেরেল (Henri Becquerel) প্রথম ইউরেনিয়াম থেকে তেজস্ক্রিয় রশ্মির অস্তিত্ব প্রমাণ করেন। পরবর্তীতে আরনেস্ট রাদারফোর্ড (Ernest Rutherford), পিয়ারে কুরি (Pierre Curie), মেরি কুরি (Marie Curie) এবং অন্যান্য বিজ্ঞানীরা অন্যান্য মৌলের তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কার করেন। এটি বাইরের চাপ, তাপ, বৈদ্যুতিক বা চৌম্বক ক্ষেত্র দিয়ে কোনোভাবে প্রভাবিত বা নিয়ন্ত্রণ করা যায় না, কাজেই এটি একটি নিউক্লিয় ঘটনা হিসেবে মেনে নেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, তেজস্ক্রিয়তার কারণে তেজস্ক্রিয় রশ্মি নির্গত হয়ে নিউক্লিয়াসের গঠন পরিবর্তিত হয়ে সেটি ভিন্ন একটি মৌলে রূপান্তরিত হয়ে যায় সেটাও লক্ষ করা হয়েছে।

নিউক্লিয়াস থেকে যে তিনটি প্রধান তেজস্ক্রিয় রশ্মি বের হয় সেগুলো হচ্ছে আলফা, বিটা এবং গামা রশ্মি (চিত্র 13.01)।

13.1.1 আলফা রশ্মি (Alpha Ray)

আলফা রশ্মি বা আলফা কণা আসলে একটি হিলিয়াম নিউক্লিয়াস। একটি হিলিয়াম নিউক্লিয়াসে থাকে দুটো প্রোটন এবং দুটো নিউট্রন, কাজেই এটি একটি চার্জযুক্ত কণা। সে কারণে বিদ্যুৎ এবং চৌম্বক ক্ষেত্র দিয়ে এর গতিপথকে প্রভাবিত করা যায়। একটা নিউক্লিয়াসের ভেতর থেকে যখন একটা আলফা কণা বের হয়ে আসে তখন তার শক্তি থাকে কয়েক MeV. কাজেই সেটি যখন বাতাসের ভেতর দিয়ে যায় তখন বাতাসের অণু-পরমাণুর সাথে সংঘর্ষ করে সেগুলোকে তীব্রভাবে আয়নিত করতে পারে। বাতাসে আলফা কণার গতিপথ হয় সরলরেখার মতো, এটা সোজা এগিয়ে যায়। তবে আলফা কণা যেহেতু হিলিয়ামের নিউক্লিয়াস তাই এটা পদার্থের ভেতর দিয়ে বেশি দূর যেতে পারে না। বাতাসের ভেতর দিয়ে 6 cm যেতে না যেতেই এটা বাতাসের অণু-পরমাণুকে তীব্রভাবে আয়নিত করে তার পুরো শক্তি ক্ষয় করে থেমে যায়। একটা কাগজ দিয়েই আলফা কণাকে থামিয়ে দেওয়া যায়। জিংক সালফাইড পর্দায় এটি প্রতিপ্রভা (phosphorescence) সৃষ্টি করে। আলফা কণা যাত্রাপথে অসংখ্য অণু-পরমাণুকে আয়নিত করে মুক্ত ইলেকট্রন তৈরি করে সেগুলোকে সংগ্রহ করে সহজেই তার উপস্থিতি নির্ণয় করা যায় কিংবা তার শক্তি পরিমাপ করা যায়।

আলফা কণা যেহেতু দুটি প্রোটন এবং দুটি নিউট্রন দিয়ে তৈরি তাই যখন একটি নিউক্লিয়াসের ভেতর থেকে বের হয়ে আসে, তখন সেই নিউক্লিয়াসের পারমাণবিক সংখ্যা কমে দুই ঘর এবং নিউক্লিওন ২০২৫

সংখ্যা কমে চার হয়। যেমন: ইউরেনিয়ামের একটি আইসোটোপ আলফা কণা বিকিরণ করে থোরিয়ামের একটি আইসোটোপে পরিণত হয়।

$$U_{238} \rightarrow Th_{234} + He_4^{++}$$

ইউরেনিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা 92 থোরিয়ামের 90, এখানে উল্লেখ্য, পরমাণুর ইলেকট্রন সংখ্যাটি এখানে ধর্তব্যের মাঝে নয়, তেজস্ক্রিয় নিউক্লিয়াসের পরমাণু সহজেই তার চারপাশের পরিবেশে বাড়তি ইলেকট্রন ছেড়ে দিতে পারে, কিংবা গ্রহণ করতে পারে।

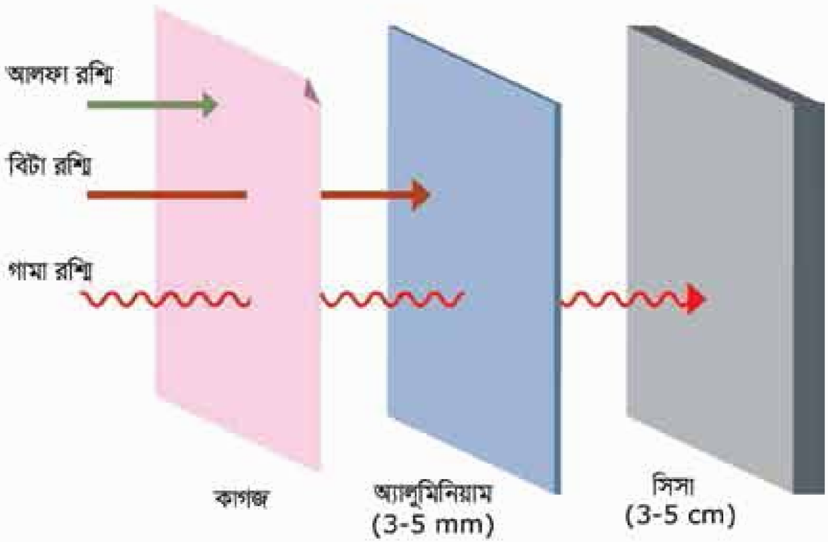

চিত্র 13.01: আলফা রশ্মি খুব বেশি আয়নিত করে শক্তি ক্ষয় করতে পারে বলে একটা কাগজের পৃষ্ঠা দিয়েই এটাকে থামানো সম্ভব। বিটা রশ্মি বা ইলেকট্রনকে থামাতে কয়েক মিলিমিটার পুরু অ্যালুমিনিয়াম দরকার হয়। গামা রশ্মির চার্জ নেই বলে এটিকে থামাতে পুরু সিসার পাতের দরকার হয়।

13.1.2 বিটা রশ্মি (Beta Ray)

বিটা রশ্মি বা বিটা কণা আসলে ইলেকট্রন। এটি নিশ্চয়ই একটি বিস্ময়ের ব্যাপার যে নিউক্লিয়াসের ভেতরে থাকে শুধু প্রোটন এবং নিউট্রন কিন্তু সেখান থেকে ইলেকট্রন কেমন করে বের হয়ে আসে? সেটি ঘটার জন্য নিউক্লিয়াসের ভেতরের একটি নিউট্রনকে প্রোটনে পরিবর্তিত হতে হয়।

$$n^0 \rightarrow p^+ + e^- + \bar{\nu}$$

অর্থাৎ একটি চার্জহীন নিউট্রন পজিটিভ চার্জযুক্ত প্রোটন এবং নেগেটিভ চার্জযুক্ত ইলেকট্রনে পরিবর্তিত হয়, কাজেই মোট চার্জের পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকে। সমীকরণের ডান পাশে ν দিয়ে পদার্থবিজ্ঞানের

জগতের রহস্যময় কণা নিউট্রিনোর প্রতিপদার্থকে (এন্টি-নিউট্রিনো) বোঝানো হয়েছে, এটি চার্জহীন এবং এর ভর খুবই কম।

নিউক্লিয়াসের ভেতরে থেকে যখন আলফা কণা বের হয় সেটা একটি নির্দিষ্ট শক্তি নিয়ে বের হয় কিন্তু বিটা কণার জন্য সেটি সত্যি নয়। বিকিরণের মোট শক্তির কতটুকু নিউট্রিনো নিয়ে নেবে তার ওপর বিটা কণার শক্তি নির্ভর করে।

বিটা কণা যেহেতু ইলেকট্রন তাই তার চার্জ নেগেটিভ (ঋণাত্মক আধান) এবং সে কারণে সেটি ইলেকট্রিক এবং চৌম্বকীয় ক্ষেত্র দিয়ে প্রভাবিত করা যায়। এটি যখন কোনো পদার্থের ভেতর দিয়ে যায় তখন সেই পদার্থের অণু-পরমাণুর সাথে সংঘর্ষের কারণে সেগুলোকে আয়নিত করতে পারে। আলফা কণার হিলিয়াম নিউক্লিয়াসের তুলনায় ইলেকট্রন খুবই ক্ষুদ্র তাই ইলেকট্রনের ভেদনক্ষমতা অনেক বেশি এবং সেটি পদার্থের অনেক ভেতর ঢুকে যেতে পারে। কয়েক মিলিমিটার পুরু অ্যালুমিনিয়ামের পাত দিয়ে একটি সাধারণ বিটা কণাকে থামানো সম্ভব।

বিটা কণার বিকিরণ হলে নিউক্লিয়াসে একটি নিউট্রন কমে গিয়ে একটি প্রোটন বেড়ে যায়, তাই তার নিউক্লিওন সংখ্যা সমান থাকে। কিন্তু যেহেতু পারমাণবিক সংখ্যা প্রোটনের সংখ্যার ওপর নির্ভর করে তাই নিউক্লিয়াসের পারমাণবিক সংখ্যা বেড়ে ভিন্ন মৌলের নিউক্লিয়াসে পরিণত হয়। যেমন তেজস্ক্রিয় C_{14} বিটা বিকিরণে N_{14} এ পরিবর্তিত হয়:

$$C_{14} \rightarrow N_{14} + e + \bar{\nu}$$ (এন্টি-নিউট্রিনো)

মজার ব্যাপার হচ্ছে, বিটা বিকিরণ বলতে আমরা যে শুধু নিউক্লিয়াসের ভেতর থেকে ইলেকট্রনের বিকিরণ বোঝাই তা নয়, ইলেকট্রনের প্রতিপদার্থ পজিট্রনের বিকিরণকেও বিটা বিকিরণ বলে। তার জন্য নিউক্লিয়াসের ভেতরে কোনো একটি প্রোটনকে নিউট্রনে পরিবর্তিত হতে হয়:

$$p^{+} \rightarrow n^{0} + \bar{e}^{+} + \nu$$ (নিউট্রিনো)

এই প্রক্রিয়াতে নিউক্লিয়াসে প্রোটনের সংখ্যা এক কমে যায় বলে তার পারমাণবিক সংখ্যাও এক কমে ভিন্ন মৌলের নিউক্লিয়াসে পরিণত হয়। (এ বিক্রিয়াটি নিউক্লিয়াসের বাইরে হতে পারে না। কারণ নিউট্রনের ভর প্রোটনের চেয়ে বেশি।)

বিটা বিকিরণের সময় নিউট্রিনো কিংবা অ্যান্টি নিউট্রিনো বের হলেও আমরা সেগুলোকে তেজস্ক্রিয় রশ্মি হিসেবে বিবেচনা করিনি, কারণ এগুলো চার্জবিহীন এবং পদার্থের সাথে এদের বিক্রিয়া এত কম যে কয়েক আলোকবর্ষ দীর্ঘ সিসার পাত দিয়েও একটা নিউট্রিনোকে থামানো যায় না!

13.1.3 গামা রশ্মি (Gamma Ray)

গামা রশ্মি আসলে শক্তিশালী বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গ। কাজেই এর কোনো চার্জ নেই (আধানহীন), কিন্তু শক্তিশালী হওয়ার কারণে এর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য খুব কম (কম্পন অনেক বেশি)। শক্তি বেশি বা কম

হলেও এর বেগ সব সময়েই আলোর বেগের সমান। যখন কোনো নিউক্লিয়াস আলফা কণা কিংবা বিটা কণা বিকিরণ করে "উত্তেজিত" অবস্থায় থাকে তখন বাড়তি শক্তি গামা রশ্মি হিসেবে বের করে এটি নিরুত্তেজ হয়। গামা রশ্মি চার্জহীন এবং ভরহীন, তাই এর বিকিরণে নিউক্লিয়াসের পারমাণবিক সংখ্যা কিংবা নিউক্লিওন সংখ্যার কোনো পরিবর্তন হয় না।

গামা রশ্মির যেহেতু চার্জ নেই তাই এটাকে বিদ্যুৎ কিংবা চৌম্বক ক্ষেত্র দিয়ে প্রভাবিত করা যায় না। চার্জ না থাকার কারণে এটি অণু-পরমাণুকে সরাসরি আয়নিত করতে না পারলেও অন্যান্য প্রক্রিয়ায় সেই ইলেকট্রন অণু-পরমাণুকে আয়নিত করতে পারে এবং সেখান থেকে গামা রশ্মির অস্তিত্বও বোঝা যায়। আলফা কিংবা বিটা কণার সমান শক্তিসম্পন্ন গামা রশ্মিকে থামাতে কয়েক সেন্টিমিটার সিসার পুরু পাতের দরকার হয়।

13.1.4 অর্ধায়ু (Half Life)

একটি নির্দিষ্ট তেজস্ক্রিয় নিউক্লিয়াস ঠিক কোন মুহূর্তে বিকিরণ করবে সেটি বলা সম্ভব নয়, পদার্থবিজ্ঞান শুধু তার বিকিরণ করার সম্ভাবনাটি বলতে পারে। সে কারণে তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ বের করার জন্য "অর্ধায়ু" (Half Life) এর ধারণাটি ব্যবহার করা হয়। যে পরিমাণ সময়ের ভেতর অর্ধেক সংখ্যক নিউক্লিয়াসের বিকিরণ ঘটে সেটি হচ্ছে অর্ধায়ু। কাজেই যে নিউক্লিয়াসের তেজস্ক্রিতা যত বেশি তার অর্ধায়ু তত কম। স্থিতিশীল নিউক্লিয়াস, যার কোনো তেজস্ক্রিয়তা নেই তার অর্ধায়ুকে আমরা "অসীম" বলে বিবেচনা করতে পারি।

এখানে একটি বিষয় জেনে রাখা দরকার, তেজস্ক্রিয়তা নিউক্লিয়াসের ঘটনা, তাই তেজস্ক্রিয় রশ্মি বিকিরণ করে একটি নিউক্লিয়াস অন্য নিউক্লিয়াসে পরিবর্তিত হয়। ভিন্ন নিউক্লিয়াস চার্জহীন পরমাণু হওয়ার জন্য খুব সহজেই এক দুইটি বাড়তি ইলেকট্রন তার কাছাকাছি পরিবেশ থেকে নিতে পারে কিংবা ছেড়ে দিতে পারে। তার কারণ নিউক্লিয়াসের ভেতরকার নিউক্লিয়ার শক্তি অনেক বেশি হলেও পরমাণুর ইলেকট্রনের শক্তি সে তুলনায় খুবই কম।

উদাহরণ

প্রশ্ন: 1 kg ভরের একটি তেজস্ক্রিয় মৌলের অর্ধায়ু 100 বছর। 200 বছর পর তার ভর কত হবে?

উত্তর: তেজস্ক্রিয়তার কারণে সরাসরি ভরের পরিবর্তন হয় না। তেজস্ক্রিয় মৌলটির তিন-চতুর্থাংশ নিউক্লিয়াস তেজস্ক্রিয় কণা বের করবে মাত্র।

13.1.5 তেজস্ক্রিয়তার ব্যবহার

তেজস্ক্রিয়তার নানা ধরনের ব্যবহার আছে। খুব কম তেজস্ক্রিয়তার দ্রব্য শরীরের ভেতর ঢুকিয়ে বাইরের থেকে তার গতিবিধি দেখে শরীরের অনেক তথ্য জানা যায়। সাধারণত সে রকম তেজস্ক্রিয় হয় খুব কম অর্ধায়ু হয়তো কয়েক মিনিট, কাজেই ঘণ্টাখানেকের মাঝে ঐ পদার্থের সব তেজস্ক্রিয়তা শেষ হয়ে যায়।

তেজস্ক্রিয়তার আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার হচ্ছে প্রাচীন জীবাশ্মের বয়স নির্ণয় করাতে। আমাদের শরীরে প্রচুর কার্বন রয়েছে এবং তার ভেতরে নির্দিষ্ট পরিমাণ C_{14} আছে। যখন প্রাণী মারা যায় তখন তার শরীরে নতুন করে C_{14} ঢুকতে পারে না। আগে যতটুকু ছিল সেটা তখন অর্ধায়ুর কারণে কমতে থাকে। কাজেই কতটুকু C_{14} থাকা স্বাভাবিক এবং কতটুকু কমে গেছে সেটা থেকে সেই প্রাণী কত প্রাচীন তা নিখুঁতভাবে বের করা যায়।

তেজস্ক্রিয় কণা শরীরের কোষের ক্ষতি করতে পারে, সে জন্য নানা ধরনের সতর্কতা অবলম্বন করা হয়, আবার শরীরের ক্ষতিকর কোষ ধ্বংস করার জন্য এই তেজস্ক্রিয়তা ব্যবহার করা যায়। সে কারণে ক্যান্সার চিকিৎসায় ক্যান্সার কোষ ধ্বংস করার জন্য তেজস্ক্রিয় কণা ব্যবহার করা হয়।

এছাড়া যন্ত্রপাতি জীবাণুমুক্ত করতে, আগুনে ধোঁয়ার উপস্থিতি নির্ণয়ে কিংবা খনিজ পদার্থে বিভিন্ন ধাতুর পরিমাণ নির্ণয়ে তেজস্ক্রিয়তার ব্যবহার রয়েছে।

13.1.6 তেজস্ক্রিয়তা সম্পর্কে সচেতনতা

উচ্চমাত্রার তেজস্ক্রিয়তা আমাদের শরীরে নানা সমস্যার সৃষ্টি করে। যখন তেজস্ক্রিয়তা নিয়ে গবেষণা শুরু হয় তখন বিজ্ঞানীরা সেটি ভালো করে জানতেন না বলে তারা নিজেরা তেজস্ক্রিয়তার সংস্পর্শে এসে রোগাক্রান্ত হয়েছিলেন। দীর্ঘদিন তেজস্ক্রিয় মৌল নিয়ে কাজ করার কারণে মেরি কুরি লিউকেমিয়াতে মারা যান। তেজস্ক্রিয়তা মানুষের রোগ প্রতিরোধক্ষমতা কমিয়ে দেয়, এমনকি বংশ পরম্পরায় বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম দিতে পারে।

চিত্র 13.02: তেজস্ক্রিয় পদার্থ ঝুঁকিপূর্ণ বলে এগুলোকে খুব সতর্কতার সাথে ব্যবহার করতে হয়।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা খুব বেশি তেজস্ক্রিয়তার মুখোমুখি হই না কিন্তু পৃথিবীর নতুন প্রযুক্তির কারণে এখন অনেকেই তেজস্ক্রিয়তার মুখোমুখি হতে শুরু করেছে। নিউক্লিয়ার শক্তি কেন্দ্রে নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া করানো হয়,

সেখানে ভয়ংকর রকম তেজস্ক্রিয়তা তৈরি হয়। অনেকগুলো বর্জ্য পদার্থের অর্ধায়ু অনেক বেশি এবং লক্ষ বছর পর্যন্ত সেগুলো তেজস্ক্রিয় থাকে। নিউক্লিয়ার শক্তি কেন্দ্রের দুর্ঘটনায় বাইরে তেজস্ক্রিয় পদার্থ ছড়িয়ে পড়ার উদাহরণও আছে। নিউক্লিয়ার শক্তি দিয়ে চালানো জাহাজ, সাবমেরিন দুর্ঘটনাতেও অনেক মানুষ তেজস্ক্রিয়তার মুখোমুখি হয়েছে। সবচেয়ে ভয়ংকর ব্যাপার ঘটেছিল যখন হিরোশিমা এবং নাগাসাকিতে নিউক্লিয়ার বোমা ফেলা হয়েছিল, তখন অসংখ্য মানুষ তেজস্ক্রিয়তার মুখোমুখি হয়েছিল। কাজেই তেজস্ক্রিয়তা নিয়ে নানা ধরনের গবেষণা শুরু হয়েছে এবং নিরাপদ তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা ইত্যাদি নির্ধারণ করা শুরু হয়েছে। একই সাথে কোথাও তেজস্ক্রিয় পদার্থ থাকলে সেটি সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সতর্ক করানো শুরু হয়েছে (চিত্র 13.02)।

13.2 ইলেকট্রনিকসের ক্রমবিকাশ (Development of Electronics)

আমাদের বর্তমান সভ্যতাটির পেছনে সবচেয়ে বড় অবদান রেখেছে ইলেকট্রনিকস, এটি মোটেও একটি অত্যুক্তি নয়। ইলেকট্রনিকসের ক্রমবিকাশকে আমরা মোটামুটি তিনটি অংশে ভাগ করতে পারব: ভ্যাকুয়াম টিউব, ট্রানজিস্টর এবং ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট।

13.2.1 ভ্যাকুয়াম টিউব

1883 সালে এডিসন দেখেছিলেন লাইট বাল্বের ভেতরে ফিলামেন্ট থেকে অন্য একটি ধাতব প্লেটে ফাঁকা জায়গা দিয়েও বিদ্যুৎ পরিবহন হতে পারে। এই প্রক্রিয়াটি এডিসন ক্রিয়া (Edison Effect) নামে পরিচিত। 1904 সালে জন ফ্লেমিং এডিসন ক্রিয়াকে কাজে লাগিয়ে প্রথম দুই ইলেকট্রোডের একটি ভ্যাকুয়াম টিউব তৈরি করেন যেটি রেকটিফায়ার হিসেবে কাজ করত অর্থাৎ পরিবর্তনশীল বিদ্যুৎপ্রবাহকে একদিকে প্রবাহিত করত। এই ভ্যাকুয়াম টিউবটিকে ইলেকট্রনিকসের শুরু হিসেবে বিবেচনা করা যায়। এই সময় রেডিও তরঙ্গ দিয়ে তথ্য আদান-প্রদানের কাজ শুরু হয়েছিল এবং গুগলিয়েলমো মার্কনির রেডিও তরঙ্গ নিয়ন্ত্রণের জন্য এই ধরনের একটি ভ্যাকুয়াম টিউবের খুব প্রয়োজন ছিল। (এখানে উল্লেখ্য যে রেডিওর আবিষ্কার হিসেবে এতদিন শুধু মার্কনির নাম উল্লেখ করা হলেও সাম্প্রতিক কালে বাঙালি বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর অবদানকেও স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে।)

1906 সালে লি দ্য ফরেস্ট তৃতীয় একটি ইলেকট্রোড সংযোজন করে নতুন আরেকটি ভ্যাকুয়াম টিউব তৈরি করেন এবং সেটি ট্রায়োড নামে পরিচিতি লাভ করে। ট্রায়োড দিয়ে বৈদ্যুতিক প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করা যেত এবং সেটি অ্যামপ্লিফায়ার হিসেবে কাজ করতে পারত।

চিত্র 13.03: কয়েক ধরনের ভ্যাকুয়াম টিউব।

প্রথমে মোর্সকোড দিয়ে টেলিগ্রাফ যোগাযোগ পরে টেলিফোনের মাধ্যমে কণ্ঠস্বর আদান-প্রদান করার জন্য ভ্যাকুয়াম টিউবের উন্নতি হতে থাকে (চিত্র 13.03)। প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যুদ্ধে ব্যবহারের জন্য রাডার, যুদ্ধাস্ত্র নিয়ন্ত্রণ, নেভিগেশন ইত্যাদি কাজের জন্য বিভিন্ন ধরনের বিশেষায়িত ভ্যাকুয়াম টিউব ব্যবহার হতে থাকে। 1946 সালে 1800 ভ্যাকুয়াম টিউব ব্যবহার করে ENIAC নামে প্রথম কম্পিউটার তৈরি করা হয়।

13.2.2 ট্রানজিস্টর

1947 সালে বেল ল্যাবরেটরিতে প্রথম ট্রানজিস্টর তৈরি করা হয় এবং এই আবিষ্কারের জন্য জন বারডিন, ওয়াল্টার ব্রাটেইন এবং উইলিয়াম শকলিকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। এই ট্রানজিস্টর কত দ্রুত এবং কত ব্যাপকভাবে পুরো পৃথিবীকে পাল্টে দেবে সেটি তখনো কেউ অনুমান করতে পারেনি।

ট্রানজিস্টর ভ্যাকুয়াম টিউবের মতোই কাজ করতে পারে কিন্তু ভ্যাকুয়াম টিউবের তুলনায় এটি অতি ক্ষুদ্র, ওজন খুবই কম, এটি ব্যবহার করতে খুব অল্প বিদ্যুতের প্রয়োজন হয়, এটি অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য এবং সবচেয়ে বড় কথা এটি অনেক কম খরচে তৈরি করা সম্ভব। কাজেই ট্রানজিস্টর খুব দ্রুত ভ্যাকুয়াম টিউবকে সরিয়ে তার স্থান দখল করে নিতে শুরু করল এবং পৃথিবীর মানুষ স্বল্প মূল্যে ট্রানজিস্টর ব্যবহার করে তৈরি নানা ধরনের ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি পেতে শুরু করল।

13.2.3 ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট

1952 এর দিকেই ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট সম্পর্কে আলোচনা শুরু হলেও সত্যিকারের ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট তৈরি করা শুরু হয় ষাটের দশকে। পঞ্চাশের দশকে একটি সিলিকনের পাতলা প্লেটে (Wafer)

অসংখ্য ট্রানজিস্টর তৈরি করে সেগুলো কেটে আলাদা করে নেওয়া হতো। ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট তৈরি করার সময় এই প্রক্রিয়াটিকে আর একটুখানি এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়েছিল। তখন শুধু ট্রানজিস্টর তৈরি না করে তার সাথে ডায়োড কিংবা রেজিস্টর এবং ক্যাপাসিটর বসিয়ে পূর্ণাঙ্গ একটি সার্কিট তৈরি করা শুরু হয়। এর নাম দেওয়া হলো ইন্টিগ্রেডেট সার্কিট (আইসি IC) বা সমন্বিত বর্তনী। প্রযুক্তির উন্নতির সাথে সাথে অল্প জায়গায় অনেক বেশি ট্রানজিস্টর বসানো শুরু হলো এবং তার নাম দেওয়া হলো প্রথমে লার্জ স্কেল ইন্টিগ্রেশন (LSI), পরে ভেরি লার্জ স্কেল ইন্ট্রেগ্রেশন (VLSI)। এই সার্কিটগুলো ব্যবহারের উপযোগী করে প্যাকেজ করা হতো যেন সরাসরি সার্কিট বোর্ডে ব্যবহার করা যায়। মাইক্রোকম্পিউটার, চিকিৎসার যন্ত্রপাতি, ভিডিও ক্যামেরা এবং যোগাযোগের উপগ্রহ এই ধরনের অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট ছাড়া কোনো দিনই সম্ভব হতো না।

13.2.4 ভবিষ্যতের ইলেকট্রনিকস

ইলেকট্রনিকসের প্রযুক্তি এখনো এগিয়ে যাচ্ছে এবং আমরা ভবিষ্যতে ইলেকট্রনিকস সার্কিটে অপটিকস বা আলোর সাহায্যে তথ্য বিনিময়সংক্রান্ত আইসি দেখতে পাব। একই সাথে প্রোগ্রাম করে নিজের প্রয়োজনমতো সার্কিট তৈরি করার আইসি (FPGA: Field Programmable Gate Array) আরো বেশি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে দেখব।

13.3 অ্যানালগ ও ডিজিটাল ইলেকট্রনিকস (Analog and Digital Electronics)

আমাদের চারপাশে প্রতিমুহূর্তে যা ঘটেছে, যেমন শব্দ, আলো চাপ তাপমাত্রা বা অন্য কিছু—সেগুলোকে আমরা কোনো এক ধরনের তথ্য বা উপাত্ত হিসেবে প্রকাশ করি। তাদের মান নিরবচ্ছিন্নভাবে পরিবর্তিত হতে পারে। আমাদের নানা কাজে সেই মানের প্রয়োজন হতে পারে তাই সেই মান আমরা সংরক্ষণ করি, বিশ্লেষণ করি কিংবা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় প্রেরণ করি। উপাত্ত প্রক্রিয়া করার জন্য আমরা ইলেকট্রনিকস ব্যবহার করতে পারি। নিরবচ্ছিন্নভাবে পরিবর্তিত হতে থাকা এই তথ্য বা উপাত্তকে বৈদ্যুতিক সিগন্যালে পরিবর্তন করা সম্ভব এবং এই ধরনের সিগন্যালকে আমরা বলি অ্যানালগ সিগন্যাল। এই অ্যানালগ সিগন্যালকে যদি সরাসরি কোনো এক ধরনের ইলেকট্রনিকস দিয়ে আমরা প্রক্রিয়া করি তাহলে সেটাকে বলা হয় অ্যানালগ ইলেকট্রনিকস।

নিরবচ্ছিন্নভাবে পরিবর্তিত হতে থাকা তথ্য বা উপাত্তের এই সিগন্যালকে সম্পূর্ণ অন্যভাবে প্রক্রিয়া করা সম্ভব। সেটি করার জন্য একটু পরপর তার মানটি কত বের করে সেটিকে কোনো এক ধরনের সংখ্যায় প্রকাশ করে নিতে হয়। তারপর ধারাবাহিকভাবে এই সংখ্যাটির মানকে সংরক্ষণ করতে হয়।

আমরা তখন আমাদের প্রয়োজনমতো এই সংখ্যাগুলো ইলেকট্রনিকস ব্যবহার করে প্রক্রিয়া করতে পারব। যখন আবার সেটিকে তার মূল অ্যানালগ সিগন্যালে পরিবর্তন করতে হয় তখন ধারাবাহিকভাবে সংরক্ষিত মানের সমান বৈদ্যুতিক সিগন্যাল তৈরি করে নিতে হয়।

আমরা দৈনন্দিন জীবনে দশভিত্তিক দশমিক (Decimal) সংখ্যা ব্যবহার করি। কিন্তু ইলেকট্রনিকসে সংখ্যা প্রকাশ করা হয় বাইনারি সংখ্যা দিয়ে, কারণ তাহলে খুব সহজেই কোনো একটি ভোল্টেজকে 1 এবং শূন্য ভোল্টেজকে 0 ধরে প্রক্রিয়া করা যায়। সিগন্যালের মানকে সংখ্যা বা ডিজিটে প্রকাশ করে ইলেকট্রনিকস করা হয় বলে এই ধরনের ইলেকট্রনিকসকে বলা হয় ডিজিটাল ইলেকট্রনিকস (চিত্র 13.04)।

ইলেকট্রনিকসের সবচেয়ে বড় অবদান কম্পিউটার। কম্পিউটারে সকল তথ্যের আদান-প্রদান বা তথ্য প্রক্রিয়া হয় ডিজিটাল ইলেকট্রনিকস দিয়ে। ইন্টারনেট বা কম্পিউটার নেটওয়ার্কেও ডিজিটাল ইলেকট্রনিকস ব্যবহার করে তথ্য আদান-প্রদান করা হয়। শব্দ ছবি বা ভিডিও ইত্যাদি সিগন্যাল শুরু হয় অ্যানালগ সিগন্যাল হিসেবে এবং ব্যবহারও হয় অ্যানালগ সিগন্যাল হিসেবে কিন্তু সেগুলো ডিজিটাল সিগন্যাল হিসেবে সংরক্ষণ প্রক্রিয়াকরণ বা প্রেরণ করা হয়। অ্যানালগ সিগন্যালে খুব সহজেই নয়েজ (Noise) প্রবেশ করে সিগন্যালের গুণগত মান নষ্ট করতে পারে। একবার সেটি ডিজিটাল সিগন্যালে পরিবর্তিত করে নিলে সেখানে Noise এত সহজে অনুপ্রবেশ করতে পারে না। কাজেই সিগন্যালের গুণগত মান অবিকৃত থাকে।

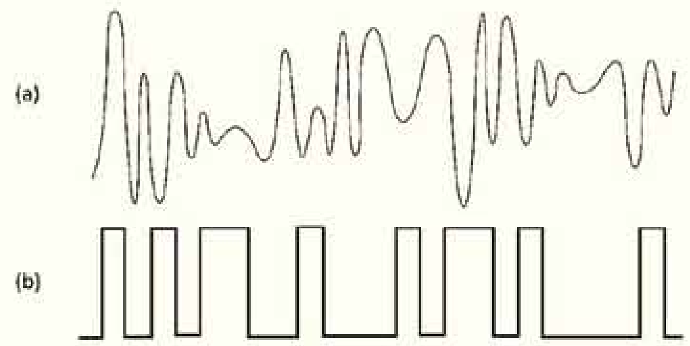

চিত্র 13.04: (a) অ্যানালগ এবং (b) ডিজিটাল সিগন্যাল।

ডিজিটাল সিগন্যাল প্রক্রিয়া করার জন্য বিশেষ ধরনের আইসি তৈরি করা হয়। এই আইসিগুলো ধীরে ধীরে অনেক ক্ষমতাশালী হয়ে উঠছে। অর্থাৎ অনেক কম সময়ে নির্ভুলভাবে অনেক বেশি পরিমাণ ডিজিটাল সিগন্যালে প্রক্রিয়া করতে পারে। কাজেই যতই দিন যাচ্ছে ডিজিটাল প্রক্রিয়া করার বিষয়টি

ততই সহজ হয়ে যাচ্ছে এবং এটি বলা বাহুল্য নয় যে আমাদের চারপাশের জগৎটি একটি ডিজিটাল জগতে রূপান্তরিত হচ্ছে।

13.4 সেমিকন্ডাক্টর (Semiconductor)

আধুনিক জগৎ এবং আধুনিক সভ্যতা পুরোটাই ইলেকট্রনিকসের উপরে গড়ে উঠেছে এবং এই ইলেকট্রনিকসের জন্য আমরা যদি কোনো এক ধরনের পদার্থের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই তাহলে সেই পদার্থটি হবে অর্ধপরিবাহী বা সেমিকন্ডাক্টর। আমরা এর আগেও পরিবাহী এবং

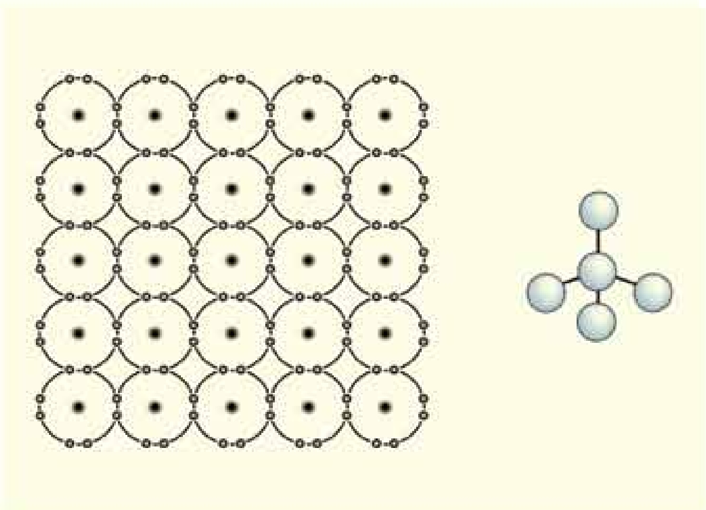

চিত্র 13.05: সিলিকন ক্রিস্টাল। ডান দিকে সিলিকন ক্রিস্টালের ত্রিমাত্রিক রূপ।

অপরিবাহী এবং অর্ধপরিবাহী বা সেমিকন্ডাক্টরের নামটি উচ্চারণ করেছি, এখন ব্যাপারটার একটুখানি গভীরে যেতে পারি।

13.05 চিত্রে সেমিকন্ডাক্টরের অনেকগুলো পরমাণুকে পাশাপাশি দেখানো হয়েছে। পরমাণুর গঠনের কারণে তাদের শেষ কক্ষপথে যদি আটটি ইলেকট্রন থাকে তাহলে সেটি কোনো এক অর্থে পরিপূর্ণ হয় এবং অনেক স্থিতিশীল হয়। পরমাণুগুলো সব সময়ই চেষ্টা করে তাদের শেষ কক্ষপথে আটটি ইলেকট্রন রাখতে। সিলিকন হচ্ছে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত সেমিকন্ডাক্টর, তার শেষ কক্ষপথে ইলেকট্রনের সংখ্যা চার, কিন্তু যখন আমরা সিলিকন ক্রিস্টালের দিকে তাকাই তখন অবাক হয়ে আবিষ্কার করি প্রত্যেকটি পরমাণুই ভাবছে তার শেষ কক্ষপথে আটটা ইলেকট্রন! এটা ঘটেছে কারণ প্রত্যেকটা পরমাণুই চারদিকে ভিন্ন চারটা পরমাণুর সাথে যুক্ত এবং সবাই নিজের ইলেকট্রনগুলো

পাশের পরমাণুর সাথে ভাগাভাগি করে ব্যবহার করছে। (আমরা চিত্রটি এঁকেছি এক সমতলে, সত্যিকার সিলিকন পরমাণুগুলো ত্রিমাত্রিক, চিত্রের ডানপাশে যে রকম দেখানো হয়েছে। প্রত্যেকটা পরমাণুই আসলে অন্য চারটি পরমাণুকে স্পর্শ করে থাকে।)

এমনিতে সেমিকন্ডাক্টরে ইলেকট্রনগুলো পরমাণুর সাথে আটকে থাকে, তাপমাত্রা বাড়ালে হয়তো একটা দুটো ইলেকট্রন মুক্ত হতে পারে। পরিবাহক মুক্ত ইলেকট্রন থাকে তাই তখন সেমিকন্ডাক্টরটা খানিকটা পরিবাহকের মতো কাজ করতে পারে। পদার্থবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গিতে এটা চমৎকার একটা ব্যাপার, কিন্তু ব্যবহারের জন্য এটা ততটা উপযোগী না। এটাকে সত্যিকার অর্থে ব্যবহার করার জন্য খুবই মজার একটা কাজ করা হয়। সিলিকন ক্রিস্টালের সাথে এমন একটা পরমাণু (যেমন ফসফরাস) মিশিয়ে দেওয়া হয় যার শেষ কক্ষপথে থাকে পাঁচটি ইলেকট্রন। তখন আমরা হঠাৎ করেই আবিষ্কার করি যেহেতু প্রত্যেকটা পরমাণু অন্য পরমাণুর সাথে নিজের ইলেকট্রন ভাগাভাগি করে একটা শৃঙ্খলার মাঝে আছে এবং ফসফরাসের এই পঞ্চম ইলেকট্রনটি বাড়তি একটা ইলেকট্রন, কোনো পরমাণুরই তার প্রয়োজন নেই, তাই সেসব পরমাণুর মাঝেই প্রায় মুক্তভাবে ঘোরাঘুরি করতে পারে। এটাকে ফসফরাসের পরমাণুর মাঝে থাকতে হবে এমন কোনো কথা নেই। ফসফরাসকে পজিটিভ আয়ন বানিয়ে এই ইলেকট্রনটি মুক্ত ইলেকট্রনের মতো ব্যবহার করে। বলা যেতে পারে ফসফরাস মেশানো এ রকম সেমিকন্ডাক্টর অনেকটাই পরিবাহী, কারণ চার্জ পরিবহনের জন্য এখানে কিছু মুক্ত ইলেকট্রন থাকে। ফসফরাসের মতো শেষ কক্ষপথে পঞ্চম ইলেকট্রনসহ পরমাণুর যোগ করে সেমিকন্ডাক্টরকে মোটামুটি পরিবাহক তৈরি করে ফেলা এই সেমিকন্ডাক্টরকে বলে n ধরনের সেমিকন্ডাক্টর।

এবারে তোমরা আরো চমকপ্রদ একটা বিষয় শোনার জন্য প্রস্তুত হও। শেষ কক্ষপথে বাড়তি পঞ্চম ইলেকট্রন এমন পরমাণু না দিয়ে যদি আমরা উল্টো কাজটি করি, শেষ কক্ষপথে একটি কম অর্থাৎ তিনটি ইলেকট্রন (বোরন) দেওয়া কিছু পরমাণু মিশিয়ে দেওয়া হয় তাহলে কী হবে? অবশ্যই বোঝা যাচ্ছে বোরনের পরমাণুর কক্ষপথে একটা জায়গায় ইলেকট্রনের জন্য একটা ফাঁকা জায়গা থাকবে এবং পরমাণুটি সেই ফাঁকা জায়গাটা পাশের একটা ইলেকট্রন এসে ভরাট করে ফেলতে পারে। তখন পাশের পরমাণুতে একটা ফাঁকা জায়গা হয়ে যাবে, সেই ফাঁকা জায়গাটি আবার তার পাশের পরমাণুর একটা ইলেকট্রন এসে ভরাট করে ফেলতে পারে, তখন সেখানে একটা ফাঁকা জায়গা হবে। অন্যভাবে বলা যায় আমাদের কাছে মনে হবে একটা ইলেকট্রনের অভাবযুক্ত একটা ফাঁকা জায়গা বুঝি পরমাণু থেকে পরমাণুতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মনে হতে পারে এটা বুঝি আসলে এক ধরনের কণা এবং তার চার্জ বুঝি পজিটিভ। এটাকে বলা হয় হোল (Hole)। অর্থাৎ আমরা বলতেই পারি বোরন পরমাণুকে নেগেটিভ আয়ন হিসেবে রেখে তার হোলটি সিলিকন ক্রিস্টালের ভেতর ঘুরে বেড়াতে পারে। অর্থাৎ এই সেমিকন্ডাক্টরটি প্রায় পরিবাহক হিসেবে কাজ করে এবং তার ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ পরিবহন করে

পজিটিভ চার্জযুক্ত হোল! শেষ কক্ষপথে তিনটি ইলেকট্রন যুক্ত পরমাণু মিশিয়ে একটা সেমিকন্ডাক্টরকে যখন পরিবাহক করে ফেলা হয় তখন তাকে বলে p ধরনের সেমিকন্ডাক্টর।

এমনিতে আলাদাভাবে n ধরনের এবং p ধরনের সেমিকন্ডাক্টরের তেমন ব্যবহার ছিল না কিন্তু যখন n এবং p ধরনের সেমিকন্ডাক্টর একটার সাথে আরেকটা যুক্ত করা হলো তখন বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির জগতের সবচেয়ে বড় অগ্রগতির সূচনা হয়েছিল।

13.4.1 ডায়োড (Diode)

13.06 চিত্রে দেখানো হয়েছে একটা p ধরনের সেমিকন্ডাক্টর n ধরনের সেমিকন্ডাক্টরের সাথে যুক্ত করে তার সাথে একটা ব্যাটারি এমনভাবে যুক্ত করা হয়েছে, যেন ব্যাটারির পজিটিভ অংশটি যুক্ত

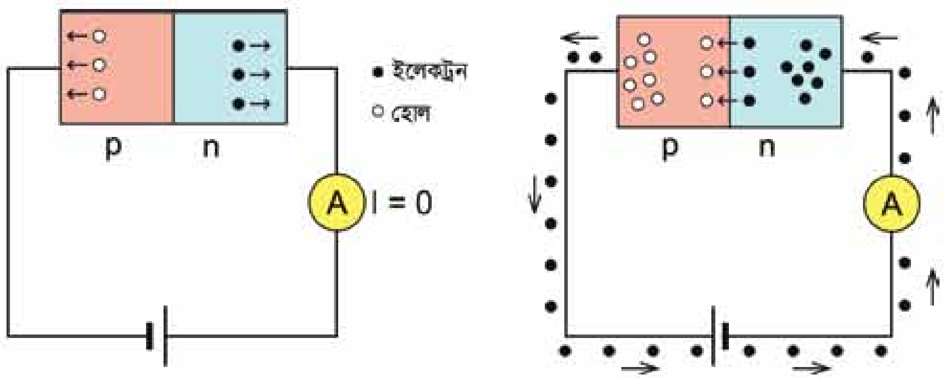

চিত্র 13.06: n এবং p যুক্ত করে তৈরি করা ডায়োড। ব্যাটারি সেলের এক সংযোগে কোনো বিদ্যুৎ প্রবাহ হয় না, অন্য সংযোগে বিদ্যুৎ প্রবাহ হয়।

হয়েছে n এর সাথে এবং নেগেটিভ অংশটি যুক্ত হয়েছে p এর সাথে। আমরা জেনেছি n ধরনের সেমিকন্ডাক্টরে বিদ্যুৎ পরিবহনের জন্য ইলেকট্রন থাকে, কাজেই ব্যাটারি সেলের পজিটিভ প্রান্ত খুব দ্রুত এই ইলেকট্রনগুলোকে নিজের কাছে টেনে নেবে। কাজেই n টাইপ সেমিকন্ডাক্টরে বিদ্যুৎ প্রবাহের জন্য কোনো ইলেকট্রন থাকবে না। এটা হয়ে যাবে বিদ্যুৎ অপরিবাহী। ঠিক একইভাবে ব্যাটারির নেগেটিভ প্রান্ত থেকে ইলেকট্রন হাজির হবে p টাইপ সেমিকন্ডাক্টরে এবং সবগুলো হোল একটা একটা ইলেকট্রন নিয়ে ভরাট হয়ে যাবে, কাজেই খুব দ্রুত দেখা যাবে বিদ্যুৎ প্রবাহ করার জন্য একটি হোলও অবশিষ্ট নেই, অর্থাৎ এই p সেমিকন্ডাক্টরটিও বিদ্যুৎ অপরিবাহী হয়ে যাবে। কাজেই ব্যাটারির সাথে এই np সেমিকন্ডাক্টরটি যুক্ত করা হলে এর ভেতর দিয়ে কোনো বিদ্যুৎই পরিবাহিত হবে না।

এবারে যদি np সেমিকন্ডাক্টরটিতে ব্যাটারি সেলের উল্টো সংযোগ দেওয়া হয় তাহলে কী হবে? অর্থাৎ ব্যাটারির পজিটিভ অংশে লাগানো হলো p ধরনের সেমিকন্ডাক্টরে এবং নেগেটিভ প্রান্ত লাগানো হলো n ধরনের সেমিকন্ডাক্টরে। এবারে ব্যাটারির নেগেটিভ প্রান্ত থেকে ইলেকট্রন ঢুকে যাবে n টাইপ

সেমিকন্ডাক্টরে এবং ইলেকট্রনগুলোকে np জাংশনের দিকে ঠেলে দেবে। ঠিক তেমনিভাবে ব্যাটারির পজিটিভ প্রান্ত p টাইপ সেমিকন্ডাক্টর থেকে ইলেকট্রন টেনে নিয়ে নতুন হোল তৈরি করতে থাকবে এবং সেই হোলগুলো ছুটে যাবে pn জাংশনের দিকে। সেখানে ইলেট্রনগুলো হোলগুলোকে ভরাট করতে থাকবে। ব্যাপারটা চলতেই থাকবে এবং কেউ যদি ব্যাটারির তারগুলোর দিকে তাকায় তাহলে দেখবে ব্যাটারির নেগেটিভ প্রান্ত থেকে ইলেকট্রন যাচ্ছে n এর দিকে এবং p থেকে ইলেকট্রন বের হয়ে ফিরে আসছে ব্যাটারির পজিটিভ প্রান্তে। সেটা চলতেই থাকবে এবং আমরা দেখব এই জাংশনের ভেতর দিয়ে চমৎকারভাবে বিদ্যুৎ প্রবাহ হচ্ছে। p এবং n ধরনের সেমিকন্ডাক্টর তৈরি এই জাংশনকে বলে ডায়োড। ডায়োড এমন একটি ইলেকট্রনিকস ডিভাইস, যেখানে ব্যাটারির এক ধরনের সংযোগে বিদ্যুৎ প্রবাহ হয় উল্টো সংযোগে হয় না।

ডায়োডের ব্যবহারের কোনো শেষ নেই। সাধারণ ডায়োড তো আছেই, সত্যি বলতে কি তোমরা সব সময় যে লাল নীল সবুজ হলুদ ছোট ছোট আলো দেখো সেগুলো সব LED বা Light Emitting Diode। ডায়োডের আরো একটা মজার ব্যবহার হচ্ছে AC থেকে DC তৈরি করা। ডায়োড ব্যবহার

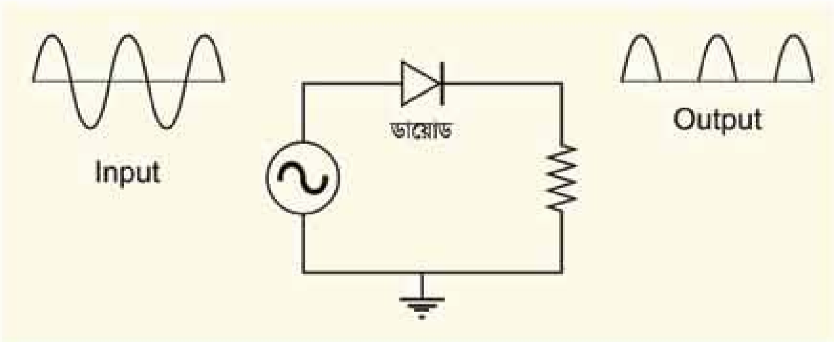

চিত্র 13.07: ডায়োড ব্যবহার করে এসি সিগন্যালের নেগেটিভ অংশ অপসারণ করে ফেলা যায়।

করে এসি সিগন্যালের নেগেটিভ অংশ অপসারণ করে ফেলা যায়। 13.07 চিত্রে দেখানো উপায়ে আমরা যদি ডায়োডের ভেতর AC ভোল্টেজ দিই অন্য পাশে নেগেটিভ অংশটুকু কেটে শুধু পজিটিভ অংশটুকু বের হয়ে আসবে।

13.4.2 ট্রানজিস্টর (Transistor)

যারা বিজ্ঞানের ইতিহাস জানে তাদেরকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় প্রযুক্তির সবচেয়ে বড় আবিষ্কার কী, সম্ভবত তারা ট্রানজিস্টরের কথা বলবে। ট্রানজিস্টর p এবং n ধরনের সেমিকন্ডাক্টর দিয়ে তৈরি এক ধরনের ডিভাইস, যেটি তার ভেতর দিয়ে বিদ্যুতের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। npn এবং pnp দুই ধরনের ট্রানজিস্টর আছে। ছবিতে তোমাদের npn ধরনের ট্রানজিস্টর দেখানো হয়েছে। এটাকে

অনেকটা পানির ট্যাপের সাথে তুলনা করা যায়, পানির ট্যাপ খুললে পানির প্রবাহ শুরু হয় আবার ট্যাপটি বন্ধ করলে পানির প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। npn ট্রানজিস্টরের যে দিক দিয়ে কারেন্ট ঢোকে তার নাম কালেক্টর এবং যেদিক দিয়ে কারেন্ট বের হয় তার নাম অ্যামিটার (Emitter)। মাঝখানে রয়েছে বেস, এই বেসটি পানির ট্যাপের মতো। এই বেসে অল্প একটু কারেন্ট দিলেই যেন ট্যাপটি খুলে যায় অর্থাৎ অনেক বিদ্যুতের প্রবাহ হতে থাকে। আবার এই অল্প কারেন্ট বন্ধ করে দিলেই বিদ্যুতের প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায় (চিত্র 13.08)।

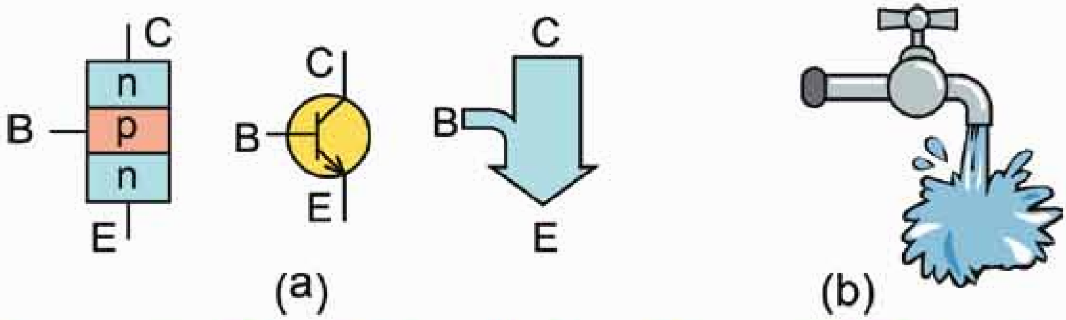

চিত্র 13.08: (a) একটি npn ট্রানজিস্টরের গঠন, প্রতীক এবং বিদ্যুৎ প্রবাহ (b) ট্রানজিস্টরকে পানির ট্যাপের সাথে তুলনা করা যায়, একটুখানি ট্যাপ খুলে অনেকখানি পানি পাওয়া যায়, সেরকম একটুখানি বেস কারেন্ট দিয়ে অনেক খানি কালেক্টর-অ্যামিটার কারেন্ট পাওয়া যায়।

এই ট্রানজিস্টর দিয়ে অসংখ্য ইলেকট্রনিকস যন্ত্রপাতি তৈরি করা হয়। ছোট সিগন্যালকে বড় করার জন্য ট্রানজিস্টর ব্যবহার করা হয়, যেটাকে আমরা বলি অ্যামপ্লিফায়ার। নানা ধরনের সিগন্যালকে প্রক্রিয়া করার জন্যও ট্রানজিস্টর ব্যবহার করা হয়।

ট্রানজিস্টর রেজিস্টর, ক্যাপাসিটর, ডায়োড ইত্যাদি ব্যবহার করে অনেক প্রয়োজনীয় সার্কিট তৈরি করা হয়। ধীরে ধীরে প্রযুক্তির উন্নতি হতে থাকে এবং এই ধরনের নানা কিছু ব্যবহার করে তৈরি করা আস্ত একটি সার্কিট ছোট একটা জায়গার মাঝে ঢুকিয়ে দেওয়া শুরু হলো এবং তার নাম দেওয়া হলো ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট। একটা ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট হয়তো একটা নখের সমান। তার ভেতরে প্রথমে হাজার হাজার ট্রানজিস্টর দিয়ে তৈরি সার্কিট ঢোকানো শুরু হয় এবং দেখতে দেখতে একটা আইসির ভেতর বিলিয়ন ট্রানজিস্টর পর্যন্ত বসানো সম্ভব হয়ে উঠতে থাকে। তোমরা এর মাঝে জেনে গেছো যে একটি ছোট চিপের ভেতর বিলিয়ন ট্রানজিস্টর ঢোকানোর এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় VLSI বা Very Large Scale Integration. এই প্রক্রিয়াটি এখনো থেমে নেই এবং চিপের ভেতর আরো ট্রানজিস্টর ঢুকিয়ে আরো জটিল সার্কিট তৈরি করার প্রক্রিয়া এখনো চলছে।

একটি ছোট চিপের ভেতর বিলিয়ন ট্রানজিস্টর ঢুকিয়ে অত্যন্ত জটিল সার্কিট তৈরি করার কারণে আমরা কম্পিউটার, ল্যাপটপ, ক্যালকুলেটর, চমকপ্রদ মোবাইল টেলিফোন ইত্যাদি অসংখ্য নতুন নতুন ইলেকট্রনিকস যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে পারছি। একসময় ইলেকট্রনিকসের যে কাজটি করতে কয়েকটি ঘর কিংবা একটা আস্ত বিল্ডিংয়ের প্রয়োজন হতো এখন সেটা একটা ছোট চিপের ভেতর ঢুকিয়ে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে এবং সেগুলো দিয়ে তৈরি নানা ধরনের যন্ত্র আমরা এখন পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে পারি।

13.5 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT: Information and Communication Technology)

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এখন খুবই পরিচিত একটি বিষয়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ কাজ থেকে শুরু করে পেশাগত জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ এখন আমরা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে সহজেই করে ফেলতে পারি। ঊনবিংশ শতকে টেলিফোন ও টেলিগ্রাফের বিকাশ মানুষের যোগাযোগের ক্ষমতাকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। বিংশ শতাব্দীতে যোগাযোগের বিপ্লব এনেছে রেডিও, টেলিভিশন, সেলফোন বা ফ্যাক্স। সাম্প্রতিক কালে যোগাযোগের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছে কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট।

13.5.1 মাইক্রোফোন

কোনো সভা বা অনুষ্ঠানে বক্তারা যে ইলেকট্রনিকস ডিভাইসের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলেন তাকে মাইক্রোফোন বলে। মাইক্রোফোন বক্তার কণ্ঠস্বরকে বিদ্যুৎ সংকেত বা তড়িৎ সংকেতে রূপান্তর করে। সেই বিদ্যুৎ সংকেতকে অ্যামপ্লিফায়ার দিয়ে বাড়িয়ে দেওয়া হয় এবং স্পিকারে পাঠানো হয়। স্পিকার সেটাকে শব্দে রূপান্তর করে এবং শ্রোতারা লাউড স্পিকারে জোরে শুনতে পান। তোমরা যখন মোবাইল ফোন ব্যবহার করো তখন বাইরে থেকে দেখা না গেলেও তোমরা আসলে মোবাইল ফোনের মাইক্রোফোনে কথা বলো এবং সেটির স্পিকারে শুনতে পাও।

মাইক্রোফোনের কার্যক্রম

দৈনন্দিন কিংবা বিশেষ কাজে ব্যবহারের জন্য নানা ধরনের মাইক্রোফোন রয়েছে, ছবিতে সেরকম সাধারণ একটি মাইক্রোফোনের গঠন দেখানো হলো। এই মাইক্রোফোনের সামনে ধাতুর একটি পাতলা পাত বা ডায়াফ্রাম থাকে। ডায়াফ্রামের সাথে একটা চলকুণ্ডলী (Coil) লাগানো থাকে যেটি 13.09 চিত্রে দেখানো উপায়ে একটা চৌম্বকীয় ক্ষেত্রের ভেতর নড়াচড়া করতে পারে। যখন কেউ এই মাইক্রোফোনের সামনে কথা বলে তখন ডায়াফ্রামটি শব্দ তরঙ্গের কম্পনের সাথে কাঁপতে থাকে।

ডায়াফ্রামের সাথে লাগানো চলকুণ্ডলীটিও চৌম্বক ক্ষেত্রে সামনে-পেছনে নড়তে থাকে। চৌম্বক ক্ষেত্রে একটি চলকুণ্ডলী নাড়াচাড়া করলে সেখানে একটি বিদ্যুৎ শক্তির আবেশ হয়, কাজেই মাইক্রোফোনটি শব্দশক্তিটিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তর করে একটি বৈদ্যুতিক সিগন্যাল পাঠায়।

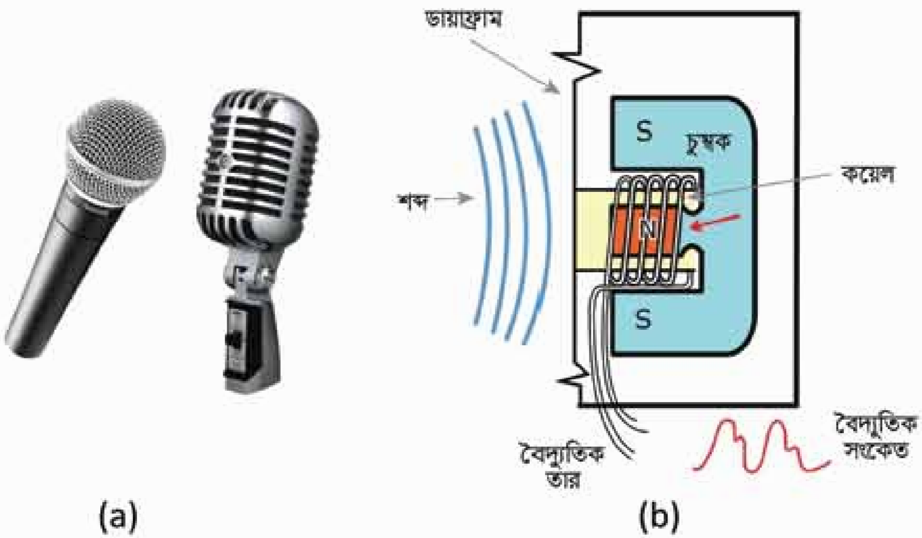

চিত্র 13.09: (a) মাইক্রোফোন এবং তার (b) গঠন।

শব্দের এই বৈদ্যুতিক সিগন্যাল শব্দের নিখুঁত উপস্থাপন হলেও এর মান খুবই কম থাকে, তাই তাকে ব্যবহার করার জন্য অ্যামপ্লিফায়ারে বাড়িয়ে নিতে হয়। তারপর সেটি শুধু স্পিকারে নয়, টেলিফোন লাইনে, রেডিও সম্প্রচারে বা রেকর্ডিংয়ে ব্যবহার করা যায়।

13.5.2 স্পিকার

স্পিকার মাইক্রোফোনের ঠিক বিপরীত কাজটি করে অর্থাৎ বিদ্যুৎ শক্তিটিকে শব্দে রূপান্তর করে। 13.10 চিত্রে একটি স্পিকারের গঠন দেখানো হলো, মাইক্রোফোনের ডায়াফ্রামের বদলে স্পিকারে চলকুণ্ডলী বা Coilটি কাগজ বা হালকা ধাতুর তৈরি একটি কোন (Cone) বা শঙ্কুর সাথে লাগানো থাকে। যখন শব্দ থেকে তৈরি বৈদ্যুতিক সিগন্যালকে অ্যামপ্লিফায়ার দিয়ে বিবর্ধিত করে স্পিকারে পাঠানো হয় তখন কাগজ বা হালকা ধাতুর তৈরি শঙ্কু বা কোনটি সামনে-পেছনে কম্পিত হয়ে যথাযথ শব্দ তৈরি করে।

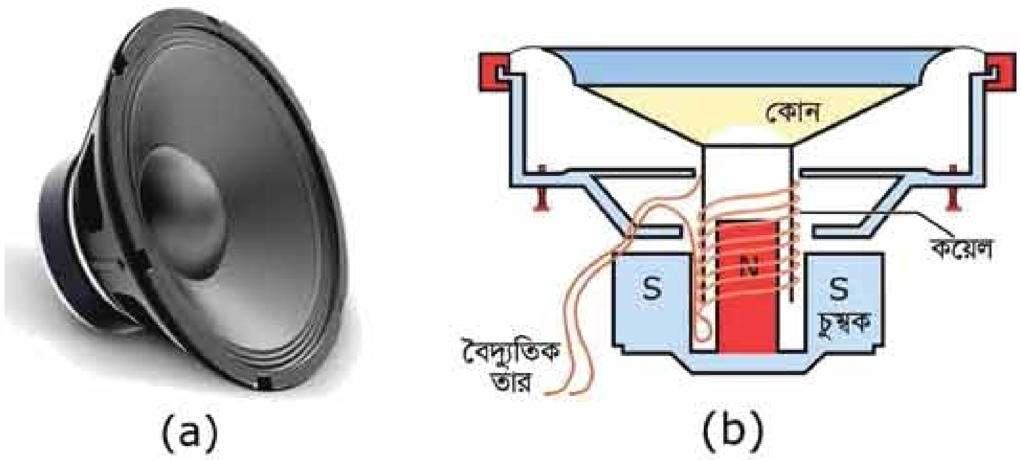

চিত্র 13.10: (a) স্পিকার এবং তার (b) গঠন।

13.5.3 রেডিও

রেডিও বিনোদন ও যোগাযোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম (চিত্র 13.11)। রেডিওতে আমরা খবরের পাশাপাশি বিনোদনের জন্য গান-বাজনা এমনকি পণ্যের বিজ্ঞাপনও শুনতে পারি। সেনাবাহিনী ও পুলিশ বাহিনী তথ্য আদান- প্রদানের জন্য নিজস্ব রেডিও ব্যবহার করে। মোবাইল বা সেলুলার টেলিফোন যোগাযোগেও রেডিও প্রযুক্তি ব্যবহার হয়।

চিত্র 13.11: রেডিও সেট।

কোনো রেডিও সম্প্রচার স্টেশনের স্টুডিওতে যখন কেউ মাইক্রোফোনে কথা বলে তখন সেই শব্দ বিদ্যুৎ তরঙ্গে রূপান্তরিত হয়। আমরা 20 Hz থেকে 20,000 Hz কম্পাঙ্ক পর্যন্ত শুনতে পারি। কাজেই শব্দ থেকে বিদ্যুৎ তরঙ্গে রূপান্তরিত সিগন্যালটিও এই কম্পাঙ্কের হয়। এটিকে পাঠানোর জন্য উচ্চ কম্পাঙ্কের তরঙ্গের সাথে যুক্ত করা হয়। এই উচ্চ কম্পাঙ্কের তরঙ্গকে বাহক তরঙ্গ বলে।

বাহক তরঙ্গের সাথে সিগন্যালকে যুক্ত করার এই প্রক্রিয়াটিকে মডুলেশন বলা হয়। এই মডুলেটেড তরঙ্গ অ্যামপ্লিফায়ার দিয়ে বিবর্ধন করা হয় এবং অ্যান্টেনার সাহায্যে চারদিকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এই বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গ বা রেডিও তরঙ্গ ভূমি তরঙ্গ হিসেবে কিংবা বায়ুমণ্ডলের

চিত্র 13.12: রেডিও সম্প্রচার প্রক্রিয়া।

আয়োনোস্ফিয়ারে প্রতিফলিত হয়ে বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়তে পারে। রেডিও বা গ্রাহক যন্ত্রের ভেতর যে অ্যান্টেনা থাকে সেটি এই রেডিও তরঙ্গকে বিদ্যুৎ তরঙ্গে রূপান্তর করে নেয়। এরপর প্রয়োজনীয় ইলেকট্রনিকস ব্যবহার করে বাহক তরঙ্গ থেকে আলাদা করে নেওয়া হয়। এই প্রক্রিয়াটিকে ডিমডুলেশন বলা হয়। ডিমডুলেটেড বৈদ্যুতিক সিগন্যালটিকে অ্যামপ্লিফায়ার দিয়ে বিবর্ধন করে শোনার জন্য স্পিকারে পাঠানো হয় (চিত্র 13.12)।

রেডিও তরঙ্গ হিসেবে পাঠানোর জন্য রেডিও সম্প্রচার স্টেশনগুলো আলাদা আলাদা কম্পাঙ্ক ব্যবহার করে। গ্রাহক যন্ত্রও নির্দিষ্ট কোনো স্টেশন শুনতে হলে সেই কম্পাঙ্কের সিগন্যালে টিউন করে নেয়— তাই আলাদা আলাদা রেডিও স্টেশন সবাই নিজের অনুষ্ঠান প্রচার করতে পারে এবং শ্রোতারা নিজের পছন্দের রেডিও স্টেশনের অনুষ্ঠান শুনতে পারে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে গ্রাহক তরঙ্গের বিস্তার বা Amplitude বাড়িয়ে বা কমিয়ে সিগন্যালটি সংযুক্ত করা হয় বলে এই পদ্ধতিটির নাম AM (Amplitude Modulation) রেডিও। যদি Amplitude সমান রেখে কম্পাঙ্ক পরিবর্তন করে মডুলেট করা হতো তাহলে এই পদ্ধতিকে বলা হতো FM (Frequency Modulation) রেডিও।

13.5.4 টেলিভিশন

তোমরা সবাই টেলিভিশন দেখেছ এবং জানো যে টেলিভিশন এমন একটি যন্ত্র যেখানে দূরবর্তী কোনো টেলিভিশন সম্প্রচার স্টেশন থেকে শব্দের সাথে সাথে ভিডিও বা চলমান ছবিও দেখতে পাই (চিত্র 13.13)। 1926 সালে জন লগি বেয়ার্ড প্রথম টেলিভিশনের মাধ্যমে ভিডিও বা চলমান ছবি পাঠিয়েছিলেন। তাঁর পদ্ধতিটি ছিল একটি যান্ত্রিক পদ্ধতি, পরে ইলেকট্রনিকস ব্যবহার করে ছবি পাঠানোর পদ্ধতিটি আরো আধুনিক পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহৃত হতে শুরু করে।

চিত্র 13.13: আগের এবং বর্তমান টেলিভিশন সেট।

রেডিও ট্রান্সমিটার এবং রিসিভার কীভাবে কাজ করে সেটি যদি তোমরা বুঝে থাকো তাহলে টেলিভিশন কীভাবে কাজ করে সেটিও খুব সহজেই বুঝতে পারবে। টেলিভিশনে শব্দ এবং ছবি আলাদা সিগন্যাল হিসেবে পাঠানো হয়। শব্দ পাঠানোর এবং গ্রাহক যন্ত্রে সেটি গ্রহণ করে শোনার বিষয়টি ইতিমধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে আমরা ছবি পাঠানোর বিষয়টি ব্যাখ্যা করি।

চলমান ছবি বা ভিডিও পাঠাতে হলে প্রতি সেকেন্ডে 25টি স্থির চিত্র পাঠাতে হয় এবং আমাদের চোখে তখন সেগুলোকে আলাদা আলাদা স্থির চিত্র মনে না হয়ে একটি চলমান ছবি বলে মনে হয়।

টেলিভিশনে রঙিন ছবি পাঠানোর জন্য টেলিভিশন ক্যামেরা প্রতিটি ছবিকে লাল, সবুজ ও নীল (RGB: Red, Green and Blue) এই তিনটি মৌলিক রঙে ভাগ করে তিনটি আলাদা ছবি তুলে নেয়। টেলিভিশন ক্যামেরার ভেতরে আলোকে সিসিডি (CCD: Charge Coupled Device) ব্যবহার করে বৈদ্যুতিক সিগন্যালে রূপান্তরিত করা হয়। এই বৈদ্যুতিক সিগন্যালকে উচ্চ কম্পাঙ্কের বাহক তরঙ্গের সাথে যুক্ত করে অ্যান্টেনার ভেতর দিয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে দেয়া হয় (চিত্র 13.14)।

গ্রাহক যন্ত্র বা টেলিভিশন সেট তার অ্যান্টেনা দিয়ে উচ্চ কম্পনের বাহক তরঙ্গকে গ্রহণ করে এবং রেকটিফায়ার দিয়ে বাহক তরঙ্গকে সরিয়ে মূল ছবির সিগন্যালকে বের করে নেয়। আগে এই সিগন্যাল থেকে তিন রঙের তিনটি ছবিকে ক্যাথোড রে টিউব নামের পিকচার টিউবে তার স্ক্রিনে

ইলেকট্রন গান দিয়ে প্রক্ষেপণ করা হতো। এখন পিকচার টিউব প্রায় উঠে গিয়েছে এবং এলইডি (Light Emitting Diode) টেলিভিশন তার জায়গা দখল করেছে। এখানে ইলেকট্রন গান দিয়ে স্ক্রিনে ছবি তৈরি না করে লাল, সবুজ ও নীল রঙের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এলইডিতে বিদ্যুৎ প্রবাহ করে ছবি তৈরি করা হয়। এলইডি টেলিভিশনে ছবির ঔজ্জ্বল্য অনেক বেশি এবং গুণগত মানও অনেক ভালো।

চিত্র 13.14: টেলিভিশন সম্প্রচার প্রক্রিয়া

এখানে উল্লেখ্য যে অ্যান্টেনার সাহায্যে টেলিভিশনের সিগন্যাল পাঠানো ছাড়াও কো এক্সিয়াল ক্যাবল দিয়েও সিগন্যাল পাঠানো হয়। এই ধরনের টিভির সম্প্রচার ক্যাবল টিভি নামে পরিচিত। এছাড়া স্যাটেলাইট টিভি নামে এক ধরনের টিভি অনুষ্ঠানের সম্প্রচার করা হয়। এটি মহাকাশে পাঠানো উপগ্রহ বা স্যাটেলাইট থেকে সরাসরি পৃথিবীতে পাঠানো হয়।

13.5.5 টেলিফোন ও ফ্যাক্স

টেলিফোন হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত একটি যোগাযোগ মাধ্যম। আমরা এখন এই টেলিফোন (চিত্র 13.15) ব্যবহার করে পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে একজন মানুষের সাথে যোগাযোগ করতে পারি।

ল্যান্ডফোন

1875 সালে আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল টেলিফোন আবিষ্কার করেছিলেন, নানা ধরনের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সেটি আধুনিক টেলিফোনে রূপ নিয়েছে, কিন্তু তার মূল কাজ করার প্রক্রিয়াটি এখনো আগের মতোই আছে।

চিত্র 13.15: ল্যান্ডফোন এবং মোবাইল বা সেলুলার ফোন।

তোমরা সবাই টেলিফোন দেখেছ এবং ব্যবহার করেছ। টেলিফোনে পাঁচটি উপাংশ থাকে। (a) **সুইচ:** যেটি মূল টেলিফোন নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত অথবা বিচ্ছিন্ন করে (b) **রিংগার:** যেটি শব্দ করে জানিয়ে দেয় যে কেউ একজন যোগাযোগ করেছে (c) **কি প্যাড:** যেটি ব্যবহার করে একজন অন্য একজনকে ডায়াল করতে পারে (d) **মাইক্রোফোন:** যেটি আমাদের কণ্ঠস্বরকে বৈদ্যুতিক সিগন্যালে পরিবর্তন করে (e) **স্পিকার:** যেটি বৈদ্যুতিক সিগন্যালকে শব্দে রূপান্তর করে শোনার ব্যবস্থা করে দেয়।

প্রত্যেকটি টেলিফোনই তামার তার দিয়ে আঞ্চলিক অফিসের সাথে যুক্ত থাকে। আমরা যখন কথা বলার জন্য কোনো নম্বরে ডায়াল করি তখন আঞ্চলিক অফিসে সেই তথ্যটি পৌঁছে যায়। সেখানে একটি সুইচ বোর্ড থাকে, যেটি নির্দিষ্ট গ্রাহকের টেলিফোনের সাথে যুক্ত করে দেয়। যদি আমরা অনেক দূরে কিংবা ভিন্ন কোনো দেশে একজনের সাথে কথা বলতে চাই তাহলে সুইচবোর্ড সেভাবে আমাদের নির্দিষ্ট নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত করে দেয়।

প্রযুক্তির উন্নতি হওয়ার আগে যখন পৃথিবীর দুই প্রান্তের দুজন মানুষ টেলিফোনে কথা বলত তখন কথাবার্তা পাঠানোর জন্য তাদের টেলিফোনকে তামার তার দিয়ে সংযুক্ত করে দিতে হতো, সে কারণে পুরো প্রক্রিয়াটা ছিল অনেক খরচসাপেক্ষ। আধুনিক যোগাযোগব্যবস্থায় পুরোটা অনেক সহজ হয়ে গেছে, এখন একটি অপটিক্যাল ফাইবারে একই সাথে আক্ষরিক অর্থে লক্ষ লক্ষ মানুষের কথাবার্তা পাঠানো সম্ভব। তাই টেলিফোনে কথাবার্তা বলার বিষয়টি অনেক সহজ হয়ে গিয়েছে।

মোবাইল টেলিফোন

ল্যান্ডফোন যেহেতু তামার তার দিয়ে যুক্ত, তাই এটাকে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় রাখতে হয় এবং টেলিফোন করার জন্য কিংবা টেলিফোন ধরার জন্য সেই জায়গাটিতে আসতে হয়। মোবাইল টেলিফোন আমাদের সেই বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্তি দিয়েছে এবং এই টেলিফোনটি আমরা আমাদের সাথে রেখে যেকোনো জায়গায় যেতে পারি এবং যতক্ষণ আমরা নেটওয়ার্কের ভেতরে আছি, যেকোনো

নম্বরে ফোন করতে পারি, কথা বলতে কিংবা এসএমএস বিনিময় করতে পারি। সে কারণে মোবাইল ফোন এখন সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত এবং সবচেয়ে জনপ্রিয় যোগাযোগ মাধ্যম।

তোমরা সবাই দেখেছ মোবাইল টেলিফোন কোনো তার দিয়ে যুক্ত নয়, যার অর্থ এটি ওয়্যারলেস বা রেডিও তরঙ্গ দিয়ে যোগাযোগ করে থাকে। কাজেই প্রত্যেকটি মোবাইল টেলিফোন আসলে একই সাথে একটি রেডিও ট্রান্সমিটার এবং একটি রেডিও রিসিভার।

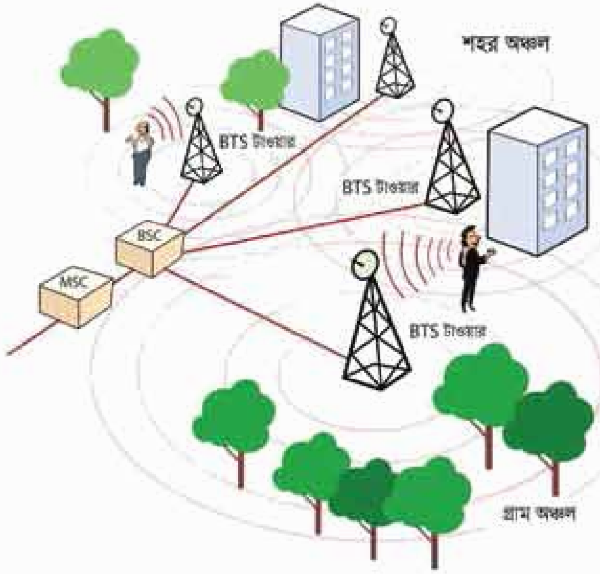

চিত্র 13.16: মোবাইল টেলিফোনের নেটওয়ার্ক।

ল্যান্ড টেলিফোনে যে যে যান্ত্রিক উপাংশ থাকা প্রয়োজন মোবাইল টেলিফোনেও সেগুলো কোনো না কোনো রূপে থাকতে হয়, তার সাথে আরো কয়েকটি বাড়তি বিষয় যুক্ত হয়। সেগুলো হচ্ছে (a) **ব্যাটারি:** এই ব্যাটারি দিয়ে মোবাইল ফোনের জন্য বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ করা হয় (b) **স্ক্রিন:** এই স্ক্রিনটিতে মোবাইল ফোনের যোগাযোগের তথ্য দেখানো হয় (c) **সিম কার্ড:** (SIM: Subscriber Identity Module) যেখানে ব্যবহারকারীর তথ্যগুলো সংরক্ষণ করা হয় (d) **রেডিও ট্রান্সমিটার ও রিসিভার:** এগুলো দিয়ে মোবাইল ফোন তার নেটওয়ার্কের সাথে যোগাযোগ করে (e) **ইলেকট্রনিক সার্কিট:** এটি মোবাইল টেলিফোনের জটিল কার্যক্রমকে ঠিকভাবে সম্পাদন করতে সাহায্য করে।

মোবাইল টেলিফোনে যোগাযোগ করার কাজটি সম্পন্ন করার জন্য পুরো এলাকাকে অনেকগুলো সেলে (Cell) ভাগ করে নেয় (চিত্র 13.16)। এজন্য মোবাইল টেলিফোনকে অনেক সময় সেলফোনও বলা হয়। প্রয়োজনের ওপর নির্ভর করে এই সেলগুলোর ব্যাসার্ধ 1 থেকে 20 কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে। প্রত্যেকটা সেলে একটি করে বেস স্টেশন (BTS: Base Transceiver Station) থাকে।

একটি এলাকার অনেকগুলো বেস স্টেশন একটা বেস স্টেশন কন্ট্রোলারের (BSC: Base Station Controller) মাধ্যমের মোবাইল সুইচিং কেন্দ্রের (MSC: Mobile Service Switching) সাথে যোগাযোগ করে। মোবাইল সুইচিং কেন্দ্রটি মোবাইল নেটওয়ার্কের একটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ, এখানে প্রেরক আর গ্রাহকের মধ্যে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া হয়।

কেউ (প্রেরক) যখন তার মোবাইল ফোনে অন্য কোনো নাম্বারে (গ্রাহকের) ডায়াল করে তখন প্রেরকের মোবাইল ফোনটি সে যে সেলে আছে তার বেস স্টেশনের (BTS) সাথে যুক্ত হয়। সেই বেস স্টেশন থেকে তার কলটি বেস স্টেশন কন্ট্রোলারের (BSC) ভেতর দিয়ে মোবাইল সুইচিং কেন্দ্রে (MSC) পৌঁছায়। মোবাইল সুইচিং কেন্দ্র তার কাছে রাখা তথ্যভান্ডার থেকে গ্রাহক সেই মুহূর্তে কোন সেলের ভেতর আছে সেটি খুঁজে বের করে। তারপর প্রেরকের কলটি গ্রাহকের সেই সেলের বেস স্টেশনের সাথে যুক্ত করে দেয় এবং সেই বেস স্টেশন থেকে গ্রাহকের মোবাইল ফোনে রিং দেওয়া হয়।

মোবাইল ফোনের নেটওয়ার্ককে সচল রাখার জন্য অনেক ধরনের প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন করা হয়েছে। আমাদের মোবাইল টেলিফোন থেকে খুবই কম শক্তির সিগন্যাল ব্যবহার করে কাছাকাছি বেস স্টেশনের সাথে যুক্ত করা হয় এবং আমরা যদি একটি সেল থেকে অন্য সেলে চলে যাই এই নেটওয়ার্ক সেটি জানতে পারে এবং এক বেস স্টেশন থেকে অন্য বেস স্টেশনে যোগাযোগটি স্থানান্তর করে দেয়। একটি ঘনবসতিপূর্ণ শহরে যদি অনেক মোবাইল ফোন ব্যবহারকারী থাকে তাহলে ছোট ছোট অনেক সেল দিয়ে তাদের ফোন করার সুযোগ দেওয়া হয়। আবার গ্রামের কম জনবসতি এলাকায় একটি অনেক বড় সেল দিয়ে পুরো এলাকা নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত রাখা হয়।

এখানে উল্লেখ্য যে, শুরুতে শুধু কথা বলার জন্য টেলিফোন উদ্ভাবন করা হয়েছিল। পরে মোবাইল টেলিফোনে কথার সাথে সাথে এসএমএস পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখন স্মার্টফোন নামে নতুন যে ফোনগুলো এসেছে সেগুলো কণ্ঠস্বরের (Voice) সাথে সাথে সব ধরনের তথ্য (Data) আদান প্রদান করতে পারে। কাজেই সেগুলো সরাসরি ইন্টারনেটের সাথে যুক্ত হতে পারে এবং আগে যে কাজগুলো কম্পিউটার বা ল্যাপটপ ছাড়া করা সম্ভব ছিল না সেগুলো এই স্মার্টফোন দিয়ে করা সম্ভব হয়েছে। শুধু তাই নয়, এই স্মার্টফোনগুলোর জন্য নানা ধরনের অ্যাপ (Application) তৈরি হচ্ছে সেগুলো দিয়ে স্মার্টফোন আমাদের আরো নানা ধরনের কাজ করতে সাহায্য করে।

স্মার্টফোন একদিকে আমাদের জীবনযাত্রার একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। একই সাথে খুব সহজে স্মার্টফোনে ইন্টারনেটে যুক্ত হওয়ার সুযোগের কারণে নতুন প্রজন্ম সামাজিক নেটওয়ার্ক জাতীয় বিষয়গুলোতে অনেক অপ্রয়োজনীয় সময় ব্যয় করছে, সেটি এই মুহূর্তে শুধু আমাদের দেশের নয়, সারা পৃথিবীর একটি বড় সমস্যা।

ফ্যাক্স

ফ্যাক্স শব্দটি হচ্ছে ফ্যাক্সিমিলি (Facsimile) এর সংক্ষিপ্ত রূপ। ফ্যাক্স করা বলতে আমরা বোঝাই কোনো ডকুমেন্টকে কপি করে টেলিফোন লাইন ব্যবহার করে তাৎক্ষণিকভাবে সরাসরি পাঠিয়ে দেওয়া। বর্তমান যুগে কম্পিউটার, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক, ইন্টারনেট এই ফ্যাক্স প্রযুক্তিকে অনেক পেছনে ফেলে এসেছে, তারপরও প্রায় সব প্রতিষ্ঠানই এখনো এই প্রাচীন কিন্তু নির্ভরযোগ্য প্রযুক্তিকে

চিত্র 13.17: ফ্যাক্স মেশিন এবং তার কর্মপদ্ধতি।

ব্যবহার করে যাচ্ছে। শুনে অবাক লাগতে পারে, ফ্যাক্স পাঠানো হয় টেলিফোন লাইন দিয়ে কিন্তু প্রথম ফ্যাক্সের ধারণাটি পেটেন্ট করা হয় টেলিফোন আবিষ্কারেরও ত্রিশ বছর আগে।

ফ্যাক্স মেশিন একই সাথে একটা ডকুমেন্টের কপি পাঠাতে পারে এবং এই মেশিনে পাঠানো একটি কপিকে প্রিন্ট করে দিতে পারে (চিত্র 13.17)। ফ্যাক্স মেশিনে যখন একটি ডকুমেন্ট দেওয়া হয় তখন সেখানে উজ্জ্বল আলো ফেলা হয়, ডকুমেন্টের কালো অংশ থেকে কম এবং সাদা অংশ থেকে বেশি আলো প্রতিফলিত হয়, সেই তথ্যগুলো সংরক্ষণ করে ডকুমেন্টটির কপিকে বৈদ্যুতিক সিগন্যালে রূপান্তর করে টেলিফোন লাইন দিয়ে পাঠানো হয়।

টেলিফোন লাইনের অন্য প্রান্তে ফ্যাক্স মেশিনটি তার কাছে পাঠানো ডকুমেন্টের কপিটিকে একটি প্রিন্টারে প্রিন্ট করে দেয়। ফ্যাক্স মেশিন এখনো একটি নির্ভরযোগ্য প্রযুক্তি, এটি একটি ডকুমেন্টের কপিকে শুধু সাদা এবং কালো হিসেবে পাঠানো হয় বলে লিখিত ডকুমেন্টের জন্য ঠিক থাকলেও রঙিন কিংবা ফটোগ্রাফের জন্য উপযুক্ত নয়। এছাড়া বেশির ভাগ ফ্যাক্স মেশিনে থার্মাল পেপার ব্যবহার করা হয় বলে ডকুমেন্টটি খুব তাড়াতাড়ি অস্পষ্ট হয়ে যেতে পারে।

13.6 ইন্টারনেট ও ই-মেইল (Internet and e-mail)

13.6.1 ইন্টারনেট:

তোমরা এর মাঝে অনেকবার কম্পিউটার কী এবং সেটা কীভাবে কাজ করে সেটা পড়ে এসেছ। একটা প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটারগুলোকে সাধারণত একটা নেটওয়ার্ক দিয়ে পরস্পরের সাথে যুক্ত করে দেওয়া হয়, যেন একটা কম্পিউটার অন্য একটা কম্পিউটারের সাথে যোগাযোগ করতে পারে, আবার প্রয়োজন হলে একটা কম্পিউটার অন্য কম্পিউটারের Resource ব্যবহার করতে পারে। এই ধরনের নেটওয়ার্ককে LAN (Local Area Network) বলা হয়ে থাকে। আজকাল LAN তৈরি করার জন্য একটা সুইচের সাথে অনেকগুলো কম্পিউটার যুক্ত করে সুইচগুলোকে পরস্পরের সাথে যুক্ত করে দিতে হয়। যখন একটা কম্পিউটারকে অন্য কম্পিউটারের সাথে যোগাযোগ করতে হয় সেটি যদি তার

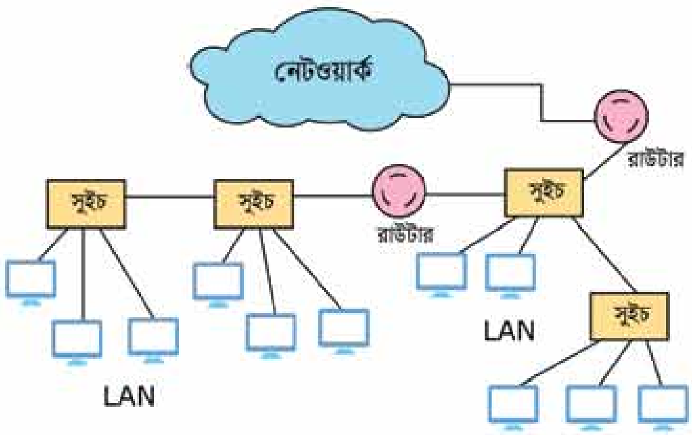

চিত্র 13.18: নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত একাধিক LAN

নিজের সুইচের সাথে যুক্ত কম্পিউটারের মাঝে পেয়ে যায় তাহলে তার সাথে সরাসরি যোগাযোগ করে। সেখানে না পেলে অন্য সুইচে খোঁজ করতে থাকে।

একটি প্রতিষ্ঠানের একটি LAN কে অন্য একটি প্রতিষ্ঠানের অন্য একটি LAN এর সাথে যুক্ত করার জন্য রাউটার (Router) ব্যবহার করা হয়। (চিত্র 13.18) বিভিন্ন নেটওয়ার্ক (Network) এর নিজেদের মাঝে Inter Connection করে Networking কে Internet বলা হয়। এই মুহূর্তে পৃথিবীর প্রায় নয় বিলিয়ন কম্পিউটার বা অন্য কোনো ডিভাইস ইন্টারনেটের সাথে যুক্ত আছে এবং এই সংখ্যাটি প্রতিদিনই বাড়ছে। কাজেই ইন্টারনেট হচ্ছে নেটওয়ার্কের নেটওয়ার্ক যেখানে প্রাইভেট, পাবলিক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা-বাণিজ্য, সরকারি-বেসরকারি স্থানীয় বা বৈশ্বিক সব ধরনের

নেটওয়ার্ক জড়িত হয়েছে। এই বিশাল নেটওয়ার্ক তৈরি করার জন্য নানা ধরনের ইলেকট্রনিকস, ওয়্যারলেস এবং ফাইবার অপটিক নেটওয়ার্ক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে।

ইন্টারনেট ব্যবহার করে এখন নানা ধরনের তথ্য আদান-প্রদান করা যায় এবং নানা ধরনের সেবা নেওয়া যায়। উদাহরণ দেওয়ার জন্য বলা যেতে পারে, ইন্টারনেটে রয়েছে নানা ধরনের ওয়েবসাইট, ইলেকট্রনিক মেইল, টেলিফোন এবং ভিডিও যোগাযোগ, তথ্য আদান-প্রদান, সামাজিক নেটওয়ার্ক, বিনোদন, শিক্ষা এবং গবেষণা টুল এবং নানা ধরনের ইন্টারনেটভিত্তিক সেবা। সারা পৃথিবীর মানুষ এখন ইন্টারনেটের ওপর নির্ভরশীল হয়ে উঠেছে এবং আমাদের জীবনধারার একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে। এখানে উল্লেখ করা যায় যে ইন্টারনেটে পৃথিবীর সকল মানুষেরই যোগাযোগ করার সমান সুযোগ আছে বলে নানা ধরনের প্রচারের সাথে সাথে অপপ্রচার এবং অপব্যবহারের সুযোগও তৈরি হয়েছে। নানা ধরনের ক্ষতিকর সফটওয়্যার তৈরি করে নেটওয়ার্কের ক্ষতি করা, বিদ্বেষ এবং হিংসা ছড়ানো, আপত্তিকর তথ্য উপস্থাপনের সাথে সাথে অপরাধীরাও তাদের কার্যক্রমে গোপনে ইন্টারনেট ব্যবহার করে থাকে।

কিছু নেতিবাচক বিষয় থাকার পরও ইন্টারনেট এই সভ্যতার সবচেয়ে বড় অবদান এবং এই প্রথমবার পৃথিবীর সকল মানুষ সমানভাবে একটি প্রযুক্তিতে অংশ নেওয়ার সুযোগ পেয়েছে। ভবিষ্যতের পৃথিবীতে এই নেটওয়ার্কের কী প্রভাব পড়বে দেখার জন্য সারা পৃথিবীর মানুষ আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে।

13.6.2 ই-মেইল

ইলেকট্রনিক মেইলের সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে ই-মেইল এবং ই-মেইল বলতে আমরা বোঝাই কম্পিউটার, ট্যাবলেট, স্মার্টফোন ইত্যাদি ডিজিটাল ডিভাইস দিয়ে নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে একজন বা অনেকজনের সাথে ডিজিটাল তথ্য বিনিময় করা। 1971 সালে প্রথম ই-মেইল পাঠানো হয় এবং মাত্র 25 বছরের ভেতরে পোস্ট অফিস ব্যবহার করে পাঠানো চিঠি থেকে ই-মেইলের সংখ্যা বেশি হয়ে গিয়েছিল। বর্তমানে ই-মেইলের ব্যবহার ছাড়া আমরা একটি দিনও কল্পনা করতে পারি না।

কম্পিউটার, ল্যাপটপ, ট্যাবলেট বা অন্য কোনো ডিজিটাল ডিভাইস দিয়ে ই-মেইল পাঠাতে হলে সব সময়ই একটি ই-মেইল সার্ভারের দরকার হয়। এই ই-মেইল সার্ভার ব্যবহারকারীদের ই-মেইল সংরক্ষণ করে এবং নেটওয়ার্কের মাধ্যমে অন্য ব্যবহারকারীদের সাথে ই-মেইল বিনিময় করে। ই-মেইল বিনিময় করার আরেকটি এবং বর্তমানে অনেক জনপ্রিয় উপায় হচ্ছে ইন্টারনেটের দেওয়া ই-মেইল সার্ভিস। তাদের মাঝে Gmail, Yahoo, Hotmail ইত্যাদি ই-মেইলের সেবা শুধু যে বিনা মূল্যে দেওয়া হয় তা নয়, তারা ব্যবহারকারীদের ই-মেইল সংরক্ষণ করার দায়িত্বও গ্রহণ করে থাকে।

ই-মেইল পাঠানোর জন্য প্রথমেই যিনি পাঠাবেন এবং যিনি পাবেন দুজনেরই ই-মেইলের ঠিকানার দরকার হয়। তোমরা সবাই ই-মেইল ঠিকানার সাথে পরিচিত এবং সবাই লক্ষ করেছ ই-মেইল ঠিকানাটি @ বর্ণটি দিয়ে ভাগ করা হয়েছে। যদি abc@def.com একটি ই-মেইল ঠিকানা হয়ে থাকে তাহলে @ এর পরের অংশটুকু হচ্ছে ডোমেইন নেইম, যেটা দিয়ে বোঝানো হয় ব্যবহারকারী কোন প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত। প্রথম অংশটুকু হচ্ছে ব্যবহারকারীর কোনো ধরনের পরিচয়।

একটি ই-মেইল একাধিক গ্রাহকের কাছে পাঠানো যায়। প্রয়োজনে ই-মেইলকে অন্য একজনকে "কার্বন কপি" হিসেবে (CC) পাঠানো যায়। ই-মেইলের শুরুতে বিষয় হিসেবে ই-মেইলের বক্তব্যটির একটি শিরোনাম লেখা যায়। শুধু তাই নয় ই-মেইলের বিষয়বস্তু লেখার পাশাপাশি তার সাথে অন্য কোনো ডকুমেন্ট বা ছবি সংযুক্ত করে পাঠিয়ে দেওয়া যায়।

এটি বলা বাহুল্য মাত্র আমরা ই-মেইল ছাড়া এখন একটি মুহূর্তও কল্পনা করতে পারি না।

ই-মেইল, ইন্টারনেট কিংবা ইন্টারনেটভিত্তিক নানা ধরনের সামাজিক নেটওয়ার্ক আমাদের জন্য একটি নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দিয়েছে। একই সাথে এই প্রযুক্তিগুলোর অপব্যবহার আমাদের জীবনে খুব সহজেই বড় ধরনের বিপর্যয় নিয়ে আসতে পারে। কাজেই এটা বলা বাহুল্য মাত্র এই অত্যন্ত শক্তিশালী প্রযুক্তিগুলো আমাদের দায়িত্বশীলের মতো ব্যবহার করতে হবে, এটি শুধু তথ্যপ্রযুক্তি নয়, সকল প্রযুক্তির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

13.7 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির কার্যকর ব্যবহার (Effective Uses of ICT)

13.7.1 স্বাস্থ্য সমস্যা

তথ্য ও প্রযুক্তির অনিয়ন্ত্রিত ব্যাপক ব্যবহারের ফলে বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। যারা অধিকক্ষণ ধরে কম্পিউটার নিয়ে কাজ করে, কম্পিউটারের কি-বোর্ড ও মাউসের দীর্ঘক্ষণ ও দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে তাদের হাতের রগ, স্নায়ু, কবজি, বাহু, কাঁধ ও ঘাড়ে অতিরিক্ত টান (stress) বা চাপ পড়ে। কাজেই কাজের ফাঁকে যথেষ্ট বিশ্রাম না নিলে এসব অঙ্গ ব্যথাসহ নানা রকম সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে।

কাজের ফাঁকে ফাঁকে বিশ্রাম না নিয়ে দীর্ঘদিন ও দীর্ঘক্ষণ কম্পিউটারের কাজ করলে চোখে নানা রকম সমস্যার সৃষ্টি হয়, একে বলা হয় কম্পিউটার ভিশন সিনড্রোম। এই সিনড্রেমের মধ্যে রয়েছে চোখ

জ্বালা পোড়া করা, চোখ শুষ্ক হয়ে যাওয়া, চোখ চুলকানো, চোখ লাল হয়ে যাওয়া এবং চোখের পানি শুকিয়ে যাওয়া।

কম্পিউটার ব্যবহার থেকে সৃষ্ট স্বাস্থ্য সমস্যার চিকিৎসার চেয়ে এই সমস্যা সৃষ্টি হতে না দেওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ। আমাদের সতর্ক হতে হবে যেন এসব স্বাস্থ্য সমস্যার সৃষ্টি না হয়। কিছু সহজ নিয়ম মেনে চললেই আমরা এই ধরনের সমস্যা থেকে রক্ষা পেতে পারি। যেমন:

(a) কম্পিউটারে কাজ করার সময় সঠিকভাবে বসতে হবে এবং সোজা সামনে তাকাতে হবে।

(b) কাজের ফাঁকে ফাঁকে অন্তত আধা ঘণ্টা পর পর 5 মিনিটের জন্য হলেও বিশ্রাম নিতে হবে এবং কাঁধ ও ঘাড়কে রিল্যাক্স করতে দিতে হবে।

(c) কম্পিউটারের স্ক্রিনটি যেন চোখ থেকে 50-60 সেন্টিমিটার দূরে থাকে।

(d) প্রতি 10 মিনিট পর পর কিছুক্ষণের জন্য হলেও দূরের কোনো কিছুর দিকে তাকাতে হবে, এতে চোখে আরামবোধ হবে।

13.7.2 মানসিক সমস্যা

কম্পিউটার ব্যবহারে যেসব শারীরিক সমস্যা হতে পারে তার চেয়ে অনেক গুরুতর সমস্যা হচ্ছে মানসিক সমস্যা। ইন্টারনেট সহজলভ্য হওয়ার কারণে আজকাল প্রায় সবাই এটি ব্যবহার করতে পারে। ইন্টারনেটে একদিকে যেমন তথ্য ও জ্ঞানের ভান্ডার উন্মুক্ত করে রাখা আছে ঠিক সেরকম সামাজিক নেটওয়ার্ক জাতীয় সার্ভিসের মাধ্যমে অসচেতন ব্যবহারকারীদের মোহগ্রস্থ করে রাখার ব্যবস্থাও করে রাখা আছে। মনোবিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখাতে শুরু করেছেন যে, মানুষ যেভাবে মাদকে আসক্ত হয়ে যায় সেভাবে অতিরিক্ত কম্পিউটার ব্যবহার, ইন্টারনেট বা সামাজিক নেটওয়ার্কে আসক্ত হয়ে যেতে পারে। অতিরিক্ত কম্পিউটার গেম খেলে মৃত্যুবরণ করেছে এরকম উদাহরণও আছে। কাজেই সব সময়ই মনে রাখতে হবে আধুনিক প্রযুক্তি মাত্রই ভালো নয়, পৃথিবীতে যেমন অনেক অপ্রয়োজনীয় এবং ক্ষতিকর প্রযুক্তি আছে ঠিক সেরকম ভালো প্রযুক্তির অপব্যবহারের কারণে সেটি আমাদের জীবনে অভিশাপ হয়ে দেখা দিতে পারে।

নিজে করো

দায়িত্বশীল হিসেবে ই-মেইল, ইন্টারনেট কিংবা সামাজিক নেটওয়ার্ক কীভাবে ব্যবহার করা যায় তার উপর একটি প্রতিবেদন লিখ।

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন

1. নিউট্রন যদি বিটা কণা বের করে প্রোটনে পরিবর্তিত হতে পারে তাহলে নিউক্লিয়াসের ভেতর সব নিউট্রন ধীরে ধীরে প্রোটনে পরিবর্তিত হয়ে যায় না কেন?
2. তাপমাত্রা বাড়ালে রেজিস্টরের রোধ বেড়ে যায় কিন্তু সেমিকন্ডাক্টরে কমে কেন?
3. তেজস্ক্রিয়তা কী ব্যাখ্যা করো।
4. আলফা ও বিটা কণার পার্থক্য ব্যাখ্যা করো।
5. সমন্বিত বর্তনী কী?
6. ইন্টারনেট কাকে বলে? এর দ্বারা কী কী কাজ করা যায়?
7. ফ্যাক্স কীভাবে কাজ করে বর্ণনা করো।

গাণিতিক প্রশ্ন

1. একটি জীবাশ্মতে যে পরিমাপ C_{14} থাকার কথা তার থেকে 16 গুণ কম আছে। জীবাশ্মটি কত পুরাতন?

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটির পাশে ঠিক (√) চিহ্ন দাও

1. তেজস্ক্রিয় মৌল থেকে নির্গত আলফা কণা কী?

(ক) একটি হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস (খ) একটি হিলিয়াম নিউক্লিয়াস
(গ) একটি তড়িৎ নিরপেক্ষ কণা (ঘ) একটি ঋণাত্মক কণা

2. তেজস্ক্রিয় ক্ষয়ের ফলে যে বিটা রশ্মি নির্গত হয় তা আসলে কী?
   (ক) ঋণাত্মক ইলেকট্রনের স্রোত
   (খ) একটি তড়িৎ নিরপেক্ষ কণা
   (গ) একটি ধনাত্মক নিউক্লিয়াস
   (ঘ) ধনাত্মক প্রোটনের স্রোত

3. কোনো সিলিকন চিপে লক্ষ লক্ষ বর্তনী সংযোজিত হলে তাকে কী বলে?
   (ক) সমান্তরাল বর্তনী
   (খ) অর্ধপরিবাহী ট্রানজিস্টর
   (গ) সমন্বিত বর্তনী
   (ঘ) অর্ধপরিবাহী ডায়োড

4. টেলিভিশন সম্প্রচারে ক্যামেরার কাজ কী?
   (ক) ছবিকে তড়িৎ সংকেতে রূপান্তর করা
   (খ) ছবিকে শব্দ তরঙ্গে রূপান্তর করা
   (গ) তড়িৎ সংকেতকে ছবিতে রূপান্তর করা
   (ঘ) শব্দ তরঙ্গকে ছবিতে রূপান্তর করা

সৃজনশীল প্রশ্ন

1. ছোট হয়ে আসছে পৃথিবী, আমরা বাস করছি গ্লোবাল ভিলেজে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি পৃথিবীর সকল মানুষকে কার্যকর ও দক্ষতার সাথে সংযুক্ত করেছে। যোগাযোগের প্রধান বাহনগুলো হচ্ছে টেলিভিশন, রেডিও এবং টেলিফোন।
   (ক) যোগাযোগ যন্ত্র কাকে বলে?
   (খ) কীভাবে টেলিফোন কাজ করে ব্যাখ্যা করো।
   (গ) কীভাবে রেডিও স্টেশন নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কের সংকেত সঞ্চালন করে এবং তা গ্রাহকের নিকট পৌঁছায়, চিত্রসহ ব্যাখ্যা করো।
   (ঘ) যোগাযোগ যন্ত্র হিসেবে টেলিভিশন ও রেডিওর কার্যকারিতা বিশ্লেষণ ও তুলনা করো।

2. শ্রীলঙ্কার প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে অনুষ্ঠিত খেলাটি ভূ-উপগ্রহের মাধ্যমে বিটিভি সম্প্রচার করছে। ফলে ঘরে বসেই টেলিভিশনে খেলাটি উপভোগ করা যাচ্ছে।
   (ক) অ্যানালগ সংকেত কাকে বলে?
   (খ) চিত্রের সাহায্যে একটি ডিজিটাল সংকেত ব্যাখ্যা করো।
   (গ) টেলিভিশনে খেলাটির সম্প্রচারকৌশল ব্যাখ্যা করো।
   (ঘ) এ ধরনের যোগাযোগ প্রযুক্তি জীবনমানকে কীভাবে উন্নত করছে— আলোচনা করো।

3. শোভন তার বাসার পুরোনো জিনিসপত্রের মধ্যে একটি ভাঙ্গা রেডিও পেল। কৌতূহলবশত সে রেডিওটির বিভিন্ন অংশ খুলে দেখতে পেল তার মধ্যে একটা যন্ত্রে রয়েছে কিছু তার পেঁচানো অংশ আর একটা ছোট চুম্বক যেটি একটি পর্দার সাথে লাগানো। বাবাকে জিজ্ঞেস করে সে জানতে পারল যে এই অংশটি শব্দ তৈরি করে। সে ভাবতে শুরু করল কীভাবে এই জিনিসগুলো শব্দ তৈরি করে।

(ক) আইসি কী?

(খ) একটি অ্যানালগ ও ডিজিটাল সংকেত কেন ভিন্ন?

(গ) শোভনের পাওয়া যন্ত্রটি যে প্রক্রিয়ায় শব্দ তৈরি হয় তার একটি ধারাচিত্র (ফ্লো-চার্ট) আঁকো।

(ঘ) বর্তমান সময়ে শোভনের পাওয়া যন্ত্রটি যদি ব্যবহার করা না হয় তাহলে যে প্রধান সমস্যা হতে পারে তা বিশ্লেষণ করো।

চতুর্দশ অধ্যায়

জীবন বাঁচাতে পদার্থবিজ্ঞান

(Physics to Save Lives)

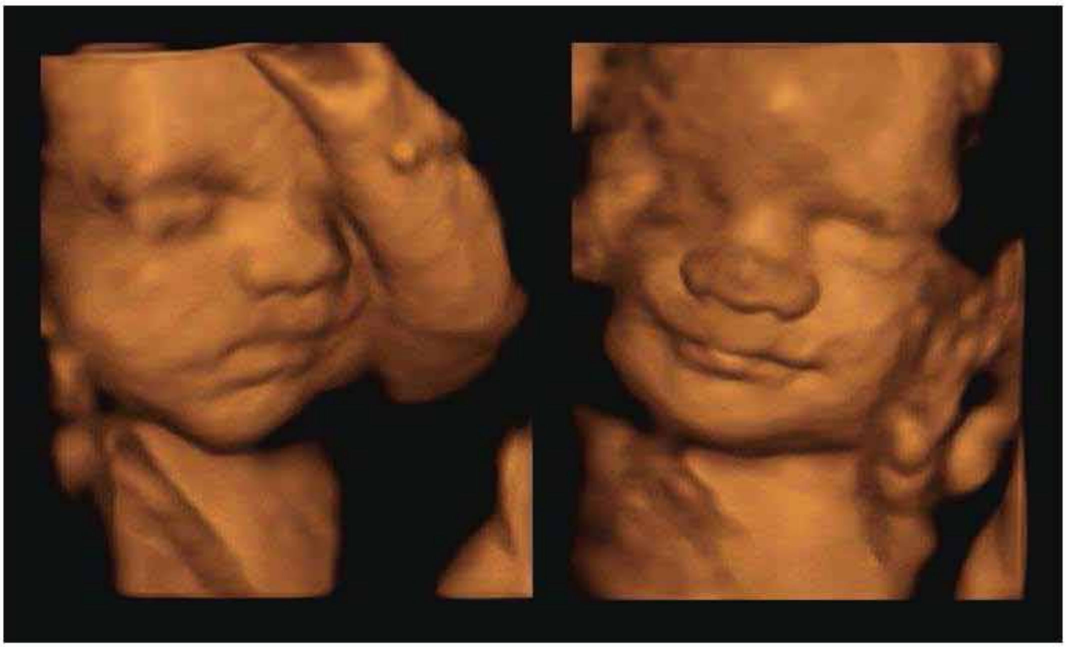

পদার্থবিজ্ঞান অন্যান্য বিষয়ের সাথে যুক্ত হয়ে যে নতুন নতুন বিজ্ঞানের জন্ম দিয়েছে তার একটি হচ্ছে জীব পদার্থবিজ্ঞান। এই নতুন বিষয়টির সুফল আমরা সরাসরি ভোগ করতে শুরু করেছি চিকিৎসাবিজ্ঞানে। আমরা কি কখনো কল্পনা করতে পেরেছিলাম শরীরকে না কেটেই বাইরে থেকে শরীরের ভেতরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখতে পারব? পদার্থবিজ্ঞানের নিত্যনতুন আবিষ্কারকে কাজে লাগিয়ে সত্যিই এটা ঘটছে। এই অধ্যায়ে চিকিৎসাবিজ্ঞানে ব্যবহার করা হয় সেরকম বেশ কিছু যন্ত্রপাতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। রোগ নির্ণয় এখন অনুমাননির্ভর নয়, বেশির ভাগ সময়েই সেটি সুনির্দিষ্ট। শুধু যে রোগ নির্ণয় তা নয়, রোগ নিরাময়ে বা চিকিৎসাতেও যে পদার্থবিজ্ঞান ব্যবহার করে করা সম্ভব এই অধ্যায়ে সেরকম উদাহরণও দেওয়া হয়েছে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- জীবপদার্থবিজ্ঞানের ভিত্তি ব্যাখ্যা করতে পারব।
- জীবপদার্থবিজ্ঞানে জগদীশচন্দ্র বসুর অবদান ব্যাখ্যা করতে পারব।
- মানবদেহ পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মে পরিচালিত হয় তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- চিকিৎসাবিজ্ঞানে রোগ নির্ণয়ে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতিতে পদার্থবিজ্ঞানের ধারণা ও তত্ত্বের ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে পারব।
- আধুনিক প্রযুক্তি এবং যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে সৃষ্ট স্বাস্থ্য সমস্যা এবং প্রতিরোধের কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারব।
- সঠিক চিকিৎসার জন্য রোগ নির্ণয়ের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে নিজে সচেতন হব এবং অন্যদের সচেতন করতে পারব।
- রোগ নির্ণয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রশংসা করতে পারব।

14.1 জীবপদার্থবিজ্ঞানের ভিত্তি (Background of Biophysics)

জীববিজ্ঞান জীবজগতের বৈচিত্র্য এবং তাদের জীবনধারণের প্রক্রিয়া বোঝার চেষ্টা করে। জৈবিক প্রাণী কীভাবে খাদ্য সংগ্রহ করে, একে অন্যের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলে, পরিবেশকে অনুভব করে এবং বংশবৃদ্ধি করে এগুলো হচ্ছে জীববিজ্ঞানের বিষয়।

অন্যদিকে প্রকৃতির ভৌত জগৎ কোন নিয়ম মেনে চলে, সেই নিয়মগুলো কোন সহজ গাণিতিক নিয়মে ব্যাখ্যা করে করা যায় সেগুলো হচ্ছে পদার্থবিজ্ঞানের বিষয়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় পদার্থবিজ্ঞানের সরলতা এবং জীববিজ্ঞানের জটিলতার ভেতরে বুঝি কোনো সম্পর্ক নেই।

কিন্তু বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে তার বিভিন্ন শাখার ওপর নির্ভর করে পদার্থবিজ্ঞান এবং জীববিজ্ঞানের মাঝে একটি যোগসূত্র গড়ে তোলা হয়েছে এবং এই বিষয়টির নাম দেওয়া হয়েছে জীবপদার্থবিজ্ঞান (Biophysics)। জীবপদার্থবিজ্ঞান জৈবিক জগতের জটিল প্রক্রিয়ার ভেতরে পদার্থবিজ্ঞানের সহজ এবং গাণিতিক সূত্রগুলো প্রয়োগ করে জীবনের নানা ধরনের রহস্য অনুসন্ধান করে থাকে। এক কথায় বলা যায় জীবপদার্থবিজ্ঞান হচ্ছে জীববিজ্ঞান এবং পদার্থবিজ্ঞানের ভেতরকার সেতুবন্ধন।

জীবপদার্থবিজ্ঞান একদিকে যেরকম ডিএনএ কিংবা প্রোটিনে অণু-পরমাণুর বিন্যাস খুঁজে বের করতে পারে ঠিক সেরকম অন্যদিকে প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে ক্যান্সারের চিকিৎসা কিংবা কৃত্রিম কিডনি তৈরি করতে পারে। শুধু তাই নয়, ভবিষ্যতের পৃথিবীতে বৈশ্বিক পরিবেশ দূষণকে নিয়ন্ত্রণ থেকে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ সব ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে সে বিষয়ে কোনো দ্বিধা নেই।

14.2 জগদীশচন্দ্র বসুর অবদান (Contributions of Jagadish Chandra Bose)

আচার্য স্যার জগদীশচন্দ্র বসু (চিত্র 14.01) একদিকে ছিলেন একজন প্রখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী, অন্যদিকে একজন সফল জীববিজ্ঞানী। আমাদের এই উপমহাদেশে তিনি ছিলেন প্রথম আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাওয়া একজন বিজ্ঞানী। জগদীশচন্দ্র বসুর পূর্বপুরুষেরা থাকতেন ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের রাঢ়িখাল গ্রামে। তার জন্ম হয় 1858 সালের 30 নভেম্বর, ময়মনসিংহে। তার বাবা ভগবানচন্দ্র বসু ফরিদপুর জেলার একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তার লেখাপড়া শুরু হয় ফরিদপুরের গ্রামীণ বিদ্যালয়ে, পরে কলকাতায় হেয়ার স্কুল এবং সেন্ট জেভিয়ার স্কুল ও কলেজে পড়াশোনা শেষ করেন। 1880

সালে বিএ পাস করার পর তিনি ইংল্যান্ড যান এবং 1880-1884 সালের ভেতরে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞানে অনার্সসহ বিএ এবং লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএসসি ডিগ্রি অর্জন করেন। 1885 সালে মাতৃভূমিতে ফিরে এসে প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ে অধ্যাপনা শুরু করেন। সেই যুগে তার কলেজে গবেষণার তেমন কোনো সুযোগ ছিল না, তারপরও তিনি গবেষণার কাজ চালিয়ে যান। দিনের বেলায় তার নানারকম ব্যস্ততা ছিল। তাই গবেষণার কাজ করতেন রাতের বেলায়।

চিত্র 14.01: আচার্য স্যার জগদীশচন্দ্র বসু।

বৈদ্যুতিক তার ছাড়া কীভাবে দূরে রেডিও সংকেত পাঠানো যায় এ বিষয়ে তিনি অনেক গবেষণা করেন। 1895 সালে তিনি প্রথমবারের মতো বেতারে দূরবর্তী স্থানে রেডিও সংকেত পাঠিয়ে দেখান। মাইক্রোওয়েভ গবেষণার ক্ষেত্রেও তার বড় অবদান আছে, তিনিই প্রথম বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গ দৈর্ঘ্যকে মিলিমিটার পর্যায়ে (প্রায় 5 মিলিমিটার) নামিয়ে আনতে সক্ষম হন। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রেডিও সংকেতকে শনাক্ত করার জন্য অর্ধপরিবাহী জংশন ব্যবহার করেন। এই আবিষ্কার পেটেন্ট করে বাণিজ্যিক সুবিধা নেওয়ার পরিবর্তে তিনি সেটি সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেন। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় কারিগরি, প্রযুক্তিবিদ এবং পেশাজীবীদের প্রতিষ্ঠান ইনস্টিটিউট অফ ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং (IEEE) তাঁকে রেডিও বিজ্ঞানের একজন জনক হিসেবে অভিহিত করেছে।

পরবর্তী সময়ে জগদীশচন্দ্র বসু উদ্ভিদ শরীরতত্ত্বের উপর অনেক গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করেন। এর মাঝে উদ্ভিদের বৃদ্ধি রেকর্ড করার জন্য ক্রেস্কোগ্রাফ আবিষ্কার, খুব সূক্ষ্ম নাড়াচাড়া শনাক্ত এবং বিভিন্ন উদ্দীপকে সাড়া দেওয়ার বিষয়গুলো উল্লেখযোগ্য। আগে ধারণা করা হতো উদ্দীপনের সাড়া দেওয়ার প্রকৃতি হচ্ছে রাসায়নিক, তিনি দেখিয়েছিলেন এটি আসলে বৈদ্যুতিক।

1917 সালে উদ্ভিদ শরীরতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করার জন্য তিনি কলকাতায় বসু বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। জগদীশচন্দ্র বসু বাংলায় লেখা রচনাবলি "অব্যক্ত" নামক গ্রন্থে সংকলিত করেছেন। তার উল্লেখযোগ্য একটি গ্রন্থ হচ্ছে "Response in the living and nonliving".

1937 সালের 23 নভেম্বর জ্ঞানতাপস আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু মৃত্যুবরণ করেন।

14.3 মানবদেহ এবং যন্ত্র (Human Bodies and Machines)

আমরা দৈনন্দিন জীবনে নানা ধরনের যন্ত্র ব্যবহার করি। কোথাও যাবার জন্য গাড়িতে উঠি, খাবার সংরক্ষণ করার জন্য রেফ্রিজারেটরে রাখি, গরমের দিনে বাতাসের জন্য ফ্যান চালাই, খবর শোনার জন্য টেলিভিশন দেখি ইত্যাদি। এই তালিকা অনেক দীর্ঘ এবং সে কারণে স্বাভাবিকভাবেই যন্ত্র বলতে কী বোঝাই সেটা সম্পর্কে আমাদের একটা ধারণা আছে। আমরা জানি, মানবদেহকে একটা যন্ত্র বলা যায় না—একটা কোষ থেকে শুরু করে একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ সৃষ্টি হয়, পৃথিবীতে এমন কোনো যন্ত্র নেই যেটি একটি ছোট ইউনিট দিয়ে শুরু করে নিজে নিজে পূর্ণাঙ্গ যন্ত্রে পরিণত হয়। মানবদেহের ভেতরে কোনো কিছু বিকল হলে সেটি নিজে নিজে সারিয়ে তোলার চেষ্টা করে, কোনো যন্ত্রই সেটি পারে না। তারপরও পরিচিত জগতের সাথে তুলনা করার জন্য কিংবা মানবদেহের অঙ্গাপ্রত্যঙ্গের কাজকর্ম বোঝানোর জন্য আমরা অনেক সময়েই মানবদেহকে যন্ত্রের সাথে তুলনা করি।

উদাহরণ দেওয়ার জন্য বলা যায় আমাদের হৃৎপিণ্ড একটি স্বয়ংক্রিয় পাম্প, যেটি বাইরের কোনো উদ্দীপনা (Stimulation) ছাড়াই স্বয়ংক্রিয়ভাবে শরীরে রক্ত সঞ্চালন করে। আমাদের কিডনি (বৃক্ক) একটি ছাঁকনি, যেটা রক্ত থেকে নাইট্রোজেন বর্জ্য সরিয়ে সেটাকে পরিশোধন করে। শরীরের হাড় এবং মাংসপেশি মিলে যান্ত্রিক লিভারের মতো কাজ করে কিংবা চোখ অনেকাংশেই ক্যামেরার মতো। শুধু তাই নয়, মানবদেহ জটিল একটা যন্ত্রের মতো ছোট ছোট অংশ বা অঙ্গ দিয়ে তৈরি, প্রত্যেকে বিশেষ কাজ সম্পন্ন করে এবং এর যেকোনো একটি অচল বা বিকল হলে পুরো শরীরে কাজকর্ম ব্যাহত হয়। অর্থাৎ বলা যায় যে মানবদেহ একটি জৈবযন্ত্রের মতো।

যন্ত্র দিয়ে কাজ করার জন্য আমাদের শক্তির প্রয়োজন হয়। বিভিন্ন ইঞ্জিনে পেট্রল, ডিজেল, গ্যাস ইত্যাদি জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করে রাসায়নিক শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে। অনেকটা সেভাবেই খাদ্য গ্রহণ করে এবং শ্বসনপ্রক্রিয়ায় আমরা খাবারের পুষ্টি থেকে শরীরের জন্য শক্তি সংগ্রহ করি।

এভাবে আমরা মানবদেহের সাথে যন্ত্রের অনেক মিল খুঁজে বের করতে পারলেও আমাদের মনে রাখতে হবে আমাদের এই মানবদেহ পৃথিবীর জটিলতম যন্ত্র থেকেও বেশি বিস্ময়কর, বেশি চমকপ্রদ এবং রহস্যময়। আমরা সেই রহস্যের ক্ষুদ্র ভগ্নাংশও এখনো পুরোপুরি সমাধান করতে পারিনি।

14.4 রোগ নির্ণয়ে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি (Diagnostic Instruments)

1950 সালে পৃথিবীর মানুষের গড় আয়ু ছিল 50 বছরের কাছাকাছি, 60 বছরে সেই আয়ু 20 বছর বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। পৃথিবীর মানুষের জীবনধারণের মান উন্নত হওয়া, রোগ প্রতিষেধক ব্যবহার,

স্বাস্থ্যসচেতন হওয়া এবং চিকিৎসার মান উন্নয়নের জন্য সারা পৃথিবীতে মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়ে গেছে।

তোমরা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছ মানুষের গড় আয়ু বেড়ে যাওয়ার পেছনে চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতির একটা সম্পর্ক আছে। আর চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতির পেছনে রয়েছে আধুনিক কিছু যন্ত্রপাতি, যেগুলো দিয়ে অনেক সঠিকভাবে রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে। একটা সময় ছিল যখন চিকিৎসকেরা রোগীর বাহ্যিক বিভিন্ন লক্ষণ দেখেই রোগ নির্ণয় করতেন। শরীরের তখন অনেক কিছু অনুমান করতে হতো, সঠিকভাবে রোগ নিরূপণ করা যেত না। আধুনিক যন্ত্রপাতির কারণে শুধু যে অনেক নিখুঁতভাবে রোগ নিরূপণ করা যাচ্ছে তা নয়, অনেক কার্যকরভাবে চিকিৎসা করা সম্ভব হয়েছে।

এই অধ্যায়ে রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসার জন্য যেসব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয় তার কয়েকটি নিয়ে আলোচনা করা হলো। তোমরা দেখবে এই যন্ত্রপাতিগুলোর সবগুলোতেই সরাসরি পদার্থবিজ্ঞানের কোনো একটি আবিষ্কারকে ব্যবহার করা হয়েছে।

14.4.1 এক্স-রে (X-Ray)

1885 সালে উইলহেলোম রন্টজেন উচ্চশক্তিসম্পন্ন একধরনের রশ্মি আবিষ্কার করেন, যেটি শরীরের মাংসপেশি ভেদ করে গিয়ে ফটোগ্রাফিক প্লেটে ছবি তুলতে পারত। এই রশ্মির প্রকৃতি তখন জানা ছিল না বলে তার নাম দেওয়া হয়েছিল এক্স-রে। এখন আমরা জানি এক্স-রে হচ্ছে আলোর মতোই বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গ, তবে তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আমাদের পরিচিত দৃশ্যমান আলো থেকে কয়েক হাজার গুণ ছোট, তাই তার শক্তিও সাধারণ আলো থেকে কয়েক হাজার গুণ বেশি। যেহেতু তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অনেক ছোট তাই আমরা খালি চোখে এক্স-রে দেখতে পাই না।

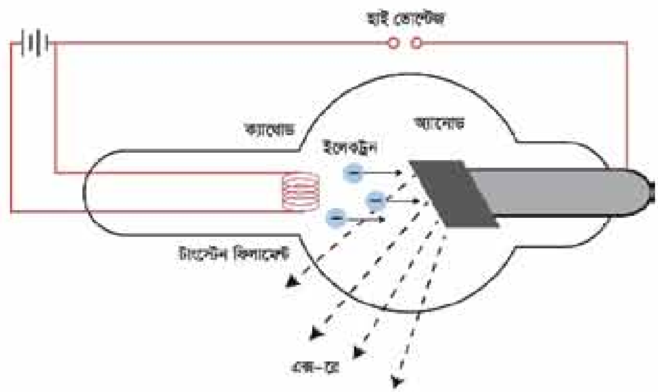

চিত্র 14.02: এক্স-রে টিউবের কার্যপদ্ধতি।

14.02 চিত্রে কীভাবে এক্স-রে তৈরি হয় সেটি দেখানো হয়েছে। একটি কাচের গোলকের দুই পাশে দুটি ইলেকট্রোড থাকে—একটি ক্যাথোড অন্যটি অ্যানোড। টাংস্টেনের তৈরি ক্যাথোডের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ করে সেটি উত্তপ্ত করা হয়। তাপের কারণে ফিলামেন্ট থেকে ইলেকট্রন মুক্ত হয় এবং অ্যানোডের

ধনাত্মক ভোল্টেজের কারণে সেটি তার দিকে ছুটে যায়। ক্যাথোড এবং অ্যানোডের ভেতর ভোল্টেজ যত বেশি হবে ইলেকট্রন তত বেশি গতিশক্তিতে অ্যানোডের দিকে ছুটে যাবে। এক্স-রে টিউবে এই ভোল্টেজ 100 হাজার ভোল্টের কাছাকাছি হতে পারে। ক্যাথোড থেকে প্রচণ্ড শক্তিতে ছুটে আসা ইলেকট্রনগুলো অ্যানোডকে আঘাত করে। এই শক্তিশালী ইলেকট্রনের আঘাতে অ্যানোডের পরমাণুর ভেতর দিকের কক্ষপথে থাকা ইলেকট্রন কক্ষপথচ্যুত হয়। তখন বাইরের দিকে কক্ষপথের কোনো একটি ইলেকট্রন সেই জায়গাটা পূরণ করে। এর কারণে যে শক্তিটুকু উদ্বৃত্ত হয়ে যায় সেটি শক্তিশালী এক্স-রে হিসেবে বের হয়ে আসে। ঠিক কত তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের এক্স-রে বের হবে সেটি নির্ভর করে অ্যানোড হিসেবে কোন ধাতু ব্যবহার করা হচ্ছে তার ওপর। সাধারণত তামাকে অ্যানোড হিসেবে ব্যবহার করা হয়। 14.03 চিত্রে একটি হাত এবং পায়ের এক্স-রে করা ছবি দেখানো হয়েছে। এক্স-রে অনেকভাবে ব্যবহার করা যায়, নিচে তার কয়েকটি ব্যবহারের তালিকা দেওয়া হলো।

চিত্র 14.03: হাত এবং পায়ের এক্স-রে।

(a) স্থানচ্যুত হাড়, হাড়ে ফাটল, ভেঙে যাওয়া হাড় ইত্যাদি খুব সহজে শনাক্ত করা যায়।

(b) দাঁতের ক্যাভিটি এবং অন্যান্য ক্ষয় বের করার জন্য এক্স-রে ব্যবহার করা হয়।

(c) পেটের এক্স-রে করে অন্ত্রের প্রতিবন্ধকতা (Intestinal Obstruction) শনাক্ত করা যায়।

(d) এক্স-রে দিয়ে পিত্তথলি ও কিডনিতে পাথরের অস্তিত্ব বের করা যায়।

(e) বুকের এক্স-রে করে ফুসফুসের রোগ যেমন যক্ষ্মা, নিউমোনিয়া, ফুসফুসের ক্যান্সার নির্ণয় করা যায়।

(f) এক্স-রে ক্যান্সার কোষকে মেরে ফেলতে পারে, তাই এটি রেডিওথেরাপিতে চিকিৎসার জন্য ব্যবহার করা হয়।

এক্স-রের অপ্রয়োজনীয় বিকিরণ যেন শরীরে কোনো ক্ষতি করতে না পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। এজন্যে কোনো রোগীর এক্স-রে নেওয়ার সময় এক্স-রে করা অংশটুকু ছাড়া বাকি শরীর সিসার তৈরি অ্যাপ্রোন দিয়ে ঢেকে নিতে হয়। অত্যন্ত প্রয়োজন না হলে গর্ভবতী মেয়েদের পেট বা তলপেটের অংশটুকু এক্স-রে করা হয় না।

14.4.2 আলট্রাসনোগ্রাফি (Ultrasonography)

আলট্রাসনোগ্রাফি দিয়ে শরীরের ভেতরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, মাংসপেশি ইত্যাদির ছবি তোলা হয়। এটি করার জন্য খুব উচ্চ কম্পাঙ্কের শব্দ ব্যবহার করে তার প্রতিধ্বনিকে শনাক্ত করা হয়। শব্দের কম্পাঙ্ক 1-10 মেগাহার্টজ হয়ে থাকে বলে একে আলট্রাসনোগ্রাফি বলা হয়ে থাকে। 14.04 চিত্রে সাধারণ 2D এবং সাম্প্রতিক আবিষ্কৃত 3D আলট্রাসনোগ্রাফি ছবি দেখানো হলো।

আলট্রাসনোগ্রাফি যন্ত্রে ট্রান্সডিউসার নামে একটি স্ফটিককে বৈদ্যুতিক শক্তি দিয়ে উদ্দীপ্ত করে উচ্চ কম্পাঙ্কের আলট্রাসনিক তরঙ্গ উৎপন্ন করা হয়। আলট্রাসনিক যন্ত্রে এই তরঙ্গকে একটা সরু বিমে পরিণত করা হয়। শরীরের ভেতরের যে অঙ্গটির প্রতিবিম্ব দেখার প্রয়োজন হয় ট্রান্সডিউসারটি শরীরের উপরে সেখানে স্পর্শ করে বিমটিকে শরীরের ভেতরে প্রবেশ করানো হয়, রোগী সে জন্য কোনো ব্যথা বা অস্বস্তি অনুভব করে না। যে অঙ্গের দিকে বিমটি নির্দেশ করা হয় সেই অঙ্গের প্রকৃতি অনুযায়ী আলট্রাসনিক তরঙ্গ প্রতিফলিত, শোষিত বা সংবাহিত হয়। যখন বিমটি মাংসপেশি বা রক্তের বিভিন্ন ঘনত্বের বিভেদতলে আপতিত হয় তখন তরঙ্গের একটি অংশ প্রতিধ্বনিত হয়ে পুনরায় ট্রান্সডিউসারে ফিরে আসে। এই প্রতিধ্বনিগুলোকে বৈদ্যুতিক সংকেতে রূপান্তর করে সমন্বিত করে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবিম্ব তৈরি করে।

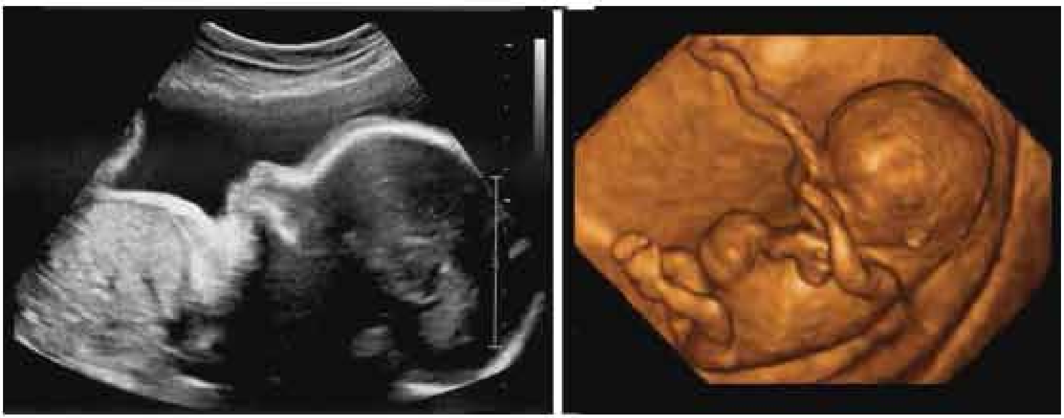

চিত্র 14.04: সাধারণ 2D এবং 3D আলট্রাসনোগ্রাফি ছবি।

আলট্রাসনোগ্রাফি নিচের কাজগুলো করার জন্য ব্যবহার করা হয়:

(a) আলট্রাসনোগ্রাফির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার স্ত্রীরোগ এবং প্রসূতিবিজ্ঞানে। এর সাহায্যে ভ্রূণের আকার, গঠন, স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক অবস্থান ইত্যাদি জানা যায়, প্রসূতিবিজ্ঞানে এটি একটি দ্রুত, নিরাপদ এবং নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি।

(b) আলট্রাসনোগ্রাফি দিয়ে জরায়ুর টিউমার এবং অন্যান্য পেলভিক মাসের (Pelvic Mass) উপস্থিতিও শনাক্ত করা যায়।

(c) পিত্তপাথর, হৃদযন্ত্রের ত্রুটি এবং টিউমার বের করার জন্যও আলট্রাসনোগ্রাম ব্যবহার করা হয়। হৃৎপিণ্ড পরীক্ষা করার জন্য যখন আলট্রাসাউন্ড ব্যবহার করা হয় তখন এই পরীক্ষাকে ইকোকার্ডিওগ্রাফি বলে।

এক্স-রের তুলনায় আলট্রাসনোগ্রাফি অনেক বেশি নিরাপদ, তবুও এটাকে ঢালাওভাবে ব্যবহার না করে সীমিত সময়ের জন্য ব্যবহার করা হয়। ট্রান্সডিউসারটি যেন কোনো নির্দিষ্ট স্থানে বেশি সময়ের জন্য একটানা বিম না পাঠায় সেজন্য আলট্রাসাউন্ড করার সময় ট্রান্সডিউসারটিকে ক্রমাগত নড়াচড়া করাতে হয়।

14.4.3 সিটি স্ক্যান (CT Scan)

সিটি স্ক্যান শব্দটি ইংরেজি Computed Tomography Scan এর সংক্ষিপ্ত রূপ। টমোগ্রাফি বলতে বোঝানো হয় ত্রিমাত্রিক বস্তুর একটি ফালির বা দ্বিমাত্রিক অংশের প্রতিবিম্ব তৈরি করা। চিকিৎসাবিজ্ঞানে এই যন্ত্রে এক্স-রে ব্যবহার করা হয়। সাধারণ এক্স-রে করার সময় শরীরের ভেতরের একবার ত্রিমাত্রিক অঙ্গের দ্বিমাত্রিক একটা প্রতিচ্ছবি নেওয়া হয়। সিটি স্ক্যান যন্ত্রে একটি এক্স-রে টিউব রোগীর শরীরকে বৃত্তাকারে ঘুরে এক্স-রে নির্গত করতে থাকে এবং অন্য পাশে ডিটেক্টর প্রতিবিম্ব গ্রহণ করতে থাকে। প্রতিবিম্বটি স্পষ্ট করার জন্য অনেক সময় রোগীর শরীরে বিশেষ Contrast দ্রব্য ইনজেকশন করা হয়।

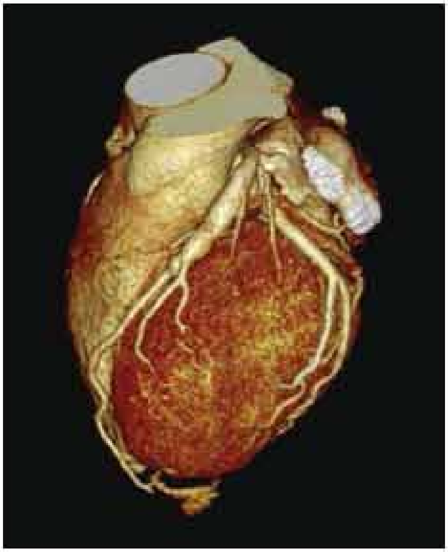

চিত্র 14.05: হৃৎপিণ্ডের সিটি স্ক্যান।

বৃত্তাকারে চারপাশের এক্স-রে প্রতিবিম্ব পাওয়ার পর কম্পিউটার দিয়ে সেগুলো বিশ্লেষণ করে সমন্বয় করা হয় এবং একটি পরিপূর্ণ ফালির (Slice) অভ্যন্তরীণ গঠন পাওয়া যায়। একটি ফালির ছবি নেওয়ার পর সিটি স্ক্যান করার যন্ত্র রোগীকে একটুখানি সামনে সরিয়ে আবার বৃত্তাকারে চারদিক থেকে এক্স-রে প্রতিচ্ছবি গ্রহণ করে, যেগুলো বিশ্লেষণ করে দ্বিতীয় আরেকটি ফালির অভ্যন্তরীণ গঠনের একটি পূর্ণাঙ্গ ছবি তৈরি করে (চিত্র 14.05)। এভাবে রোগীকে একটু একটু করে সামনে এগিয়ে নিয়ে তার শরীরের কোনো একটি অঙ্গের অনেকগুলো ফালির প্রতিচ্ছবি নেওয়া হয়। একটা

রুটির অনেকগুলো স্লাইস পরপর সাজিয়ে নিয়ে আমরা যেরকম পুরো রুটিটি পেয়ে যাই, ঠিক সেরকম শরীরের কোনো অংশের অনেকগুলো স্লাইসের ছবি একত্র করে আমরা রোগীর শরীরের ভেতরের একটা ত্রিমাত্রিক প্রতিচ্ছবি তৈরি করে নিতে পারি। সিটি স্ক্যানের কাজের পদ্ধতিটি দেখে তোমরা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছ এটি অত্যন্ত ব্যয়বহুল জটিল এবং একটি বিশাল যন্ত্র। তবে শরীরের ভেতরে না গিয়ে বাইরে থেকেই শরীরের ভেতরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নিখুঁত ত্রিমাত্রিক ছবি তৈরি করতে পারে বলে এটি আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের খুব প্রয়োজনীয় একটি যন্ত্র হয়ে (চিত্র 14.06) দাঁড়িয়েছে।

চিত্র 14.06: সিটি স্ক্যান করার যন্ত্র।

সিটি স্ক্যান করে নিচের কাজগুলো করা সম্ভব:

(a) সিটি স্ক্যানের সাহায্যে শরীরের নরম টিস্যু, রক্তবাহী শিরা বা ধমনি, ফুসফুস, ব্রেন ইত্যাদির পূর্ণাঙ্গ ছবি পাওয়া যায়।

(b) যকৃৎ, ফুসফুস এবং অগ্ন্যাশয়ের ক্যান্সার শনাক্ত করার কাজে সিটি স্ক্যান ব্যবহার করা হয়।

(c) সিটি স্ক্যানের প্রতিবিম্ব টিউমারকে শনাক্ত করতে পারে। টিউমারের আকার ও অবস্থান সম্পর্কে বলতে পারে এবং সেটি টিউমারের আশপাশের টিস্যুকে কী পরিমাণ আক্রান্ত করেছে সেটিও জানিয়ে দিতে পারে।

(d) মাথার সিটি স্ক্যানের সাহায্যে মস্তিষ্কের ভেতর কোনো ধরনের রক্তপাত হয়েছে কি না, ধমনি ফুলে গেছে কি না কিংবা কোনো টিউমার আছে কি না সেটি বলে দেওয়া যায়।

(e) শরীরে রক্ত সঞ্চালনে সমস্যা আছে কি না সেটিও সিটি স্ক্যান করে জানা যায়।

সতর্কতা: সিটি স্ক্যান করার জন্য যেহেতু এক্স-রে ব্যবহার করা হয় তাই গর্ভবতী মহিলাদের সিটি স্ক্যান করা হয় না। ছবির কন্ট্রাস্ট বাড়ানোর জন্য যে "ডাই" ব্যবহার করা হয় সেটি কারো কারো শরীরে অ্যালার্জির জন্ম দিতে পারে বলে সেটি ব্যবহার করার আগে সতর্ক থাকতে হয়।

14.4.4 এমআরআই (MRI: Magnetic Resonance Imaging)

মানুষের শরীরের প্রায় সত্তর ভাগ পানি, যার অর্থ মানুষের শরীরের প্রায় সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গে পানি থাকে (পানির প্রতিটি অণুতে থাকে হাইড্রোজেন এবং হাইড্রোজেনের নিউক্লিয়াস হচ্ছে প্রোটন।) শক্তিশালী

চৌম্বকক্ষেত্র প্রয়োগ করলে প্রোটনগুলো চৌম্বকক্ষেত্রের দিকে সারিবদ্ধ হয়ে যায়, তখন নির্দিষ্ট একটি কম্পনের বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গ পাঠানো হলে এই প্রোটনগুলো সেই তরঙ্গ থেকে শক্তি গ্রহণ করে তাদের দিক পরিবর্তন করে এবং এই প্রক্রিয়াটিকে বলে নিউক্লিয়ার ম্যাগনেটিক রেজোনেন্স (অনুনাদ)। পদার্থবিজ্ঞানের এই চমকপ্রদ ঘটনাটির ওপর ভিত্তি করে ম্যাগনেটিক রেজোনেন্স ইমেজিং বা এমআরআই তৈরি করা হয়েছে (চিত্র 14.07)।

এমআরআই যন্ত্রটি দেখতে সিটি স্ক্যান যন্ত্রের মতো কিন্তু এর কার্যপ্রণালি সম্পূর্ণ ভিন্ন। সিটি স্ক্যান যন্ত্রে এক্স-রে পাঠিয়ে প্রতিচ্ছবি নেওয়া হয়, এমআরআই যন্ত্রে একজন রোগীকে অনেক শক্তিশালী চৌম্বকক্ষেত্রে রেখে তার শরীরে রেডিও ফ্রিকোয়েন্সির বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গ দেওয়া হয়। শরীরের পানির অণুর ভেতরকার হাইড্রোজেনের প্রোটন থেকে ফিরে আসা সংকেতকে কম্পিউটার দিয়ে বিশ্লেষণ করে শরীরের ভেতরকার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রতিবিম্ব তৈরি করা হয়।

সিটি স্ক্যান দিয়ে যা কিছু করা সম্ভব, এমআরআই দিয়েও সেগুলো করা যায়। তবে এমআরআই দিয়ে শরীরের ভেতরকার কোমল টিস্যুর ভেতরকার পার্থক্যগুলো ভালো করে বোঝা সম্ভব। সিটি স্ক্যান করতে পাঁচ থেকে দশ মিনিটের বেশি সময়ের দরকার হয় না, সেই তুলনায় এমআরআই করতে একটু বেশি সময় নেয়। সিটি স্ক্যানে এক্স-রে ব্যবহার করা হয় বলে যত কমই হোক তেজস্ক্রিয়তার একটু ঝুঁকি থাকে, এমআরআইয়ে সেই ঝুঁকি নেই।

শরীরের ভেতরে কোনো ধাতব কিছু থাকলে (যেমন: পেস মেকার) এমআরআই করা যায় না, কারণ আর এফ তরঙ্গ ধাতুকে উত্তপ্ত করে বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে।

চিত্র 14.07: এমআরআই করার যন্ত্র।

14.4.5 এনজিওগ্রাফি (Angiography)

এক্স-রের মাধ্যমে শরীরের রক্তনালিগুলো দেখার জন্য এনজিওগ্রাফি ব্যবহার করা হয়। সাধারণ এক্স-রে করে রক্তনালি ভালোভাবে দেখা যায় না বলে এনজিওগ্রাফি করার সময় রক্তনালিতে বিশেষ Contrast Material বা বৈসাদৃশ্য তরল (ডাই) ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। রক্তনালির যে অংশটুকু পরীক্ষা করতে হবে ঠিক সেখানে ডাই দেওয়ার জন্য একটি সরু এবং নমনীয় নল কোনো একটি আর্টারি দিয়ে শরীরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। এই সরু এবং নমনীয় নলটিকে বলে ক্যাথিটার। ক্যাথিটার দিয়ে রক্তনালির নির্দিষ্ট জায়গায় ডাই দেওয়ার পর সেই এলাকায় এক্স-রে নেওয়া হয়। ডাই থাকার কারণে এক্স-রেতে

রক্তনালিগুলোকে স্পষ্ট দেখা যায়। তাই পরে কিডনির সাহায্যে ছেঁকে আলাদা করা হয় এবং প্রস্রাবের সাথে শরীর থেকে বের হয়ে যায়।

সাধারণত যেসব সমস্যা পরীক্ষা করার জন্য ডাক্তাররা এনজিওগ্রাম করার পরামর্শ দেন, সেগুলো হচ্ছে:

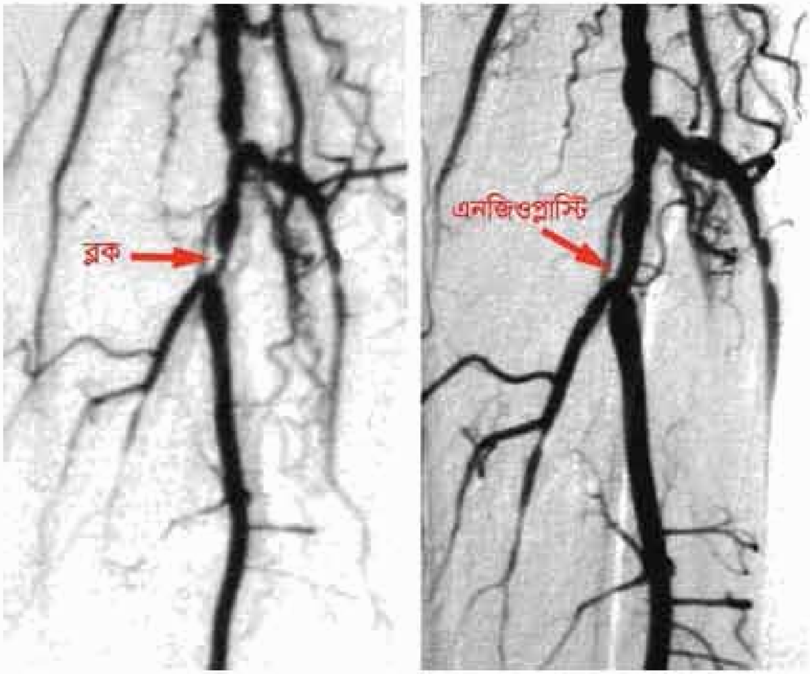

চিত্র 14.08: বামের ছবিতে রক্তনালিগুলোর এনজিওগ্রাফিতে ধমনিতে ব্লকেজ দেখা যাচ্ছে এবং ডানের ছবিতে এনজিওপ্লাস্টি করার পর স্বাভাবিক রক্তপ্রবাহ।

(a) হৃৎপিণ্ডের বাইরের ধমনিতে ব্লকেজ হলে (চিত্র 14.08)। রক্তনালি ব্লক হলে রক্তের স্বাভাবিক প্রবাহ হতে পারে না, হৃৎপিণ্ডে যথেষ্ট রক্ত সরবরাহ করা না হলে সেটি ঠিকভাবে কাজ করতে পারে না এবং হার্ট অ্যাটাকের আশঙ্কা বেড়ে যায়।

(b) ধমনি প্রসারিত হলে

(c) কিডনির ধমনির অবস্থাগুলো বোঝার জন্য

(d) শিরার কোনো সমস্যা হলে।

সিটি স্ক্যান কিংবা এমআরআই করার সময় সকল পরীক্ষা শরীরের বাইরে থেকে করা হয়। এনজিওগ্রাম করার সময় একটি ক্যাথিটার শরীরের ভেতরের রক্তনালিতে ঢোকানো হয় বলে কোনো রকম সার্জারি না করেই তাৎক্ষণিকভাবে রক্তনালি ব্লকের চিকিৎসা করা সম্ভব। যে প্রক্রিয়ায়

এনজিওগ্রাম করার সময় ধমনির ব্লক মুক্ত করা হয় তাকে এনজিওপ্লাস্টি বলা হয়। এনজিওপ্লাস্টি করার সময় ক্যাথিটার দিয়ে ছোট একটি বেলুন পাঠিয়ে সেটি ফুলিয়ে রক্তনালিকে প্রসারিত করে দেখা হয়। অনেক ক্ষেত্রে সেখানে একটি রিং (ring) প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয় যেন সংকুচিত ধমনিটি প্রসারিত থাকে এবং প্রয়োজনীয় রক্তের প্রবাহ হতে পারে।

14.4.5 এন্ডোসকপি (Endoscopy)

চিকিৎসাজনিত কারণে শরীরের ভেতরের কোনো অঙ্গ বা গহ্বরকে বাইরে থেকে সরাসরি দেখার প্রক্রিয়াটির নাম এন্ডোসকপি। এন্ডোসকোপি যন্ত্র দিয়ে শরীরের ফাঁপা অঙ্গগুলোর ভেতরে পরীক্ষা করা যায় (চিত্র 14.09)।

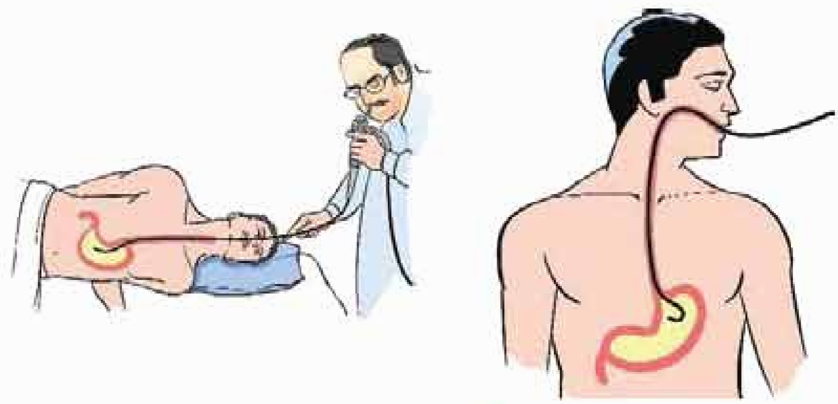

চিত্র 14.09: এন্ডোসকপির মাধ্যমে পাকস্থলীর ভেতরে দেখার প্রক্রিয়া।

এন্ডোসকপি যন্ত্রে দুটি স্বচ্ছ নল থাকে। একটি নল দিয়ে বাইরে থেকে রোগীর শরীরের নির্দিষ্ট অঙ্গের ভেতরে তীব্র আলো ফেলা হয়। এটি করা হয় অপটিক্যাল ফাইবার দিয়ে, আলো এই ফাইবারে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের মাধ্যমে প্রবেশ করে। রোগীর শরীরের ক্ষতিগ্রস্ত বা রোগাক্রান্ত জায়গাটি আলোকিত করার পর সেই এলাকার ছবিটি দ্বিতীয় স্বচ্ছ নলের ভেতর দিয়ে দেখা যায়। কোনো বস্তু দেখতে হলে সেটি সরলরেখায় থাকতে হয় কিন্তু শরীরের ভেতরের কোনো অংশের ভেতরে সরলরেখায় তাকানো সম্ভব নয়, তাই ছবিটি দেখার জন্য অপটিক্যাল ফাইবার ব্যবহার করা হয়, যেখানে আলো পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন করে আঁকাবাঁকা পথে যেতে পারে। শরীরের অভ্যন্তরের একটি নির্দিষ্ট জায়গা সূক্ষ্মভাবে দেখার জন্য অত্যন্ত সরু 5 থেকে 10 হাজার অপটিক্যাল ফাইবারের একটি বান্ডিল ব্যবহার করা হয়। প্রত্যেকটি ফাইবার একটি বিন্দুর প্রতিচ্ছবি নিয়ে আসে বলে সব মিলিয়ে অত্যন্ত নিখুঁত একটি ছবি দেখা সম্ভব হয়। অপটিক্যাল ফাইবার অত্যন্ত সরু হয় বলে 5 থেকে 10 হাজার ফাইবারের বান্ডিলটির প্রস্থচ্ছেদও কয়েক মিলিমিটার থেকে বেশি হয় না।

বর্তমানে অত্যন্ত ক্ষুদ্র সিসিডি ক্যামেরার প্রযুক্তির কারণে এন্ডোসকপি যন্ত্রের আগায় একটি ক্ষুদ্র ক্যামেরা বসিয়ে সেটি সরাসরি শরীরের ভেতরে ঢুকিয়ে ভিডিও সিগন্যাল দেখা সম্ভবপর হচ্ছে। এন্ডোসকপি ব্যবহার করে ডাক্তাররা যেকোনো ধরনের অস্বস্তিবোধ, ক্ষত, প্রদাহ এবং অস্বাভাবিক কোষ বৃদ্ধি পরীক্ষা করে থাকেন। যে অঙ্গগুলো পরীক্ষা করার জন্য এন্ডোসকপি ব্যবহার করা হয় সেগুলো হচ্ছে:

(a) ফুসফুস এবং বুকের কেন্দ্রীয় বিভাজন অংশ।
(b) পাকস্থলী, ক্ষুদ্রান্ত্র, বৃহদন্ত্র বা কোলন।
(c) স্ত্রী প্রজনন অঙ্গ।
(d) উদর এবং পেলভিস।
(e) মূত্রনালির অভ্যন্তর ভাগ।
(f) নাসাপথ, নাকের চারপাশের সাইনাস এবং কান।

এন্ডোসকপি করার সময় যেহেতু একটি নল সরাসরি ক্ষত স্থানে প্রবেশ করানো হয় সেটি দিয়ে সেই ক্ষত স্থানের Sample নিয়ে আসা সম্ভব এবং প্রয়োজনে এটা ব্যবহার করে কিছু কিছু সার্জারিও করা সম্ভব।

14.4.6 ইসিজি (ECG)

ইসিজি হলো ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম (Electro Cardiogram) শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। ইসিজি করে মানুষের হৃৎপিণ্ডের বৈদ্যুতিক এবং পেশিজনিত কাজকর্মগুলো পর্যবেক্ষণ করা যায়। আমরা জানি বাইরের কোনো উদ্দীপনা ছাড়াই হৃৎপিণ্ড ক্ষুদ্র বৈদ্যুতিক সংকেত তৈরি করে এবং এই সংকেত পেশির ভেতর ছড়িয়ে পড়ে, যার কারণে হৃৎস্পন্দন হয়। ইসিজি যন্ত্র (চিত্র 14.10) ব্যবহার করে আমরা হৃৎপিণ্ডে এই বৈদ্যুতিক সংকেতগুলো শনাক্ত করতে পারি। এর সাহায্যে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন হার এবং ছন্দময়তা পরিমাপ করা যায়। ইসিজি সিগন্যাল হৃৎপিণ্ডের মধ্যে রক্তপ্রবাহের একটি পরোক্ষ প্রমাণ দেয়।

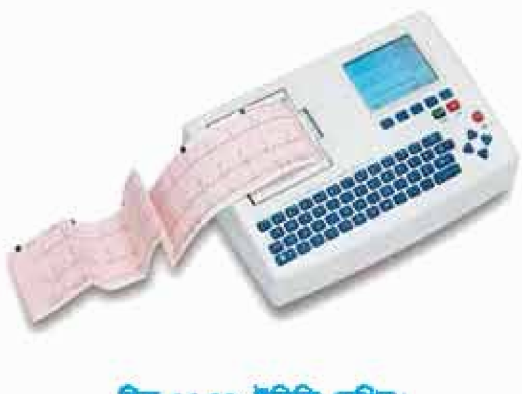

চিত্র 14.10: ইসিজি মেশিন।

ইসিজি করতে হলে বৈদ্যুতিক সংকেতগুলো গ্রহণ করার জন্য শরীরে ইলেকট্রোড লাগাতে হয়। দুই হাতে দুটি, দুই পায়ে দুটি এবং ছয়টি হৃৎপিণ্ডের অবস্থানসংলগ্ন বুকের ওপর লাগানো হয়। প্রত্যেকটি ইলেকট্রোড থেকে বৈদ্যুতিক সংকেতকে সংগ্রহ করা হয়। এই সংকেতগুলোকে যখন ছাপানো হয় (চিত্র 14.11) তখন সেটিকে বলে ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম।

একজন সুস্থ মানুষের প্রত্যেকটি ইলেকট্রোড থেকে পাওয়া বিদ্যুৎ সংকেতের একটা স্বাভাবিক নকশা থাকে। যদি কোনো মানুষের হৃৎপিণ্ডে অস্বাভাবিক অবস্থা তৈরি হয় তখন তার ইলেকট্রোড থেকে পাওয়া সংকেতগুলো স্বাভাবিক নকশা থেকে ভিন্ন হবে।

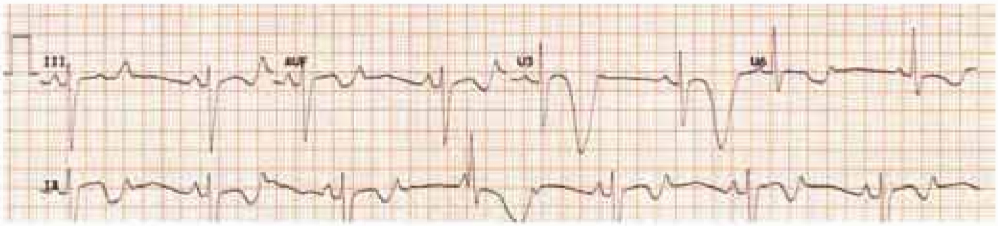

চিত্র 14.11: ইসিজি মেশিন থেকে পাওয়া বিদ্যুৎ সংকেত।

সাধারণ কোনো রোগের কারণ হিসেবে বুকের ধড়ফড়ানি, অনিয়মিত কিংবা দ্রুত হৃৎস্পন্দন বা বুকের ব্যথা হলে ইসিজি করা হয়। এছাড়া নিয়মিত চেকআপ করার জন্য কিংবা বড় অপারেশনের আগে ইসিজির সাহায্য নেওয়া হয়। হৃৎপিণ্ডের যেসব ইসিজি করা যায় সেগুলো হচ্ছে:

(a) হৃৎপিণ্ডের যেসব অস্বাভাবিক স্পন্দন অর্থাৎ স্পন্দনের হার বেশি বা কম হলে
(b) হার্ট অ্যাটাক হয়ে থাকলে
(c) হৃৎপিণ্ডের আকার বড় হয়ে থাকলে

ইসিজি মেশিনটি অত্যন্ত সহজ-সরল মেশিন কিন্তু এটি ব্যবহার করে শরীরের ভেতরকার হৃৎপিণ্ডের অবস্থার অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায় বলে একজন রোগীর চিকিৎসার জন্য এটি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়।

14.4.7 ইটিটি (ETT)

ইংরেজি Exercise Tolerance Test এর সংক্ষিপ্ত রূপ হলো ইটিটি। ব্যায়াম বা অনুশীলন করার সময় ইসিজি করাকেই ইটিটি বলা হয়ে থাকে।

স্বাভাবিক অবস্থায় হৃৎপিণ্ড থেকে যে বৈদ্যুতিক সংকেত আসে সেখানে অনেক সময় হৃৎপিণ্ডের প্রকৃত অবস্থাটি বোঝা যায় না। রোগীকে বাড়তি শারীরিক পরিশ্রম বা ব্যায়াম করানো হলে হৃৎপিণ্ডের

ওপর বাড়তি চাপ পড়ে, তখন হৃৎপিন্ডের বৈদ্যুতিক সক্রিয়তা এবং স্পন্দনের হার এবং ছন্দময়তা দেখে হৃৎপিন্ডের করোনারি ধমনিতে আংশিক অবরুদ্ধ অবস্থা থাকলে সেটি অনেক সময় ইটিটি করে শনাক্ত করা যায়।

ইটিটি করার সময় রোগীকে বাড়তি শারীরিক পরিশ্রম করানোর জন্য স্থির সাইকেল চালাতে হয় কিংবা ট্রেডমিলে হাঁটতে হয়। পরীক্ষার সময় সাইকেলের চাকার গতি ধীরে ধীরে বাড়ানো হয় কিংবা ট্রেডমিলের ঢাল বাড়ানো হয় এবং এই বাড়তি পরিশ্রমের কারণে রোগীর হৃৎপিণ্ড কী রকম প্রতিক্রিয়া করে সেটা দেখার জন্য ইসিজি রেকর্ড করা হয়। সাধারণত একজন ডাক্তার সার্বক্ষণিকভাবে রোগীর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন।

ইটিটি পরীক্ষার সময় অনুশীলনের সময় রোগীর হৃৎপিন্ডে যে পরিবর্তনগুলো হয় ইসিজিতে একজন ডাক্তার সেগুলো শনাক্ত করে রোগীর চিকিৎসার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

14.5 রোগ নিরাময়ে পদার্থবিজ্ঞান (Physics in Treatment)

14.5.1 রেডিওথেরাপি (Radio Therapy)

রেডিওথেরাপি শব্দটি ইংরেজি Radiation Therapy শব্দটির সংক্ষিপ্ত রূপ। রেডিওথেরাপি হচ্ছে কোনো রোগের চিকিৎসায় তেজস্ক্রিয় বিকিরণের ব্যবহার। এটি মূলত ক্যান্সার রোগের চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয়। রেডিওথেরাপিতে সাধারণত উচ্চ ক্ষমতার এক্স-রে ব্যবহার করে ক্যান্সার কোষকে ধ্বংস করা হয়। এই এক্স-রে ক্যান্সার কোষের ভেতরকার ডিএনএ (DNA) ধ্বংস করে কোষের সংখ্যা বৃদ্ধি করার ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়। একটি টিউমারকে সার্জারি করার আগে ছোট করে নেওয়ার জন্য কিংবা সার্জারির পর টিউমারের অবশিষ্ট অংশ ধ্বংস করার জন্যও রেডিওথেরাপি করা হয়।

চিত্র 14.12: রেডিওথেরাপি যন্ত্র।

বাইরে থেকে রেডিওথেরাপি দিয়ে চিকিৎসা করার জন্য সাধারণত একটি লিনিয়ার এক্সেলেটর ব্যবহার করে উচ্চক্ষমতার এক্স-রে তৈরি করা হয়। শরীরে যেখানে টিউমারটি থাকে সেদিকে তাক করে

তেজস্ক্রিয় বিষটি পাঠানো হয় (চিত্র 14.12)। বিষটি তখন শুধু ক্যান্সার কোষকে ধ্বংস করে দেয় না, তার বিভাজনক্ষমতাও নষ্ট করে দেয়। বিষটি শুধু ক্যান্সার আক্রান্ত জায়গায় পাঠানো সম্ভব হয় না বলে আশপাশের কিছু সুস্থ কোষও ধ্বংস হয় কিন্তু এই রেডিওথেরাপি বন্ধ হওয়ার পর সুস্থ কোষগুলো আবার সক্রিয় হয়ে উঠতে শুরু করে।

14.5.2 আইসোটোপ এবং এর ব্যবহার (Isotopes and Their Uses)

তোমরা জানো একটি মৌলিক পদার্থের নিউক্লিয়াসে নিউট্রনের সংখ্যা ভিন্ন হলে তাকে সেই মৌলিক পদার্থের আইসোটোপ বলে। প্রকৃতিতে অনেক মৌলের বিভিন্ন আইসোটোপকে স্বাভাবিকভাবে তেজস্ক্রিয় হিসেবে পাওয়া যায় আবার নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া করে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ বানানো সম্ভব। চিকিৎসার ক্ষেত্রে অনেক সময়ই এই তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহার করা হয়। এই আইসোটোপগুলো রোগ নির্ণয় করার জন্য যেরকম ব্যবহার করা যায় ঠিক সেরকম রোগ নিরাময়ের জন্যও ব্যবহার করা যায়।

শরীরের কোনো কোনো অংশে মাঝে মাঝে আলাদাভাবে বিশেষ কোনো যৌগিক পদার্থ যুক্ত হয়। সেই যৌগিক পদার্থের পরিমাণ দেখে অঙ্গটি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া সম্ভব। যৌগটির পরিমাণ বোঝার জন্য যৌগটির কোনো একটি পরমাণুকে তার একটি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ দিয়ে পাল্টে দেওয়া হয় এবং সেই তেজস্ক্রিয় আইসোটোপটির বিকিরণ থেকে নির্দিষ্ট অঙ্গে যৌগের পরিমাণ বোঝা যায়। সাধারণত আইসোটোপটি গামা রে বিকিরণ করে এবং বাইরে থেকেই এই গামা রে শনাক্ত করা যায়।

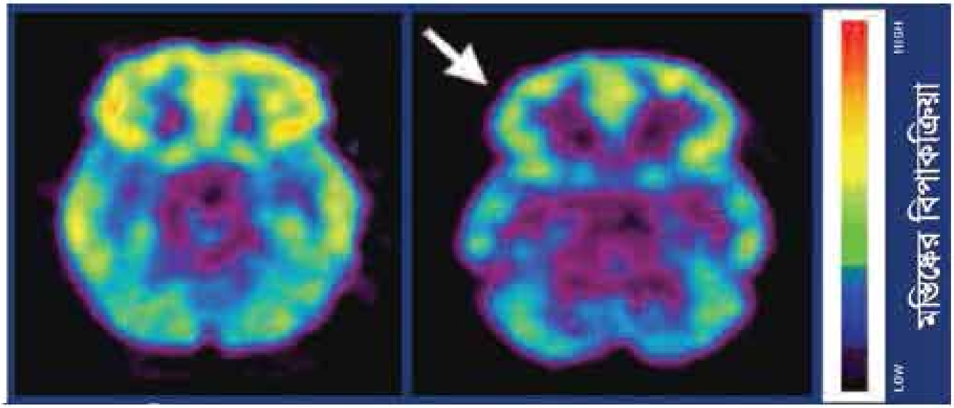

চিত্র 14.13: PET scan দিয়ে দেখা স্বাভাবিক এবং কোকেন মাদকাসক্ত মানুষের মস্তিষ্কের ক্রিয়াশীল অংশের ছবি।

তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহারের একটি চমকপ্রদ উদাহরণ PET বা Positron Emission Tomography যেখানে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপটি পজিট্রন বিকিরণ করে। তোমরা জানো পজিট্রন ইলেকট্রনের প্রতি কনা (anti particle) এবং এটি ইলেকট্রনের সাথে যুক্ত হয়ে শক্তিতে রূপান্তর হয়। এই শক্তি দুটো গামা রে হিসেবে বিপরীত দিকে বের হয়ে আসে। কাজেই বিপরীত দিকে দুটি নির্দিষ্ট শক্তির গামা রে শনাক্ত করে পজিট্রনটি কোথা থেকে বের হয়েছে সেটি বের করে নেওয়া যায়। সেই তথ্য থেকে আমরা শুধু যে পজিট্রন তৈরির অস্তিত্ব জানতে পারি তা নয়, সেটি ঠিক কোথায় কতটুকু আছে সেটাও বলে দিতে পারি। গ্লুকোজের ভেতর পজিট্রন বিকিরণ করে সেরকম একটি আইসোটোপ যুক্ত করে দিলে PET ব্যবহার করে আমরা মস্তিষ্কের কোথায় কতটুকু গ্লুকোজ জমা হয়েছে সেটি বের করতে পারব। এই তথ্য থেকে কোন সময় মস্তিষ্কের কোন অংশ বেশি ক্রিয়াশীল এবং বেশি গ্লুকোজ ব্যবহার করেছে (চিত্র 14.13) সেই তথ্যও বের করা সম্ভব। PET প্রযুক্তি মানুষের মস্তিষ্কের কর্মপদ্ধতি বের করার ব্যাপারে যুগান্তকারী ভূমিকা রেখেছে।

তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহার করে শুধু যে রোগ নির্ণয় বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কর্মপদ্ধতি বের করা হয় তা নয়, এটি দিয়ে রোগ নিরাময়ও করা হয়। কোবাল্ট-60 (^{60}Co) একটি গামা রে বিকিরণকারী আইসোটোপ, এই আইসটোপ ব্যবহার করে ক্যান্সার আক্রান্ত কোষকে গামা রে দিয়ে ধ্বংস করা হয়। আয়োডিন-131 (^{131}I) থাইরয়েডের চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয়, থাইরয়েডের চিকিৎসায় এটি এতই কার্যকর, যা আজকাল থাইরয়েডের সার্জারির সেরকম প্রয়োজন হয় না।

এছাড়া লিউকেমিয়া নামে রক্তের ক্যান্সারের চিকিৎসায় তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ফসফরাস-32 (^{32}P) যুক্ত ফসফেট ব্যবহার করা হয়।

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন

1. ভৌতজগৎ ও জীবজগৎ কি সম্পূর্ণ ভিন্ন নিয়মে চলে?
2. জীবপদার্থবিজ্ঞানের সূচনা কীভাবে হলো?
3. পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মগুলো কেন জীবজগতের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়?
4. পদার্থবিজ্ঞানে জগদীশচন্দ্র বসুর অবদান বর্ণনা করো।

5. জীবপদার্থবিজ্ঞানে তাঁর অবদান কী?

6. মানবদেহ কখনো কখনো যন্ত্রের মতো আচরণ করে—ব্যাখ্যা করো।

7. মানবদেহ একটি জৈব যন্ত্র—এর সপক্ষে যুক্তি দাও।

8. পদার্থবিজ্ঞানের উদ্ভাবিত যন্ত্রপাতি কীভাবে চিকিৎসা ক্ষেত্রে কাজে লাগে।

9. রোগ নির্ণয়ের জন্য ব্যবহৃত কতগুলো যন্ত্রপাতির নাম লেখ।

10. এক্স-রে কী? রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে এর ব্যবহার লেখ।

11. আলট্রাসনোগ্রাফি কীভাবে চিকিৎসাক্ষেত্রে রোগ নির্ণয় করে।

12. এমআরআই-এর মাধ্যমে প্রাপ্ত প্রতিবিম্বের বর্ণনা দাও।

13. ইসিজির সাহায্যে কোন কোন রোগ নির্ণয় করা যায়?

14. এন্ডোসকপি যন্ত্র কী কাজে ব্যবহৃত হয়?

15. চিকিৎসাক্ষেত্রে রেডিওথেরাপি কেন ব্যবহার করা হয়?

16. ইটিটি এক ধরনের ইসিজি পরীক্ষা—বর্ণনা করো।

17. কোন কোন ক্ষেত্রে এনজিওগ্রাম করা হয়?

18. আইসোটোপ কী? চিকিৎসাক্ষেত্রে এটি কী কাজে লাগে?

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটির পাশে ঠিক (√) চিহ্ন দাও

1. বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর সাথে কোন বিষয়টি সংশ্লিষ্ট?
   i. বসু মন্দির প্রতিষ্ঠা
   ii. তেজস্ক্রিয় মৌলের ব্যবহার
   iii. ক্রেস্কোগ্রাফ আবিষ্কার

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i　　(খ) i ও ii
(গ) i ও iii　　(ঘ) i, ii ও iii

2. X-Ray ফিল্মে হাড়ের ছবি স্পষ্ট দেখা যাওয়ার কারণ:

(ক) হাড় X-Ray দ্বারা অভেদ্য　　(খ) মাংসপেশি X-Ray দ্বারা অভেদ্য
(গ) তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অনেক বেশি　　(ঘ) উঁচু ভেদনক্ষমতাসম্পন্ন

3. সূক্ষ্ম রক্তনালিকার ব্লকেজ পরীক্ষা করার প্রযুক্তির নাম হলো:
   (ক) এনজিওগ্রাম (খ) এনজিওপ্লাস্টি
   (গ) ইটিটি (ঘ) ইসিজি

4. হৃৎস্পন্দনের হার অছন্দময়তা পরিমাপ করা হয় কীভাবে?
   (ক) তড়িৎ সংকেত শনাক্ত করে (খ) X-Ray এর মাধ্যমে
   (গ) নিউক্লীয় চৌম্বক অনুনাদের মাধ্যমে (ঘ) শব্দ তরঙ্গ ব্যবহার করে

সৃজনশীল প্রশ্ন

1. বিনুর চাচি মা হতে চলেছেন। চেকআপের জন্য তিনি নিয়মিত ডাক্তারের কাছে যান। কোনো এক মাসে ডাক্তার ভ্রূণের সঠিক অবস্থান ও আকার জানার জন্য তাকে একটি পরীক্ষা করার পরামর্শ দিলেন। আলট্রাসনোগ্রাফির মাধ্যমে তিনি পরীক্ষাটি করালেন এবং এর মাধ্যমে ডাক্তার ভ্রূণ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করলেন।
   (ক) এমআরআই-এর পূর্ণরূপ কী?
   (খ) আইসোটোপগুলো একটি নির্দিষ্ট মৌলের রূপভেদ কেন?
   (গ) ভ্রূণ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভে আলট্রাসনোগ্রাফির ভূমিকা আলোচনা করো।
   (ঘ) বিনুর চাচির পরীক্ষাটি অন্য কোনো চিকিৎসা প্রযুক্তির মাধ্যমে করা যাবে কি? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

2. দীর্ঘদিন ধরে কাশিতে ভুগতে থাকা রোগীর বুকের এক্স-রে রিপোর্ট দেখে ডাক্তার সিটি স্ক্যান করার পরামর্শ দিলেন। পাশাপাশি ব্যবস্থাপত্রে নিয়মিত খাবার জন্য ঔষধ লিখে দিয়ে সাত দিন পর দেখা করার কথা বললেন।
   (ক) এক্স-রে কী?
   (খ) এক্স-রের বদলে আলট্রাসনোগ্রাফি ব্যবহার কেন করা হয় না?
   (গ) উদ্দীপকে উল্লিখিত রোগীর ক্ষেত্রে সিটি স্ক্যান কী ধরনের উপকারে আসতে পারে– ব্যাখ্যা করো।
   (ঘ) উল্লিখিত রোগীর জন্য সিটি স্ক্যানের বিকল্প হিসেবে এমআরআই এর ব্যবহার করার সম্ভাবনা মূল্যায়ন করো।

সমাপ্ত

স্বাধীনতার
৫০
বছর
উন্নয়ন আমারও

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র: ‘শেখ হাসিনার উদ্যোগ, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ’

বিদ্যুৎ উৎপাদনে পারমাণবিক প্রযুক্তি সর্বাধিক নিরাপদ ও পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তি। বিশ্বে মোট বিদ্যুৎ চাহিদার ১০ ভাগ আসে পারমাণবিক প্রযুক্তি খাত থেকে। বাংলাদেশও বিশ্বের অন্যান্য উন্নত দেশের মতো ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা মেটানোর জন্য স্বল্প মূল্যে উৎপাদিত পরিবেশ বান্ধব এই প্রযুক্তির ব্যবহার করার প্রয়াসে পাবনা জেলার রূপপুরে দুই ইউনিট বিশিষ্ট পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করছে। প্রতিটি ইউনিট প্রায় ১২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন করবে। ১৯৬১ সালে পাবনা জেলায় ৬৩২ একরের উপর এই পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হলেও তা স্থগিত হয়ে যায়। ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পুনরায় প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেন। তারই ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে শেখ হাসিনা সরকারের উদ্যোগে ২০১৭ সালের নভেম্বরে প্রথম ইউনিট ও ২০১৮ সালে দ্বিতীয় ইউনিটের নির্মাণ কাজ শুরু হয় যা ২০২৩ বা ২০২৪ সাল থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষম হবে।

২০২৩

শিক্ষাবর্ষ

দাখিল

৯ম-১০ম পদার্থবিজ্ঞান

'কল্পনাশক্তি জ্ঞান থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ' —অ্যালবার্ট আইনস্টাইন

দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে হলে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে

– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য '৩৩৩' কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে ১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য